শ্রীচৈতন্যভাগবত

ভূমিকা

রাধাগোবিন্দ নাথ

সাধনা প্রকাশনী

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকা

আবির্ভাব ঃ ২০ শে মাঘ ১২৮৫

তিরোভাব ঃ ১৫ ই অগ্রহায়ন ১৩৭৭

বৈষ্ণবাচার্য ড. রাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাধনা প্রকাশনী

পূজ্যপাদ ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরমহোদয়-বিরচিত
এবং নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকাসম্বলিত সংস্করণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

(ভূমিকা)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং
কুমিল্লা ভিক্‌টোরিয়া কলেজের ও পরে নোয়াখালী চৌমুহানী কলেজের
প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ

রাধাগোবিন্দ নাথ

এম.এ., ডি.লিট্, পরাবিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ
ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর
কর্তৃক লিখিত

সাধনা প্রকাশনী

৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

শ্রীচৈতন্যভাগবত ভূমিকা প্রকাশের সময়
আষাঢ়, ১৩৭৩। শকাব্দা ১৮৮৮
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮৯। জুন, ১৯৬৬

নবকলেবর
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯
জুন, ২০১২

প্রকাশক ঃ সন্দীপন নাথ
সাধনা প্রকাশনী
৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সাধনা প্রেস
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ২২৩৭ ৮৪৫৬ / ২২১২ ১৬০০
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৯ ১১৪২৬

মুদ্রাকর ঃ
দাস এন্টারপ্রাইস
১৮০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

লেখকের নিবেদন

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের তদ্রূপ একটি টীকা লেখার নিমিত্ত, বহু সময়, বহু স্থানের বহু ভক্ত এই অযোগ্য অধমকে কৃপাদেশ করিয়া আসিতেছেন। "মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ"-নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে, সেই আদেশ বহুল-পরিমাণে আসিয়া উপনীত হইল। তখন মনে হইল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণাতেই এইরূপ আদেশ। মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তি। পুতুলের দ্বারাও তিনি তাঁহার অভীষ্ট কাজ করাইতে পারেন। ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তদের অভিলাষ-পূরণের নিমিত্ত এই অযোগ্য অধমের দ্বারাও কিছু কাজ করাইতে পারেন—এই ভরসাতেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের "নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা" লেখার অনধিকার-চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গৌরতত্ত্ব জানেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন-কলেবর, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার কৃপাব্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে বা লিখিতে সমর্থ নহে। শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর পুনঃ পুনঃ এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন। সে-জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই টীকা-লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং টীকার নামও দেওয়া হইয়াছে "নিতাই-করুণা কল্লোলিনী টীকা"। যখন যাহা চিত্তে জাগিয়াছে, তাহাকেই তাঁহার কৃপায় স্ফুরিত বলিয়া মনে করিয়াছি এবং তদনুসারেই টীকা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অবশ্য এই অধমের বিষয়-মলিন চিত্তের ভিতর দিয়াই তাহা স্ফুরিত হইয়াছে; সুতরাং এই অযোগ্য অধমের চিত্তের মলিনতায় তাহা আবৃত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। তবে ভরসা এই, অদোষদর্শী ভক্তবৃন্দ সেই মলিনতাটুকু বাদ দিয়া, গ্রহণীয় যদি কিছু থাকে, তাহাই গ্রহণ করিবেন। কৃপা করিয়া কেহ যদি শাস্ত্র-যুক্তির সহায়তায় ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া দেন, এই অযোগ্য অধম নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে।

পরম পূজনীয় নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয়, স্ব-রচিত টীকার সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। এই প্রভুপাদই বোধ হয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা-লিখনের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তাঁহার টীকা অতি সংক্ষিপ্ত। সেই জন্যই

বোধ হয়, এই অযোগ্য অধমের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপাদেশ। "নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকাতে" স্থলবিশেষে "অ: প্র."—এই সাঙ্কেতিক উক্তিতে স্বীকৃতি-জ্ঞাপন-পূর্বক প্রভুপাদের টীকা হইতেও কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রভুপাদের সংস্করণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাদটীকায় বহু হস্তলিখিত এবং মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে পাঠান্তর এবং অতিরিক্ত পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। এমন পৃষ্ঠা কমই আছে, যাহাতে এইরূপ উদ্ধৃতি নাই। ইহা যে গ্রন্থ-সম্পাদনে প্রভুপাদের অসাধারণ অধ্যবসায়, ধৈর্য এবং ন্যায়-নিষ্ঠতার পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, পরম-পণ্ডিত প্রভুপাদের সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠই বিশেষরূপে নির্ভরযোগ্য। এজন্য তাঁহার চরণে প্রণতি জানাইয়া এবং তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া, বর্তমান সংস্করণের মূল অংশের পাঠ প্রভুপাদের গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। পাঠান্তরাদিরও অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া প্রভুপাদের উদ্ধৃত পাঠান্তরাদি আমরা টীকার মধ্যেই উল্লেখ করিয়াছি। মূলের যে-শব্দগুলি পরিষ্কারভাবেই মুদ্রাকর-প্রমাদ বলিয়া বুঝা যায়, সে-গুলির সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। যেমন, উপষ্কার (১।৩।২৬২, উপস্কার), যায় (১।৫।১৩৮ ; যার), নামামত (১।৬।২৪ ; নানামত); বালন (১।৬।২২৬, বালক), বিষ্ণুযায়ামোহে (১।৬।২৩৮ ; বিষ্ণুমায়ামোহে), চিন্তিতে (১।৬।২৯৫ ; চিনিতে), রড় (১।৭।৪০ ; বড়), গঙ্গাম্নান (১।৭।১৬৭ ; গঙ্গাস্নান), সর্ব্বাঙ্গ (১।৮।১৭৩ ; সর্ব্বজ্ঞ), আসি (১।৮।১৭৬ ; আমি) ; শিক্ষা-শুরু (১।১০।১৫৫ ; শিক্ষাগুরু), বা (২।১।১৪৫ ; না), অদ্বৈতে (২।৬।১৫০ ; অদ্বৈতে), যতুসংহ (২।১৮।৭৭, যতুসিংহ), হইক (২।২৩।৫২১, হউক), কক্বত (৩।৪।৪৭২, সক্বত), ইশ্বর (৩।৮।৫১, ঈশ্বর) ইত্যাদি।

গ্রন্থের মূল অংশে প্রাচীন বর্ণবিন্যাসই রক্ষিত হইয়াছে। নানা কারণে টীকায় যথাসম্ভব আধুনিক বর্ণবিন্যাস-রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্বন্ধে স্থলবিশেষে কতকগুলি প্রতিকূল ধারণার কথা শুনা যায় বলিয়া, গ্রন্থকার ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের চরণ চিন্তা করিয়া, সে-সমস্ত ধারণার নিরসনের জন্য, একটু বিস্তৃতভাবেই এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলা-মহিমা-বর্ণনেই পরমভাগবত গ্রন্থকারের পরম আবেশ ছিল। একই স্থলে ধারাবাহিকভাবে কোনও তত্ত্বের বর্ণন-বিষয়ে তাঁহার অভিনিবেশ ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন স্থলে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, লীলা-মহিমা-বর্ণনের প্রসঙ্গে, তিনি শ্রীগৌরের মুখে, শ্রীনিত্যানন্দের মুখে, ভক্তবৃন্দের স্তবে এবং নিজের উক্তিতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিভিন্ন তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত পরিষ্কারভাবে জানা যায় এবং ইহাই জানা যায় যে, তত্ত্ব-বিষয়ে পরবর্তী আচার্যদের সহিত এবং মহাপ্রভুর পরবর্তী উক্তির সহিত, কোনও অংশেই তাঁহার অনৈক্য নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের মধ্যে শ্রীলবৃন্দাবনদাসই সর্বপ্রথমে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভূমিকায় এ-সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক যদি আগে ভূমিকাটি দেখেন, তাহা হইলে টীকার অনুসরণে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাঠকদের সুবিধার নিমিত্ত অন্ত্যখণ্ডের শেষে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—গ্রন্থোল্লিখিত শ্লোকসূচী, গ্রন্থোল্লিখিত স্থান-পরিচায়ক-পয়ারসূচী, পৌরাণিক-বিবরণ-সূচী, বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ের সূচী, পয়ার-টীকায় এবং শ্লোক-ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত শ্লোকসূচী এবং পয়ার সূচী।

টীকা-রচনার ব্যাপারে উৎসাহ দান ও প্রমাণ-গ্রন্থ সংগ্রহাদিদ্বারা অনুগ্রহপূর্বক যাঁহারা আমার আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জানাইতেছি। পাঠক, অনুগ্রাহক এবং অন্য ভক্তবৃন্দের চরণেও সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি। অনুগ্রহপূর্বক তাঁহারা এই অযোগ্য অধমের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

অনুগ্রহপূর্বক "সাধনা-প্রকাশনী"-নামক প্রতিষ্ঠান (৬৯, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ৯) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গ্রন্থ-প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমি এই প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাধারা এই প্রতিষ্ঠানের উপর অজস্র বর্ষিত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা।

৪৬, রসা রোড ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন
কলিকাতা ৩৩
২০।৫।১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ

ভক্তকৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

সঙ্কেত-পরিচয়

সঙ্কেত		পরিচয়
অ. কৌ.	—	কবি কর্ণপূরের অলঙ্কার-কৌস্তুভ (পুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ)
অ. প্র.	—	প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা
উ. নী. ম.	—	উজ্জ্বলনীলমণি (বহরমপুর-সংস্করণ)
কঠ	—	কঠোপনিষৎ
কড়চা	—	মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্, কড়চানামে খ্যাত
গী., বা গীতা	—	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
গো. পূ. তা.	—	গোপালপূর্বতাপনী শ্রুতি
গৌ কৃ. ত.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা (রাধাগোবিন্দ নাথ)
গৌ. গ. দী.	—	কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর-সংস্করণ)
গৌ. বৈ. অ.	—	শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (হরিদাস দাস)
গৌ. বৈ. দ.	—	গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন (রাধাগোবিন্দ নাথ)
চৈ. চ.	—	শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ)
ছান্দো., বা ছা., উ.	—	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
তন্ত্রসার	—	শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। ১৩৩৪ সাল।
তৈ. উ.	—	তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ
নৃ. পূ. তা.	—	নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষৎ
বি. পু.	—	বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
বৃ. আ.	—	বৃহদারণ্যক-শ্রুতি
বৃ. ভা.	—	বৃহদ্ভাগবতামৃত (সনাতনগোস্বামী)
ব্র. সং.	—	ব্রহ্মসংহিতা (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভ. র. সি.	—	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (বহরমপুর-সংস্করণ)
ভা.	—	শ্রীমদ্ভাগবত (বঙ্গবাসী-সংস্করণ)
মশ্রী	—	মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (রাধাগোবিন্দ নাথ)
মাঠরশ্রুতি	—	প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১ অনুচ্ছেদ-ধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য।
মুণ্ড	—	মুণ্ডকোপনিষৎ

ল. ভা.	—	লঘুভাগবতামৃত বা সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ)
শতপথশ্রুতি	—	ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত।
শ্বেতা	—	শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি
সৌপর্ণশ্রুতি	—	প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩২ অনুচ্ছেদ-ধৃত।
হ. ভ. বি.	—	শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংস্করণ)
১।২।১৪১ ইত্যাদি	—	শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৪১-পয়ার। ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকার সূচীপত্র

২৯৭ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে "প্রাপ্তোশমঃ" স্থলে "প্রাপ্তোপশমঃ" হইবে।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁহার চরণ বন্দো দন্তে করি ঘাস ॥
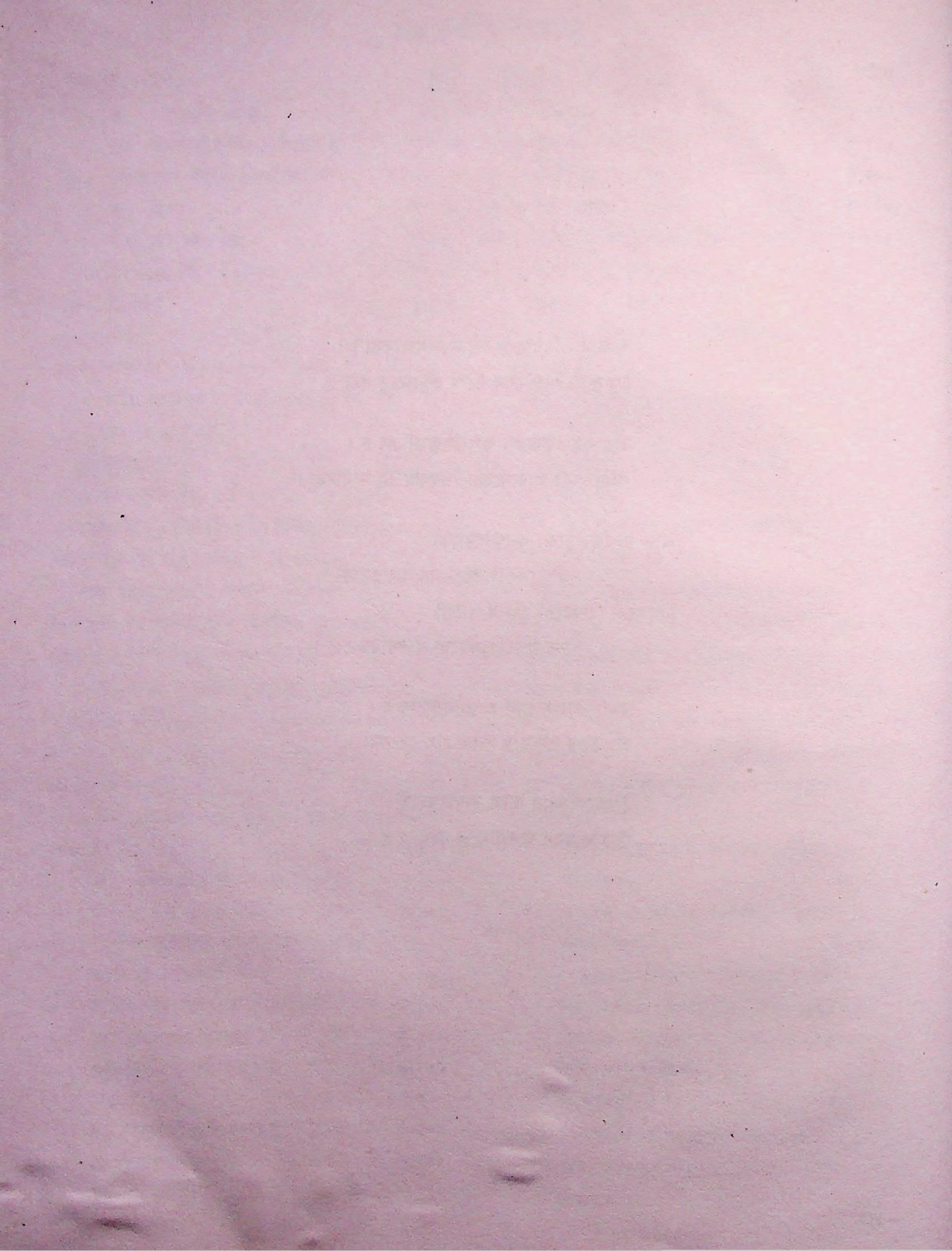
শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকা

১। গ্রন্থকারের পরিচয়

শ্রীচৈতন্যভাগবতের গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থমধ্যে তাঁহার বংশ-পরিচয়াদি লিখেন নাই। একস্থলে তিনি তাঁহার মাতা এবং দীক্ষাগুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ-পাত্র—নারায়ণী-গর্ভজাত॥ ৩।৬।২২১॥

তাঁহার মাতার নাম নারায়ণী। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র। এ-কথার তাৎপর্য এই। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে মহাপ্রভু এই নারায়ণীকে উপলক্ষ্য করিয়াই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন কীর্তন প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বহির্মুখ লোকগণের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা এরূপ ভয়ও দেখাইতে লাগিলেন যে, রাজনৌকা আসিয়া নিমাই-পণ্ডিতকে এবং তাঁহার কীর্তনসঙ্গীদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। এ-কথা শুনিয়া সরল-প্রকৃতি শ্রীবাসপণ্ডিত অত্যন্ত ভয় পাইলেন। তখন প্রভু তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, যদি রাজনৌকা আসে, তাহা হইলে তিনিই সর্বাগ্রে নৌকায় আরোহণ করিয়া রাজার নিকটে যাইবেন এবং রাজা ও রাজার পাত্রমিত্রাদিকে কৃষ্ণনাম বলাইয়া কাঁদাইবেন। তারপর বলিলেন, "ইহাতে যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে সাক্ষাতেই তুমি আমার প্রভাব দেখ।" তখন প্রভু—

"সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী'॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-জগতে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী—প্রভু গৌরচান্দ।
আজ্ঞা কৈলা 'নারায়ণি! কৃষ্ণ বলি কান্দ'॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত॥
অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥ ২।২।৩১৮-২২॥

ইহার পরে, শ্রীবাস-গৃহে প্রভুর মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভু ভক্তগণকে নিজের গলার মালা দিয়া তাঁহার চর্বিত তাম্বূল ভোজনের জন্য আদেশ করিলে,—

"মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া।
কোটিচান্দ-শারদ-মুখের দ্রব্য পায়্যা॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ॥
"ধন্য ধন্য" এই সে সেবিলা নারায়ণ।
বালিকা-স্বভাবে ধন্য ইঁহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়ে—'নারায়ণি!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥'
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যার ধ্বনি।
'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥' ২।১০।২৮৭-৯৪॥

বৃন্দাবনদাস নিজেই তাঁহার জননী নারায়ণীদেবী সম্বন্ধে এ-সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়া গিয়াছেন,—

"নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ১।৮।৩৭॥'

কবি কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন—

"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীল কিলিম্বিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা॥ ৪৩॥ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি অম্বিকার ভগিনী ছিলেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, সেই কিলিম্বিকাই নবদ্বীপলীলায় নারায়ণী।" মুরারি গুপ্তও লিখিয়াছেন—"শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী হরির প্রসাদ ভোজন করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন॥ কড়চা। ২।৭।২৬॥"

এতাদৃশী মহামহীয়সী ছিলেন বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী নারায়ণী দেবী। বৈষ্ণবসমাজ এখন পর্য্যন্ত নারায়ণী দেবীর নামে মস্তক অবনত করেন।

নারায়ণী দেবী যে শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতৃ-তনয়া ছিলেন, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এবং মুরারি গুপ্তের উক্তি

হইতেই তাহা জানা যায়। বৃন্দাবনদাসই লিখিয়াছেন, শ্রীবাস পণ্ডিতেরা "চারি ভাই" ছিলেন (১।২।৯২-৯৩)। কবিরাজ গোস্বামী এবং কর্ণপূরও "চারি ভাই"-এর কথাই বলিয়াছেন। এই "চারি ভাই" হইতেছেন—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর কৃপামাত্র ছিলেন। কিন্তু শ্রীরাম, শ্রীনিধি ও শ্রীপতি—শ্রীবাসের এই তিন সহোদরের মধ্যে, নারায়ণী কাহার কন্যা, তাহা প্রাচীন গৌর-চরিতকারদের গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান" বলেন "নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা।—বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩৭৫ পৃঃ।" এই বিবরণ নির্ভরযোগ্য হইলে মনে হয়, এই নলিন পণ্ডিত নবদ্বীপে থাকিতেন না, অথবা মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-কালে তিনি জীবিত ছিলেন না। এজন্যই বোধ হয় প্রাচীন গৌর-চরিতকারদের গ্রন্থে তাঁহার নাম দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু বৃন্দাবনদাসের পিতার নাম তিনি নিজেও তাঁহার গ্রন্থে কোনও স্থলে লিখেন নাই, মুরারি গুপ্ত, কর্ণপূর এবং কবিরাজ গোস্বামীও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় যে-সকল ভক্ত তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, বৃন্দাবনদাসের পিতা, সে-সকল ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সেজন্য তাঁহার নাম প্রকাশের প্রয়োজন বৃন্দাবনদাসের হয় নাই। তিনি যে তাঁহার মাতা নারায়ণী দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও কেবল তিনি প্রভুর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন বলিয়াই, নারায়ণীদেবীর মহিমা প্রদর্শনের জন্যই। স্বীয় মাতার পরিচয় দান তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। বৃন্দাবন দাস যে নারায়ণীর গর্ভজাত ছিলেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থের শেষের দিকে—পূর্বোদ্ধৃত "সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ-পাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত ॥ ৩।৬।২২১ ॥"-বাক্যে। তাহার পূর্বেও যে তিনি নারায়ণীর মহিমার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সে-সকল স্থলে, নারায়ণী যে তাঁহার জননী, তাহা তিনি বলেন নাই। গ্রন্থের শেষভাগেও যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরিচয়-দানের উদ্দেশ্যে বলিয়া মনে হয় না, নিজের দৈন্য এবং নারায়ণীর মহিমা জানাইবার জন্যই। তাঁহার এই শেষ উক্তির ধ্বনি এইরূপ বলিয়া মনে হয়— "শ্রীগৌরাঙ্গের অবশেষপাত্র নারায়ণীর সন্তান বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। নচেৎ আমি শ্রীনিত্যানন্দের এই কৃপা পাইতাম না। আমার তদ্রূপ কোনও যোগ্যতাই ছিল না।" এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের কোনও স্থলেই তাঁহার নিজের পরিচয়-জ্ঞাপক কোনও বাক্যই দৃষ্ট হয় না। একমাত্র গৌর-নিত্যানন্দের এবং ভক্তদের চরণে স্বীয় দৈন্য এবং প্রার্থনা জ্ঞাপনের উপলক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোনও উপলক্ষ্যেই গ্রন্থকার তাঁহার নিজের কথা কিছু বলেন নাই। ইহা তাঁহার ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যেরই পরিচায়ক। গৌর-নিত্যানন্দের, ভক্তের এবং ভক্তির মহিমা বর্ণনাই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার পিতা সম্ভবতঃ উল্লিখিত ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না; সে-জন্যই তাঁহার বর্ণনায় (মুরারি গুপ্ত-আদির বর্ণনায়ও) তাঁহার পিতার নাম স্থান পায় নাই। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের কোনও স্থলেই তাঁহার আত্ম-প্রচারের প্রয়াস লক্ষিত হয় না। যদি আত্ম-প্রচারের এবং তদুপলক্ষ্যে আত্ম-পরিচয়দানের, ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে, তাঁহার পিতা উল্লিখিত ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, তিনি তাঁহার নামের উল্লেখ করিতেন।

নারায়ণীর পিতৃব্য শ্রীবাস পণ্ডিতের নাম তিনি বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা করিয়াছেন শ্রীবাসের প্রতি গৌরের কৃপা এবং শ্রীবাসের ভক্তি-মহিমা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে; কিন্তু শ্রীবাস যে তাঁহার খুল্ল-মাতামহ, তাহা বৃন্দাবনদাস কোনও স্থলেই বলেন নাই।

যাহা হউক "প্রেমবিলাস"-নামক গ্রন্থের ত্রয়োবিংশ বিলাসে লিখিত হইয়াছে—

"কুমারহট্টে বিপ্র বৈকুণ্ঠনাথ যিঁহো।
তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥
তাঁর গর্ভে জনমিলা বৃন্দাবন দাস ॥"

আরও আছে,— "বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে।
তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেল স্বর্গে ॥"

প্রেমবিলাসের বহু উক্তির প্রামাণিকতা গবেষকগণকর্তৃক, যুক্তি-সঙ্গত কারণে, স্বীকৃত না হইলেও এবং প্রেমবিলাসের কোনও কোনও বিবরণ পরবর্তী কালে সংযোজিত বলিয়া বিবেচিত হইলেও, উপরে উদ্ধৃত পয়ারসমূহের লেখক যে-মহাপণ্ডিত, অতি সম্ভ্রান্ত এবং বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং শ্রীবাসের গৃহে লালিত-পালিতা, মহাপ্রভুর অসাধারণ-কৃপাপ্রাপ্তা এবং খ্যাতনামা গৌর-চরিতকার বৃন্দাবনদাসের জননী, অদ্যাপিও বৈষ্ণব-জগতে পূজনীয়া এবং পরম-শ্রদ্ধেয়া নারায়ণী দেবীর পতির একটি স্বকপোল-কল্পিত নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং খুমারহট্ট-নিবাসী বলিয়া তাঁহার পরিচয়ও দিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। তাঁহার মিথ্যা উক্তি যে সকলের নিকটে ধিক্কৃত হইবে, ইহা লেখক অবশ্যই জানিতেন। "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের" সঙ্কলয়িতা শ্রীল হরিদাস দাস-মহোদয়ও নারায়ণী দেবীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—নারায়ণী দেবীর "স্বামীর নাম—শ্রীবৈকুণ্ঠদাস বিপ্র। ***বৃন্দাবনদাস যখন গর্ভে, সেই সময় শ্রীনারায়ণীর স্বামীর পরলোকগমন হয় (এ-স্থলে প্রেমবিলাসের উক্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে)।" আবার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-প্রসঙ্গেও তিনি লিখিয়াছেন—বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের "পিতার নাম—বৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র। মাতার নাম নারায়ণী দেবী। নারায়ণী শ্রীবাশ পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নলিন পণ্ডিতের কন্যা।"

ক। **বিরুদ্ধমতের আলোচনা।** ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় এবং তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থে (১৭৭-৭৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, "নারায়ণী শিশুকালে অর্থাৎ চার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছিলেন এবং যৌবন-প্রাপ্তির পর তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল।" অথাৎ বৃন্দাবনদাস ছিলেন নারায়ণীর জারজ-পুত্র। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে ডক্টর মজুমদার পদকর্তা উদ্ধবদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"প্রভুর চর্ব্বিত পান স্নেহবশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশবে বিধবা ধনী সাধ্বীসতী-শিরোমণি
সেবন করিল সে চর্ব্বিতে ॥"

এই পদের "শৈশবে বিধবা ধনী"-বাক্যটি দেখিয়াই বোধ হয় মজুমদার মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"নারায়ণী শিশুকালে অর্থাৎ চার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছিলেন।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। পদকর্তা উদ্ধবদাস নারায়ণী দেবীকে "শৈশবে বিধবা" যেমন বলিয়াছেন, তেমনি আবার "সাধ্বীসতী-শিরোমণিও" বলিয়াছেন। যে রমণী শিশু (মজুমদার মহাশয়ের মতে যাঁহার বয়স চারি বৎসরের কম এবং নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাসের উক্তিতে, যাঁহার বয়স চারি বৎসর এবং যিনি বাল্যক্রীড়ায় উন্মত্ত), তিনি সাধ্বী কি অসাধ্বী, সতী কি অসতী, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা, কোনও নারী যখন অন্ততঃ কৈশোরের শেষভাগে উপনীত হয়েন তখনই তাঁহার যৌন-লালসা উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। যৌন-লালসা যখন অত্যন্ত বলবতী হয়, তখন তাহাকে যে নারী সংযত করিতে পারেন, তিনি সাধ্বী এবং সতী বলিয়া পরিচিত হয়েন। যিনি পারেন না, তাঁহাকেই লোকে অসাধ্বী এবং অসতী বলে। কোনও নারীর চারি বৎসর বয়সে যৌন-লালসার উদ্গমই হয় না। সুতরাং সেই নারী সাধ্বী বা অসাধ্বী, সতী বা অসতী, তাহা নির্ণয় করা যায় না। পদকর্তা উদ্ধবদাস নারায়ণীকে যে "সাধ্বীসতী-শিরোমণি" বলিয়াছেন, তাহা "শিশু অর্থাৎ চারি বৎসর বয়সের" নারায়ণী সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে না। নারায়ণীর কৈশোরের বা যৌবনের অবস্থা সম্বন্ধেই তাহা প্রযোজ্য। প্রশ্ন হইতে পারে—উদ্ধবদাস তবে নারায়ণীকে "শৈশবে বিধবা ধনী" বলিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন এই। কোনও নারী যদি ১৫।১৬-বৎসর এমন কি বিশ বৎসর বয়সেও বিধবা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি স্নেহ-প্রীতি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন—"আহা! কচি বয়সে মেয়েটি শাঁখা-সিন্দুর-হারা হইল! কি আর ইহার বয়স। এখনও শিশু বলিলেও চলে।" লৌকিক জগতে এখনও এইরূপ খেদোক্তি শ্রুত হইয়া থাকে। পদকর্তা উদ্ধবদাসও, নারায়ণীর চর্বিত-তাম্বূল-প্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্যের কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার অল্প বয়সের বৈধব্যের স্মৃতিতেই খেদের সহিত বলিয়াছেন—"শৈশবে বিধবা ধনী সাধ্বীসতী-শিরোমণি।" চারি বৎসর বয়সের বালিকার যে সন্তান জন্মিতে পারে না, ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। চারি বৎসর বয়সের বালিকা সাধ্বীসতী কিনা, এই প্রশ্নেরও যে কোনও অবকাশ নাই, তাহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। বৃন্দাবনদাস যে নারায়ণীর সন্তান, তাহাও সর্বজন-বিদিত। এই অবস্থায়, চারি বৎসর বয়সের নারায়ণী যদি বিধবা থাকিতেন, তাহা হইলে বৃন্দাবনদাস যে তাহার জারজ পুত্র, তাহাও অস্বীকার করা যাইবে না। তাহা হইলে পদকর্তা উদ্ধবদাস কি জারজ পুত্রের গর্ভধারিণীকেই "সাধ্বীসতী-শিরোমণি" বলিয়াছেন? এই আলোচনা হইতে জানা গেল, পদকর্তা উদ্ধবদাসের উক্তি হইতে ডক্টর মজুমদারের সিদ্ধান্তের কোনও সমর্থনই পাওয়া যায় না। ডক্টর মজুমদার তাঁহার উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সমর্থনে মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতেও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াঽভর্ত্তৃকা মধুরদ্যুতিঃ।
হরেঃ প্রাশ্য প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥ ২।৭।২৬॥"

মজুমদার মহাশয় এই শ্লোকস্থ "অভর্ত্তৃকা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"স্বামিহীনা"।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীও তৎসম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ৪৫২-চৈতন্যাব্দের সংস্করণের সর্বশেষে "শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস"-শীর্ষক প্রবন্ধে, মুরারি গুপ্তের কড়চার উল্লিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে "অভর্ত্তৃকা"-স্থলে "অভ্রাতৃকা"-পাঠ আছে—"শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াঽভ্রাতৃকা মধুরদ্যুতিঃ। হরেঃ প্রাশ্য

প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ॥" প্রভুপাদ "অভ্রাতৃকা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"যাঁহার কোন সহোদর ছিল না।" অমৃতবাজার কার্যালয় হইতে যে মুদ্রিত কড়চা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে "অভর্তৃকা" পাঠই দৃষ্ট হয়। ডক্‌টর মজুমদার প্রভুপাদের উদ্ধৃত "অভ্রাতৃকা"-পাঠযুক্ত শ্লোকটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—"কোন মেয়ের পরিচয় দিতে হইলে তাহার স্বামী আছে কিনা বলা, ভাই আছে কিনা বলা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। সেই জন্য মনে হয় অমৃতবাজার কার্যালয়ের ছাপা বইয়ের 'অভর্তৃকা'-পাঠই ঠিক।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। লিপিকর-প্রমাদ, বা মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ "অভর্তৃকা"-স্থলে "অভ্রাতৃকা", কিংবা "অভ্রাতৃকা"-স্থলে "অভর্তৃকা"-পাঠ হওয়া অসম্ভব নয়। যাহা হউক, ডক্‌টর মজুমদারের স্বীকৃত "অভর্তৃকা"-পাঠ স্বীকার করিয়াই তাহার অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ভর্তা-শব্দের অর্থ—পতি, স্বামী। ধব-শব্দের অর্থও—পতি, স্বামী। প্রচলিত রীতি অনুসারে দেখা যায়, যে-নারীর স্বামী মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে "বিধবা" বলা হয়, 'অধবা" বলা হয় না। যে-পুরুষের পত্নী মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে "বিপত্নীক" বলা হয়, "অপত্নীক" বলা হয় না। এই সকল স্থলে নঞর্থসূচক "বি"-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং এই "বি"-শব্দের অর্থ হইতেছে—"যাহা পূর্বে ছিল, কিন্তু এখন নাই", যেমন, যাঁহার ধব বা পতি আগে ছিলেন, কিন্তু এখন নাই, তিনি "বিধবা"। যাঁহার পত্নী আগে ছিলেন, কিন্তু এখন নাই, তিনি "বিপত্নীক"। কিন্তু নঞর্থসূচক "অ"-শব্দের একটি ভিন্নরূপ ব্যঞ্জনা আছে। অবাধ, অম্লান, অসম্পূর্ণ প্রভৃতি শব্দে তাহা দৃষ্ট হয়। যে ব্যাপারে কোনও বাধাই জন্মে নাই, তাহাকে বলে "অবাধ"। যাহাতে কখনও ম্লানতা আসে নাই, তাহাকে বলে "অম্লান"। যাহাতে কখনও সম্পূর্ণতা আসে নাই তাহাকে বলে "অসম্পূর্ণ"। "অপুত্রক"-শব্দের ব্যঞ্জনাও তদ্রূপ। যাঁহার পুত্র কখনও আসে নাই, অর্থাৎ জন্মে নাই, তাঁহাকেই "অপুত্রক" বলা হয়, যাঁহার পুত্র জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে, তাঁহাকে "অপুত্রক" বলা হয় না, "মৃতপুত্র" বলা হয়। অ-শব্দের এইরূপ অর্থেই প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী "অভ্রাতৃকা"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"যাহার কোন সহোদর ছিল না," অর্থাৎ কোন সহোদর জন্মেই নাই। এজন্যই যাঁহার পতি মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে "বিধবাই" বলা হয়, কিন্তু "অধবা" বলা হয় না। যাঁহার পত্নী মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে "বিপত্নীকই" বলা হয়, "অপত্নীক" বলা হয় না। "অধবা"-শব্দে অবিবাহিতা, কুমারী এবং "অপত্নীক"-শব্দে অবিবাহিতা পুরুষকেই বুঝায়। সেই ভাবে "অভর্তৃকা"-শব্দে, যাঁহার ভর্তা বা পতি এখনও হয় নাই, অর্থাৎ যিনি এখনও অবিবাহিতা, সেই নারীকেই বুঝায়, যাঁহার স্বামী মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝায় না। যদি "বিভর্তৃকা" বলা হইত, তাহা হইলেই "বিধবা" বুঝাইত। এইরূপে দেখা গেল, মুরারি গুপ্ত নারায়ণীকে "বিধবা" বলেন নাই, পরন্তু "অবিবাহিতা কুমারীই" বলিয়াছেন। সুতরাং মুরারি গুপ্তের উক্তিও ডক্‌টর মজুমদারের সিদ্ধান্তের সমর্থক নহে।

বৃন্দাবনদাস যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল; সুতরাং তিনি বিধবা নারায়ণীর গর্ভ হইতেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে বিধবা নারায়ণীর পুত্র বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যে বিধবা নারায়ণীর জারজপুত্র, তাহা নয়। সুতরাং, "বৃন্দাবনদাস বিধবার পুত্র" একথা শুনিয়াই যাঁহারা তাঁহাকে তাঁহার মাতার "জারজপুত্র" মনে করেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসাই করিতে হয় !!

পূর্বে কর্ণপূরের উক্তির উল্লেখপূর্বক বলা হইয়াছে, নারায়ণী দেবী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর—

কিলিম্বিকা। অর্থাৎ তিনি জীবতত্ত্ব নহেন, সুতরাং মায়ার বশীভূতও নহেন—প্রাকৃত মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনামূলক কাম বা সম্ভোগেচ্ছাও তাঁহার থাকিতে পারে না। তাঁহার এই স্বরূপতত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কামার্তা হইয়া অবৈধভাবে অন্য পুরুষের সঙ্গমেচ্ছা যে তাঁহার জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতেই জানা যায়, নারায়ণী মহাপ্রভুর অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবদেরও প্রাণভরা আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন (পূর্বোদ্ধৃত পয়ারসমূহ দ্রষ্টব্য)। এতাদৃশী নারায়ণীর কাম-বাসনা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কবি কর্ণপূর বৃন্দাবনদাসেরই সম-সাময়িক লোক, বয়সে বৃন্দাবনদাসের ৪।৫ বৎসরের জ্যেষ্ঠ। সুতরাং নারায়ণীর পরিচয় তিনি জানিতেন। নারায়ণী যদি ভ্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে কর্ণপূর কি তাঁহাকে ব্রজ-পরিকর বলিয়া ঘোষণা করিতেন ? আর, বৃন্দাবনদাসই কি জোর গলায় বলিতে পারিতেন—"অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি। 'গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী' ॥ (২।১০।২৯৪)?" অধিকন্তু, নারায়ণী ভ্রষ্টা হইলে এখন পর্যন্তও কি তাঁহার নামে বৈষ্ণব-সমাজ মস্তক অবনত করিতেন ? পরবর্তী বিবরণ হইতে জানা যাইবে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বহুল মামগাছী নামক এক ভদ্রপল্লীতে, মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত বাসুদেব দত্তের এক ঠাকুরবাড়ী ছিল। বাসুদেব দত্ত দরিদ্রা বিধবা নারায়ণীর উপর সেই সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাসও সে-স্থানে মাতার নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। নারায়ণী যদি জারজ-সন্তানের জননী হইতেন, তাহা হইলে বাসুদেব দত্ত কি তাঁহার উপরে তাঁহার বিগ্রহ-সেবার ভার অর্পণ করিতেন ? মামগাছী-নিবাসী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ কি তাহাতে আপত্তি করিতেন না এবং সেই ঠাকুর-মন্দির কি বর্জন করিতেন না ? নারায়ণীর জারজ সন্তান হইলে বৃন্দাবনদাসও কি কোনও চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের সুযোগ পাইতেন ? তখন সত্যকাম-জাবালির যুগ ছিল না। নারায়ণী ভ্রষ্টা ছিলেন না, পূতচরিত্রাই ছিলেন, "সাধ্বীসতী-শিরোমণিই" ছিলেন। গৌরের নরলীলায়, ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাবের নিমিত্তই, নারায়ণীর বিবাহ। যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতার নাম—বৈকুণ্ঠনাথ (বা বৈকুণ্ঠদাস) বিপ্র এবং মাতার নাম নারায়ণী দেবী।

খ। জন্ম-সময়। ঠিক কোন্ সময়ে বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে তাঁহার উক্তি হইতে জন্ম-সময় সম্বন্ধে মোটামোটি একটা অনুমান করা যায়।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে মহাপ্রভু যখন সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, তখন নারায়ণীর বয়স ছিল চারি বৎসর (পূর্বে উদ্ধৃত পয়ারসমূহ দ্রষ্টব্য)। কবি কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে (৪।৭৬-শ্লোকে) লিখিয়াছেন—পৌষমাসের অন্তে প্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন্ এবং মাঘ মাসের প্রথম হইতে কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন (২।২।৩৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহার এক বৎসর পরে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন (২।২৬।৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানা যায়, প্রভু ১৪৩০ শকের পৌষ মাসের অন্তেই গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং মাঘ মাসেই নারায়ণীকে কৃপা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে জানা যায়, ১৪৩০ শকের মাঘ মাসে নারায়ণীর বয়স ছিল চারি বৎসর।

সাধারণতঃ দেখা যায়, ১৫।১৬ বৎসর বয়সের পূর্বে নারীদের সন্তান-সম্ভাবনা হয় না, কচিৎ চৌদ্দ বৎসরেও তাহা দৃষ্ট হয়। তদনুসারে ১৪৩০ শকের ১১।১২, অন্ততঃ ১০ বৎসর পরেই, অর্থাৎ ১৪৪১।১৪৪২, অন্ততঃ ১৪৪০ শকের পূর্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম সম্ভব নয়। নারায়ণী দেবী ১৪ বৎসর বয়সে সন্তান-সম্ভবা হইয়াছিলেন মনে করিলে, ১৪৪০ শকে বৃন্দাবনদাসের জন্মের অনুমান করা যায়, কিন্তু ১৪৪০ শকের পূর্বে যে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ১৪৪০ শকেই যে জন্ম হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, অথবা ১৪৪০ শকের পরে কোন্ শকে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার কোনও উপায় নাই।

ডক্টর মজুমদারও তাঁহার গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "১৪৪০ শক বা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হয় নাই।" বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাহিত্যিক বৃন্দাবনদাসের জন্মসময়-সম্বন্ধে নির্বিচারে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ডক্টর মজুমদার তাঁহার গ্রন্থের ১৮০-৮২ পৃষ্ঠায়, অতি নিপুণতার সহিত, তৎসমস্তের খণ্ডন করিয়াছেন।

১৪৫৫ শকে মহাপ্রভুর তিরোভাব। ১৪৪০ শকের পূর্বে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-সময়ে তাঁহার বয়স ১৫ বৎসরের অধিক থাকিতে পারে না, বরং ১৫ বৎসরের কম হওয়ারই সম্ভাবনা।

গ। পরবর্তী জীবন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধেও প্রাচীন কোনও গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার পূর্বোল্লিখিত "শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস"-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"পরম পরিতাপের বিষয়, তাঁহার—সেই আদিকবির—সেই বঙ্গীয় সাহিত্যকাননের কলকণ্ঠ কোকিল ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসের পবিত্র জীবনের সকল কথা জানিবার কোনও উপায় নাই। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে, এইটুকুই অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী দেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম এবং প্রভু-নিত্যানন্দের প্রেমে মাতুয়ারা হইয়া থাকাই তাঁহার কর্ম্ম।"

সেই প্রবন্ধে বৃন্দাবনদাস-সম্বন্ধে প্রভুপাদ আরও লিখিয়াছেন—"শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিম পারে মামগাছি বলিয়া একটি গ্রাম আছে। ভক্তিরত্নাকরে ঐ গ্রাম মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই গ্রামে বাসুদেব দত্তের একটি সেবা আছে। আমরা কোন সময় সেই সেবাদর্শনে সেই গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় সকলেই কহিলেন যে, 'নারায়ণী দেবী ঐ সেবানির্বাহের ভার গ্রহণ করিয়া মামগাছিতে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন'। আপাতত সেই সেবাটির নাম 'নারায়ণীর সেবা'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীবাসমহাশয় ও শ্রীরাম উভয়েই কুমারহট্টে সপরিবারে বাস করেন। * * * অনুমান করা যাইতে পারে যে * * *, তাহাকে (নারায়ণীকে) মামগাছির সন্নিকটে কোন গ্রামে বিবাহ দেওয়া হয়। নারায়ণী গর্ভবতী হইলে, তিনি বিধবা হন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে আর সুবিধা না হওয়ায়, বাসুদেব দত্তের ঠাকুরবাটিতে তিনি কামদারী স্বীকার করেন। বাসুদেব দত্তের নিবাসভূমি কাঁচরাপাড়া শিবানন্দের বাটী হইতে স্বল্প দূরে। * * * প্রভুর নবদ্বীপলীলার সময় বাসুদেব দত্ত প্রভুর নিকটে থাকিবার জন্য মামগাছিতে সেবা প্রকাশ করেন এবং পরে বাসুদেব আর শ্রীনবদ্বীপে যাওয়ার সুবিধা না দেখিয়া এবং শ্রীবাসের বন্ধুতাপ্রযুক্ত, তাঁহার ভ্রাতৃতনয়াকে ঐ সেবার ভার সমর্পণ করেন।

* * * শিশুকালে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদীয় পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছির ঠাকুরবাটিতে বাস করিতেন, ইহাতে সন্দেহ কি? সংস্কৃতবিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। মামগাছি নবদ্বীপ-ধামের অংশবিশেষ, সুতরাং তথায় বিদ্যানগরের ন্যায়, অনেক পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল, ইহাতে সন্দেহ কি? যে গ্রামে এখনও ব্রহ্মাণীস্থল দেদীপ্যমান, সে গ্রামে যে বিদ্যার বিশেষ চর্চা ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষত ঐ গ্রামটি বিশারদ ভট্টাচার্য ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির বাসগৃহের অতি নিকট, এমন কি এক গ্রাম বলিলেও হয়। কাঞ্চনপল্লীবাসী বাসুদেব দত্ত পণ্ডিত ও ধনবান্ ছিলেন, ইহা কবিরাজ গোস্বামী ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যে সেবা প্রকাশ করেন, তাহা অবশ্য ভদ্রপল্লীর মধ্যে।

সেই মামগাছির ভদ্রপল্লীতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে পাঠশালায় বাল্যবিদ্যা অভ্যাস করেন এবং শেষে কোনও চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। * * * শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থানকরত যে সময়ে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহার শেষ কালে কবিবর বৃন্দাবনদাস মহোদয় তাঁহার সঙ্গ লইয়া, পরমানন্দ লাভ করেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সর্বশেষ ভৃত্য (শিষ্য)। "সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ-পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥ ৩।৬।২২১॥" ইহাতে বুঝা যায়, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে দীক্ষা দেওয়ার পরে শ্রীনিত্যানন্দ বেশী দিন প্রকট ছিলেন না; থাকিলে তাঁহার আরও শিষ্য হইত। "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান" হইতে জানা যায়, শ্রীল বৃন্দাবনদাসের শ্রীপাট ছিল—বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে। দেনুড় গ্রাম নবদ্বীপ হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমে। তিনি দেনুড় গ্রামে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস যে প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা দর্শন করেন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কেননা, সেই সময়ে তাঁহার জন্মই হয় নাই। এজন্য প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন,—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে
হইলাও বঞ্চিত সে সুখ-দরশনে॥ ১।৮।২৮৪॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখনে না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥ ২।৮।১৯৮॥"

তিনি যে কখনও নীলাচলে গিয়া প্রভুর লীলা দর্শন করিয়াছেন, তাহার কোনও আভাসও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায় না। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও জগন্নাথের মাড়ুয়া-বসন-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন "গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥ ৩।১১।৮৪॥" মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে, ১৪৩৪ শকে, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নীলাচলে গিয়াছেন, তিনি আর কখনও নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। তাহাতে মনে হইতে পারে, বৃন্দাবনদাস গদাধর-শ্রীমুখের যে বাক্যের কথা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি গদাধরের মুখেই শুনিয়াছেন—সুতরাং তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পূর্বে তাঁহার নীলাচল-গমন সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, প্রভুর অন্তর্ধান-সময়ে, ১৪৫৫ শকে, তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসরের কমই ছিল। এত অল্প বয়সে তাঁহার নীলাচল-গমন সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রভুর দর্শনের

নিমিত্ত নারায়ণীদেবী যে কখনও নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাহারও কোনও আভাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নাই। এমনও হইতে পারে, বাসুদেব দত্ত তাঁহাকে যে সেবার ভার দিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথবা, এমনও হইতে পারে যে, প্রভুর অন্তর্ধানের পূর্বেই নারায়ণী দেবী অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন্ সময়ে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জানা না গেলেও, শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি উক্তি হইতে মনে হয়, এই গ্রন্থলেখার সময়ে তিনি প্রকট ছিলেন না। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-জগতে যাঁর ধ্বনি। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'॥ ২।২।৩১৭॥" এই পয়ারের "অদ্যাপিহ"-শব্দ হইতে মনে হয়, গ্রন্থ-লিখনের সময় নারায়ণী দেবী প্রকট ছিলেন না। এই আলোচনা হইতে মনে হয়, বৃন্দাবনদাস নীলাচলে গদাধরের শ্রীমুখ-বাক্য গদাধরের মুখে তিনি নিজে শুনেন নাই; যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই গদাধরের শ্রীমুখ-বাক্য জানিতে পারিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের দুইটি পয়ারে গ্রন্থকার শ্রীক্ষেত্রে প্রচলিত একটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন (৩।১১।৯৩,৯৭)। বাক্যটি হইতেছে "লাগি হইতে লাগিল"। এই বাক্যের প্রসঙ্গে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"লাগি হইতে লাগিল"—অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে বস্ত্র সংলগ্ন হইতে লাগিল। অদ্যাবধি শ্রীক্ষেত্রে 'লাগি হওয়া' কথাটি প্রচলিত রহিয়াছে। যথা—'ফুলের লাগি হওয়া' অর্থাৎ ফুল লাগাইয়া বা চড়াইয়া দেওয়া, 'চন্দনের লাগি হওয়া' অর্থাৎ চন্দন লাগাইয়া দেওয়া প্রভৃতি।" বৃন্দাবনদাস শ্রীক্ষেত্রে (নীলাচলে) প্রচলিত এই বাক্যটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে পারে, তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু নীলাচল হইতে আগত কোনও লোকের মুখেও তিনি বঙ্গদেশে এই বাক্যটি শুনিয়া থাকিতে পারেন। সুতরাং এই বাক্যটি হইতেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পূর্বে তাঁহার নীলাচল-গমন সম্ভবপর ছিল না। এই আলোচনা হইতে জানা গেল, বৃন্দাবনদাস প্রভুর নীলাচল-লীলাও দর্শন করেন নাই। তিনি প্রভুর কোনও লীলারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না।

তিনি যে কখনও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তাহার ইঙ্গিতও শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় না। অবশ্য "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে" শ্রীল হরিদাস দাস-মহোদয় লিখিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস দেনুড়ে যে শ্রীগৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি রামহরি-নামক তাঁহার জনৈক কায়স্থ-শিষ্যের উপর বিগ্রহ-সেবার ভার অর্পণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। কোন্ প্রমাণ-বলে শ্রীল হরিদাস দাস-মহোদয় একথা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি সে-স্থলে বলেন নাই।

যাঁহারা একটু অভিনিবেশের সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কি অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। দুই তিনটি স্থলে তিনি পৌরাণিক কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন; কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে স্তবাদিতে, তিনি যে কত পুরাণেতিহাসের আখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে পরম-ভাগবত ছিলেন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্রই তিনি গৌর-নিত্যানন্দের মহিমা, ভক্তের মহিমা এবং শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ ও মহিমা, অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনেক স্থলে গ্রন্থকার গানের আকারে কতকগুলি পয়ার ও ত্রিপদী লিখিয়াছেন এবং এই গানগুলির রাগ-রাগিণীরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, সঙ্গীতে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

ঘ। উপাসনা ও স্বরূপ। কবি কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন, যিনি পূর্বে বেদব্যাস ছিলেন, তিনিই অধুনা বৃন্দাবনদাস। ব্রজের কুসুমাপীড়-নামক কৃষ্ণসখাও তাঁহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। "বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥ গৌ. গ. দী.॥ ১০৯॥" ইহা হইতে বুঝা যায়, বৃন্দাবনদাস ব্রজের সখ্যভাবের উপাসক ছিলেন। স্বরূপে তিনি বেদব্যাস এবং ব্রজসখা কুসুমাপীড়।

ঙ। রচিত গ্রন্থ। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে তাঁহার কয়েকটি উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ ১।১।৬০, ১।১২।১৪৩॥
নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা করি শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা অনুসারে॥ ১।১০।৪০৩॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে।
কিছুমাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে॥ ২।২৬।২২৬॥
সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত রায়।
সূত্রমাত্র লিখি আমি তাঁহার আজ্ঞায়॥ ৩।৪।৩০২॥

প্রথমোক্ত পয়ারের "অন্তর্য্যামী"-শব্দ হইতে মনে হয়, চৈতন্যচরিত লিখার নিমিত্ত বৃন্দাবনদাসের মনেও ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। অন্তর্যামী নিত্যানন্দ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত-ব্যতীত তিনি অন্য কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কিনা এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত গানগুলি ব্যতীত অন্য কোনও গান বা কীর্তনের পদ লিখিয়াছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অবশ্য বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া কয়েকখানি গ্রন্থ এবং কতকগুলি কীর্তনের পদ প্রচলিত আছে। সে-গুলির সমস্ত কিন্তু নারায়ণী-নন্দন বৃন্দাবনদাসের রচনা নহে। এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে শ্রীল হরিদাস দাস-মহাশয় কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন (তাঁহার গ্রন্থের বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ডে)। তাঁহার অভিধানের ১৩৭৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বংশ-বিস্তার', 'গৌরাঙ্গ-বিলাস' (পাটবাড়ী পুঁথি বি ৪৭), 'চৈতন্যলীলামৃত' (পাটবাড়ী পুঁথি কা ১৮ ক), ভজন-নির্ণয়, ভক্তি-চিন্তামণি প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের নামে আরোপিত হইয়াছে।" এ-স্থলে "আরোপিত"-শব্দ হইতে বুঝা যায়, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির লেখক যে শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, তাহা শ্রীল হরিদাস দাস-মহাশয় স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। আবার তাঁহার অভিধানের ১৫৮৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দপ্রভোরৈশ্বর্য্যামৃতকাব্যম্ (পাটবাড়ী পুঁথি বি ৯) শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচনা বলিয়া লিখিত (১২৬০ সালের লিপি)। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর

বিবিধ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যাদির বর্ণনা-প্রসঙ্গে তদীয় প্রকৃতি-স্বরূপেরও বর্ণনা আছে। সংস্কৃত বিবিধ ছন্দে ১২৮ শ্লোকে রচিত। 'রসকল্পসারতত্ত্ব'-নামক তাঁহাতে আরোপিত আর এক গ্রন্থেও (পাটবাড়ী পুঁথি বি ৪৬) ঐ জাতীয় কথাই বিবৃত হইয়াছে।" ১৬১৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—"গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে শ্রীবৃন্দাবনদাসের ভণিতায় ৬৩টি পদ আছে। তদ্ব্যতীত পদকল্পতরু প্রভৃতিতে উক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলীর সবগুলি এই কবিরই কৃত কিনা—এই সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্‌দের বিষম সন্দেহ আছে। ডাক্তার সুকুমার সেন 'ব্রজবুলির সাহিত্য'-নামক পুস্তকে তিন জন এবং শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক' পুস্তকে বিভিন্ন পুঁথি ও পদাবলী দেখিয়া কোনও পরিচয় না পাইয়া ১৮ জন 'বৃন্দাবনদাস' নামাঙ্কিত বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকের উল্লেখ করিয়াছেন।" সুতরাং বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া লিখিত কোনও গ্রন্থ, কিংবা বৃন্দাবনদাস ভণিতায় কোনও পদ দেখিলেই, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। তাঁহার রচিত কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তিনি যে-সকল তত্ত্বের, যে-সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং যে-সকল ভাবধারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সহিত সঙ্গতি আছে কিনা দেখিতে হইবে। এ-স্থলেই পূর্বে বলা হইয়াছে—শ্রীল হরিদাস দাস-মহাশয়ের অভিধানে উল্লিখিত এবং বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচনা বলিয়া কথিত "নিত্যানন্দপ্রভোরৈশ্বর্য্যামৃতকাব্যম্‌" এবং "রসকল্পসারতত্ত্ব"-নামক গ্রন্থদ্বয়ে নিত্যানন্দের "প্রকৃতিস্বরূপেরও" বর্ণনা আছে বলিয়া হরিদাস দাস-মহাশয় জানাইয়াছেন। "প্রকৃতিস্বরূপ" বলিতে "স্ত্রীলোকস্বরূপ" বুঝায়। নারায়ণী-তনয় বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব, ভাব ও লীলাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিত্যানন্দের "প্রকৃতিস্বরূপের" কোনও ইঙ্গিত পর্যন্তও দৃষ্ট হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, বৈষ্ণবাচার্যদের পরবর্তী গ্রন্থসমূহেও তাহাই বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত বিচার করিলে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবনদাসের লিখিত হইতে পারে না।

বৃন্দাবনদাস-ভণিতায় দুইটি পদ আমরা এক জায়গায় শুনিয়াছি। এ-স্থলে পদ দুইটি উদ্ধৃত হইতেছে। প্রথম পদটি এইরূপ—"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়। নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথা সে কয়॥ সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা। দশদিকময়, নিতাই সুন্দর, নিতাই ভুবন-তারা॥ রাধার মাধুরী, অনঙ্গমঞ্জরী, নিতাই নিতুই সে সেবি। কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবী। নিতাই রাধার ভগিনী, শ্যাম-সোহাগিনী, সব সখীগণপ্রাণ। যাহার লাবণি, মণ্ডপ সাজোনি, শ্রীমণিমন্দির নাম॥ নিতাইসুন্দর, যোগপীঠে ধরে, রত্নসিংহাসন শেযে। বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলাসে সখীর মাঝে॥ কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি মুখ সর্ব অঙ্গ। নিতাই নিতাই; নিতাই নিতাই, নিতুই নূতন রঙ্গ॥ নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, চলিব বরজপুরে। দাস বৃন্দাবন করে নিবেদন, নিতাই না ছাড়িও মোরে॥"

দ্বিতীয় পদটি এই। "নিতাই নাগর, রসের সাগর, সকল রসের গুরু। যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়, বাঞ্ছা কল্পতরু॥ নিতাই রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান, সতত থাকয়ে সঙ্গে। নিশি দিশি নাই, ফিরয়ে সদাই, কৃষ্ণ কথা রসরঙ্গে॥ বসি বাম পাশে, মৃদু মৃদু হাসে, প্রাণনাথ বলি ডাকে। (সেইত আমার গুণের নিতাই; অনঙ্গমঞ্জরীভাবে বিভাবিত বলাই)। রাধার যেমন, মনের বাসনা, তেমতি করিয়া থাকে॥

সোনার কেতুকী, রসের মূরতি, সাধিতে মনের সাধা। দাস বৃন্দাবন, করে নিবেদন, দেখিতে নিতাই রাধা ।।”

উভয় পদেই নিতাইকে নাগরও বলা হইয়াছে এবং নাগরীও (অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপাও) বলা হইয়াছে। আবার দ্বিতীয় পদে নিতাইকে রাধাও বলা হইয়াছে। নিতাই আবার “বসি বাম পাশে, মৃদু মৃদু হাসে, প্রাণনাথ বলি ডাকে।” কাহার বাম পাশে নিতাই বসেন ? কাহাকে নিতাই প্রাণনাথ বলিয়া ডাকেন ? নিতাই বলরামরূপেই কি শ্রীকৃষ্ণের বামপাশে বসেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই কি প্রাণনাথ বলিয়া ডাকেন ? না কি নিতাইরূপে অভিন্নকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গের বাম পাশে বসেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ বলিয়া ডাকেন ? অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীরাধার ভগিনী হইলেও কি শ্রীরাধা ? অনঙ্গমঞ্জরীতে মহাভাব আছে সত্য, কিন্তু শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব কি আছে ?

যাহা হউক, এই পদদ্বয়ে নিতাই-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-প্রণেতা বৃন্দাবনদাসের অভিমতের এবং অন্যান্য প্রামাণিক বৈষ্ণবাচার্যদের অভিমতেরও, সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং এই পদ দুইটি নারায়ণী-নন্দন বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। যে, অথবা যে-যে, বৃন্দাবনদাস পূর্বকথিত “নিত্যানন্দপ্রভোরৈশ্বর্য্যামৃতকাব্যম্” এবং “রসকল্পসারতত্ত্ব” লিখিয়াছেন, সেই, অথবা সেই-সেই, বৃন্দাবনদাসই, অথবা তদনুরূপ মনোভাববিশিষ্ট অপর কোনও বৃন্দাবনদাসই, উল্লিখিত পদদ্বয়ের রচয়িতা বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অনুগত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের মধ্যে উল্লিখিতরূপ ভাবের একান্ত অভাব।

শ্রীল হরিদাস দাস মহাশয়ও তাঁহার অভিধানের ১৫৪৬ পৃষ্ঠায়, অপর দুইজন বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন—“চৈতন্যগণোদ্দেশ” এবং “শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকা”। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি-প্রণেতা বৃন্দাবনদাস সম্বন্ধে হরিদাস দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—“ইনি কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা নহেন”।

যাহা হউক, এই আলোচনায় জানা গেল, নারায়ণীতনয় বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবত-ব্যতীত অপর কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না। তিনি সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে, সার্বভৌমের মুখে তিনি সন্ন্যাসের তীব্র বিরোধিতা ব্যক্ত করিয়াছেন। পরবর্তীকালের ত্যাগী বৈষ্ণব-বাবাজীদের ন্যায় তিনি বেষাশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না। কেননা, তৎকালে বেষাশ্রয়-সংস্কার প্রচলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও বৈষ্ণবোচিত দাস-অভিমানে তিনি নিজেকে “বৃন্দাবনদাস” বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব-সময় সম্বন্ধেও নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। শ্রীল হরিদাস দাস মহাশয় তাঁহার অভিধানে (১৩৭৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—“১৫১১ শকে ইঁহার অন্তর্ধান হয় বলিয়া কেহ কেহ বলেন।” কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র।

চ। **শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের দৈন্য।** শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের দৈন্য ছিল অসাধারণ। তাঁহার এই দৈন্য ছিল অকপট এবং ভক্তি হইতে উত্থিত। এজন্য তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার আত্ম-পরিচয়ের কোনও প্রয়াসই দৃষ্ট হয় না। “বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান”—এই উক্তিতে তাঁহার নামটি মাত্র তিনি উল্লেখ করিয়াছেন

এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও পরিচয় তিনি দেন নাই। একস্থলে তাঁহার জননী নারায়ণী দেবী সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম 'নারায়ণী'॥ অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'॥ ২।২।৩১৮-১৯॥"; কিন্তু এতাদৃশী নারায়ণী দেবী যে তাঁহার জননী, তাহা তিনি বলেন নাই। বলিলে তাঁহার আত্ম-মহিমা প্রকাশ পাইত। মহাপ্রভুর অশেষ-কৃপাপ্রাপ্ত এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন নারায়ণী দেবীর খুল্লতাত। তিনি যে শ্রীল বৃন্দাবনদাসের খুল্লমাতামহ, তাহাও তিনি কোনও স্থলে বলেন নাই। বলিলে তাঁহার আত্ম-মহিমা প্রকাশ পাইত। আত্ম-মহিমা-বোধই তাঁহার ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা-কথন-প্রসঙ্গে, সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে, মাত্র একটি স্থলে, বৃন্দাবনদাস "নারায়ণীর গর্ভজাত" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। "সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান (শ্রীনিত্যানন্দের) বৃন্দাবনদাস। অবশেষ-পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত॥ অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥' ৩।৬।১২১-২২।" এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে, বৃন্দাবনদাস মনে করিয়াছেন—"আমার এমন কোনও যোগ্যতা বা সুকৃতি নাই, যাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ আমাকে তাঁহার ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করিতে পারেন। কেবলমাত্র, বৈষ্ণব-মণ্ডলে সুপ্রসিদ্ধা এবং চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণীর গর্ভজাত বলিয়াই, আমার জননীর প্রতি প্রীতি ও কৃপাবশতঃই শ্রীনিত্যানন্দ আমার ন্যায় অধমকে তাঁহার ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।" সুতরাং এ-স্থলে তাঁহার আত্ম-পরিচয়ও তাঁহার দৈন্যেরই পরিচায়ক।

শ্রীচৈতন্যভাগবত যে গ্রন্থকারের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার হৃদয়ের, অন্তস্তলের অকপট অনুভূতি ছিল এই যে, শ্রীচৈতন্যের লীলা-বর্ণনে তাঁহার কোনও যোগ্যতাই ছিল না, একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যের কৃপাতেই তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়া গিয়াছেন—"চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে শেষের (শেষ রূপ নিত্যানন্দের) কৃপায়। যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়॥ ১।১।৬১॥ চৈতন্য-কথার আদি-অন্ত নাহি দেখি। তাঁহার কৃপায় যে বোলায়েন তাহা লিখি॥ কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়। এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥ ১।১।৬৫-৬৬॥" এ-স্থলে শ্রীল বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—নিজে নৃত্য করিবার যোগ্যতা যেমন কাষ্ঠের পুতলির থাকে না, পুতুলের নর্তনকারী পুতুলকে যে-ভাবে নাচায়, পুতুলও যেমন সেই ভাবেই নাচিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনের যোগ্যতাও তাঁহার নাই, শ্রীগৌরচন্দ্র কৃপা করিয়া যাহা বলাইয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন। চিত্তে শুদ্ধাভক্তির অসাধারণ আবির্ভাব না হইলে এতাদৃশ অসাধারণ অকপট দৈন্য কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

২। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপাদান (১-১২ অনুচ্ছেদ)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর কোনও লীলাই প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন নাই। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। "অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ ১।১।৬০ এবং ১।১২।১৪৩॥" এই পয়ারের "অন্তর্য্যামী"-শব্দ হইতে মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের চরিত-কথা লিখিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনদাসেরও ইচ্ছা হইয়াছিল। অন্তর্যামী নিত্যানন্দ তাঁহার ইচ্ছা জানিয়াই গ্রন্থলেখার নিমিত্ত "কৌতুকে" তাহাকে আদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান কোথায় এবং কিরূপে পাইলেন? এ-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কয়েকটি বিশেষ উক্তি আছে।

ক। বিশেষ উক্তি। কোনও কোনও বিবরণের উপাদান তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে পাইয়াছেন।

(১) শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু-শ্রীগৌরাঙ্গে ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ২।৫ অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দ নিজেই তাঁহার নিকট ষড়্‌ভুজরূপ দর্শনের কথা বলিয়াছেন। "আপনে কহিয়া আছেন ষড়্‌ভুজদর্শনে। তান প্রীতে কহি তান এ-সব কথনে॥ ২।৫।১২৮॥"

(২) ২।২৩-অধ্যায়ে কাজি-উদ্ধার-লীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দই তাঁহার নিকটে এই লীলার কথা বলিয়াছেন "ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে। সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে॥ ২।২৩।৪২৮॥"

(৩) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দের মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব এবং বৈষ্ণবের মহত্ত্বও তিনি কিছু কিছু শুনিয়াছেন। "নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব। কিছু কিছু শুনিলাঙ সভার মহত্ত্ব॥ ২।২০।১৫৬॥" ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, প্রভুর যে-সকল লীলায় বৈষ্ণবের তত্ত্ব এবং মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে-সকল লীলার কথাও তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে শুনিয়া থাকিবেন।

এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপকরণ যে তিনি শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে পাইয়াছেন, তাহা তিনি বলেন নাই।

কোনও কোনও বিবরণের উপাদান গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকটে পাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণে অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের প্রার্থনায় মহাপ্রভুও তাঁহাকে সেই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। ২।২৪-অধ্যায়ে তাহা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ-সকল কথা। ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা॥ ২।২৪।৬৮॥" অন্য কোনও লীলার বিবরণ যে গ্রন্থকার শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে পাইয়াছেন, তাহা তিনি লিখেন নাই।

জগন্নাথের ওড়ন-ষষ্ঠীযাত্রা ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বিবরণ যে গ্রন্থকার শ্রীগদাধরের শ্রীমুখোক্তি হইতে পাইয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। "গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥ ৩।১১।৮৪॥" গদাধর পণ্ডিত ছিলেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শিষ্য।

খ। সাধারণ উক্তি। গ্রন্থের উপাদান-প্রাপ্তিসম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লিখিত কথা কয়টিই গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন। সাধারণভাবে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কে বা জানে।
তাহি লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥ ১।১।৬৪॥"

এই পয়ারোক্ত "ভক্তস্থানে"-শব্দের অন্তর্গত "ভক্ত"-শব্দে তিন শ্রেণীর ভক্ত বুঝাইতে পারে—প্রথমতঃ, প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তগণ। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী নহেন, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকটে প্রভুর লীলার বিবরণ শুনিয়াছেন, যে-সকল ভক্ত। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী নহেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের কথিত কোনও ঘটনার সম্যক্ বিবরণও শুনেন নাই কোনও ঘটনার কোনও কোনও অংশমাত্র যাঁহারা শুনিয়াছেন, পরবর্তীকালের সে-সকল ভক্ত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তদের কথিত বিবরণের

যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তদের কথিত বিবরণের সহিত, প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর ভক্তদের কথিত বিবরণের সঙ্গতি আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

যাহা হউক, শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থের উপাদান-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এ-পর্যন্ত তাহা বলা হইল। তাঁহার গ্রন্থ হইতে জানা যায়, মুরারি গুপ্তের নিকটেও তিনি এই বিষয়ে ঋণী।

গ। **মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ**। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণের চারিটি শ্লোকের মধ্যে শেষ দুইটি (১।১।৩-৪ শ্লোক) মুরারি গুপ্তের রচিত। এই শ্লোকদ্বয় মুরারি গুপ্তের কড়চার শ্লোক নহে। ইহাতে মনে হয়, কড়চা ব্যতীত, মুরারি গুপ্তের রচিত অন্যান্য শ্লোকও বৃন্দাবনদাস দেখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ও মধ্যখণ্ডে (অর্থাৎ প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলার) যে-সমস্ত ঘটনার বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহার অনেকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অথবা কেবল উল্লেখমাত্র, মুরারি গুপ্তের কড়চাতেও দৃষ্ট হয়। অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে, যে-স্থলে প্রভুর আদেশে মুরারি গুপ্ত কর্তৃক তাঁহার "রামাষ্টক"-শ্লোক-সমূহের আবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে কড়চায় লিখিত রামাষ্টকের দুইটি শ্লোকও (৩।৪।১-২ শ্লোকদ্বয়) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মুরারির কড়চাও দেখিয়াছেন এবং অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য কড়চাতে যে-সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অথবা কেবল উল্লেখমাত্র আছে, বৃন্দাবনদাস সে-সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, অন্য ভক্তদের মুখে শুনিয়াই তিনি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে-সমস্ত বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-সমস্ত বিবরণের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও হেতু থাকিতে পারে না। কিন্তু যে-সকল পরবর্তী কালের ভক্ত ঘটনা-বিশেষের আনুপূর্বিক বিবরণ সম্যক্‌রূপে জানিতেন না, বিচ্ছিন্নভাবে অংশবিশেষ মাত্র শুনিয়াছেন, তাঁহাদের কথিত বিবরণ যদি শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বিবরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে বিচারের আবশ্যকতা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না ; কেননা, সেই বিবরণ কিম্বদন্তীমূলক হওয়াও অসম্ভব নহে। যে-ঘটনা-সম্বন্ধে এতাদৃশ বিবরণ দৃষ্ট হইবে, প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ঘটনার বিবরণ যদি অন্যত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিবরণের সহিত মিলাইয়াই তাহার যাথার্থ্য বিচার করা সঙ্গত হইবে।

এক্ষণে কিম্বদন্তীর উৎপত্তি ও স্বরূপ-সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা হইতেছে।

৩। কিম্বদন্তীর উৎপত্তি ও স্বরূপ

যে-ঘটনা বহুলোক প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন, তাঁহাদের মুখে সেই ঘটনার প্রকৃত বিবরণও বহুলোকে জানিতে পারেন। সুতরাং সেই ঘটনা-সম্বন্ধে অনুমান-মূলক বিবরণের সংযোগ সম্ভবপর নহে।

কিন্তু যে-ঘটনা দু'চার জন লোকমাত্র প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, সেই ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ সকলের পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব নহে। ঘটনার দু'একটি অংশমাত্র যদি কেহ শুনিতে পায়েন, তাহা হইলে অনুমানের সহায়তায়, তাঁহার অবগত অংশের সহিত অনুমিত কোনও ঘটনার সংযোগ করিয়া, তিনি হয়তো একটা আনুপূর্বিক বিবরণ প্রস্তুত করিতে পারেন। এই আনুপূর্বিক বিবরণ যে আনুমানিক, তিনি তাহা জানেন।

কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া লোক-পরম্পরাক্রমে সেই বিবরণ যখন অন্যান্য লোকের শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাহা যে আনুমানিক, তাহা লোকে মনে করে না ; সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। তখনই তাহা কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়। এইরূপ কিম্বদন্তীতে ঘটনা-সমূহের এবং ঘটনার সময়েরও অদ্ভুত সমাবেশ হইতে পারে। মনে হয়, এইরূপেই কিম্বদন্তীর উৎপত্তি হয় এবং এইরূপই কিম্বদন্তীর স্বরূপ। প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিবরণের সহিত মিলাইয়াই এতাদৃশ কিম্বদন্তীর বিচার করা প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের যথার্থ উক্তি জানিতে হইলে, গৌর-চরিতকারদের প্রদত্ত বিবরণের স্বরূপ জানা আবশ্যক। এখন তাহা বিবেচিত হইতেছে।

৪। গৌর-চরিতকার (৫-১০ অনুচ্ছেদ)

এই কয়জন প্রাচীন গৌর-চরিতকার আছেন—মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কর্ণপূর এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইঁহাদের প্রদত্ত বিবরণের স্বরূপ কয়েকটি অনুচ্ছেদে আলোচিত হইতেছে (৫-১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৫। মুরারি গুপ্ত

মুরারি গুপ্ত নবদ্বীপবাসী এবং মহাপ্রভুর সম-সাময়িক, মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি প্রভুর নবদ্বীপ-লীলার (অর্থাৎ সন্ন্যাস পর্যন্ত সমস্ত লীলার) প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি তাঁহার কড়চায় প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-বিষয়ে তাঁহার উক্তি-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

কিন্তু তিনি প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তীকালের লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত রথযাত্রা উপলক্ষে তিনি যখন নীলাচলে যাইতেন, তখন যে-কয়মাস নীলাচলে থাকিতেন, সেই কয়মাসের লীলাই তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং নীলাচল হইতে প্রভু যখন বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তখনকার কোনও কোনও লীলাও হয়তো তিনি দর্শন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত, প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী কোনও লীলারই তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না।

নীলাচলে অবস্থান-কালে, মুরারি গুপ্তের পক্ষে এবং অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তদের পক্ষেও, প্রভুর দক্ষিণদেশ বা পশ্চিমদেশ ভ্রমণ-সম্বন্ধে, কোনও বিবরণ অবগত হওয়া সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, প্রভুর মুখে কৃষ্ণ-কথাদি-শ্রবণে এবং প্রভুর সহিত কীর্তনাদিতেই, তাঁহারা প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রভুর রূপ-গুণ-মহিমাদিতেই তাঁহাদের চিত্ত সর্বদা আবিষ্ট থাকিত, কোনও তথ্য-সংগ্রহের কথা তাঁহাদের মনেও জাগিত বলিয়া মনে হয় না।

এ-সমস্ত কারণে, অমৃতবাজার কার্যালয় হইতে প্রকাশিত মুদ্রিত কড়চায়, প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলা-সম্বন্ধে যে-বিবরণ দৃষ্ট হয়, বিশেষজ্ঞগণ তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না।

মুদ্রিত কড়চার চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকায়, কড়চার অনুবাদক শ্রীল হরিদাস দাস-মহাশয় লিখিয়াছেন —"শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিচরণ তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ পর্যন্ত ইহারাই অনুসরণ করিয়াছেন (২।/০ পৃঃ)।" অর্থাৎ ত্রয়োদশ সর্গের পরে কর্ণপূর কড়চার অনুসরণ করেন নাই। সে-স্থানে

হরিদাস দাস-মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, কড়চার কোনও কোনও স্থলে পরবর্তীকালের সংযোজনাও কিছু কিছু থাকিতে পারে (২।৶০ ও ২॥৵০ পৃঃ)।

ডকটর বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়, তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"কবি কর্ণপুর মহাকাব্যের একাদশ সর্গ পর্যন্ত বর্ণনায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত মুরারির গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু একাদশ সর্গের পর আর তিনি তেমনভাবে মুরারিকে অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে নীলাচল-লীলা-বর্ণন-বিষয়ে মুরারির গ্রন্থের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ দৃঢ় হয়।"

কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কোনও স্থলেই মুরারি গুপ্তের কড়চার উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কড়চার উল্লেখ করিয়াছেন। "গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—আদিলীলা নাম॥ আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ চৈ. চ. ১।১৩।১৩-১৪॥"

এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে, প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী লীলা-সম্বন্ধে কড়চায় যাহা লিখিত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

সন্ন্যাসের পরবর্তী লীলা-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত কড়চায় অবশ্যই কিছু লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয়, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আবার, তাঁহার কড়চায় পরবর্তী কালের লেখাও কিছু প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া, কোন্ কোন্ বিবরণ যে তাঁহার লিখিত, তাহা নির্ণয় করাও দুষ্কর।

তথাপি মুরারি গুপ্তই হইতেছেন প্রভুর আদি-চরিতকার।

৬। কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কোনও লীলারই প্রত্যক্ষ-দর্শী ছিলেন না। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈত-প্রভু—এই তিন প্রভুর প্রকটকালে যে তিনি তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছেন, তাহারও কোনও প্রমাণ তাঁহার লিখিত গৌর-চরিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আবার, তিনি হইতেছেন গৌর-চরিতকারদের মধ্যে সর্বশেষ লেখক। তথাপি তাঁহার প্রাপ্ত উপাদানের একটা সর্বাতিশায়ী বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া, মুরারি গুপ্তের পরে, তাঁহার প্রাপ্ত উপাদানের কথাই সর্বাগ্রে বলা হইতেছে।

কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর লীলাকে তিন ভাগ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। তাঁহার আদিলীলা হইতেছে—প্রভুর সন্ন্যাস পর্যন্ত সময়ের লীলা—শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে এবং মধ্যখণ্ডে বর্ণিত লীলা। সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলাকে তিনি সাধারণভাবে "শেষ" লীলা বলিয়া, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। সন্ন্যাসের পরবর্তী প্রথম ছয় বৎসরের লীলাকে তিনি মধ্যলীলা নাম দিয়াছেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যেই প্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশে এবং পশ্চিম-দেশে গিয়াছিলেন একবার বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। প্রভুর শেষ আঠার বৎসরের লীলাকে তিনি অন্ত্যলীলা বলিয়াছেন। এই আঠার বৎসরের মধ্যে প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া অন্য কোনও স্থানেই গমন করেন নাই, জগন্নাথের স্নানযাত্রার পরে, জগন্নাথের অদর্শন-কালে, কেবল আলালনাথে যাইতেন।

ক। গৌর-চরিতের উপাদান-প্রাপ্তি তাঁহার প্রাপ্ত উপাদান-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"আদিলীলমধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥ চৈ. চ. ১।১৩।১৪-১৬॥"

অন্ত্যলীলার উপাদান-সম্বন্ধে করিবাজ গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—

"চৈতন্যলীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ চৈ. চ. ২।২।৭৩॥"

অর্থাৎ স্বরূপদামোদর রঘুনাথের নিকটে যাহা বলিয়াছেন, রঘুনাথের মুখে তাহা শুনিয়া এ-স্থলে বর্ণনা করা হইল। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

"স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সে কালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূর দেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুইজন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজিটীকা ব্যবহার॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৬-৯॥"

এ-স্থলে "স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ-বৃত্তিকার" বাক্যের তাৎপর্য এই যে, স্বরূপদামোদর সূত্রাকারে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, রঘুনাথ দাস তাহারই বিস্তৃত বর্ণনা কবিরাজকে শুনাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গৃহীত বিবরণঃ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ হইতে করিবাজ গোস্বামী যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা, কৈশোরলীলা এবং যৌবনলীলা (অর্থাৎ সন্ন্যাস পর্যন্ত লীলা) সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

"বাল্যলীলা সূত্র এই কৈল অনুক্রম
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল (কহিল)।
পুনরুক্তি হয়—বিস্তারিয়া না কহিল॥ চৈ. চ. ১।১৪।৯১-৯২॥"

পৌগণ্ড বয়সে লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥
অতএব দিঙ্ মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল ॥ চৈ. চ. ১।১৫।২৯-৩০ ॥"

কৈশোর-লীলায় দিগ্ বিজয়ি-জয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

"বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষগুণের বিচার ॥
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্ বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ চৈ. চ. ১।১৬।২৪-২৫ ॥"

এ-স্থলে চৈ. ভা. ১।৯।৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহার পরে সমগ্র কৈশোর-লীলা-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ ॥ চৈ. চ. ১।১৬।১০৩ ॥"

প্রভুর যৌবন-লীলায় কাজী-উদ্ধার-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—

উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ চৈ. চ. ১।১৭।১৩৬ ॥"

বৃন্দাবনদাস সর্বশেষে বলিয়াছেন—প্রভু কাজীকে দণ্ড দিয়া চলিয়া গেলেন (চৈ. ভা. ২।২৩।৪১৯); কিন্তু কি ভাবে কি দণ্ড দিলেন, তাহা বলেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী তাহা বলিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. ১।১৭। ১৩৭-২১৯)। চৈ. ভা. ২।২৩।৪১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

আদিলীলার অন্তে কবিরাজ লিখিয়াছেন,—

"এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৬৭ ॥"

মধ্যলীলার প্রারম্ভেও তিনি একথা বলিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥
অতএব আমি তার সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল ॥ চৈ. চ. ২।১।৩-৪ ॥"

প্রভুর শেষলীলা-(অর্থাৎ সন্ন্যাসের পরবর্তী-লীলা)-বর্ণনাতেও কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতের কোনও কোনও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

"এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ-লীলা না-যায়-বর্ণন ॥

তার মধ্যে যেইভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারিয়া করিলা বর্ণন॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব।
ইহাঁ যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥ চৈ. চ. ২।১।৫-৭॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ৩।১১।১০১-৭৫ পয়ারসমূহে, বৃন্দাবনদাস জগন্নাথের মাণ্ডুয়াবসন ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির যে-প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী সূত্রাকারে তাহার উল্লেখ করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—"বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥ চৈ. চ. ২।১৬।৮০॥" এই প্রসঙ্গে কবিরাজ কোনও "বিশেষ" সংযুক্ত করেন নাই।

বৃন্দাবনদাসের বর্ণিত শেষলীলার কোন্ কোন্ অংশ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও তিনি বলিয়াছেন।

"গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে॥
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ২।৩।২১৩-১৪॥"

এ-স্থলে বৃন্দাবনদাস প্রভুর সঙ্গীদের যে-নাম দিয়াছেন, কবিরাজ তাহা স্বীকার করেন নাই, তিনি অন্য নাম দিয়াছেন। (চৈ. ভা. ৩।২।৩৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাই এ-স্থলে কবিরাজের "বিশেষ"।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত অদ্বৈতাচার্যকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণের বিবরণও কবিরাজ গ্রহণ করিয়াছেন।

"আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। চৈ. চ. ২।১৬।৫৪-৫৫॥"

নীলাচল হইতে প্রভুর বঙ্গদেশে আগমন-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—উড়িয়া-কটক হইতে এক যবনরাজা নৌকাযোগে প্রভুকে পিছলদা পর্যন্ত আনিয়া দিলেন। তারপর—

"সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানীহাটী।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপাশাটী॥"
**** রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড় কষ্টে সৃষ্টে আইলা॥
এক দিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা—যাহাঁ শ্রীনিবাস॥
তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দঘর।
বাসুদেবগৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পতি গৃহে প্রভু যে মতে রহিলা।
লোকভিড়-ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা॥

মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দর্শন ॥
সাতদিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥
শান্তিপুরাচার্য্যগৃহে যৈছে আইলা।
শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥
এথা হৈতে প্রভু যৈছে গৌড়েরে চলিলা।
তবে রামকেলি গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥
তাহাঁ যৈছে রূপ-সনাতনেরে মিলিলা।
নৃসিংহানন্দ যৈছে পথ সাজাইলা ॥
সূত্রমধ্যে আমি তাহা করিলু বর্ণন।
নাটশালা হৈতে যৈছে ফিরি আগমন ॥
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা।
লোকভিড় ভয়ে বৃন্দাবনে নাহি গেলা ॥
শান্তিপুরে পুন কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৯৯-২১৩ ॥"

বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে, নীলাচল হইতে প্রভুর বঙ্গদেশে আগমনের বিবরণ দিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী, মধ্যলীলার সূত্র-কথন-প্রসঙ্গে, (চৈ. চ. ২।১।১৪০-২১২ পয়ারে) এবং মধ্যলীলার ষোড়শ অধ্যায়ে (চৈ. চ. ২।১৬।৯০-২৪৯ পয়ারে), এই বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়াছেন; বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন—এ-কথা বলিয়া, এই লীলার বর্ণন হইতে কবিরাজ ক্ষান্ত হয়েন নাই। নাটশালা হইতে শান্তিপুরে আসিয়া প্রভু যে দশ দিন বাস করিয়াছিলেন, সেই দশ দিনের লীলা-সম্বন্ধেই কবিরাজ বলিয়াছেন—"শান্তিপুরে পুন কৈল দশ দিন বাস। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।" শান্তিপুরে প্রভুর দশ দিন অবস্থিতি-কালের লীলাব্যতীত প্রভুর বঙ্গদেশে আগমনের অন্য বিবরণ কবিরাজ গোস্বামী যে স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়াছেন, তাহার হেতু এই যে, এই বিবরণে তাঁহাকে অনেক "বিশেষ" সংযুক্ত করিতে হইয়াছে। কয়েকটি "বিশেষ" এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—কুলিয়া হইতেই প্রভু রামকেলি গিয়াছেন (চৈ. ভা. ৩।৩।৫০১ এবং ৩।৪।৫); রামকেলি হইতে নাটশালা যাইয়া সে-স্থান হইতে শান্তিপুরে আসেন। কবিরাজ লিখিয়াছেন,—কুলিয়া হইতে প্রভু শান্তিপুরে, শান্তিপুর হইতে রামকেলি হইয়া নাটশালায় গিয়াছিলেন এবং নাটশালা হইতে আবার শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন।

(২) প্রভুর রামকেলিতে অবস্থান-কালে প্রভুর সঙ্গে রূপ-সনাতনের মিলনের কথা বৃন্দাবনদাস কিছুই লিখেন নাই। কবিরাজ কিন্তু প্রভুর সহিত রূপ-সনাতনের এবং তাঁহাদের প্রতি প্রভুর কৃপার, বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। (চৈ. চ. ২।১ পরিচ্ছেদে)।

(৩) নীলাচল হইতে প্রভুর গৌড়দেশে আগমন-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস গদাধর-সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। প্রভুর সঙ্গে বঙ্গদেশে আগমনের নিমিত্ত গদাধরের উৎকণ্ঠাময়ী ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রভু যে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন, কবিরাজ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৬ অধ্যায়)।

(৪) মহাপ্রভু কটকে আসিলে রাজা প্রতাপরুদ্র যে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রভুর গৌড়-গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস সে-সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। কবিরাজ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৬ অধ্যায়)।

(৫) প্রভু কিরূপে নীলাচল হইতে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিলেন, বৃন্দাবনদাস তাহা কিছুই লিখেন নাই। কবিরাজ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৬ অধ্যায়)।

(৬) কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৬ অধ্যায়), নাটশালা হইতে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন সপ্তগ্রামের রঘুনাথদাস শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং প্রভু তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস এ-সকল কথা কিছুই লিখেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতে রঘুনাথদাসের উল্লেখ পর্যন্তও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না।

খ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত অথচ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুল্লিখিত কয়েকটি লীলা ঃ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে এমন কয়েকটি লীলা অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহাদের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। এ-স্থলে এতাদৃশী কয়েকটি লীলার উল্লেখ করা হইতেছে।

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবতের ৩।৫।৫০৯-৬৩৩ পয়ার-সমূহে এবং ৩।৬।১-৬৭ পয়ার-সমূহে, শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার-ধারণ-প্রসঙ্গ এবং চোর-দস্যুদের উদ্ধার-প্রসঙ্গ।

বৃন্দাবনদাসের উক্তি (৩।৫।২২৭-৩২) অনুসারে, প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ যখন রামদাসাদি ভক্তগণের সহিত নীলাচল হইতে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রথমে পানিহাটিতে আসিয়া তিন মাস ছিলেন (৩।৫।৩২০-২১, ৩।৫।৩৩২)। কিছু দিন পরে অলঙ্কারধারণের নিমিত্ত নিত্যানন্দের ইচ্ছা হইল (৩।৫।৩৩৩) এবং তৎক্ষণাৎ নানাবিধ অলঙ্কার উপস্থিত হইল, নিত্যানন্দ সমস্ত ধারণ করিলেন (৩।৫।৩৩৪-৪৩)। এইভাবে সুসজ্জিত হইয়া নিত্যানন্দ গঙ্গার তীরবর্তী গ্রামসমূহে সঙ্কীর্তনানন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন (৩।৫।৩৫৬)। এইরূপে জানা গেল, প্রভুর আদেশে রামদাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত পানিহাটিতে উপস্থিতির প্রায় ৪।৫ মাস পরেই নিত্যানন্দ অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হইতে জানা যায়, দক্ষিণদেশ হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রথম রথযাত্রা উপলক্ষ্যে (অর্থাৎ ১৪৩৪ শকের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে), তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়াছিলেন। চাতুর্মাস্যের পরে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসেন। সেই সময়েই, গৌড়দেশে নাম-প্রেম-বিতরণের জন্য প্রভু নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন এবং রামদাসাদি কয়েকজন ভক্তকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।২৫।৩৮-৪৪)।

ইহা হইতে জানা গেল, ১৪৩৪ শকের শেষার্ধে ই প্রভু নিত্যানন্দকে রামদাসাদির সঙ্গে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং ১৪৩৪ শকের শেষভাগে, অথবা ১৪৩৫ শকের প্রথম ভাগেই, নিত্যানন্দ অলঙ্কার ধারণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস যে নিজে নিত্যানন্দের এই অলঙ্কার-ধারণ-লীলা দর্শন করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না। যেহেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৪৪০-শকের পূর্বে তাঁহার জন্মই হয় নাই।

(২) শ্রীচৈতন্যভাগবতের ৩।৭।৮-১২০ পয়ারসমূহে বর্ণিত, সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের অলঙ্কার-ধারণাদি-সম্বন্ধে, প্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক ব্রাহ্মণকর্তৃক, প্রভুর নিকটে অভিযোগ এবং প্রভুকর্তৃক সেই ব্রাহ্মণকে শিক্ষাদান।

(৩) শ্রীচৈতন্যভাগবতের ৩।১০।১৩০-৪৮ পয়ার-সমূহে বর্ণিত কেশব ভারতীর প্রসঙ্গ।

এইরূপ বিবরণ আরও কিছু কিছু আছে; বাহুল্যবোধে উল্লিখিত হইল না। যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে-সকল বিবরণের উল্লেখ পর্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয় না, সে-সমস্ত বিবরণের স্বরূপ কি, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

গ। কবিরাজগোস্বামীর উপাদানের স্বরূপ। মহাপ্রভুর শেষলীলার (অর্থাৎ সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলার) উপাদান-সম্বন্ধে কবিরাজ স্বরূপ-দামোদরের এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর কড়চার উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বরূপ-দামোদর ছিলেন নবদ্বীপবাসী, প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ। পূর্বাশ্রমে তখন তাঁহার নাম ছিল পুরুষোত্তম আচার্য। তিনি প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলারও প্রত্যক্ষদর্শী। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তিনিও কাশীতে যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণদেশ হইতে প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের সময় হইতে দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় পর্যন্ত সময় ছিল কয়েক দিন অধিক দুই বৎসর দুই মাস। এই সময়ে স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না।

নীলাচল হইতে প্রভু যখন বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তখনও স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সঙ্গে ছিলেন এবং প্রভুর সঙ্গেই আবার নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

প্রভু যখন নীলাচল হইতে পশ্চিমদেশে (বৃন্দাবনে) গমন করিয়াছিলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর নীলাচলে ছিলেন। বিজয়া দশমীর পরে প্রভু পশ্চিমদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী রথযাত্রার পূর্বে, সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসেই, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। এই ছয়-সাত মাসও স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না।

এইরূপে দেখা গেল, মোট প্রায় পৌণে তিন বৎসর তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না। তিনি প্রভুর অন্তর্ধানের পরেও কিছু কাল প্রকট ছিলেন। ঐ পৌণে তিন বৎসরের লীলাব্যতীত তিনি প্রভুর সমস্ত লীলাই প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছেন। নীলাচলেও তিনি ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলাদির সময়ে স্বরূপ-দামোদর এবং রায় রামানন্দই প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন।

ঐ পৌণে তিন বৎসরের লীলার বিবরণও তিনি বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে কাটোয়া হইতে প্রভুর রাঢ়দেশ-ভ্রমণান্তে শান্তিপুরে আগমনের এবং শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আগমনের বিবরণ তিনি মুকুন্দ দত্তের নিকটে জানিতে পারিয়াছেন। প্রভুর নবদ্বীপসঙ্গী মুকুন্দ দত্ত সেই সময়ে প্রভুর সঙ্গী

ছিলেন এবং নীলাচলেও তিনি ছিলেন প্রভুর নিত্যসঙ্গী। নীলাচলে উপস্থিতি হইতে প্রভুর দক্ষিণদেশ-যাত্রার পূর্বপর্যন্ত লীলার সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। সেই সময়ের লীলার বিবরণ তিনি সার্বভৌমের নিকটেও জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশে ভ্রমণ-কালে রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু রায় রামানন্দের নিকটেই জানিতে পারিয়াছেন। দক্ষিণদেশে গমনের পথেও প্রভু রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথেও মিলিত হইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন প্রভু বিদ্যানগরে রায়ের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার তীর্থভ্রমণের কথা তাঁহার নিকটে বলিয়াছিলেন। রামানন্দের নিকটে "তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা ॥ চৈ. চ. ২।৯।২৯৫ ॥" দক্ষিণদেশ হইতে যে-দিন প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন সেই দিন—"মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লৈয়া। সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া॥ ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন। আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সম্বাহন॥ প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে। সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥ সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ। তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈলা জাগরণ॥ চৈ. চ. ২।৯।৩২৪-২৭॥" রায়রামানন্দ ও সার্বভৌমের নিকটেই প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের বিবরণ স্বরূপ-দামোদর জানিতে পরিয়াছেন। প্রভুর পশ্চিমদেশ-ভ্রমণের বিবরণও তিনি প্রভুর পশ্চিমদেশ-ভ্রমণের সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্যের নিকটে জানিতে পরিয়াছেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য নীলাচলেই থাকিতেন। এইরূপে জানা গেল, উল্লিখিত পৌনে তিন বৎসরের লীলার বিবরণও স্বরূপ-দামোদর বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন। আর পরবর্তী কালের প্রভুর নীলাচল-লীলা তো তিনি নিজেই প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত লীলার বিবরণ তিনি সূত্রাকারে তাঁহার কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী সেই কড়চা পাইয়াছিলেন।

এক্ষণে রঘুনাথদাস গোস্বামীর কথা বলা হইতেছে। প্রভুর অন্তর্ধানের ষোল বৎসর পূর্বে তিনি নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন এবং প্রভুর অন্তর্ধানের পূর্বে আর কখনও নীলাচল ত্যাগ করেন নাই। প্রভু তাঁহাকে স্বরূপ-দামোদরের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার নিকটেই থাকিতেন। এই ষোল বৎসর তিনি স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। রঘুনাথ—"অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৩৮॥ মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস। সর্ব্বত্যাগি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥ প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাথে। প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥ ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন। স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥ চৈ. চ. ১।১০।৮৯-৯১॥" প্রভুর শেষ ষোল বৎসরের লীলার রঘুনাথ ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবকও। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাঁহার কড়চায় (অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু-নামক গ্রন্থে), "সংক্ষেপে বাহুল্যে" (অর্থাৎ বহু লীলার, অথচ প্রত্যেক লীলার সংক্ষেপে) বর্ণন করিয়াছেন। এই রঘুনাথদাস ছিলেন কবিরাজ গোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরুর একজন। করিবাজ তাঁহার এই কড়চা পাইয়াছেন। কবিরাজ যখন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে দাসগোস্বামীর সঙ্গেই বাস করিতেন। স্বরূপ-দামোদরের কড়চাও তিনি দাস গোস্বামীর নিকটেই পাইয়াছেন এবং এই কড়চায় স্বরূপ-দামোদর যে-সকল লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, স্বরূপ-দামোদরের মুখে রঘুনাথ সে-সমস্তের বিস্তৃত বিবরণও শুনিয়াছিলেন এবং

তিনি কবিরাজের নিকটে সে-সমস্ত বলিয়াছিলেন (চৈতন্যলীলারত্ন সার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ চৈ. চ ২।২।৭৩ ॥)। দাস গোস্বামীর নিজের কড়চায় লিখিত লীলার বিস্তৃত বিবরণ যে তিনি কবিরাজ গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

এইরূপে দেখা গেল, স্বরূপ-দামোদরের কড়চায়, রঘুনাথ দাসের কড়চায় এবং রঘুনাথের মুখের বিবৃতিতে, কবিরাজ গোস্বামী যে-উপাদান পাইয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ভরযোগ্য।

দাসগোস্বামীর গৃহত্যাগের পূর্ববর্তী কালের কোনও কোনও লীলার বিবরণও তাঁহার মুখে কবিরাজ গোস্বামী শুনিয়াছেন। যেমন, শান্তিপুরে প্রভুর সহিত রঘুনাথের মিলন, নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে বাসের নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টা, পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত রঘুনাথের মিলন, সপ্তগ্রামে হরিদাস ঠাকুরের সহিত রঘুনাথের মিলন, শান্তিপুরে হরিদাস ও মায়াদেবীর বিবরণ ইত্যাদি। মায়াদেবী ও হরিদাসের প্রসঙ্গ-বর্ণন করিয়া কবিরাজ লিখিয়াছেন—"স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল। রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥ সেই সব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া। চৈতন্যকৃপায় লিখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা॥ চৈ. চ. ৩।৩। ২৫৬-৫৭॥" রঘুনাথের উদ্ধার-কথা-বর্ণনের প্রসঙ্গেও কবিরাজ লিখিয়াছেন—"আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস। গৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পবৃক্ষে করিলা প্রকাশ॥ চৈ. চ. ৩।৬।৩১৯॥"

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয়ও কবিরাজ গোস্বামীর দুই জন শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁহাদের নিকটেও তিনি অনেক ঘটনার বিবরণ জানিতে পারিয়াছেন। যেমন, রামকেলিতে প্রভুর সহিত রূপ-সনাতনের মিলন, প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন এবং প্রভুকর্তৃক শ্রীরূপের শিক্ষাদি, বল্লব ভট্টের বিবরণ, কাশীতে প্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের মিলন, প্রভুকর্তৃক সনাতনের শিক্ষা, প্রকাশানন্দসরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদের উদ্ধার, নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীরূপের মিলন, সপার্ষদ প্রভুকর্তৃক শ্রীরূপের নাটকের আলোচনা, নাটক-লিখনের বিবরণ, নীলাচলে প্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের মিলন প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত কবিরাজের অপর শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্টগোস্বামী, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী এবং শ্রীজীবগোস্বামীর নিকটেও তিনি কোনও কোনও বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন।

এইরূপে দেখা গেল—কবিরাজ গোস্বামী যে-বিবরণ পাইয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। এই জাতীয় বিবরণ-প্রাপ্তি অপর কোনও চরিতকারের পক্ষেই সম্ভব হয় নাই। ইহাই কবিরজ গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণের সর্বাতিশায়ী বৈশিষ্ট্য।

৭। লোচনদাস ঠাকুর

তাঁহার গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল," বঙ্গভাষায় পয়ারাদি ছন্দে রচিত। তিনিও বহুস্থলে মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুসরণ করিয়াছেন। আবার, দু'য়েকটি এমন ঘটনারও তিনি বর্ণনা দিয়াছেন, যাহা মুরারি গুপ্ত এবং বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার বিরোধী। তাঁহার প্রচারিত মতবাদও উক্ত চরিতকার-দ্বয়ের, এবং শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অনুগত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণেরও, মতের বিরুদ্ধ। কবিরাজ গোস্বামী কোনও স্থলেই লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করেন নাই।

৮। কবি কর্ণপূর

ইনি শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম পরমানন্দ দাস। মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরীগোস্বামীর নাম উচ্চারণ করিতেন না বলিয়া, এবং কর্ণপূরের নামে "পরমানন্দ" শব্দটি আছে বলিয়া, কর্ণপূরকে কেবল "পুরীদাস" বলিতেন। কর্ণপূর দুইখানি গৌর-চরিতগ্রন্থ লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্। উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত-ভাষায় রচিত।

ক। কর্ণপূরের নাটক হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোক। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে কর্ণপূরের নাটক হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

(১) কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন কাটোয়া হইতে যাত্রা করিয়া রাঢ়দেশ ভ্রমণান্তে গঙ্গার নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তখন—"—নিত্যানন্দ মহাশয়। মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥ প্রভু কহে—শ্রীপাদ! তোমার কোথাকে গমন। শ্রীপাদ কহে—তোমাসঙ্গে যাব বৃন্দাবন॥ প্রভু কহে—কতদূরে আছে বৃন্দাবন। তেঁহো কহে—কর এই যমুনা দর্শন॥ এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা-সন্নিধানে। আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা-জ্ঞানে॥ 'অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।' এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥ চৈ. চ. ২৷৩৷২১-২৫॥" ইহার পরে কবিরাজ নাটক হইতে যমুনা-স্তবের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমদাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী॥ নাটক॥ ৫৷১০॥"

কবিরাজ এ-স্থলে কেবল যমুনা-স্তবটিই কর্ণপূরের নাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর রাঢ়দেশ-ভ্রমণ-বিষয়ে কর্ণপূরের বিবরণের সহিত কবিরাজের বিবরণ সর্বাংশে এক নহে। দৃষ্টান্তরূপে দু'য়েকটি বিবরণ কথিত হইতেছে।

কর্ণপূর লিখিয়াছেন, গঙ্গা হইতে কিছু দূরবর্তী স্থানেই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিকটে আত্মপরিচয় দিয়াছেন (নাটক। ৫৷৯-শ্লোকের পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কবিরাজ লিখিয়াছেন, গঙ্গা-সন্নিধানে আসিয়াই নিত্যানন্দ আত্মপরিচয় দিয়াছেন (চৈ. চ. ২৷৩৷২৩-২৪)। কর্ণপূর লিখিয়াছেন, যমুনা-স্তব পাঠ করিয়া প্রভু যখন যমুনা-জ্ঞানে গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন, তখন একজন পুরুষ আসিয়া নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলে, নিত্যানন্দ তাঁহাকে বলিলেন—"ওহে! এই অল্প দূরে গঙ্গাপারে অদ্বৈতের গৃহ। তুমি ত্বরিত গতিতে যাইয়া অদ্বৈতকে জানাও যে, 'একজন সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যানন্দ নিকটবর্তী হইয়া আপনার অপেক্ষা করিতেছেন।' তখন সেই পুরুষটি বলিলেন—'আমি তাহাই করিতেছি'। এ-কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন (নাটক॥ ১০-১১ শ্লোকের মধ্যবর্তী অংশ)। ইহার পর অদ্বৈত আসিলেন এবং নিত্যানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভো অদ্বৈত! নবদ্বীপে কশ্চিৎ প্রেরিতোঽস্তি?—হে অদ্বৈত! নবদ্বীপে কেহ কি প্রেরিত হইয়াছেন?" তখন অদ্বৈত বলিলেন—"অথ কিম্? সর্বে আগতপ্রায়া এব।—তা বৈ কি? সকলে আগত-প্রায়ই।" (নাটক॥ ৫৷১৬ এবং ৫৷১৭ শ্লোকের মধ্যবর্তী অংশ)। অদ্বৈত নৌকা লইয়াই অসিয়াছিলেন—এ-কথা নাটকে আছে। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, প্রভুর নিকটে আত্মপরিচয়-দানের পূর্বে "আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি। শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞি॥ প্রভু লৈয়া যাব আমি তাঁহার মন্দিরে। সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥ তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।

শচীসহ লঞা আইস সব ভক্তগণ ॥ চৈ. চ. ২।৩।১৮-২০ ॥" নাটক হইতে জানা যায়, প্রভুর অদ্বৈত-ভবনে প্রবেশের দিনেই নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ শান্তিপুরে উপনীত হইয়াছিলেন এবং প্রভুর ভিক্ষার পরে তাঁহারা প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন (নাটক ॥ ৫।২৩-২৪ ॥)। কিন্তু কবিরাজ বলেন, পরের দিন প্রাতঃকালে আচার্যরত্ন শচীমাতাকে শান্তিপুরে লইয়া আসিয়াছিলেন, ভক্তবৃন্দও সেই সঙ্গেই আসিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।৩।১৩৪-৩৬ ॥"

(২) সার্বভৌমের সহিত প্রভুর বেদান্ত-বিচার-প্রসঙ্গে, প্রভু বলিয়াছিলেন, " 'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ। 'প্রাকৃত' নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন ॥ চৈ. চ. ২।৬।১৩৩ ॥" কর্ণপূরও যে তাঁহার নাটকে এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কবিরাজ নাটকের ৬।৬৭-শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং স্যা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ং সবিশেষমেব ॥" কবিরাজের এবং কর্ণপূরের উক্তির মর্ম অনেকটা একরূপ হইলেও কথাগুলি ঠিক একরকম নহে। কবিরাজ তাঁহার প্রাপ্ত বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আনুষঙ্গিকভাবে কর্ণপূরের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৩) নীলাচলে প্রভুর সহিত স্বরূপ-দামোদরের মিলন-কথা বলিয়া স্বরূপ-দামোদর যে-শ্লোকে প্রভুর স্তব করিয়াছিলেন, কর্ণপূরের নাটক হইতে কবিরাজ সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।—"হেলোদ্ধুনিতখেদয়া বিশদয়া" ইত্যাদি নাটকের ৮।১০ শ্লোক।" প্রভুর সহিত স্বরূপ-দামোদরের মিলন-প্রসঙ্গ কর্ণপূর যেভাবে বলিয়াছেন, কবিরাজ ঠিক সেইভাবে বলেন নাই। নাটকে দৃষ্ট হয়, স্বরূপ-দামোদর উল্লিখিত শ্লোকটি আকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই (আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা) উচ্চারণ করিয়াছিলেন, প্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলেন নাই। কিন্তু কবিরাজ বলিয়াছেন—"সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা। চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২।১০।১১৬ ॥" নাটক হইতে কবিরাজ কেবল প্রণাম-শ্লোকটিই গ্রহণ করিয়াছেন, বিবরণ গ্রহণ করেন নাই।

(৪) প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা-কথন-প্রসঙ্গে কবিরাজ লিখিয়াছেন, প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে সার্বভৌম যখন রাজাকে দর্শন-দানের নিমিত্ত প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইলেন, তখন প্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া বলিয়াছিলেন—"সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন—। স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ চৈ. চ. ২।১১।৬ ॥" এই প্রসঙ্গে কবিরাজ নাটকের "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" ইত্যাদি ৮।২৩ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সার্বভৌম যখন বলিলেন, প্রতাপরুদ্র রাজা হইলেও জগন্নাথের সেবক এবং ভক্তোত্তম। তখন প্রভু বলিয়াছিলেন "তথাপি রাজা কালসর্পাকার। কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥ চৈ. চ. ২।১১।৮।" এই প্রসঙ্গেও কবিরাজ কর্ণপূরের নাটকের "আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি" ইত্যাদি ৮।২৪ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজার নিকটে সার্বভৌম এ-সকল কথা জানাইলে, রাজা বলিয়াছিলেন "পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার। শুনি জগাই মাধাই তেঁহো করিল উদ্ধার ॥ 'প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগত উদ্ধার।' এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥ চৈ. চ. ২।১১।৩৬-৩৭ ॥" এই প্রসঙ্গেও নাটকের—"অদর্শনীয়ানপি নীচযোনীম্" ইত্যাদি ৮।২৮ শ্লোকটি কবিরাজ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নাটকের বিবরণের সহিত কবিরাজের বিবরণের মোটামোটি মিল দেখা যায়।

প্রভুর দাক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সহিত মিলন-কালে "শিবানন্দে কহে প্রভু—তোমার আমাতে। গাঢ় অনুরাগ হয়— জানি আগে হৈতে॥ শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হৈয়া। দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শ্লোক পড়িয়া॥ চৈ. চ. ২।১১।১৩৫-৩৬॥" তাঁহার পঠিত শ্লোকটি হইতেছে, স্তোত্ররত্নে শ্রীযমুনাচার্যকৃত ২৬শ শ্লোক, "নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ। ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥" যমুনাচার্যের এই শ্লোকটি কর্ণপূরের নাটকেও (৮।৪১), উল্লিখিত প্রসঙ্গে, সেন শিবানন্দের উক্তিরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। এ-স্থলে নাটকের কতকগুলি উক্তির সহিত কবিরাজের বর্ণনার ঐক্য আছে, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে ঐক্য নাই। যথা, কর্ণপূর এ-স্থলে লিখিয়াছেন, গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত শ্রীনিত্যানন্দও ছিলেন (৮।৩৬)। কিন্তু কবিরাজ বলিয়াছেন, নিত্যানন্দ পূর্ব হইতেই নীলাচলে ছিলেন।

(৬) বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যখন প্রয়াগে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীরূপ-গোস্বামীও গৌড়দেশ হইতে সে-স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রভু দশ দিন পর্যন্ত তাঁহাকে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর। রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥ চৈ. চ. ২।১৯।১০৯॥" এ-স্থলে তাঁহার উক্তির সমর্থনে কর্ণপূরের নাটক হইতে তিনি তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, "কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা" ইত্যাদি (৯।৩৮), যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি" ইত্যাদি (৯।২৯) এবং "প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে" ইত্যাদি (৯।৩০)। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোক বর্তাহারীর মুখে এবং তৃতীয় শ্লোকটি সার্বভৌমের মুখে প্রকাশিত। এই শ্লোকত্রয়ে শ্রীরূপের কৃপার প্রাচুর্যের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু কিরূপে কৃপা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। কবিরাজ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৯ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(৭) বারাণসীতে শ্রীসনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা ও কৃপার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া কবিরাজ লিখিয়াছেন—"এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ। যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥ নিজগ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া। সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥ চৈ. চ. ২।২৪।২৫৮-৫৯॥" ইহার পরে কর্ণপূরের নাটক হইতে কবিরাজ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, "গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ম্" ইত্যাদি (৯।৩৪॥ এই শ্লোকে সনাতনের প্রতি কৃপার কথা বলা হইয়াছে), "তং সনাতনমুপাগতম্" ইত্যাদি (৯।৩৫॥ এই শ্লোকেও সনাতনের প্রতি কৃপার কথা) এবং "কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা" ইত্যাদি (৯।৩৮॥ এই শ্লোকে রূপ ও সনাতন—এই উভয়ের প্রতি কৃপার কথা বলা হইয়াছে)। তিনটি শ্লোকই বার্তাহারীর মুখে প্রকাশিত। রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভু কিভাবে কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ-স্থলে কর্ণপূর তাহার কোনও বিবরণই দেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৯-২৪ পরিচ্ছেদসমূহ দ্রষ্টব্য)।

(৮) রঘুনাথদাসের গৃহত্যাগের কথা বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর। রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৫৯॥" ইহার পরে তিনি কর্ণপূরের নাটক হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, "আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ" ইত্যাদি (১০।৩) এবং "যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা" ইত্যাদি (১০।৪)। উভয় শ্লোকই শিবানন্দ সেনের উক্তি।

কর্ণপূর এ-স্থলে রঘুনাথদাসের প্রতি প্রভুর কৃপার বিবরণ কিছু দেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন (চৈ. চ. ৩।৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে দেখা গেল, কর্ণপূরের নাটক হইতে কবিরাজ গোস্বামী মোট পনরটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কর্ণপূরের মহাকাব্য হইতে কোনও উক্তিই তিনি উদ্ধৃত করেন নাই, এমন কি শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কোনও স্থলে তিনি কর্ণপূরের মহাকাব্যের নামও উল্লেখ করেন নাই। নাটক হইতে তিনি পনরটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু নাটক হইতে তিনি তাঁহার গ্রন্থের কোনও উপাদান গ্রহণ করেন নাই। কবিরাজ তাঁহার প্রাপ্ত উপাদানের অনুসরণেই তাঁহার গ্রন্থে ঘটনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; দু'য়েকটি স্থলে তাঁহার বর্ণনার সহিত কর্ণপূরের নাটকের বর্ণনার কিছু সাদৃশ্য আছে মাত্র।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জনা যায়, কর্ণপূরের নাটক হইতে উল্লিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত না করিলেও, কবিরাজের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থাকিত না, অঙ্গহীনও হইত না।

কর্ণপূরের গ্রন্থ হইতে কবিরাজ গোস্বামী কোনও উপাদান গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই, যাঁহাদের নিকট হইতে তিনি উপাদান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ-প্রসঙ্গে, মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, স্বরূপ-দামোদর এবং রঘুনাথদাসাদির কথা তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু কর্ণপূরের কথা বলেন নাই।

কর্ণপূরের গ্রন্থ হইতে উপাদান গ্রহণ না করার হেতু বোধ হয় এই যে, কবিরাজ বিভিন্ন ঘটনার যে বিবরণ পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত কর্ণপূরের গ্রন্থের বিবরণের অনেক স্থলেই সঙ্গতি নাই।

খ। কর্ণপূরের প্রাপ্ত উপাদানের স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। কর্ণপূর ছিলেন মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র। পিতার নিকটেই কর্ণপূর গৌর-চরিতের উপাদান পাইয়াছেন। আবার কর্ণপূর নিজেও ছিলেন প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। সুতরাং কর্ণপূরের বিবরণের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে কিরূপে সন্দেহ জন্মিতে পারে?

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। প্রথমে সেন শিবানন্দ-সম্বন্ধেই কিছু বিবেচনা করা হইতেছে। বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থের আদিখণ্ডে এবং মধ্যখণ্ডে (অর্থাৎ প্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ববর্তী গার্হস্থ্যলীলার বর্ণনায়) কোনও স্থলেই শিবানন্দ সেনের নাম উল্লেখ করেন নাই। প্রভু যখন নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে যখন প্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে গিয়াছিলেন, তখন "শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গ সনে" বাসুদেব দত্ত শ্রীবাসের গৃহে আসিয়াছিলেন (চৈ. ভা. ৩।৫।১৮)। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহাই হইতেছে শিবানন্দ সেনের সর্বপ্রথম উল্লেখ। এ-স্থলে শিবানন্দের উল্লেখমাত্র আছে; শিবানন্দ-সম্বন্ধে অন্য কোনও কথাই নাই, প্রভু যে শিবানন্দের সঙ্গে একটি কথাও বলিয়াছেন, তাহারও কোনও উল্লেখ নাই। শিবানন্দ সেন যে প্রভুর পূর্বপরিচিত প্রিয়ভক্ত, বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, সেই সময় পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া—"এক দিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস। প্রাতে কুমারহট্টে আইলা—যাহাঁ শ্রীনিবাস॥ তাহাঁ হইতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর। বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥ চৈ. চ. ২।১৬।২০২-৩॥" এই প্রসঙ্গে কবিরাজের উক্তির সহিত বৃন্দাবন-দাসের উক্তির সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীবাসের গৃহেই বাসুদেব দত্ত গিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে শিবানন্দ সেনও গিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ বলেন, শ্রীবাসের গৃহ

হইতে প্রভু প্রথমে শিবানন্দের গৃহে গমন করিয়াছেন, তাহার পরে বাসুদেবের গৃহে গিয়াছেন। কবিরাজের উক্তি হইতে জানা যায়, শিবানন্দ ছিলেন প্রভুর পূর্বপরিচিত এবং অতি প্রিয়; নতুবা প্রভু তাঁহার গৃহে যাইবেন কেন?

কুমারহট্টের অপর নাম হালিসহর। কাঞ্চনপল্লী (কাঁচরাপাড়া) হইতেছে বাসুদেব দত্তের শ্রীপাট। শিবানন্দ সেনের শ্বশুরবাড়ী কাঁচরাপাড়ায়। এ-স্থানেই তিনি থাকিতেন। গৌ. বৈ. অ.।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাস ও কবিরাজের উক্তির এক সঙ্গে বিবেচনা করিলে বুঝা যায়—শিবানন্দ সেন কাঁচরাপাড়াতেই থাকিতেন। অদ্বৈতাচার্যের একটি বাড়ি যেমন শান্তিপুরে ছিল এবং নবদ্বীপেও যেমন তাঁহার আর একটি বাড়ি ছিল, শিবানন্দের বোধ হয় নবদ্বীপে তদ্রূপ কোনও বাড়ি ছিল না। এজন্যই বোধ হয় বৃন্দাবনদাস প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-প্রসঙ্গে শিবানন্দের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু নবদ্বীপে তাঁহার বাড়ি না থাকিলেও তিনি যে প্রভুর দর্শনে নবদ্বীপে আসিতেন, কবিরাজের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায়। নচেৎ তিনি কিরূপে প্রভুর পরিচিত এবং প্রিয় হইয়াছিলেন? তবে শিবানন্দ সেন যে প্রভুর সমগ্র নবদ্বীপ-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, তাহাও বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে প্রভুর গার্হস্থ্য লীলার উপাদান-প্রাপ্তি কর্ণপূরের পক্ষে সম্ভব হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলা-সম্বন্ধে শিবানন্দ সেনের অভিজ্ঞতা বিষয়ে বিবেচনা করা হইতেছে।

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে করিয়া প্রতি বৎসরই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শিবানন্দ সেন নীলাচলে যাইতেন এবং চাতুর্মাস্যের পরে ভক্তদিগকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন। পথে যে-সকল বিশেষ ঘটনা ঘটিত এবং ঐ কয়মাস নীলাচলে প্রভু যে-সকল লীলা করিতেন, সে-সমস্ত তিনি প্রত্যক্ষভাবেই জানিতেন। কিন্তু নীলাচলে অন্য সময়ে যে-সকল লীলা হইত, সে-সকলের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। সেই সময়ে নীলাচলে এবং অন্য সময়ে নীলাচলের বাহিরে প্রভু যে-সকল লীলা করিয়াছিলেন, তাহাদের বিবরণ যথার্থরূপে অবগত হওয়ার সুযোগও তাঁহার বিশেষ ছিল না। তাহার হেতু মুরারি গুপ্তের প্রসঙ্গেই পূর্বে বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল, শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে গৌর-চরিতের উপাদান-সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু অবগত হওয়া কর্ণপূরের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

এক্ষণে কর্ণপূরের নিজের সম্বন্ধে বিবেচিত হইতেছে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ৬।৭ বৎসর পরে কর্ণপূরের জন্ম। প্রভুর অন্তর্ধানের সময় তাঁহার বয়স ছিল ১৭।১৮ বৎসর। তাঁহার দুই বার নীলাচলে গমনের কথা কবিরাজ বলিয়াছেন—এক বার অতি শৈশবে এবং আর এক বার সাত বৎসর বয়সে। এই দুই বারের প্রত্যেক বারেই প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর বিশেষ-কৃপা-প্রসঙ্গেই কবিরাজ এই দুই বারের কথা বলিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে না যে, কর্ণপূর দুই বারের বেশী নীলাচলে গমন করেন নাই। যাহা হউক, যে-কয় বার তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বারে যে-কয় মাস সে-স্থানে ছিলেন, প্রভুর সেই কয় মাসের লীলাই তিনি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছেন। প্রভুর অন্য কোনও লীলার বিবরণ যথার্থভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ তাঁহার বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার হেতু পূর্বে মুরারি গুপ্তের প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে।

এই আলোচনা হইতে মনে হয়, প্রভুর লীলার বিশেষ বিবরণ যথার্থভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ

কর্ণপূর যে বিশেষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সুতরাং প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শিবানন্দের পুত্র হইলেও এবং নিজেও প্রভুর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত হইলেও, কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে প্রভুর লীলার যে-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যে সম্যক্‌রূপে নির্ভরযোগ্য, তাহা বলা যায় না।

৯। কর্ণপূরের এবং কবিরাজের প্রদত্ত বিবরণের আলোচনা

বস্তুতঃ কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে প্রভুর লীলার যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত, কবিরাজ গোস্বামীর প্রাপ্ত সন্দেহাতীত বিবরণের অনেক অসঙ্গতি এবং বিরোধ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটি বিবরণ এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

ক। **সন্ন্যাসান্তে প্রভুর রাঢ়দেশ-ভ্রমণ-প্রসঙ্গ।** কাটোয়া হইতে বহির্গত হইয়া প্রভু যে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে তাহা বলেন নাই। মহাকাব্য হইতে জানা যায়, সেই দেশে (কোন্ দেশ, তাহার নাম নাই) ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও হরিনাম শুনিতে না পাইয়া, দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে প্রভু এক নদীতে জলমগ্ন হইতেছিলেন, এমন সময় কতকগুলি বালক হরিধ্বনি করিয়া উঠিলে প্রভু প্রেমার্দ্র হইলেন (মহাকাব্য ॥ ১১।৫৯)॥

মহাকাব্য ॥ ১১।৬০-শ্লোক হইতে জানা যায়, পথে প্রভু এক দিন আহারও করিয়াছিলেন।

মহাকাব্য ॥ ১১।৬২-৬৩-শ্লোকে বলা হইয়াছে,—প্রভু নিজেই অদ্বৈত-ভবনে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন এবং নবদ্বীপে যাইয়া নবদ্বীপবাসী ভক্তদিগকে অদ্বৈত-গৃহে আনয়নের নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দকে আদেশ করিলেন, তদনুসারে নিত্যানন্দও নবদ্বীপে গেলেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, প্রভুর তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল। মহাকাব্য ॥ ১১।৬৮-শ্লোকে বলা হইয়াছে, চলিতে চলিতে প্রভু নিজেই অদ্বৈতগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু কর্ণপূর তাঁহার নাটকে অন্যরূপ কথা লিখিয়াছেন। দেহত্যাগের উদ্দেশ্যে প্রভুর নদীতে নিমজ্জনের কথা নাটকে নাই। প্রভু যে পথে এক দিন আহার করিয়াছিলেন, সে-কথাও নাটকে নাই। নাটকে বরং বলা হইয়াছে—তিন দিন পর্যন্ত প্রভুর আহার ছিল না, জলপান পর্যন্ত ছিল না (নাটক ॥ ৫।৬)। প্রভু নিজে যে অদ্বৈত-ভবনে গমনের ইচ্ছা করিয়াছেন, নাটকে সে-কথাও নাই ; আছে বরং নিত্যানন্দই কৌশলে প্রভুকে অদ্বৈতগৃহে আনয়নের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন (নাটক ॥ ৫।৯-শ্লোকের পরে, নিত্যানন্দের স্বগতোক্তি—"সম্প্রতি সংপৎস্যতে মে মনোরথঃ, যদনেন পথৈবাদ্বৈতবাটীমাসাদয়িতুং শক্যতে)।" ভ্রমণের তিন দিনের মধ্যে কখনও যে প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ছিল, সে-কথাও নাটকে নাই। আছে—নিত্যানন্দ যখন প্রভুর নিকটে আত্ম-পরিচয় দিলেন, তখনই প্রভুর একটু বাহ্যজ্ঞান হইল, তখন তিনি নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন। নিত্যানন্দ যে কাটোয়া হইতেই প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তখনও প্রভুর সেই জ্ঞান ছিল না (নাটক ॥ ৫।৯ এবং ৫।১০-শ্লোকের মধ্যবর্তী অংশ)। প্রভু যে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছেন, এ-কথাও নাটকে নাই। নাটক হইতে জানা যায়, প্রভুর অজ্ঞাতসারে নিত্যানন্দই আচার্যরত্নকে অদ্বৈতমুখ্যদিগকে সংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন (নাটক ॥ ৪।৪৩) এবং নিত্যানন্দ সর্বদাই প্রভুর সঙ্গে ছিলেন। প্রভু নিজেই যে অদ্বৈত-ভবনে গিয়াছেন, এ-কথাও নাটকে নাই ; আছে—অদ্বৈত গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রভুকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া গেলেন (নাটক ॥ ৫।১৩ এবং ৫।১৭-শ্লোকের মধ্যবর্তী অংশ)।

এই বিবরণ হইতে জানা গেল, আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে কর্ণপূর মহাকাব্যে এক রকম লিখিয়াছেন, নাটকে অন্য রকম লিখিয়াছেন।

কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থশেষে নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—১৪৬৪ শকে (অর্থাৎ মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৯ বৎসর পরে) মহাকাব্যের লেখা শেষ হইয়াছে এবং ১৪৯৪ শকে (অর্থান্তরে ১৫০১ শকে) নাটকের লেখা শেষ হইয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল, মহাকাব্যের অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর পরে নাটকের লেখা শেষ হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর রাঢ়দেশ-ভ্রমণ-বিবরণ কর্ণপূর মহাকাব্যে যাহা বলিয়াছেন, পরে তাহা যথার্থ নহে (অর্থাৎ তাহা কিম্বদন্তীমূলক) বুঝিতে পারিয়া নাটকে সংশোধিত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে, কবিরাজের বিবরণের সহিত, মহাকাব্যের বিবরণের তো কোনও সঙ্গতিই নাই, নাটকের বিবরণেরও যে সর্বাংশে মিল নাই, তাহা পূর্বেই যমুনা-স্তব-শ্লোক-প্রসঙ্গে [৪ঘ (অ) (১)] প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে কোনও কোনও বিষয়ে নাটকের বিবরণের সহিত কবিরাজের বিবরণের যে সঙ্গতি আছে, তাহাতেই বুঝা যায়, কর্ণপূর তাঁহার নাটকে সংশোধিত বিবরণই দিয়াছেন এবং ইহাতে ইহাও বুঝা যায় যে, মহাকাব্যের পরেই নাটক লিখিত হইয়াছে ; নচেৎ সংশোধনের অবকাশ থাকিত না।

খ। **মহাপ্রভুর সর্বপ্রথম নীলাচলে উপস্থিতি-প্রসঙ্গ**। এই প্রসঙ্গের সহিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য যে সাক্ষাদ্‌ভাবে সংশ্লিষ্ট, কর্ণপূরের বিবরণ হইতেও তাহা জানা যায়। সুতরাং এ-সম্বন্ধে সার্বভৌমের উক্তিই হইবে একমাত্র প্রামাণ্য উক্তি। কর্ণপূর বা শিবানন্দ সেন এই লীলা দর্শন করেন নাই, তখন কর্ণপূরের জন্মও হয় নাই। সার্বভৌমের নিকটে শুনিয়া স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় যাহা নিবদ্ধ করিয়াছেন, তদনুসারে কবিরাজ-গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এ-স্থলে লিখিত হইতেছে। শান্তিপুর হইতে চলিতে চলিতে প্রভু, কমলপুরের পরে আঠারনালায় উপস্থিত হইয়া, নিত্যানন্দকর্তৃক তাঁহার দণ্ডভঙ্গের ব্যাপারের ছলে সঙ্গীদের সহিত কলহ করিয়া, সঙ্গীদের নিকটে বলিলেন—"আমি তোমাদের সঙ্গে আর যাইব না, একাকী যাইব। হয় তোমরা আগে যাও, আর না হয় আমি আগে যাই। তোমরা যাহা বলিবে, তাহাই করিব।" তখন মুকুন্দ দত্ত বলিলেন—"প্রভু, তুমিই আগে যাও, আমরা পরে যাইব।" তখন প্রভু জগন্নাথের মন্দিরের দিকে একাকীই ধাবিত হইলেন। জগমোহনে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথ-দর্শন মাত্রেই প্রেমাবিষ্ট হইয়া, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া প্রভু জগন্নাথের দিকে ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু গর্ভমন্দিরের দ্বারদেশে গিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। দৈবাৎ সার্বভৌম তখন সে-স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রভুকে রক্ষা করিলেন। প্রভুর মূর্ছাভঙ্গ হয় না ; এদিকে ভোগের সময়ও উপস্থিত ; সুতরাং প্রভুকে আর মন্দিরের দ্বারদেশে রাখা যায় না। তখন সার্বভৌম নিজের অনুগত কয়েকজন লোকের দ্বারা ধরাধরি করাইয়া প্রভুকে স্বীয় গৃহে লইয়া আসিলেন এবং প্রভুর শ্বাস-প্রশ্বাস দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। প্রভুকে সার্বভৌম নিজগৃহে লইয়া যাওয়ার পরে, প্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দ-মুকুন্দাদি জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখে উপনীত হইয়া শুনিলেন, তত্রত্য লোকগণ বলাবলি করিতেছে—"এক সন্ন্যাসী আসিয়া আজ জগন্নাথ-দর্শন করিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। সার্বভৌম তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়াছেন।" তাঁহারা বুঝিলেন—এই সন্ন্যাসী প্রভুই, অপর কেহ নহেন। সুতরাং সার্বভৌমের গৃহে গেলেই প্রভুকে পাওয়া যাইবে। কিন্তু নিত্যানন্দাদি সার্বভৌমের গৃহ চিনিতেন না। এমন সময় হঠাৎ গোপীনাথ আচার্য সিংহদ্বারের

নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন নবদ্বীপবাসী, প্রভুর নবদ্বীপলীলা দর্শন করিয়াছেন এবং প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তিনি নীলাচলে আসিয়া সার্বভৌমের গৃহে বাস করিতেছিলেন—তিনি ছিলেন সার্বভৌমের ভগিনীপতি। মুকুন্দ দত্তের সহিত নবদ্বীপেই তাঁহার পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিয়া তিনি প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুকুন্দ প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের এবং নীলাচলে উপস্থিতির এবং তত্রত্য লোকগণ যাহা বলাবলি করিতেছিল—সমস্তই আচার্যকে জানাইলেন। তখন গোপীনাথ আচার্য নিত্যানন্দাদিকে সার্বভৌমের গৃহে লইয়া গেলেন। সার্বভৌম তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করিলেন এবং যখন জানিলেন যে, তাঁহারা জগন্নাথ-দর্শন করেন নাই, তখন স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদিগকে দর্শনে পাঠাইলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহারা প্রভুর কর্ণমূলে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর মূর্ছাভঙ্গ এবং বাহ্যজ্ঞান হইল। তাহার পর সমুদ্রস্নানাদি করিয়া তাঁহারা সেই দিন সার্বভৌমের গৃহেই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন এবং সার্বভৌম তাঁহার মাতৃস্বসার গৃহে প্রভুর বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন। এইরূপই হইল কবিরাজ-গোস্বামীর কথিত বিবরণ।

কিন্তু কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—কমলপুর হইতে প্রভু শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন (মহাকাব্য ॥ ১১।৮৪-৮৫)। শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রভু সার্বভৌমের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্বভৌম অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রভুর যথোচিত সম্বর্ধনা করিলেন এবং প্রভুর অভিপ্রায় জানিয়া স্বীয় পুত্রের সহিত প্রভুকে জগন্নাথ-দর্শনে পাঠাইলেন। জগন্নাথকে দর্শন করিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন, পুনঃ পুনঃ নমস্কার এবং স্তব করিলেন, প্রভুর নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগন্নাথকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলেন। মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি নিজ ভক্তগণের সহিত প্রভু কতিপয় দিবস শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানপূর্বক জগন্নাথদর্শন করিতে লাগিলেন (মহাকাব্য ॥ ১২।১-৯)।

এই প্রসঙ্গে কর্ণপূর তাঁহার নাটকে (নাটক ।। ৬।১৪ এবং ৬।২০ শ্লোকের মধ্যবর্তী অংশে) লিখিয়াছেন—কমলপুর হইতে সঙ্গের ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরুষদের সাহায্য-ব্যতীত, তাঁহাদের ন্যায় পরদেশীদিগের পক্ষে জগন্নাথ-দর্শন দুর্লভ হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ চিন্তিত হইলে মুকুন্দ বলিলেন, বিশারদের জামাতা (অর্থাৎ সার্বভৌমের ভগিনীপতি) এবং প্রভুর নবদ্বীপ-বিলাসাভিজ্ঞ গোপীনাথ আচার্য এখানে আছেন। সার্বভৌমের দ্বারা তিনি দর্শনের সুযোগ করিয়া দিতে পারিবেন। তখন ভক্তগণ তুষ্ট হইয়া বলিলেন —"তাহা হইলে সর্বাগ্রে সার্বভৌমের বাড়ীরই অন্বেষণ করা উচিত।" এমন সময় জগন্নাথ-দর্শনের উদ্দেশ্যে গোপীনাথ আচার্য সে-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। মুকুন্দের সহিত তাঁহার দেখা হইলে, তিনি মুকুন্দের নিকট প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, মুকুন্দ সমস্ত জানাইলেন। গোপীনাথ এক যতীন্দ্রকে সে-স্থলে দেখিলেন, কিন্তু তিনি যে প্রভু, তাহা জানিতে পারিলেন না। মুকুন্দ পরিচয় দিলে গোপীনাথ আচার্য প্রভুর চরণযুগলে প্রণাম করিলেন। কিরূপে যথেচ্ছভাবে জগন্নাথের দর্শন লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মুকন্দ গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে, গোপীনাথ বলিলেন—সার্বভৌমের দ্বারা সুযোগ করাইয়া দেওয়া যাইবে। তিনি প্রভুকেও বলিলেন— "সার্বভৌমের সহিত আলাপ না করিলে দর্শন সুলভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রভুর কি ইচ্ছা?" প্রভু বলিলেন—"তোমার ইচ্ছাই আমারও ইচ্ছা।" তারপর গোপীনাথ আচার্য সকলকে লইয়া সার্বভৌমের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং কিছুকাল দ্বারদেশে সকলকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, গোপীনাথ ভিতরে গিয়া সার্বভৌমকে

জানাইলেন। স্বীয় শিষ্যবৃন্দের সহিত সার্বভৌম আসিয়া প্রভুকে নমস্কার করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। গোপীনাথের নিকটে সার্বভৌম প্রভুর পূর্বাশ্রমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহা জানিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। গোপীনাথ সার্বভৌমকে জানাইলেন—স্বচ্ছন্দে জগন্নাথের দর্শন ইহাদের অভিপ্রেত। তখন সার্বভৌম স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বরকে ডাকিয়া বলিলেন—"চন্দনেশ্বর! এই শ্রীপাদের অনুগমন কর। যাহাতে ইনি স্বচ্ছন্দভাবে দর্শন করিতে পারেন, সর্বতোভাবে তাহাই করিতে হইবে। কেহ যেন কোনওরূপ বাধা না দেয়। ইনি মদীয়, অন্যতম নহেন।" তখন চন্দনেশ্বর প্রভুকে লইয়া মন্দিরে গেলেন।

এই প্রসঙ্গে, নাটকের বিবরণের সহিত মহাকাব্যের বিবরণেরও সর্ববিষয়ে সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণের সহিত মহাকাব্য এবং নাটকের বিবরণের কোনও সঙ্গতিই নাই।

গ। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-যাত্রা-প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিচারের নিমিত্ত, কবিরাজের কথিত বিবরণ জানা দরকার বলিয়া, এ-স্থলে প্রথমে কবিরাজের কথিত বিবরণই প্রদত্ত হইতেছে।

কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।৬ এবং ২।৮-পরিচ্ছেদে যাহা লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। প্রভুর পূর্বপরিচয়াদি জানিয়া এবং প্রভুর প্রকৃতি-বিনীত স্বভাব দেখিয়া, প্রভুর প্রতি সার্বভৌমের অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছিল। তরুণ বয়সে কিরূপে প্রভুর সন্ন্যাস-ধর্ম রক্ষিত হইবে, তাহা ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিলেন—"আমি নিরন্তর ইহাকে বেদান্ত শুনাইব এবং বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব।" পরে একদিন প্রভু সার্বভৌমের সঙ্গেই জগন্নাথ দর্শন করিলেন এবং সার্বভৌমের সঙ্গেই সার্বভৌমের গৃহে আসিলেন। প্রভুকে বসাইয়া সার্বভৌম বলিলেন—"বেদান্তশ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ॥ প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ। সেই ত কর্ত্তব্য আমার—তুমি যেই কহ॥ চৈ. চ. ২।৬।১১৩-১৪॥" সার্বভৌম প্রভুকে বেদান্ত (অর্থাৎ শঙ্করভাষ্যানুগত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা) শুনাইতে লাগিলেন। প্রভু "সাতদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে। ভাল মন্দ নাহি কহে, বসি মাত্র শুনে॥ অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম—। সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥ ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি। বুঝ কি না বুঝ—ইহা বুঝিতে না পারি॥ প্রভু কহে—মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন। তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করি যে শ্রবণ॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি। তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥ ভট্টাচার্য্য কহে—'না বুঝি' হেন জ্ঞান যার। বুঝিবার তরে সেই পুছে আর বার॥ তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি। হৃদয়ে কি আছে তোমার—বুঝিতে না পারি॥ প্রভু কহে—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল। তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল॥ সূত্রের অর্থ—ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া। তুমি ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ চৈ. চ. ২।৬।১১৫-২৩॥" শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া প্রভু ব্রহ্মসূত্রের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব পক্ষ অপার করিল॥ বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল। সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥ ভগবান্ 'সম্বন্ধ' ভক্তি 'অভিধেয়' হয়। প্রেমা 'প্রয়োজন'—বেদে তিন বস্তু কয়॥ আর যে যে কিছু কহে—সকলি কল্পনা। স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬০-৬৩॥" প্রভুর মুখে এ-সকল কথা—"শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাণী—হইলা স্তম্ভিত॥

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! না কর বিস্ময়। ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥ আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন। ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬৫-৬৭॥" এই সময় প্রভু শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকটির উল্লেখ করিলেন—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ভা. ১।৭।১০॥"

প্রভুর মুখে এই শ্লোক—"শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়। এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥ প্রভু কহে—তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি। পাছে আমি করিব অর্থ, যে বা কিছু জানি॥ শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান। তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ-বিধান॥ নব-বিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র-মত লৈয়া। শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষত হাসিয়া॥ ভট্টাচার্য্য! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি॥ কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়। ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায়॥ ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল। তাঁর নব-অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল॥ আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়। পৃথক্-পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নির্ণয়॥ তৎপদ-প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া। অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬৮-৭৬॥" প্রভুর কথিত শ্লোকার্থ "শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার। প্রভুকে 'কৃষ্ণ' জানি করে আপনা ধিক্কার॥ ইহো ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—ইহা না জানিয়া। মহাঅপরাধ কৈল গর্ব্বিত হইয়া॥ আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ। কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥ দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ॥ দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি। পুন উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥ প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব। নাম-প্রেম-দান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥ শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে। বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥ শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥ অশ্রু-স্তম্ভ পুলক কম্প স্বেদ থরহরি। নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥ তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল। স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥ * * স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা। ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥ চৈ. চ. ২।৬।১৮০-৯৫॥"

ইহার পরে—"আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দর্শনে। দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে॥ পূজারী আনিঞা মালা প্রসাদান্ন দিলা। প্রসাদান্ন মালা পাইয়া প্রভু হর্ষ হৈলা॥ সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া। ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হৈয়া॥ অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন। সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্ফুটে কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা। কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাঢ়িলা॥ বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দর্শন। আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন॥ বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা। প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাথে দিলা॥ প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল। স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল॥ চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল। এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিলা॥ 'শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ (পদ্মপুরাণবচন)॥ দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন। প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥ দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন। প্রভু-ভৃত্য দোঁহার স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥ স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা। প্রেমাবিষ্ট হঞা

প্রভু কহিতে লাগিলা—॥ আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন। আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥ আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ। সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥ আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥ আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন। আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন॥ আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন। বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥ এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে। সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে॥ চৈতন্য-চরণ বিনে নাহি জানে আন। ভক্তিবিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান॥ চৈ. চ. ২।৬।১৯৬-২১৪॥"

ইহার পরে, "আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে। জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু-স্থানে॥ দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি। দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি॥ ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন। প্রভু উপদেশ কৈল নামসঙ্কীর্ত্তন॥ চৈ. চ. ২।৬।২১৬-১৮।" ইহার পরে প্রভু "হরের্নাম" শ্লোকটি বলিয়া, "এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার। শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার॥ চৈ. চ. ২।৬।২১৯।" তারপর প্রভু সার্ব-ভৌমকে বলিলেন—"যাঞা করহ জগন্নাথ-দরশন॥ জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা। ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া॥ উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা। নিজ বিপ্রহাথে দুই জনা সঙ্গে দিলা॥ নিজ দুই শ্লোক লিখি এক তাল পাতে। 'প্রভুকে দিহ' বলি দিল জগদানন্দ-হাথে॥ প্রভু-স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা। মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল তার হাথে পাঞা॥ দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল। তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল॥ (প্রভু শ্লোক দেখি পত্রী চিরিয়া ফেলিল। ভিত্ত্যে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥ ২।৬।২২৩-২৯।" শ্লোক দুইটি হইতেছে "বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগম্" ইত্যাদি এবং "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ" ইত্যাদি।) "এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠে রত্নহার। সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার॥ সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত এক তান। মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন॥ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।' এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥ চৈ. চ. ২।৬।২৩০-৩২॥"

ইহার পরে "একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু-স্থানে আইলা। নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥ ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা। শ্লোক শেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥ (ভট্টাচার্য্যের পঠিত শ্লোকটি এইরূপ) তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এব আত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভি-র্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্॥" (ভা. ১০।১৪।৮॥ শ্লোকশেষে প্রকৃত পাঠ—"মুক্তিপদে", সার্ব্বভৌম তৎস্থলে "ভক্তিপদে" পাঠ বলিয়াছেন)। প্রভু কহে—'মুক্তিপদে' ইহা পাঠ হয়। 'ভক্তিপদে' কেনে পঢ়—কি তোমার আশয়॥ ভট্টাচার্য্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তিফল। ভগবদ্‌বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥ কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে। যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥ সেই দুইয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি। তার মুক্তি ফল নহে—যেই করে ভক্তি॥ যদ্যপি সে মুক্তি হয় পঞ্চ পরকার। সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥ সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥ 'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥ (এস্থলে ভাগবত হইতে প্রমাণ-শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে)। ** প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়। 'মুক্তিপদ'-শব্দে—সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ মুক্তি পদে যার—সেই 'মুক্তিপদ' হয়। নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥ দুই অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কাহে পাঠ ফিরি? সার্ব্বভৌম কহে—ও-শব্দ কহিতে না পারি॥ যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়। তথাপি

আগ্নিয়দোষে কহনে না যায় ॥ যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের পঞ্চমুক্ত্যে বৃত্তি। রূঢ়িবৃত্ত্যে করে তভু সাযুজ্য প্রতীতি ॥ মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণাত্রাস ॥ ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস ॥ শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে। ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ। তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদ ॥ চৈ. চ. ২।৬।২৩১-৫০ ॥"

এপর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতেছে প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার পূর্ববিবরণ। এক্ষণে চৈ. চ. ২।৭-পরিচ্ছেদ হইতে দক্ষিণ-দেশ-যাত্রার কথা বলা হইতেছে।

"এই মত সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল। দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ মাঘ শুক্লপক্ষে (অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে পূর্ণিমা তিথিতে) প্রভু করিল সন্ন্যাস। ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল। প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্যগীত কৈল ॥ চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন। বৈশাখ-প্রথমে (অর্থাৎ ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসের প্রথমে) দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ চৈ. চ. ২।৭।২-৫ ॥" প্রভু একাকীই যাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী নিত্যানন্দ অনেক বুঝাইয়া, কৃষ্ণদাস-নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লওয়ার প্রস্তাবে প্রভুকে সম্মত করাইলেন। তখন প্রভু "তাঁহা-সভা" (প্রভুর সঙ্গীদিগকে) লৈয়া গেলা সার্ব্বভৌম-ঘরে ॥ নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল। সভাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল ॥ নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে—। তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে। অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব। তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব ॥ শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর। চরণে ধরিয়া করে বিষাদ উত্তর—॥ বহুজন্ম পুণ্য ফলে পাইনু তোমার সঙ্গ। হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ ॥ শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন। দিন কথো রহ, দেখি তোমার চরণ ॥ তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন। রহিলা দিবসকথো—না কৈল গমন ॥ * * দিন চারি রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে। চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে ॥ প্রভুর আগ্রহে ভট্টাচার্য্য সম্মত হইলা। প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥ দর্শন করি ঠাকুর-পাশে আজ্ঞা মাগিল। পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি। আনন্দে দক্ষিণ দেশে চলিলা গৌরহরি ॥ ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ জন। জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ সমুদ্র তীরে তীরে আলালনাথ-পথে। (চৈ. চ. ২।৭।৪০-৫৮) ॥" সার্ব্বভৌমের আদেশে গোপীনাথ আচার্য প্রভুর জন্য কৌপীন ও জগন্নাথের প্রসাদ আনিতে গেলেন। "তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে—। অবশ্য করিবে মোর এই নিবেদনে ॥ রায়-রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে। অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে ॥ শূদ্র-বিষয়ি-জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবে। আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥ চৈ. চ. ২।৭।৬০-৬২ ॥" প্রভু সম্মত হইলেন। আলিঙ্গন করিয়া প্রভু সার্বভৌমকে বিদায় দিলেন, সার্বভৌম মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। প্রভু "তাঁরে উপেক্ষিয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥ চৈ. চ. ২।৭।৭০ ॥" নিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণ প্রভুর সঙ্গে চলিলেন, গোপীনাথ আচার্যও কৌপীন ও প্রসাদ লইয়া আসিলেন এবং প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। "সভাসঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা। নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা ॥ ২।৭।৭৪ ॥ এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে। সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে। প্রাতঃকালে

স্নান করি করিলা গমন ॥ ভক্তগণে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন ॥ মূর্চ্ছিত হইয়া সভে ভূমিতে পড়িলা। তাহা সভা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥ চৈ. চ. ২।৭।৮৮-৯০ ॥ ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাই রহিলা। আর দিন দুঃখী হইয়া নীলাচলে আইলা ॥ চৈ. চ. ২।৭।৯২ ॥"

প্রভু এই যে গেলেন, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ দেশ-ভ্রমণান্তে, দুই বৎসর পরে, নীলাচলে ফিরিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে, প্রভু যে কখনও নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া, কয়েক দিন থাকিয়া, আবার দক্ষিণ দেশে গিয়াছেন, এইরূপ কোনও কথা, এমন কি কোনও ইঙ্গিতও, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণে দৃষ্ট হয় না।

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে, কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে যাহা লিখিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা কথিত হইতেছে। মহাকাব্যের অধ্যায় এবং শ্লোক-সংখ্যাও বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হইতেছে।

কর্ণপূর লিখিয়াছেন—সার্বভৌম মনে মনে ভাবিলেন, "মহাবংশ-জাত এবং অল্পবয়স্ক এই মহাশয়, কলিযুগে, সুদুর্গম যতিত্ব কিরূপে উত্তীর্ণ হইবেন ? (১২।১৫)। অতএব, আমি ইঁহাকে অজস্র বেদান্ত শুনাইয়া, বৈরাগ্যরসের দ্বারা এবং ভাস্বজ্‌-জ্ঞানৈকতানের দ্বারা মোক্ষপথের পথিক করিব (১২।১৬)।" প্রভু তাঁহার এইরূপ মনোভাব জানিতে পারিয়া, সার্বভৌমের প্রতি সানুকম্প হইয়া, বিলোল-চিত্তে মনে মনে হাস্য করিলেন (১২।১৭)। অন্য একদিন, স্বীয় পাদানুরক্ত ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরচন্দ্র সার্বভৌমের গৃহে গিয়া উপনীত হইলেন (১২।১৮)। সার্বভৌম গাত্রোত্থানপূর্বক প্রণাম করিলেন এবং প্রভুকে প্রশস্ত আসন দিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন (১২।১৯)। বিনীতভাবে সার্বভৌম প্রভুকে বলিলেন—"আমার শিষ্যগণ এ-স্থানে বেদান্ত পাঠ করিতেছেন ; আপনারা যোগ্যতম, শ্রবণ করুন ; তাহাতে মনোমালিন্য শীঘ্রই দূরীভূত হইবে (১২।২০)। আমি এই বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অনেক বার অধ্যাপনও করিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি প্রভুর সমীপে পাঠ করাইতে প্রমত্ত হইলেন (১২।২১)। তিনি প্রগল্‌ভতার সহিত বেদান্ত বলিয়া যাইতেছেন ; তাহা শুনিয়া গৌরচন্দ্র ধীরে ধীরে সার্বভৌমের বাক্যের সম্বন্ধে উদ্‌গ্রাহবিধির (অর্থাৎ নিজ বাক্যের অবতারণা) করিলেন (১২।২২)। প্রভু বলিলেন—"কি বলিতেছেন ? ইহার পূর্বপক্ষই বা কি ? ইহার কি সিদ্ধান্তই বা করিতেছেন ? বেদান্তশাস্ত্রের এইরূপ অর্থ নয়। অতএব, আমি যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন (১২।২৩)।" এইরূপ বলিয়া, সার্বভৌমের প্রতিপক্ষরূপে প্রভু অদ্বৈতবাদ নিরসনপূর্বক ভক্তিসংস্থাপক স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন (১২।২৪)। প্রভু এইরূপে অখিল প্রমাণের দ্বারা এবং তাৎপর্য, লক্ষণা, গৌণী, মুখ্যা এবং জহদজহৎস্বার্থা নাম্নী শব্দশক্তির দ্বারা, স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন (১২।২৫)। সার্বভৌমও বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি-উত্থাপন করিলেন। প্রভু তৎসমস্ত খণ্ডন করিলে সার্বভৌম আবার পূর্বপক্ষ করিলেন। প্রভু তাহারও খণ্ডন করিলেন (১২।২৬)। তাঁহাদের বাদানুবাদে দীর্ঘকাল অতীত হইল (১২।২৭)। অনন্তর সার্বভৌম বিস্মিত ও ব্যাকুল হইয়া মনে মনে বলিলেন—"আমার প্রাতিভাখণ্ডনার্থ ইনি কে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? ইনি কি বৃহস্পতি ? (১২।২৮)। এইরূপ তর্ক আমার সর্বদাই হইয়াছে। কিন্তু বৃহস্পতিও আমার প্রতিভাসমুদ্র তাঁহার বুদ্ধিরূপ নৌকাদ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন না (১২।২৯)। ইনি তো কৈশোরবয়স্ক। কতই বা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং করাইয়াছেন ? ইঁহাকে পরাভত করিবার শক্তি তো আমার ছিল। তথাপি ইঁহাকে পরাভূত করিতে

পারিলাম না (১২।৩০)। অতএব ইনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণ, ইহাতে আর অন্যথা নাই। ইঁহার চরিত্রই তাঁহার পরিচায়ক।” মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াই, সার্বভৌম পুলকিত দেহে তাঁহার হৃদয়েশ্বরকে নমস্কার করিলেন (১২।৩১)। অশ্রু-বিগলিত নেত্রে এবং পুলকিত কলেবরে স্তুতি-নতিদ্বারা প্রভুকে প্রসন্ন করাইতে লাগিলেন এবং কৃপাসিন্ধু প্রভুও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন (১২।৩২)। প্রভু তাঁহাকে শত কোটি দিবাকরের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইলেন এবং সার্বভৌমও ততোঽধিক আনন্দিত হইয়া প্রভুর স্তব করিলেন (১২।৩৩)। সার্বভৌম প্রভুর যে-স্তব করিয়াছেন, বৃহস্পতি যত্নসহকারেও তদ্রূপ স্তব করিতে সমর্থ নহেন (১২।৩৪)।

এই পর্যন্তই মহাকাব্য-কথিত, প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের বিবরণ। এই বিবরণের প্রথমাংশে (১২।১৭-২৩ শ্লোকসমূহে) কর্ণপূর যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত বিবরণের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। পরবর্তী ১২।২৪ শ্লোকের উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই, যেন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া, সার্বভৌমের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কবিরাজের উক্তি এইরূপ নহে। কবিরাজ বলিয়াছেন, সাতদিন পর্যন্ত বেদান্ত শুনিয়াও প্রভু যখন ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না, তখন সার্বভৌম তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু বলিলেন—“সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি। তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি।” প্রভু আরও বলিয়াছেন—“মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।” (ইহাতে প্রভুর স্বাভাবিক বিনয়ই প্রকাশ পাইয়াছে)। তখন সার্বভৌম বলিলেন —“যে বুঝে না, বুঝার জন্য সে তো জিজ্ঞাসা করে। তুমি কিছু জিজ্ঞাসাও কর না। তোমার হৃদয়ে কি আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” তখনই প্রভু ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপূর্বে নহে। তাহার পরে ১২।২৫-২৬-শ্লোকদ্বয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে সার্বভৌমের সহিত প্রভুর বেদান্ত-বিচার, সূত্রাকারে উল্লিখিত হইলেও, কবিরাজের বিস্তৃত বিবরণের সহিত তাহার অসঙ্গতি নাই। কিন্তু পরবর্তী ১২।২৮-৩২ শ্লোকসমূহে সার্বভৌমের যে পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে, কবিরাজের বিবরণ অনুসারে, সেই পরিবর্তন হইয়াছিল, অনেক পরে।

এক্ষণে মহাকাব্য হইতে প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-প্রসঙ্গ কথিত হইতেছে।

পূর্ববিবরণে সর্বশেষ যে শ্লোকটির কথা বলা হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—“অনন্তর গৌরচন্দ্র কতিপয় দিবস নীলাচলে যাপন করিয়া দক্ষিণ দিকে গমনের ইচ্ছা করিলেন এবং সকলে হরিনাম-কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন (১২।৩৫)। কিছু দূরে যাইয়া প্রভু সে-সমস্ত ভক্তকে বিদায় দিলেন। তাহার পরে, গোপীনাথ-নামক ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে প্রভুকে নমস্কার করিলেন (১২।৩৬)। যাইতে যাইতে গোপীনাথের হাতে একখানি স্তবের পুস্তিকা দেখিয়া, প্রভু প্রীতিবশতঃ তাঁহার হাত হইতে তাহা টানিয়া লইলেন। তৎপর, প্রভুর অনুগামী ভক্তগণও সে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১২।৩৭)। তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে, প্রভু একাকী এক বৃক্ষমূলে বসিয়া সেই পুস্তিকাখানি খুলিয়া, অতীব হর্ষের সহিত অনেক-ক্ষণ দেখিলেন (১২।৩৮)। প্রভু সেই পুস্তিকখানির মধ্যে একস্থলে ‘কৃষ্ণ’-শব্দটি দেখিলেন (১২।৩৯) এবং তাহা দেখিয়াই প্রেমবিহ্বল চিত্তে ভূপতিত হইলেন, অশ্রুধারায় তাঁহার অঙ্গ ধৌত হইতে লাগিল এবং তিনি চেষ্টাশূন্য হইলেন (১২।৪০)। সার্বভৌমের প্রতি করুণা বিধান করিতে ইচ্ছুক, কৃপালু প্রভু বৃক্ষমূলে পতিত অবস্থাতেই সেই দিবসের অবশিষ্ট ভাগ এবং সমস্ত রাত্রিও যাপন করিলেন (১২।৪১)। প্রাতঃকালে

জাগরিত হইয়া বিহ্বলচিত্তে বাগ্‌গদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠে প্রভু বলিলেন—"অহো ! মহানুভাবাত্মা সার্বভৌমের নিকটে আমার বহু অপরাধ হইয়াছে (১২।৪২)। একমাত্র মোহজাত দম্ভের বশীভূত হইয়া, আমি কিরূপেই বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে যাইতেছি। তাই আমি শ্রীক্ষেত্রে পুনরায় গমন করিব এবং তাঁহার সেবা করিব। তিনিই মহানুভাব (১২।৪৩)। তাঁহার সেবাবিধি-ব্যতীত আমি আর কিছুই করিব না।" এইরূপ ভাবিয়া প্রভু এক প্রহর মধ্যে পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন (১২।৪৪)। আচার্যবর্য গোপীনাথকে আনয়নের নিমিত্ত সার্বভৌম তৎক্ষণাৎ একজন লোককে পাঠাইলেন। সেই লোকও ত্বরিতগতিতে গোপীনাথ আচার্যের নিকটে যাইয়া বলিল (১২।৪৫), "আচার্য ! শীঘ্র আসুন। কৃষ্ণচৈতন্যদেব এই স্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া গোপীনাথ বলিলেন "অরে ! তুমি কি সব মিথ্যা কথা বলিতেছ ? প্রভু যে সহর্ষে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন (১২।৪৬)। আমরাই বহু দূর পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। কেন তিনি এখানে আসিবেন ?" গোপীনাথ একথা বলিলে সেই লোক আবার বলিল, "আমি পুনঃ পুনঃ সত্য কথাই বলিতেছি (১২।৪৭)।" তখন গোপীনাথ ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং প্রভুকে দেখিয়া হৃষ্টমনা হইয়া প্রিয়বাক্যে প্রভুকে বলিলেন (১২।৪৮), "দেব ! আপনি কেনই বা গেলেন ? আবার কেনই বা ফিরিয়া আসিলেন ? ইহা অতীব আশ্চর্য !" তখন প্রভু মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন (১২।৪৯), "আচার্য ! সম্প্রতি সার্বভৌমের নিকটে আমার বহু অপরাধ হইয়াছে। যেহেতু দম্ভবশতঃ আমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলাম (১২।৫০)। এই মহাত্মা ভগবৎ-স্বরূপ, জগত্রয়ীত্রাণপর, সচেষ্ট। যেহেতু, ইঁহার মুখ হইতে, 'কৃষ্ণ'-নামযুক্ত একটি ললিত পদ্য নির্গত হইয়াছে (১২।৫১)। অতএব ইঁহার সেবাই আমার কর্তব্য, কেবল ইঁহার সেবাই আমার পক্ষে ঈশ্বর-সেবা—এইরূপ ভাবিয়াই আমি তীর্থগমন হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছি (১২।৫২)।" গোপীনাথ প্রভুর এ-সকল কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন (১২।৫৩)। ইহার পরে ১২।৫৪-৫৮-শ্লোকসমূহে প্রভুর করুণার বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করিয়া গোপীনাথ বলিলেন—"প্রভু ! বুঝিতে পারিলাম, সম্প্রতি সার্বভৌমের প্রতি আপনি ভূরিতর অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন।" প্রভু তাঁহাকে বলিলেন "মহাত্মন্‌ ! এরূপ কথা বলিবেন না। এখন ইঁহার সেবাই আমার কর্তব্য (১২।৫৯)।" এই কথা বলিয়া প্রভু সেই দিন সেখানেই রহিলেন এবং প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া নিত্যকৃত্য সমাধা করিলেন (১২।৬০)। তাহার পরে প্রভু নামগ্রহণার্থ জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন (১২।৬১) এবং গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গলদশ্রুলোচনে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন (১২।৬২)। জগন্নাথের ধূপ-পর্যন্ত প্রাভাতিক অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্বক প্রভু বাহিরে আসিলেন (১২।৬৩) এবং সার্বভৌমকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে গেলেন। সার্বভৌম তখনও শয্যা হইতে উঠেন নাই (১২।৬৪)। প্রভুকে দেখিয়া সার্বভৌমের এক ভৃত্য সার্বভৌমকে জাগাইতে যাইতেছিল, প্রভু তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং সার্বভৌমের শয়নগৃহের নিকটে বিলীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন (১২।৬৫)। অতঃপর, সার্বভৌমের পার্শ্বপরিবর্তন-কালে অর্ধনিদ্রিত-অর্ধজাগ্রত অবস্থায় তাঁহার মুখনিঃসৃত 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ' বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন (১২।৬৬)। তাহার পর সার্বভৌম জাগ্রত হইয়াই গৌরচন্দ্রকে দেখিলেন (১২।৬৭) এবং শয্যা হইতে উঠিয়া তিনি প্রভুকে নমস্কার করিলেন। সেই সময়টি উভয়ের মহাকৌতুকপূর্ণ কথায় পূর্ণ হইয়া গেল (১২।৬৮)। তাহার পরে

প্রভু স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল হইতে প্রসাদান্ন লইয়া স্বীয় করতলে ধারণ করিলেন (১২।৬৯) এবং বাহু উত্তোলনপূর্বক প্রভু সার্বভৌমকে বলিলেন—"আপনি নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া যথাকালে এই মহাপ্রসাদ ভোজন করিবেন" —ইহা বলিয়া তাঁহার হাতে প্রসাদান্ন অর্পণ করিলেন (১২।৭০)। সার্বভৌম উত্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ করতলে ধারণ করিয়া—"মহাপ্রসাদ গ্রহণে বিলম্ব করা সঙ্গত নহে" মনে করিয়া (১২।৭১), পুলকান্বিত দেহে তৎক্ষণাৎ তাহা মুখে দিলেন। তাহা দেখিয়া প্রভু দুই বাহুদ্বারা সার্বভৌমকে মহানন্দে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকেও আনন্দিত করিলেন (১২।৭২)। ইহার পরে ১২।৭২-৭৫ শ্লোকসমূহে উভয়ের প্রেম-বিকার কথিত হইয়াছে। তদবধি সার্বভৌমের সমস্ত গর্ব দূরীভূত হইল। কায়মনোবাক্যে তিনি গৌরচন্দ্রের পদারবিন্দে অনুরক্ত হইলেন (১২।৭৬)।

ইহার পরে অন্য একদিন সার্বভৌম জগন্নাথের ধূপ-আরতির পরে প্রভুর দর্শনার্থ গমন করিলেন (১২।৭৭) এবং প্রভুকে প্রণাম ও স্তব করিয়া অত্যন্ত ভীতির সহিত অঞ্জলিবদ্ধকরে প্রভুর নিকটে নিবেদন করিলেন (১২।৭৮),—"প্রভু, কৃপা করিয়া একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করুন। অবশ্য ইহা বলিতেও আমার ভয় হইতেছে (১২।৭৯)।"—একথা বলিয়া সার্বভৌম একাদশ স্কন্ধের দুইটি শ্লোক পাঠ করিলেন এবং তাহা শুনিয়া প্রভু অর্থ করিতে লাগিলেন (১২।৮০)। প্রভু প্রত্যেকটি শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করিলেন, শুনিয়া সার্বভৌম অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন (১২।৮১)। অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া সার্বভৌম প্রভুর স্তব করিলেন এবং আত্মনিন্দা করিতে করিতে বলিলেন—"আমি অত্যন্ত মূঢ়, আমার তুল্য নররূপী পশু আর নাই। হে দেব! আমি আপনার অনুভাব জানিতে পারি নাই (১২।৮২)।"

তারপর সার্বভৌম মহাপ্রভুর একজন পার্ষদকে লইয়া নিজগৃহে গেলেন এবং একখানা পত্রীতে নিরবদ্য শ্লোক লিখিয়া, প্রভুর ভোজনের নিমিত্ত অনন্যদৃষ্ট মহাপ্রসাদ সেই পার্ষদের নিকটে দিয়া—"মহাপ্রভুকে এই পত্রী খানি দিবে" বলিয়া তাঁহার হস্তে পত্রী অর্পণ করিলেন (১২।৮৩-৮৪)। মুকুন্দ দত্ত সেই পত্রী দেখিয়া, সার্বভৌমের দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া, ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিলেন এবং পরে প্রভুর হস্তে সেই পত্রী অর্পণ করিলেন। মহাপ্রভুও মন্দস্বরে শ্লোকদ্বয় পাঠ করিতে লাগিলেন (১২।৮৫)। শ্লোকদ্বয় হইতেছে এই। "বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগম্" ইত্যাদি এবং "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ" ইত্যাদি (১২।৮৬-৮৭)। শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়াই প্রভু হাসিতে হাসিতে সেই পত্রীটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভিত্তিতে দেখিয়াই সমস্ত লোক শ্লোকদ্বয়কে মণির ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিলেন (১২।৮৮)। পরবর্তী ১২।৮৯-শ্লোকে প্রভুর কৃপার মহিমা কথিত হইয়াছে। যিনি একমাত্র অধ্যাত্মপথের পথিক ছিলেন, সেই সার্বভৌম এখন মোক্ষের নামও শ্রবণ করেন না। ইহা একমাত্র ভগবান্ গৌরচন্দ্রেরই কৃপা (১২।৯০)।

কোনও এক সময়ে সার্বভৌম মহাপ্রভুর অগ্রভাগে, প্রস্তাবক্রমে ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিয়া, শ্লোকস্থ 'মুক্তিপদে স দায়ভাক্'—এই স্থলে 'ভক্তি' এইরূপ পাঠ করিয়া আনন্দ-অনুভব করিলেন (১২।৯১)। তাহা শুনিয়া প্রভু সেইক্ষণেই 'মুক্তি'-শব্দের অন্য অর্থ করিলেন। সার্বভৌম তাহার সমর্থন করিলেন। তথাপি বলিলেন "আপনার প্রতিভাতেই এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে (১২।৯২)। তথাপি আমি বলিতেছি, ইহা অসভ্যস্মৃতির হেতু হওয়ায় অশ্লীলদোষ।"—এইরূপ যাঁহার মধুময় বাক্য, সেই সার্বভৌম কথাদ্বারা কথনীয় নহেন (১২।৯৩)। সেই গৌরচন্দ্র শ্রীক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিবস বাস করিয়া তীর্থভ্রমণার্থ

গমনের উপক্রম করিলেন (১২।৯৪) এবং জগন্নাথের আদেশ লইয়া আনন্দের সহিত দক্ষিণদিকে গমন করিলেন (১২।৯৫)। প্রভুকে যাইতে দেখিয়া সার্বভৌম অত্যন্ত খেদান্বিত হইলেন (১২।৯৬) এবং বলিলেন "প্রভু, আমার পুত্রশোক কেন না হইল? আমার দেহপাত কেন না হইল? আপনার চরণযুগল দর্শন করিয়া, এক্ষণে আপনার বিরহ-দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি আমার নাই (১২।৯৭)।"

এ-পর্যন্ত মহাকাব্যে কথিত, প্রভুর দক্ষিণদেশে যাত্রার বিবরণ কথিত হইল। কবিরাজ-প্রদত্ত বিবরণের সহিত এই বিবরণের কোনও সঙ্গতিই নাই। এই বিবরণে বলা হইয়াছে, প্রভু একবার চলিয়া গিয়া বহু দূর পর্যন্ত যাইয়া, সার্বভৌমের এক পুস্তিকায় 'কৃষ্ণ'-শব্দটি দেখিয়া, সার্বভৌমের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। কবিরাজের বিবরণে ইহার নাম-গন্ধও নাই। মহাকাব্যের বিবরণে, প্রভুকর্তৃক সার্বভৌমকে মহাপ্রসাদ-প্রদানের কথা যাহা বলা হইয়াছে, কবিরাজও তাহা বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু কবিরাজের বিবরণে, এই মহাপ্রসাদ-প্রদানের ঘটনা ঘটিয়াছিল বেদান্ত-বিচারের পরে এবং প্রভুর দক্ষিণদেশে যাত্রার পূর্বে। এই বিবরণে কথিত, সার্বভৌমকর্তৃক একাদশ স্কন্ধের দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যা-শ্রবণের নিমিত্ত প্রভুর নিকটে প্রার্থনার কথা যাহা বলা হইয়াছে, কবিরাজের বিবরণে তাহা নাই। 'বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগম্' ইত্যাদি এবং 'কালান্নষ্টম্' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের প্রসঙ্গ কবিরাজও বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাঁহার বিবরণ অনুসারে, এই ঘটনাও ঘটিয়াছিল বেদান্ত-বিচারের পরে এবং প্রভুর দক্ষিণদেশ-যাত্রার পূর্বে। মহাকাব্যে কথিত, সার্বভৌমকর্তৃক ভাগবত শ্লোকের পাঠ-পরিবর্তনের বিবরণ, কবিরাজও দিয়াছেন; কিন্তু তাহাও প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রার পূর্বে। এইরূপে দেখা গেল, মহাকাব্যের বিবরণে, বিভিন্ন সত্য ঘটনার সহিত অযথার্থ ঘটনার এবং আনুমানিক সময়ের অদ্ভুত সমাবেশ রহিয়াছে। এ-সমস্ত হইতেছে কিম্বদন্তীর লক্ষণ (৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এক্ষণে কর্ণপূরের নাটকের বিবরণ কথিত হইতেছে। নাটকে সার্বভৌমের সহিত প্রভুর বেদান্ত-বিচারের উল্লেখ নাই। তবে কতকগুলি উক্তি হইতে বেদান্ত-বিচারের কথা জানা যায়। প্রভুর পরিচয়াদি জানিবার নিমিত্ত গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে সার্বভৌমের কথাবার্তার পরে সার্বভৌম বলিয়াছেন—"বেদান্তশ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ॥ ৬।২০-শ্লোকের পূর্ববর্তী এক অংশ।—বেদান্ত-শ্রবণের দ্বারা ইঁহার (প্রভুর) সংস্কার করিতে হইবে।" ইহার পরে গোপীনাথ আচার্য প্রভুর নিকটে বলিলেন—"সার্বভৌম সানুচর প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন" এবং আরও বলিলেন—"দেব! ভট্টাচার্যের আর একটি নিমন্ত্রণও আছে।" প্রভু বলিলেন—"কিং তৎ? —তাহা কি?" তখন আচার্য বলিলেন—সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসীর নিকটে যোগপট্ট গ্রহণ করাইয়া "বেদান্তং শ্রাবয়িষ্যতি॥ ৬।২৬-শ্লোকের পূর্ববর্তী একটি অংশ॥—সার্বভৌম (প্রভুকে) বেদান্ত শ্রবণ করাইবেন।" প্রভু বলিলেন—"আমি অনুগৃহীত হইলাম। আমি বালক, তিনি আমাকে স্নেহ করেন। কেন তাঁহাকে দোষ দিতেছ (ঐ)।" ইহার পরে অন্য এক সময়ের কথা বলা হইয়াছে। সার্বভৌম প্রভুকে নমস্কার করিয়া স্তব-স্তুতি করিলেন এবং স্তবে প্রভুর ভগবত্তার কথা বলিলেন (৬।৩২-৩৩)। তাহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"ভট্টাচার্য! আমি আপনার বাৎসল্যের পাত্র। এ-সব কি বলিতেছেন?" তখন সার্বভৌম আবার নানাবিধ শাস্ত্রবচনের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত আনন্দ, তাহা প্রতিপন্ন করিলেন (৬।৩৪-৪৩)। তখন প্রভু বলিলেন—"সাধু, সাধু। এখন জগন্নাথ-দর্শনে গমন করুন।" গোপীনাথ আচার্য প্রভুকে বলিলেন—"দেব!

স এবায়ং ভট্টাচার্য্য ?—ইনি কি সেই ভট্টাচার্য ?" প্রভু বলিলেন—"তুমি মহাভাগবত। তোমার সঙ্গের ফলেই ইঁহার এই অন্যরূপ হইয়াছে।" ইহা হইতেছে ভক্তমহিমা-খ্যাপনার্থ প্রভুর দৈন্যোক্তি। গোপীনাথ তো পূর্ব হইতেই সার্বভৌমের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন শঙ্করানুগত মায়াবাদী, শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্তাও স্বীকার করিতেন না, প্রভুর ভগবত্তাও স্বীকার করেন নাই (নাটক ॥ ৬।২০-শ্লোকের পূর্ববর্তী অংশ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখন সার্বভৌম প্রভুর ভগবত্তা স্বীকার করিয়া স্তব করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্তানন্দত্বও (আনন্দঘনবিগ্রহত্বও) স্বীকার করিতেছেন। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রভুর সঙ্গে বেদান্তবিচারের পরে, প্রভুর কৃপাতেই তাঁহার এই পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, ইহার পরে, নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের সর্বশেষে বলা হইয়াছে, সার্বভৌম প্রভুর সঙ্গী দামোদর এবং জগদানন্দকে লইয়া জগন্নাথদর্শনে গেলেন এবং একটি পত্রীতে দুইটি শ্লোক এবং জগন্নাথের প্রসাদ প্রভুর জন্য তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। মুকুন্দ পত্রীটি লইয়া দেখিলেন, তাহাতে 'বৈরাগ্যবিদ্যা' এবং 'কালান্নষ্টং'—ইত্যাদি দুইটি শ্লোক লিখিত হইয়াছে। মুকুন্দ ভিত্তিতে শ্লোকদ্বয় লিখিয়া রাখিয়া প্রভুর হস্তে পত্রী দিলেন। প্রভু তাহা দেখিয়া পত্রীখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। (মুকুন্দই যে প্রভুর হাতে পত্রী দিয়াছিলেন, কবিরাজ তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মুকুন্দের নিকট হইতে পত্রী লইয়া জগদানন্দই প্রভুর হাতে দিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—সার্বভৌম নিজের এক বিপ্রের হাতে প্রসাদ দিয়াই জগদানন্দ ও দামোদরের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন)। ইহার পরে, নাটকের সপ্তম অঙ্কে প্রভুর দক্ষিণদেশ-যাত্রার কথা বলা হইয়াছে।

প্রভু যে দক্ষিণদেশ যাত্রা করিয়া কিছু দূর যাইয়া আবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া আঠার দিন ছিলেন এবং তাহার পরে পুনরায় দক্ষিণদেশে গিয়াছেন, এ-সমস্ত বিবরণ কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়া থাকিলেও, নাটকে তাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। ইহাতে বুঝা যায়, মহাকাব্যে লিখিত বিবরণ অযথার্থ বা কিম্বদন্তীমূলক বুঝিতে পারিয়াই কর্ণপূর তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ নাটকে তাহার আর উল্লেখ করেন নাই। নাটকে লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, বেদান্ত-বিচারের পরে এবং প্রভুর দক্ষিণদেশ-গমনের পূর্বেই শ্লোকদ্বয়-সমন্বিত সার্বভৌমের পত্রী প্রভুর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রভু যে সার্বভৌমকে মহাপ্রসাদ দিয়াছিলেন, তাহার অতি বিস্তৃত বিবরণও নাটকে দৃষ্ট হয় (৬।২৬-৩১)। কিন্তু নাটকের বর্ণনা অনুসারে, ইহা হইতেছে—বেদান্তবিচারের এবং প্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের পরিবর্তনের পরে এবং সার্বভৌমকর্তৃক প্রভুর ভগবত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্তানন্দত্ব খ্যাপনের পূর্বে—সুতরাং প্রভুর দক্ষিণদেশ-গমনেরও পূর্বে।

কবিরাজের বিবরণ হইতে জানা যায়, প্রভু একাকীই প্রসাদান্ন লইয়া সার্বভৌমের গৃহে গিয়াছিলেন, প্রভুর গমনের পরেও প্রভুর কোনও সঙ্গী সে-স্থানে গমন করেন নাই। কিন্তু নাটকে লিখিত হইয়াছে, দামোদর এবং জগদানন্দও প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাহার পরে গোপীনাথ এবং মুকুন্দও যাইয়া সার্বভৌমের দ্বিতীয় কক্ষায় গোপনে অবস্থান করিলেন। এই প্রসঙ্গে সার্বভৌমের দুই জন ভৃত্যের পরস্পর কথোপ-কথনও উল্লিখিত হইয়াছে এবং গোপীনাথ-মুকুন্দ তাহা শুনিয়াছেন। পরে দামোদর বাহির হইয়া আসিলে, গোপীনাথ আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন—"ভৃত্য-

...র কথোপকথনে তাহা জানিতে পারিয়াছি (নাটক॥ ৬৷৩০-৩২-শ্লোকের মধ্যবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য)। কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণে এ-সমস্তের কিছুই নাই। ইহাতে মনে হয়—এই অংশটি কিম্বদন্তীমূলক, অথবা নাটকীয় রসের অপেক্ষায় কর্ণপূর এতাদৃশ বিবরণ সংযোজিত করিয়াছেন।

ঘ। রামানন্দরায়ের সহিত প্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ। (গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির ভয়ে, এখন হইতে প্রয়োজনের অনুরোধে বিশেষ বিশেষ স্থলব্যতীত অন্যত্র, কবিরাজের পয়ারও উদ্ধৃত হইবে না, কর্ণপূরের সংক্ষিপ্ত শ্লোকানুবাদও লিখিত হইবে না, কোনও বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণও দেওয়া হইবে না। কেবল সে সমস্তের সারমর্ম কথিত হইবে)।

কবিরাজকথিত বিবরণ। দক্ষিণদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে বাহির হইয়া প্রভু আলালনাথ হইয়া কূর্মস্থানে গেলেন এবং সে-স্থানে গলৎকুষ্ঠী বিপ্র বাসুদেবকে উদ্ধার করিলেন। কূর্মস্থান হইতে জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্র হইয়া প্রভু গোদাবরীতীরে গেলেন এবং গোদাবরীতীরস্থ বনে প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্তন করিয়া গোদাবরী পার হইয়া অপর তীরে আসিয়া এক ঘাটে স্নান করিলেন এবং ঘাট হইতে কিছু দূরে জলের নিকট বসিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং বহু লোক "বাজনা বাজায়"। তিনি বিধিমত স্নান-তর্পণ করিলেন। "প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রামরায়। তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥ তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া। রামানন্দ আইলা অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥ চৈ. চ. ২৷৮৷১৪-১৫॥" রামানন্দ "আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥ উঠি প্রভু কহে উঠ, কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥ তথাপি পুছিল—তুমি রায় রামানন্দ? তেঁহো কহে—সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ॥ তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥ চৈ. চ. ২৷৮৷১৭-২০॥" চেতনা লাভ করিয়া উভয়ে উভয়ের মহিমা কীর্তন করিলেন। "হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া। রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া—॥ তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন। পুনরপি পাই যেন তোমার দর্শন॥ রায় কহে—আইলা যদি পামর শুধিতে। দর্শন মাত্র শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিতে॥ দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন। তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥ চৈ. চ. ২৷৮৷৪৫-৪৯॥" রামানন্দ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং "প্রভু যাঞা সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল। দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥ প্রভু স্নান-কৃত্য করি আছেন বসিয়া। এক ভৃত্যসঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া॥ নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে। দুই জনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে। প্রভু কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥ চৈ. চ. ২৷৮৷৫১-৫৪॥"

প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ-পূর্বক, রায় রামানন্দ যথাক্রমে স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিলেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রসঙ্গেই প্রভু বলিলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" তখন রামানন্দ জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বলিলে, প্রভু বলিলেন "এহো হয়, আগে কহ আর"। তখন রামানন্দ প্রথমে প্রেমভক্তির এবং পরে দাস্য প্রেমের কথা বলিলেন। প্রত্যেক প্রসঙ্গেই প্রভু বলিলেন "এহো হয়, আগে কহ আর॥" প্রেমভক্তি-প্রসঙ্গে রায় মহাশয় দুইটি শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন— (ক) "নানোপচারকৃত-পূজনমার্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায়

ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥" এবং (খ) "কৃষ্ণ-ভক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥" ইহার পরে রামানন্দ সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেমের কথা বলিলেন। প্রভু বলিলেন "এহোত্তম আগে কহ আর। রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ চৈ. চ. ২।৮।৬৩ ॥" এই উক্তির সমর্থনে রামানন্দ প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। শুনিয়া "প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয় ॥ চৈ. চ. ২।৮।৭৩ ॥" রায় বলিলেন—"ইহার (অর্থাৎ কান্তাপ্রেমের) মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ (চৈ. চ. ২।৮।৭৫) ।" প্রভু একটা পূর্বপক্ষ তুলিলেন। শাস্ত্র-প্রমাণের সাহায্যে রামানন্দ সন্তোষজনক ভাবে তাহা খণ্ডন করিয়া রাধাপ্রেমের অন্যনিরপেক্ষতা স্থাপন করিলেন। তখন "প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে ॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়। আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয় ॥ কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ। রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ॥ চৈ. চ. ২।৮।৮৯-৯১ ॥" রামানন্দ বিস্তৃতভাবে জিজ্ঞাসিত তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া "প্রভু কহে—জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব। শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥ রায় কহে—কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৬-৪৭ ॥" শুনিয়া "প্রভু কহে—এই হয়, আগে কহ আর। রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর ॥ যে বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥ এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ তথাহিগীতম্ ॥ পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল ॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥ এ সখি! সে সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি ॥ না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন, দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ-প্রেম কি ঐছন রীতি ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৪৯-৫৬ ॥" শুনিয়া "প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ সাধ্যবস্তু সাধন-বিনু কেহো নাহি পায়।—কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায় ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৫৭-৫৮ ॥" তখন রামানন্দ রাগানুগা-মার্গে কান্তাভাবে সাধনের কথা বলিলেন। "এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥ এই মত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা। প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে গেলা ॥ বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া। রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিয়া ॥ মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইহাঁ আগমন। দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন ॥ তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে। তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥ * * * ॥ (প্রভু বলিলেন) দশ দিনের কা কথা, যাবৎ আমি জীব। তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ নীলাচলে তুমি আমি রহিব এক সঙ্গে। সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ এত বলি দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা। সন্ধ্যাকালে রায় পুন আসিয়া মিলিলা ॥ অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া। প্রশ্নোত্তরগোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা ॥ প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর। এই মত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ চৈ. চ. ২।৮।১৮৭-৯৮ ॥" প্রভু রামানন্দকে এই কয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার, কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ কীর্তি বড়, সম্পত্তিগণের মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি বড়, দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ গুরুতর, মুক্তমধ্যে কোন্ জীব বাস্তবিক মুক্ত, গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম, শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের সার,

জীব অনুক্ষণ কাহার স্মরণ করে, ধ্যেয়মধ্যে কোন্ ধ্যান জীবের কর্তব্য, সমস্ত ত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে বাস জীবের কর্তব্য, শ্রবণের মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কি, উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান এবং মুক্তি এবং ভক্তি যাঁহাদের কাম্য, তাঁহাদের গতি কোথায়। রামানন্দ প্রত্যেক প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। এই রূপে তাঁহাদের সেই রাত্রিও অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে উভয়ে নিজ নিজ কার্যে গেলেন।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে রামানন্দ আবার প্রভুর নিকটে আসিলেন এবং নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥ পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপ-রূপ॥ তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥ এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥ চৈ. চ. ২।৮।২২০-২৪॥"

প্রভু রামানন্দের প্রেমের মহিমা খ্যাপন করিয়া বলিলেন—"রামানন্দ! রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম। সেই প্রেমের প্রভাবেই তুমি সর্বত্র রাধাকৃষ্ণ দেখিয়া থাক, আমাতেও দেখিতেছ। তখন "রায় কহে তুমি প্রভু ছাড় ভারিভুরি। মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥ রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥ আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার? তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে। ধরিতে না পারে দেহ—পড়িলা ভূমিতে॥ প্রভু তারে হস্ত-স্পর্শে করাইল চেতন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥ আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন॥ ** (প্রভু বলিলেন) গৌর-অঙ্গ নহে মোর—রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি-আস্বাদন॥ তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম। লুকাইলে প্রেমবলে জান সব মর্ম্ম॥ চৈ. চ. ২।৮।২২৯-৪০॥"

"এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে॥ সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে॥ চৈ. চ. ২।৮।২৪৩॥ আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা। বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা—॥ বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে। আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥ দুই জনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে। সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥ এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন। তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন॥ চৈ. চ. ২।৮।২৪৭-৫০॥" প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রভু দক্ষিণদেশে চলিয়া গেলেন।

নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া প্রভু যখন গোদাবরীতীরে আসিয়াছিলেন, তখন রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ এ-স্থলে কথিত হইল। এই মিলন-সম্বন্ধে রামানন্দের কথিত বিবরণের উপরে অপর কাহারও বিবরণের গুরুত্ব থাকিতে পারে না। রামানন্দ ছিলেন স্বরূপদামোদরের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ, উভয়ে এক সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন। রামানন্দের নিকটে স্বরূপদামোদর যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী যে সেই কড়চা অনুসারেই রামানন্দ-মিলন-প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। "দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে। রামানন্দ-মিলন লীলা করিল প্রচারে॥ চৈ. চ. ২।৮।২৬৩॥"

দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও প্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে আর একবার মিলিত হইয়াছিলেন। এজন্য প্রভুর পরবর্তী ভ্রমণ-বিবরণও সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

গোদাবরীতীর হইতে যাত্রা করিয়া প্রভু গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জুন তীর্থ, দাসরাম-মহাদেবের স্থান, আহোবল-নৃসিংহের স্থান, সিদ্ধিবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, পুনঃ সিদ্ধিবট, বৃদ্ধকাশী, বৃদ্ধকাশী হইতে কোনও এক ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে, পাষণ্ডী বৌদ্ধগণের আগমন ও বৌদ্ধাচার্যের সহিত বিচার, তারপর ত্রিপদী-ত্রিমল্ল, পানা-নরসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিকাল-হস্তি-স্থান, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকোলতীর্থ, পিতাম্বর-শিবের স্থান, শিয়ালি ভৈরবী-স্থান, কাবেরীতীর, বেদাবন, অমৃতলিঙ্গ শিব-স্থান, দেবস্থান, কুম্ভকর্ণ-কপালের সরোবর, শিবক্ষেত্র, পাপনাশনাদি দর্শন করিয়া—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গেলেন। সে-স্থানে শ্রীবৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন এবং ভট্টের নিকটে লক্ষ্মীদেবীর প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে প্রভু ঋষভপর্বতে গেলেন এবং সেই স্থানে পরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পুরী বলিলেন, তিনি এখান হইতে নীলাচল হইয়া গৌড়ে যাইবেন। প্রভু প্রর্থনা করিলেন—গৌড় হইতে তিনি যেন নীলাচলে আসেন, তাঁহার নিকটে থাকেন—ইহাই প্রভুর ইচ্ছা। প্রভু বলিলেন—"আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে।" সে-স্থান হইতে পুরীগোস্বামী নীলাচলে যাত্রা করিলেন, প্রভু দক্ষিণদেশে শ্রীশৈলে, পরে কামকোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরায় গেলেন। সে-স্থানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার আশ্রমে গিয়া প্রভু দেখেন, সেই বিপ্র তখন পর্যন্ত রন্ধনই আরম্ভ করেন নাই। প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলিলেন "প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি। পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥ বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ। তবে সীতা করিবেক পাক-প্রয়োজন॥ তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা। আস্তেব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥ প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে। নির্বিঘ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে॥ চৈ. চ. ২৷৯৷১৬৭-৭০॥" প্রভু তাঁহার উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী। রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে—ইহা কর্ণে শুনি॥ এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়। এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়॥ চৈ. চ. ২৷৯৷১৭৩-৭৪॥" তাঁহার কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তুমি এইরূপ ভাবনা কেন করিতেছ? পণ্ডিত হইয়া বিচার কর না কেন? সীতাদেবী হইতেছেন—ঈশ্বর-প্রেয়সী, চিদানন্দ-মূর্তি। তাঁহাকে দর্শন করিবার শক্তিও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের নাই। রাবণ তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন কিরূপে? রাবণ যখন আসিতে-ছিলেন, তখন সীতা অন্তর্ধান করিলেন এবং রাবণের সম্মুখে মায়াসীতা পাঠাইয়াছিলেন। সেই মায়াসীতাকেই রাবণ লইয়া গিয়াছেন। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর।" প্রভুর কথায় রামভক্ত বিপ্রের বিশ্বাস জন্মিল, তিনি আহার করিলেন।

তাহার পরে দক্ষিণ-মথুরা হইতে প্রভু কৃতমালা, দুর্বেশন এবং মহেন্দ্রশৈল হইয়া সেতুবন্ধে আসিলেন এবং ধনুতীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। সে-স্থানে এক বিপ্রসভায় কূর্মপুরাণ শুনিলেন। প্রভু শুনিলেন, দক্ষিণ-মথুরায়, রাবণকর্তৃক সীতাহরণ-বিষয়ে তিনি রামভক্ত বিপ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, কূর্মপুরাণেও তাহা রহিয়াছে—"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥ পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা। বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় স্বপুরাদুদনীনয়ৎ॥ —'রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ। রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ॥ সীতা লৈয়া রাখিলেন

পার্বতীর স্থানে। মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে।। রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল। অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল।। তবে মায়াসীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান। সত্য-সীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান।। চৈ. চ. ২।৯।১৮৮-৯১।।" এসব কথা "শুনিঞা প্রভুর আনন্দিত হৈল মন। রামদাস বিপ্রের কথাহ ইল স্মরণ।। এসব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল। ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল।। নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল। প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল।। পত্র লঞা পুন দক্ষিণ-মথুরা আইলা। রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা।। পত্র পাইয়া বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন। প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন।। চৈ. চ. ২।৯।১৯২-৯৬।।"

প্রত্যাবর্তনের পথে দক্ষিণমথুরা হইতে তাম্রপর্ণী, নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তালা, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থ, পানাগড়িতীর্থ, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্বত, কন্যাকুমারী এবং আমলীতলা হইয়া প্রভু মল্লার দেশে এবং বাতাপানীতে আসিলেন।

মল্লারদেশে ভট্টমারি সন্ন্যাসীরা ছিলেন। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসঙ্গী সরল-প্রকৃতি কৃষ্ণদাসকে "স্ত্রী-ধন" দেখাইয়া তাঁহারা প্রলুব্ধ করিলেন। প্রভুর অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণদাস ভট্টমারিদের গৃহে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশে প্রভু ভট্টমারিদের গৃহে আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"দেখ, তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী। তোমরা কেন আমার ব্রাহ্মণটিকে রাখিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ?" প্রভুর কথা—"শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা। মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা॥ তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাথে হৈতে। খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে।। ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন। কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন।। চৈ. চ. ২।৯।২১৪-১৬।।"

সেই দিনই প্রভু পয়স্বিনীতীরে আসিলেন। সে-স্থানে ভক্তগণের নিকটে ব্রহ্মসংহিতার একটি অধ্যায় পাইয়া তাহার প্রতিলিপি লইয়া, সে-স্থান হইতে—অনন্তপদ্মনাভ, পয়োষ্ণী, সিংহারি মঠ, মৎস্যতীর্থ হইয়া মধ্বাচার্য-স্থানে আসিলেন এবং মধ্বাচার্যানুগত তত্ত্ববাদীদের সহিত সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনা করিলেন এবং তাঁহাদের গর্ব চূর্ণ করিয়া—ফল্গুতীর্থ, পঞ্চাপ্‌সরাতীর্থ, সূর্পারকতীর্থ, কোলাপুর হইয়া প্রভু পাণ্ডুপুরে আসিলেন। সে-স্থানে শ্রীপাদ মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। পাণ্ডুপুর হইতে প্রভু কৃষ্ণবেণ্বাতীরে আসিলেন এবং সে-স্থান হইতে "কৃষ্ণ-কর্ণামৃত"-গ্রন্থের প্রতিলিপি লইয়া, মাহিষ্মতীপুর হইয়া ঋষ্যমুখ পর্বতে দণ্ডকারণ্যে আসিয়া সপ্ততালবৃক্ষকে বৈকুণ্ঠে পাঠাইলেন। পম্পাসরোবরে স্নান করিয়া প্রভু—পঞ্চবটী, নাসিক, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত হইয়া, পুনরায় গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে, উপনীত হইলেন।

"পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর।। রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন। আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন।। চৈ. চ. ২।৯।২৯০-৯১।।" দুই জনে বসিয়া "নানা ইষ্টগোষ্ঠী" করিলেন, এবং "তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।। কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা। চৈ. চ. ২।৯।২৯৪-৯৫।।" প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত অসংখ্য লোক উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া রামানন্দ "নিজ ঘরে" গেলেন। প্রভু ভিক্ষা করার নিমিত্ত মধ্যাহ্নে উঠিলেন। "রাত্রিকালে রায় পুন কৈল আগমন। দুইজন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ।। দুইজনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে। পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে।। রামানন্দ কহে—গোসাঞি তোমার আজ্ঞা পাঞা। রাজাকে লিখিল আমি বিনতি করিয়া।। রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে। চলিবার সজ্জা

আমি লাগিয়াছি করিতে ॥ প্রভু কহে—এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন। তোমা লৈয়া নীলাচলে করিব গমন ॥ রায় কহে—প্রভু আগে চল নীলাচল। মোর সঙ্গে হাথিঘোড়া সৈন্য কোলাহল ॥ দিন দশে ইহা সব করি সমাধান। তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া। নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥ যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিলা গমন। সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ ॥ ২।৯।৩০০-৩০৪ ॥ আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা। নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইলা ॥ প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ জগদানন্দ দামোদর-পণ্ডিত মুকুন্দ। নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ গোপীনাথাচার্য্য চলে আনন্দিত হঞা। প্রভুরে মিলিলা সভে পথে লাগ পাঞা ॥ প্রভু প্রেমাবেশে সভে করে আলিঙ্গন। প্রেমাবেশে সভে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা। সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ চৈ. চ. ২।৯।৩১০-১৫ ॥" দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভুর সহিত নীলাচলবাসী ভক্তদিগের মিলন করাইলেন। তারপর—"ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল। তবে প্রভু কালা কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! শুন ইহার চরিত। দক্ষিণ গেলেন ইহো আমার সহিত ॥ ভট্টমারি হৈতে গেলা আমাকে ছাড়িয়া। ভট্টমারি হৈতে ইহায় আনিল উদ্ধারিয়া ॥ এবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়। যাহাঁ তাহাঁ যাহ, আমা সনে নাহি আর দায় ॥ এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা। মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥ চৈ. চ. ২।১০।৬০-৬৪ ॥" নিত্যানন্দাদি প্রভুর সঙ্গিগণ, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত, কৃষ্ণদাসকে গৌড়দেশে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভুর প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া পরমানন্দপুরী গোস্বামী, কমলাকান্ত-নামক এক দ্বিজকে সঙ্গে করিয়া, তৎক্ষণাৎ নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমশঃ কাশী হইতে স্বরূপদামোদর, ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে রামানন্দ রায় বিদ্যানগর হইতে কটকে আসিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে তাঁহার কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া নীলাচলে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রও আসিয়াছিলেন। রামানন্দ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন—"তোমার আজ্ঞায় আমি রাজাকে কহিল। তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল ॥ আমি কহিল—আমা হৈতে না হয় বিষয়। চৈতন্যচরণে রহোঁ—যদি আজ্ঞা হয় ॥ তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা। আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥ তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে। মোর হাথে ধরি কহে পীরিতি বিশেষে—॥ তোমার যে বর্ত্তন—তুমি খাহ সে বর্ত্তন। নিশ্চিন্ত হইয়া সেব চৈতন্য-চরণ ॥ চৈ. চ. ২।১১।১৪-১৮ ॥" ইহার পরে রামানন্দ রায় আর কখনও বিদ্যানগরে গমন করেন নাই। প্রভু যখন নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর সঙ্গে তিনি কটক হইয়া রেমুণা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। "এই মত চলি প্রভু রেমুণা আইলা। তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা ॥ চৈ. চ. ২।১৬।১৫১ ॥" এতদ্ব্যতীত রামানন্দ আর কখনও নীলাচল ত্যাগ করেন নাই।

এ পর্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে, রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন-প্রসঙ্গ কথিত হইল। এক্ষণে কর্ণপূরের মহাকাব্যে, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, প্রদত্ত বিবরণ কথিত হইতেছে।

কর্ণপূরের মহাকাব্যের বিবরণ ও আলোচনা। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে যাত্রা-প্রসঙ্গে কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে যে বলিয়াছেন, প্রভু কিয়দ্দুর যাইয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং অষ্টাদশ দিবস থাকিয়া, পুনরায় দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই যাত্রায় প্রভু প্রথমে কূর্মক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন (১২।১০০। আলালনাথ হইয়া কূর্মক্ষেত্রে গমনের কথা মহাকাব্যে নাই)। সে-স্থানে কুষ্ঠী বাসুদেব-বিপ্রকে উদ্ধার করিলেন (১২।১০৬-১৬)। কূর্মক্ষেত্র হইতে নৃসিংহক্ষেত্র হইয়া গোদাবরীতীরস্থ এক বনে প্রভু উপনীত হইলেন। তাহার পর, গোদাবরীতে উপনীত হইয়া—"ভবানন্দ-পুত্রের (রামানন্দের) সহিত সম্ভাষা করিব কিনা"—মনোমধ্যে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, তাঁহার সহিত দেখা না করিয়াই, প্রভু দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলেন (১২।১৩০-৩১)। (কর্ণপূরের এই বিবরণ কবিরাজ-প্রদত্ত বিবরণের সম্পূর্ণ বিরোধী। কবিরাজ লিখিয়াছেন, দক্ষিণদেশ-গমন-কালেই প্রভু রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং দশ দিন থাকিয়া তাঁহার সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাদির আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" দেখাইয়াছিলেন এবং রাজকার্য পরিত্যাগপূর্বক নীলাচলে বাস করার জন্য রামানন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। অথচ কর্ণপূর বলেন, দক্ষিণদেশে গমনের পথে গোদাবরীতীরে আসিয়াও প্রভু রামানন্দের সহিত দেখা না করিয়া দক্ষিণদেশে চলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক) তার পর প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া (১৩।৩), সে-স্থানে ত্রিমল্লভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্যকাল অবস্থান করিলেন (১৩।৪)। শরৎকাল আসিলে প্রভু শ্রীরঙ্গ হইতে দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়া কোনও এক স্থানে রঘুনাথ-ভক্ত এক বিপ্রকে দেখিলেন। দেখিলেন সেই বিপ্র—"দশানন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছেন, লক্ষ্মী হইয়াও সীতা রাক্ষসের হস্তগত হইয়াছেন"—ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত শোকগ্রস্ত। তাঁহার মন জানিয়া প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! আপনি কখনও এ-সকল কথা মনে স্থান দিবেন না। আমি স্বরূপ-কথা বলিতেছি, শুনুন। অথবা যদি আমার কথায় আপনার প্রতীতি না হয়, তাহা হইলে দুইটি পুরাতন পত্র দেখুন।" একথা বলিয়া প্রভু অকস্মাৎ স্বীয় অঞ্চল হইতে আকর্ষণ করিয়া দুইটি পত্র ব্রাহ্মণকে দেখাইলেন (১৩।৯-১১)। পত্র দুইটি এইরূপ—"সীতয়া-রাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ" ইত্যাদি এবং "পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা" ইত্যাদি (১৩।১২-১৩। সম্পূর্ণ শ্লোকদ্বয় পূর্বে কবিরাজের বিবরণ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কবিরাজের বিবরণের সহিত কর্ণপূরের বিবরণের সঙ্গতি নাই। কবিরাজ লিখিয়াছেন—রামভক্ত বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া নিজে উপবাসী রহিলেন। প্রভু উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি রাবণকর্তৃক সীতা-হরণের কথা বলিয়াছিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, চিদানন্দ-মূর্তি সীতাকে দর্শনের শক্তিও রাবণের নাই, স্পর্শ করা তো দূরে। এইভাবে প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিলে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আহার করিলেন। প্রভু যে, সে-স্থানেই স্বীয় অঞ্চল হইতে আকর্ষণ করিয়া সেই বিপ্রকে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা কবিরাজ বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, প্রভু যখন সেতুবন্ধে গিয়াছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্মপুরাণ-শ্রবণ-কালে উল্লিখিত শ্লোকদুইটি শুনিয়া, রামভক্ত বিপ্রের কথা স্মরণ করিয়া, এক নূতন পত্র লেখাইয়া পুঁথিতে রাখাইয়া, শ্লোকদ্বয়সমন্বিত পুরাতন পত্রটি লইয়া আসিলেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে সেই ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া সেই পত্রটি তাঁহাকে দিলেন। এই বিবরণ পূর্বেই কথিত হইয়াছে)।

যাহা হউক, মহাকাব্য হইতে জানা যায়, আরও অগ্রসর হইয়া প্রভু এক স্থানে পরমানন্দপুরীর দর্শন পাইলেন। সে-স্থান হইতে প্রভু দক্ষিণ দিকে এবং পুরী গোস্বামী নীলাচলে গমন করিলেন (১৩।১৫-১৬)। তারপর, চলিতে চলেতে একস্থানে আসিয়া প্রভু সাতটি তালবৃক্ষ দেখিলেন এবং আলিঙ্গন করিলেন, আলিঙ্গন-মাত্রে বৃক্ষগণ আকাশ-পথে চলিয়া গেল, সেই স্থান শূন্য হইয়া পড়িল (১৩।১৭-১৮)।

চলিতে চলিতে প্রভু এক স্থানে পাষণ্ডীদিগকে দেখিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের মতের আলোচনা করিয়া প্রভুকে বিলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেন (১৩।২০-২১)। সেই পাষণ্ডিগণ প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে প্রলুব্ধ করার জন্য বলিল—"অরে তুই কোথায় যাইতেছিস্? কেবল দুঃখই পাইবি। আমাদের সহিত মিত্রতা কর, তাহা হইলে এই দেহেই স্বর্গে যাইতে পারিবি।" কৃষ্ণদাস প্রলুব্ধ হইয়া প্রভুর পথে গমন করিতে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন (১৩।২৩-২৬)। প্রভু তাহাদিগকে বলিলেন—"ওহে সন্ন্যাসিগণ! ইহা সঙ্গত নয়। ইহাকে ছাড়িয়া দাও, তোমরাও চলিয়া যাও (১৩।২৮)।" স্বীয় প্রভাবে প্রভু কোনও প্রকারে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ বিমুখ করিলেন—"কথং কথঞ্চিদ্‌বিমুখী চকার (১৩।২৯)।" প্রভু তাঁহাদের এই কুচেষ্টা দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে কিছু না বলিয়াই, সেতুবন্ধের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন (১৩।৩০॥ কবিরাজের বিবরণের সহিত কর্ণপূরের এই বিবরণেরও সঙ্গতি নাই। কবিরাজ বলিয়াছেন, ভট্টমারিরাই কৃষ্ণদাসকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কর্ণপূর বলেন, পাষণ্ডীরা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। পাষণ্ডী বলিতে বৌদ্ধদিগকেই বুঝায়। বৌদ্ধদিগের সহিত তাহাদের মতবিষয়ে প্রভুর যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, তাহা কবিরাজও বলিয়াছেন। কিন্তু ভট্টমারিদের সহিত প্রভুর বিচারের কথা কবিরাজ বলেন নাই। এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়, এই পাষণ্ডীরা কবিরাজ-কথিত ভট্টমারি নহে। যাহা হউক কর্ণপূরের উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভু কৃষ্ণদাসকে কিছু না বলিয়াই সেতুবন্ধের দিকে চলিয়া গেলেন। ইহাতে মনে হয়, প্রভু কৃষ্ণদাসকে পাষণ্ডীদের নিকটে রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। প্রভু যে কৃষ্ণদাসকে পাষণ্ডীদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, মহাকাব্যে তাহা বলা হয় নাই। কবিরাজ বলিয়াছেন, ভট্টমারিদের নিকট হইতে প্রভু কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া নিজের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।)

পাষণ্ডীদের নিকট হইতে সেতুবন্ধে আসিয়া, রামেশ্বর এবং রঘুনাথের কীর্তি সেতু দর্শন করিয়া, পূর্ব-পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া, শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া প্রভু পুনরায় গোদাবরীতীরে উপনীত হইলেন এবং সে-স্থানে রামানন্দের দর্শন করিলেন (১৩।৩২-৩৪)। প্রভু রামানন্দের গৃহে গেলেন—"জগাম তদ্‌বেশ্মনি॥ ১৩।৩৫॥" প্রভু যে কখনও রামানন্দের গৃহে গিয়াছিলেন, একথা কবিরাজ বলেন নাই। কবিরাজ বলিয়াছেন—দক্ষিণদেশে গমনের পথেও প্রভু গোদাবরীতীরে গিয়াছিলেন এবং গোদাবরীতীরেই রামানন্দের সহিত প্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। এক বৈদিক ব্রাহ্মণ প্রভুকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে, তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া, প্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। প্রভু সেই ব্রাহ্মণের গৃহে গেলেন, রামানন্দ স্বগৃহে গেলেন। সেই যাত্রায়, রামানন্দ সেই বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়াই প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইতেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু পুনরায় যখন গোদাবরীতীরে আসিয়াছিলেন, তখনও তিনি রামানন্দের গৃহে যায়েন নাই, তিনি যেখানে থাকিতেন, সেখানে আসিয়াই রামানন্দ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন)।

প্রভু সকৈতবে রামানন্দকে বলিলেন—"কবিতা (শ্লোক) পাঠ কর।" তখন রামানন্দ একটি

বৈরাগ্যরসাঢ্য শ্লোক পাঠ করিলেন (১৩।৩৮), যথা, "বৈরাগ্যং চেজ্জনয়তিতরাং পাপমেবাস্তু যস্মাৎ সান্দ্রং রাগং জনয়তি ন চেৎ পুণ্যমস্মাসু ভূয়াৎ। বৈরাগ্যেণ প্রমুদিতমনোবৃত্তিরভ্যেতি রাগং রাগেণ স্ত্রীজঠরকুহরে তাম্যতি ব্রাহ্মণোঽপি॥ ১৩।৩৯॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"ইহা বাহ্য, অতি বাহ্য। (১৩।৪০)।" তখন রামানন্দ স্বরচিত একটি ভক্তি-প্রতিপাদয়িত্রী কবিতা পাঠ করিলেন (১৩।৪১), যথা, "নানোপচার-কৃতপূজনমার্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥ ১৩।৪২॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—'বাহ্য, ইহাও বাহ্য। অন্য কিছু পাঠ কর (১৩।৪৩)।" তখন রামানন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইয়া উত্থানপূর্বক (১৩।৪৪)—"ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্নোতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্যবাদীৎ॥ ১৩।৪৫॥—অনুরাগিণী সখীগণের আস্বাদিত এবং বিদগ্ধ নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) পরম প্রেমের পরাকাষ্ঠা-প্রতিপাদক, উভয়ের পরৈক্য-প্রতিপাদক, একটি গীত বলিলেন।" যথা, "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥ এসখি সো সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥ ধ্রু॥ না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন। দুঁহুকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥ অব সোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥ বর্দ্ধনরুদ্র নরাধিপমান। রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥ ১৩।৪৬॥" শুনিয়া প্রভু "ইহা পরাৎপর" বলিয়া পরমানন্দে রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন (১৩।৪৭)। প্রভু রামানন্দের সহিত সম্ভাষণপর হইয়া কতিপয় দিবস সে-স্থানে অবস্থান করিয়া, নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিলেন (১৩।৪৭-৫০)। (কবিরাজ বলিয়াছেন—দক্ষিণ-পথে গমনের সময়েই প্রভু রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, প্রত্যাবর্তনের সময়ে নহে। কর্ণপূর বলিয়াছেন, দক্ষিণদেশে গমনের সময়ে প্রভু রামানন্দের সহিত দেখা করেন নাই। এজন্যই তিনি প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পথে উল্লিখিত আলোচনার কথা বলিয়াছেন। বৈরাগ্যরসাঢ্য শ্লোকটির কথা কবিরাজ বলেন নাই; তৎস্থলে স্বধর্মাচরণ হইতে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি পর্যন্ত বলিয়াছেন এবং প্রভু এ-সমস্তকে "বাহ্য" বলিয়াছেন। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পরে রামানন্দ জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বলায়, প্রভু বলিয়াছেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।" তখনই রামানন্দ প্রেমভক্তির কথা বলিয়া "নানোপচারকৃতপূজনম্"-ইত্যাদি শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রভু বলিয়াছেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।" অথচ কর্ণপূর বলিতেছেন, "নানোপচার"-ইত্যাদি শ্লোকটি শুনিয়া প্রভু বলিলেন "বাহ্য, ইহাও বাহ্য।" ইহা কবিরাজের উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। "নানোপচার"-শ্লোকটি যে প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক, তাহা কর্ণপূরও বলিয়াছেন "ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রীং কবিতাম্ (১৩।৪১)।" ভক্তি-প্রতিপাদিকা কবিতাকে প্রভু কি "বাহ্য" বলিতে পারেন? যাহা হউক, "নানোপচার"-শ্লোকের পরেই রামানন্দ বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর পরম-প্রেমের পরাকাষ্ঠা-সূচক "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতটি বলিয়াছেন বলিয়া কর্ণপূর লিখিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজের বিবরণে দেখা যায়—ঐ দুইয়ের মধ্যে আরও অনেক কথা আছে। রামানন্দ "নানোপচার"-শ্লোকের পরে, প্রভুর প্রশ্ন অনুসারে, যথাক্রমে দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, এবং কান্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন, তাহার পরে কান্তাপ্রেমেব মধ্যে রাধাপ্রেমের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন। রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে প্রভুর পূর্বপক্ষের উত্তরে রাধাপ্রেমের অন্যনিরপেক্ষতার কথা এবং তাহার পরে, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের কথা বলিয়া,

রাধাপ্রেমের পরমোৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। তাহার পরে রাধাপ্রেমের পরমোৎকর্ষের পরিচায়করূপে প্রভু রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব জানিতে চাহিলেন, তখন রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিততত্ত্বের কথা বলিলেন। আরও কিছু জানিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হওয়াতেই রামানন্দ প্রেমবিলাস-বিবর্তসূচক "পহিলহিঁ রাগ" গীতটি গাহিয়া শুনাইলেন। শ্রীরাধার প্রেম যে প্রেমের চরম-পরাকাষ্ঠা, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত, কবিরাজকথিত পূর্ববর্তী বিবরণগুলি অপরিহার্য। এই বিবরণগুলির অভাবে আলোচনার স্বাভাবিকতাও থাকে না, বিভিন্ন প্রেমস্তরের উত্তরোত্তর উৎকর্ষও খ্যাপিত হয় না এবং রাধাপ্রেমের পরমোৎকর্ষত্বের পরিচয়ও সম্যক্‌রূপে পাওয়া যায় না; আলোচনা অসম্পূর্ণ ই থাকিয়া যায়। কর্ণপূরের বিবরণও অসম্পূর্ণ। যাঁহারা কোনও ঘটনার আনুপূর্বিক প্রকৃত বিবরণ জানেন না, বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি অংশমাত্র জানেন এবং সেই অংশও কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল তাহাও জানেন না, অনুমানের সহায়তায় তাঁহারা যে বিবরণ গড়িয়া তোলেন এবং যাহা পরবর্তী কালে কিম্বদন্তীর রূপ ধারণ করে, কর্ণপূরের বিবরণও তদ্রূপ। ইহাতে কিম্বদন্তীর লক্ষণ সুস্পষ্ট। অবশ্য যাঁহারা কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহারা তাহাকে কিম্বদন্তী মনে করেন না, সত্য ঘটনাই মনে করেন)।

এক্ষণে মহাকাব্যে কথিত পরবর্তী বিবরণের কথা বলা হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রভু স্নানযাত্রা দর্শন করিলেন। প্রভু পরের দিন প্রভাত-সময়ে জগন্নাথ-দর্শনে গেলেন; জগন্নাথ তখন "গূঢ়" ছিলেন বলিয়া দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন (১৩।৫৭); বাহিরে আসিয়া প্রভু ত্বরান্বিত হইয়া আলালনাথে চলিয়া গেলেন এবং ভক্তগণও তাঁহার অন্বেষণার্থ বাহির হইলেন (১৩।৫৮) কিন্তু কোনও স্থানে প্রভুকে না পাইয়া দুঃখিত মনে শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন (১৩।৫৯)। এদিকে প্রভু সেই পথেই গোদাবরীতে গিয়া তাঁহার (রামানন্দের) সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত প্রিয়সম্ভাষণে চারি মাস এবং আরও কয়েক মাস অতিবাহিত করিলেন (নিনায় মাসাংশ্চতুরোঽপরাংশ্চ ॥ ১৩।৬০) এবং পরে হেমন্তকালে রামানন্দের সহিত শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন (১৩।৬১ ॥ (কর্ণপূরের এই বিবরণ, কবিরাজ-প্রদত্ত বিবরণের সম্পূর্ণ বিরোধী। কবিরাজের বিবরণ অনুসারে পূর্বেই বলা হইয়াছে—প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তিনি আর কখনও গোদাবরীতীরে গমন করেন নাই। রাজকার্য উপলক্ষ্যেই তিনি গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে থাকিতেন। রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে আগমনের পরে তাঁহার আবার গোদাবরীতীরে গমনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কর্ণপূরের এই বিবরণেও কিম্বদন্তীর লক্ষণ সুস্পষ্ট)।

মহাকাব্যের পরবর্তী অংশেও এমন অনেক বিবরণ আছে, যাহাতে কিম্বদন্তীর লক্ষণ সুস্পষ্ট। বাহুল্য-বোধে তৎসমস্ত উল্লিখিত হইল না।

কর্ণপূরের নাটকের বিবরণ ও আলোচনা। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ে কর্ণপূরের নাটকের বিবরণ কথিত হইতেছে।

নাটকের সপ্তম অঙ্ক হইতে জানা যায়, রাজা সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু কি পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিবেন?" সার্বভৌম বলিলেন—"আসিবেন বই কি? তাঁহার সঙ্গীরা যে এখানেই রহিয়াছেন।" রাজা—"একাকী গেলেন কেন?" সার্বভৌম—"আমি কয়েকজন সমীচীন বিপ্রকে সঙ্গে পাঠাইয়াছি। তাঁহারা গোদাবরী পর্যন্ত যাইবেন। প্রভু সেতুবন্ধ পর্যন্ত যাইবেন বলিয়া অনুমান হয়।" এইরূপ কথাবার্তা

বলিতেছে, এমন সময় সার্বভৌম-প্রেরিত বিপ্রগণ গোদাবরী হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সার্বভৌমের উপদেশ অনুসারে তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—"প্রভু আলালনাথ হইতে কূর্মক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, সে-স্থানে কুষ্ঠীবাসুদেব বিপ্রের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। তাহার পর নৃসিংহক্ষেত্র হইয়া গোদাবরীতীরে গেলেন। সে-স্থানে কোনও ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এমন সময় রামানন্দ রায় প্রভুর নিকটে উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—'কিছু বল'। রামানন্দ বলিলেন—"মনো যদি ন নির্জিতং কিমমুনা তপস্যাদিনা। কথং স মনসো জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ॥ কিমস্য চ বিচিন্তনং যদি ন হন্ত চেতোদ্রবঃ। স বা কথমহো ভবেদ্ যদি ন বাসনাক্ষালনম্ (নাটক॥ ৭।৭)॥" শুনিয়া প্রভু বলিলেন 'ইহা বাহ্য'। তার পর প্রভু রামানন্দকে এই কয়টি প্রশ্ন করিলেন।—বিদ্যা কি? কীর্তি কি? শ্রী (অর্থাৎ সম্পত্তি) কি? দুঃখ কি? মুক্ত কাহারা? গেয় কি? শ্রেয়ঃ কি? স্মর্তব্য কি? অনুধ্যেয় কি? কোথায় বসতি কর্তব্য? শ্রবণানন্দি কি? উপাস্য কি? রামানন্দের মুখে এই প্রশ্নগুলির উত্তর শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"ভদ্রম্। বল বল।" তখন রামানন্দ বলিলেন—'নির্বাণনিম্বফলমেব রসানভিজ্ঞাশ্চূষন্তু নামরসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু। শ্যামামৃতং মদনমন্থরগোপরামা-নেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥ (৭ ১১॥)।' প্রভু বলিলেন—'ইহা সমানার্থক। অন্য কিছু বল।' তখন রামানন্দ বলিলেন—'লীঢ়ানেব পথশ্চকোরযুবতীমুখেন যাঃ কুর্বতে সদ্যঃ স্ফাটিকরত্নরত্নঘটিতাং যাঃ পাদপীঠাবলীম্। যাঃ প্রক্ষালিত-মৃষ্টয়োর্জললব-প্রস্যন্দ-শঙ্কাকুলস্তাঃ কৃষ্ণস্য পাদাব্জয়োর্নখমণি-জ্যোৎস্নাশ্চিরং পান্তু নঃ॥ ৭।১২॥' প্রভু বলিলেন—'ইহা কাব্য। আরও বল।' তখন একটু চিন্তা করিয়া রামানন্দ বলিলেন—'শ্রীবৎসস্য চ কৌস্তুভস্য চ রমাদেব্যাশ্চ গর্হাকরো রাধাপাদসরোজযাবকরসো বক্ষঃস্থলস্থো হরেঃ। বালার্কদ্যুতিমণ্ডলীব তিমিরৈশ্ছন্দেন বন্দীকৃতা কালিন্দ্যাঃ পয়সীব পীববিকচং শোণোৎপলং পাতু নঃ॥ ৭।১৩॥' শুনিয়া প্রভু বলিলেন—'ইহাও তদ্রূপ।' তখন রামানন্দ প্রভুর চরণদ্বয় ধরিয়া বলিলেন—"সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে। প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥ ৭।১৪॥ অথবা, অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূন্ মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিস্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্॥ ৭।১৫॥' রামানন্দের এ-সকল কথা প্রভু যেভাবে শুনিলেন, তাহা হইতেছে এই। 'ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং তদুদিতমতিতরত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানম্। ব্যধিকরণতয়া বানন্দবৈবশ্যতো বা প্রভুরথ করপদ্মেনাস্যমস্যাপ্যধত্ত॥ ৭।১৬॥' রামানন্দ প্রভুর চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর প্রভুর নিমন্ত্রণকারী সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন—'দেব! অপরাহ্ণ সমাগত।' তখন ভগবান্ মধ্যাহ্নকৃত্যে চলিয়া গেলেন, আমরাও প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া সেই দিনই সে-স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি।" এ-পর্যন্ত গোদাবরী হইতে প্রত্যাগত এক বিপ্রের কথিত বিবরণ বলা হইল।

ইহার পরে নাটকের সেই সপ্তম অঙ্কেই, কর্ণাটরাজের অমাত্য মল্লভট্টের মুখে পরবর্তী বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। মল্লভট্ট বলিলেন—"দক্ষিণদেশে—কর্মনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরল (অল্পসংখ্যক) সাত্বত, প্রচুরতর পাশুপত এবং প্রচুরতম পাষণ্ডীসমূহ ছিলেন। প্রভুর দর্শনমাত্রে তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়া, বিনা উপদেশেই, তাঁহারা সকলে স্ব-স্ব মত পরিত্যাগপূর্বক প্রভুর মতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। লোকপরম্পরা এই সংবাদ শুনিয়া, প্রভুর লীলা বিশেষভাবে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে, কর্ণাটাধিপতি ছদ্মবেশে প্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন

এবং প্রভুর সেতুবন্ধ পর্যন্ত গমন এবং সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত প্রভুর অনুসরণ করিয়া, তিনি প্রভুর অলৌকিক এবং চমৎকার চরিত অনুভব করিয়া ভবযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছেন।

একদিন প্রভু ভগবন্নামকীর্তন করিতে করিতে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি-ভূষিত দেহে, প্রেমাবেশে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা হইয়া চলিতেছিলেন। পাষণ্ডীরা তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিলেন—'ইনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী; সুতরাং ভগবৎ-প্রসাদ নাম করিয়া, ইঁহার নিকটে কিছু উপস্থিত করিলেই ইনি গ্রহণ করিবেন।' এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা কুক্কুরের ভোজনযোগ্য অশুচিতর অন্ন একখানা থালায় করিয়া প্রভুর নিকটে আনিলেন। ভগবৎ-প্রসাদ শুনিয়া প্রভু সেই থালা হাতে লইয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া চলিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি পক্ষী আসিয়া প্রভুর হাত হইতে থালা লইয়া গেল।

অন্য একদিন কোনও একস্থানে, প্রভু যদৃচ্ছাক্রমে এক ব্রাহ্মণের গৃহে যাইয়া দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ সর্বদা রাম-নাম জপ করিতেছেন। দেখিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে আবার সেই স্থানে আসিয়া প্রভু দেখিলেন, সেই ব্রাহ্মণ নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। প্রভু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন—'শিশুকাল হইতেই রামনাম জপ আমার অভ্যাস ছিল। কিন্তু প্রভু, তোমার দর্শনমাত্রে আমার মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, বলপূর্বকও আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। প্রভু! তোমারই এই প্রভাব।'

কোনও এক স্থানে প্রভু দেখিলেন—শব্দার্থজ্ঞানহীন এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধভাবে গীতা পাঠ করিতেছেন এবং যতক্ষণ পাঠ করেন, ততক্ষণ তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদি দৃষ্ট হইতেছে। প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি যাহা পাঠ করিতেছ, তাহার অর্থ কি?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আমি অর্থ কিছুই বুঝি না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পাঠ করি, ততক্ষণ পর্যন্তই, অর্জুনের রথস্থ তোত্রপাণি তমালশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাই।' প্রভু বলিলেন—'ব্রাহ্মণ! তুমি গীতাপাঠের উত্তম অধিকারী।' একথা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ যে আনন্দ অনুভব করিলেন, তাহা তাঁহার গীতাপাঠজনিত আনন্দ হইতেও প্রচুরতর ছিল। ব্রাহ্মণ প্রভুকে বলিলেন—'স্বামিন্! তুমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ।' ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রেমবিহ্বল হইয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন।"

ইহার পরেই নাটকের অষ্টম অঙ্কে, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, কাশীমিশ্রের গৃহে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা, সার্বভৌমকর্তৃক প্রভুর নিকটে নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দের পরিচয়াদি দান, প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। তদনন্তর প্রভুর জগন্নাথ-দর্শনের কথা বলা হইয়াছে। তাহার পরে, পরমানন্দপুরী, স্বরূপদামোদর, ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতির নীলাচলে আগমন, রথযাত্রার আসন্নতা, গৌড়ীয়ভক্তদের নীলাচলে আগমনাদি, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর গুণ্ডিচামার্জন, রথযাত্রাকালে রথাগ্রে প্রভুর ভাবাবেশাদি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। তাহার পরে নবম অঙ্কে প্রভুর গৌড়দেশে গমনের কথা বলা হইয়াছে

এক্ষণে কর্ণপূরের নাটকে কথিত বিবরণ আলোচিত হইতেছে। প্রস্তাবিত বিষয়ে, মহাকাব্যের বিবরণ হইতে নাটকের বিবরণ যে ভিন্ন রকমের, কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্বক তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মহাকাব্যে বলা হইয়াছে, দক্ষিণদেশে গমনের পথে গোদাবরীতীরে গমন করিয়াও প্রভু রামানন্দের সহিত দেখা করেন নাই, সেতুবন্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেই রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু

নাটকে বলা হইয়াছে, দক্ষিণে গমনের পথেই প্রভু রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছেন। প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যে রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহা নাটকে বলা হয় নাই।

মহাকাব্যে বলা হইয়াছে, দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, স্নানযাত্রার পরের দিনই প্রভু আলালনাথ হইয়া বিদ্যানগরে গিয়া, রামানন্দের সঙ্গে কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নাটকে ইহার ইঙ্গিত পর্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বুঝা যায়, এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যের বিবরণ অযথার্থ বা কিম্বদন্তীমূলক মনে করিয়াই, কর্ণপূর তাঁহার নাটকে ইহা লিখেন নাই।

রামানন্দের সহিত মিলন-প্রসঙ্গে মহাকাব্যে যে-শ্লোকগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, নাটকে সেই শ্লোকগুলি উল্লিখিত হয় নাই, ভিন্ন রকমের কয়েকটি শ্লোক লিখিত হইয়াছে।

কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন, রামানন্দের গৃহেই প্রভু তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন এবং কতিপয় দিবস পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নাটকে তিনি লিখিয়াছেন, গোদাবরীতীরে আলোচনা হইয়াছিল (রামানন্দের গৃহে নহে) এবং সেই আলোচনাও হইয়াছিল এক দিন মাত্র, অপরাহ্ণ পর্যন্ত।

রামানন্দের গৃহে প্রভুর কতিপয় দিবস অবস্থানের কথা মহাকাব্যে লিখিত হইলেও, নাটকে তাহা লিখিত হয় নাই। নাটকে বলা হইয়াছে, এক ব্রাহ্মণই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গোদাবরীতীর হইতে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীমূলক বিবেচিত হওয়াতেই বোধ হয় মহাকাব্যের উক্তি নাটকে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক।

মহাকাব্যের বিবরণের সহিত কবিরাজের বিবরণের অসঙ্গতি, মহাকাব্যের বিবরণ-কথন-প্রসঙ্গে, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে, কবিরাজের ও নাটকের বিবরণ আলোচিত হইতেছে।

রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন-প্রসঙ্গে নাটকে যে-কয়টি শ্লোক লিখিত হইয়াছে, কবিরাজের বিবরণে তন্মধ্যে একটি শ্লোকও নাই। মহাকাব্যের "না সো রমণ"—ইত্যাদি গীতটির উল্লেখ কবিরাজও করিয়াছেন। নাটকে লিখিত "সখি ন সো রমণো নাহম্"—ইত্যাদি অংশ, উক্ত গীতের একাংশের সংস্কৃত অনুবাদ হইলেও, সমস্ত গীতটির অনুবাদ নহে। নাটকের "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি"—ইত্যাদি শ্লোক মহাকাব্যেও নাই, কবিরাজের উক্তিতেও নাই।

রামানন্দের নিকটে প্রভুর যে কয়টি প্রশ্ন এবং রামানন্দ-প্রদত্ত তৎসমস্তের যে-উত্তর, নাটকে লিখিত হইয়াছে, কবিরাজও তাঁহার গ্রন্থে সে-সমস্তের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কবিরাজের বর্ণনানুসারে, এই প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী হইয়াছিল "না সো রমণ"-ইত্যাদি গান কীর্তিত হওয়ার পরে এক দিন। নাটকের বিবরণ অনুসারে, তাহা হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এক দিন।

নাটকের বর্ণনানুসারে, প্রভুর সহিত রামানন্দের মিলন এবং আলোচনা হইয়াছিল—গোদাবরীতীরে, এক দিন মাত্র, দিবাভাগে, বেলা অপরাহ্ণ পর্যন্ত। কিন্তু কবিরাজ বলিয়াছেন—এই আলোচনা হইয়াছিল, প্রভুর নিমন্ত্রক এক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে, রাত্রিকালে এবং দশ দিন পর্যন্ত।

খুঁটিনাটি বিষয়ে অসঙ্গতির কথা বলা হইল না। কিন্তু একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক মনে হইতেছে।

নাটকে বলা হইয়াছে (অষ্টম অঙ্কে), দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ! ময়ি দক্ষিণস্যাং দিশি গতে সতি শ্রীপাদনিত্যানন্দেন ক গতম্? —মুকুন্দ! আমি দক্ষিণ দিকে গেলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কোথায় গেলেন?"। মুকুন্দ বলিলেন—"গৌড়ে। উক্তঞ্চেদম্—

ভগবদাগমনসময়মনুমায় পুনঃ সর্বৈরদ্বৈতপ্রমুখৈঃ সহ ময়াত্রাবগন্তব্যমিতি।—তিনি গৌড়ে গিয়াছেন। বলিয়াও গিয়াছেন—'ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন-সময়ের অনুমান করিয়া অদ্বৈত-প্রমুখ সকলের সহিত পুনরায় আমি আগমন করিব।'" ইহার পরে, রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে, নীলাচলে সমাগত গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে, গোপীনাথাচার্য বলিয়াছেন—"অয়মদ্বৈতঃ অয়ং নিত্যানন্দঃ। —ইনি অদ্বৈত, ইনি নিত্যানন্দ (অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে যে নিত্যানন্দও আসিয়াছিলেন, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল)।" শিবানন্দ সেনও যে গিয়াছিলেন, তাহাও বলা হইয়াছে—"অয়ং শিবানন্দঃ।" ইহার পর বলা হইয়াছে, পরমানন্দপুরী ও স্বরূপাদির সহিত আসিয়া প্রভু যখন গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত মিলিত হইলেন, তখন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপসৃত্য নিত্যানন্দং প্রণম্যাদ্বৈতং পরিষ্বজতে। —শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিকটে আসিয়া নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করিলেন।" এ-সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল, প্রভু দক্ষিণদেশে চলিয়া যাওয়ার পরে, শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন এবং প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে, গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত তিনি আবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ লিখিয়াছেন, প্রভুর দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত নিত্যানন্দ অন্যত্র কোথাও গমন করেন নাই, নীলাচলেই ছিলেন (নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে কর্ণপূরও "গঙ্গার" মুখে বলাইয়াছেন, শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচল-যাত্রাকালে, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ—এই চারি জন প্রভুর সঙ্গী ছিলেন এবং সপ্তম অঙ্কে কর্ণপূরই বলিয়াছেন—রাজা প্রতাপরুদ্র যখন সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দক্ষিণদেশ হইতে প্রভু পুনরায় নীলাচলে আসিবেন কি?" তখন সার্বভৌম বলিয়াছিলেন—"অথ কিম্? সঙ্গিনস্তত্র বর্তন্তে।—প্রভুর সঙ্গিগণ তো এখানেই রহিয়াছেন।" সার্বভৌমের উক্তি হইতেও জানা গেল, প্রভুর দক্ষিণদেশ গমনের পরে, নিত্যানন্দও নীলাচলেই ছিলেন। এইরূপে দেখা গেল, নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে, কর্ণপূরের ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কের উক্তির সহিত অষ্টম অঙ্কের উক্তির বিরোধ বর্তমান—পরস্পরবিরোধী বাক্য)। দক্ষিণ হইতে প্রভু আলাল-নাথে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, নিত্যানন্দ যে তাঁহার অপর সঙ্গিত্রয়ের সহিত প্রভুকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, কবিরাজ তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নাটকের পরস্পরবিরোধী উক্তি যে অযথার্থ বা কিম্বদন্তীমূলক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অথচ, কর্ণপূরের নাটকোক্তি হইতেই জানা যায়, গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত সেই সময়ে কর্ণপূরের পিতা শিবানন্দও ছিলেন। শিবানন্দ তো প্রত্যক্ষ-ভাবেই সমস্ত জানিতেন। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, নিত্যানন্দ-সম্বন্ধীয় এই বিবরণ কর্ণপূর তাঁহার পিতা শিবানন্দ সেন হইতে প্রাপ্ত হয়েন নাই। কর্ণপূরের গ্রন্থে এইরূপ আরও কয়েকটি বিবরণ আছে, যেগুলি-সম্বন্ধে শিবানন্দের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল, অথচ সে-গুলি-সম্বন্ধে কর্ণপূরের প্রদত্ত বিবরণ যথার্থ নহে—যেমন, মহাকাব্যে কথিত, রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর কৃপা-প্রসঙ্গ প্রভৃতি। বাহুল্যবোধে এবং গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে, সে-সমস্ত উল্লিখিত হইল না।

১০। কর্ণপূরের বিবরণের স্বরূপ

যাহা হউক, এ-পর্যন্ত কর্ণপূরের গ্রন্থ-সম্বন্ধে যে-আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে জানা গেল, কর্ণপূরের অনেক বিবরণে কিম্বদন্তীর লক্ষণ বিদ্যমান।

কর্ণপূরের এ-সমস্ত বিবরণকে মতভেদও বলা চলে না। যে হেতু কোনও বাক্যের বা শব্দের তাৎপর্য-সম্বন্ধেই যুক্তিসঙ্গত মতভেদ থাকিতে পারে এবং স্থানবিশেষে একাধিক মতও শ্রদ্ধার্হ হইতে পারে। কিন্তু কোনও বাস্তব-ঘটনার বিবরণ-সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে না। ঘটনার প্রকৃত বিবরণ এক রকমই হইবে, একাধিক রকম হইতে পারে না। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়—ইহাই প্রকৃত কথা। দক্ষিণদিকের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্বক কেহ যদি বলেন—"এই দিকে সূর্যের উদয় হয়," তাহা হইলে, তাঁহার উক্তি কেহই স্বীকার করেন না, সকলে তাঁহাকে দিগ্‌ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করেন।

কল্পভেদ বা প্রকাশভেদের কথা বলিয়াও এতাদৃশ বিবরণের সমাধান-চেষ্টার অবকাশ নাই। কেননা, বর্তমান কল্পে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রভু যে-সকল লীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সে-সকল লীলা যে প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রকাশের লীলার বিবরণই সমস্ত গৌর-চরিতকার স্ব-স্ব গ্রন্থে যথাসম্ভব দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই কল্পে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত গৌর-লীলার বিবরণে মৌলিক ভেদ থাকা সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক, কবিরাজের প্রদত্ত বিবরণের সহিত মিলাইয়া, এ-পর্যন্ত কর্ণপূরের মহাকাব্যের এবং নাটকের বিবরণ-সম্বন্ধে যে-আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে—অনেক স্থলেই কর্ণপূরের উক্তির সহিত কবিরাজের উক্তির সঙ্গতি নাই, কোনও কোনও স্থলে বরং বিরোধই আছে। কর্ণপূরের অনেক বিবরণে যে কিম্বদন্তীর লক্ষণ সুস্পষ্ট, আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী আলোচনায়, প্রভুর গার্হস্থ্যাশ্রমের পরবর্তী কালের লীলার কথাই বলা হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমের লীলাবর্ণনেও যে কর্ণপূরের কোনও কোনও উক্তি কিম্বদন্তীমূলক, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। তাঁহার মহাকাব্যে, ৫।৮২-৮৮ শ্লোকসমূহে কর্ণপূর বলিয়াছেন, শচীমাতা ভূপতিত হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিয়াছিলেন এবং প্রভুও তাঁহার মস্তকে স্বীয় চরণ অর্পণ করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্তের কড়চাতেও এতাদৃশ বিবরণ দৃষ্ট হয় না, অন্য কোনও প্রাচীন গৌরচরিতেও দৃষ্ট হয় না। এই উক্তি যে অযথার্থ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, কবিরাজ গোস্বামী যাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপাদান পাইয়াছেন, তাহাদের নামের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে কর্ণপূরের নামের উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তিনি কর্ণপূরের গ্রন্থ হইতে কোনও উপাদান গ্রহণ করেন নাই।

প্রকৃত ঘটনার কোনও কোনও বিচ্ছিন্ন অংশকে অবলম্বন করিয়াই কিম্বদন্তীর উদ্ভব হয়। সুতরাং কিম্বদন্তীর মধ্যেও কিছু কিছু সত্য বিবরণ থাকে। এজন্যই কোনও কোনও স্থলে, কবিরাজের বিবরণের সহিত কর্ণপূরের বিবরণের সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে "কোনও কোনও বিবরণ কবিরাজ কর্ণপূরের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন"—এইরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলা-সম্বন্ধে মুরারিগুপ্তের কড়চার বিবরণ এবং তদনুগামী শ্রীচৈতন্যভাগবতেরও প্রায় সমস্ত বিবরণই কবিরাজ গোস্বামী গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলাসম্বন্ধে, তিনি কেবল স্বরূপদামোদর, রঘুনাথ দাস এবং শ্রীরূপসনাতনাদির নিকট হইতে প্রাপ্ত, প্রত্যক্ষদর্শীদের কথিত বিবরণই গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য কাহারও বিবরণই তিনি গ্রহণ করেন নাই। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণের উপরেই কবিরাজ-গোস্বামিকথিত, প্রভুর সমস্ত লীলার বিবরণ

প্রতিষ্ঠিত—সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বিবরণই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য, তাঁহার প্রদত্ত বিবরণের সহিত যে বিবরণের অসঙ্গতি বা বিরোধ দৃষ্ট হইবে, সেই বিবরণ কিম্বদন্তীমূলক হওয়ারই সম্ভাবনা।

এক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপাদানের স্বরূপ-আলোচিত হইতেছে।

১১। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপাদানের স্বরূপ

পূর্বে (২খ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, পরবর্তী কালের যে-সকল ভক্ত প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না, প্রত্যক্ষদর্শীদের কথিত কোনও ঘটনার সম্যক্ বিবরণও যাঁহারা শুনেন নাই, কোনও ঘটনার কোনও কোনও অংশমাত্র যাঁহারা শুনিয়াছেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তির সহিত তাঁহাদের কথিত বিবরণের সঙ্গতি আছে কিনা, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আবার পূর্বে (২গ-অনুচ্ছেদে) ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে যদি তাদৃশ কোনও বিবরণ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই বিবরণের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথিত বিবরণ জানিতে হইলে, গৌর-চরিতকারদের গ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণের স্বরূপ বিচারের প্রয়োজন। সেজন্য পূর্ববর্তী ৫-১০-অনুচ্ছেদ-সমূহে বিভিন্ন চরিতকারের বিবরণ আলোচিত হইয়াছে এবং সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, মহাপ্রভুর সমস্ত লীলাসম্বন্ধে, বিশেষতঃ সন্ন্যাসের পরবর্তী লীলা-সম্বন্ধে, একমাত্র কবিরাজ গোস্বামীর কথিত বিবরণই সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য, প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলা-সম্বন্ধে, মুরারি গুপ্তের কথিত বিবরণে এবং কর্ণপূরের কথিত বিবরণেও কিম্বদন্তীর লক্ষণ বিদ্যমান।

কবিরাজ গোস্বামীর কথিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যভাগবতে এমন কতকগুলি বিবরণ প্রবেশ করিয়াছে, যে-গুলি কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই অনুমিত হয়।

১২। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কিম্বদন্তী বলিয়া অনুমিত কয়েকটি বিবরণ

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, কিম্বদন্তীমূলক বলিয়া অনুমিত কয়েকটি বিবরণ এ-স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। যে-যে পয়ারে এই বিবরণগুলি দৃষ্ট হয়, সেই সেই পয়ারেরও উল্লেখ করা হইতেছে এবং প্রত্যেক স্থলে যে-পয়ারের টীকায়, কিম্বদন্তীমূলক বলিয়া অনুমানের হেতু কথিত হইয়াছে, সেই পয়ারের টীকারও উল্লেখ করা হইতেছে।

মধ্যখণ্ডে

ক। নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া প্রভুর কাশীতে গমন ও অবস্থান এবং কাশীত্যাগ-প্রসঙ্গ (২।১৯।১০৫-৬)। ২।১৯।১০৫-৬ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য।

খ। সন্ন্যাস-গ্রহণের নিমিত্ত গৃহত্যাগের পূর্বে, প্রভুকর্তৃক স্বীয় আরও দুই অবতারের কথা—ভক্তদের নিকটে (২।২৬।১১-১২) এবং শচীমাতার নিকটে (২।২৬।৪৬)। ২।২৬।৪৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অন্ত্যখণ্ডে

গ। সন্ন্যাসের পরে, কাটোয়া হইতে প্রভুর সঙ্গে কেশব ভারতীর গমন (৩।১।২২-২৩)। ৩।১।২২-২৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঘ। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে, কাটোয়া হইতে নবদ্বীপে যাওয়ার জন্য চন্দ্রশেখরের প্রতি প্রভুর আদেশ (৩।১।২৪-২৭), চন্দ্রশেখরের নবদ্বীপ-গমন (৩।১।৩০)। ৩।১।৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঙ। রাঢ়দেশ-ভ্রমণকালে প্রভুর বক্রেশ্বরে যাওয়ার কথা (৩।১।৬১)। ৩।১।৬১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

চ। রাঢ়-ভ্রমণ-কালে প্রভুর এক গ্রামে বিশ্রাম এবং আহার (৩।১।৭১-৮২)। ৩।১।৭১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ছ। নীলাচল-গমনের জন্য প্রভুর প্রতি জগন্নাথের আদেশ (৩।১।৮৭-৮৮)। ৩।১।৮৭-প্রয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

জ। ভ্রমণান্তে গঙ্গা-জ্ঞানে প্রভুর গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাস্তব (৩।১।৯৯-১১৮)। ৩।১।১১৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঝ। নিত্যানন্দের সহিত প্রভুর একগ্রামে বিশ্রাম (৩।১।১২১)। ৩।১।১২১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঞ। প্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দের নবদ্বীপে প্রেরণ, প্রভুর কুলিয়ায় গমন। নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমনাদি (৩।১।১২৪-২১৫)। ৩।১।২১৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ট। শান্তিপুরে একদিন মাত্র থাকিয়াই প্রভুর নীলাচল-যাত্রা (৩।২।৫-২৭)। ৩।২।২৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঠ। নীলাচল-গমনকালে প্রভুর সঙ্গী (৩।২।৩৫)। ৩।২।৩৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ড। নীলাচলের পথে প্রভুর দণ্ড-বহনকারী (৩।২।২০১)। ৩।২।২০১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ঢ। প্রভুর নীলাচল-গমনের পথে কয়েকটি ঘটনা (৩।২।২০০-৪২০)। ৩।২।৪২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ণ। প্রভুর সঙ্গী নিত্যানন্দাদির সার্বভৌম-গৃহে গমনের বিবরণ (৩।২।৪৪৪-৪৯)। ৩।২।৪৫০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ত। সার্বভৌমগৃহে প্রভু ও নিত্যানন্দের কথোপকথন (৩।২।৪৭১-৮৭)। ৩।২।৪৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

থ। সার্বভৌমকর্তৃক প্রভুর প্রতি উপদেশাদি (৩।৩।১০-১৫৭)। ৩।৩।১৫৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

দ। দামোদর পণ্ডিতের নীলাচলে উপস্থিতি (৩।৩।১৭৬)। ৩।৩।১৭৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য!

ধ। প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারীর নীলাচলে বাস (৩।৩।১৭৭-৭৮)। ৩।৩।১৭৭-৭৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ন। নিত্যানন্দকর্তৃক জগন্নাথের সিংহাসনে আরোহণ, বলরামের আলিঙ্গন এবং মালা-গ্রহণ (৩।৩।১৮৩-১৯৩)। ৩।৩।১৯৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প। নীলাচলে প্রভুর বাসস্থান (৩।৩।১৯৪-৯৯)। ৩।৩।১৯৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ফ। অদ্বৈত-মাধবেন্দ্র-মিলন (৩।৪।৪২৫-৩৬)। ৩।৪।৪২৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ব। রাজা প্রতাপরুদ্রের সর্বপ্রথম প্রভু-দর্শন (৩।৫।১৩৮-২০৬)। ৩।৫।২০৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভ। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নীলাচলে বাস (৩।৯।৫৭)। ৩।৯।৫৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ম। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নীলাচলে আগমন ও শ্রীঅদ্বৈতের কৃপালাভ (৩।১০।২৩৩-৬৮)। ৩।১০।২৫৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

য। রথযাত্রার পূর্বে নিত্যানন্দের নীলাচলে গমন-প্রসঙ্গ (৩৮-অধ্যায়)। ৩৮।১৬২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এ-সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, অথচ কবিরাজ গোস্বামিকর্তৃক অনুল্লিখিত, কয়েকটি বিবরণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৬খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মতভেদ, কল্পভেদ, লীলার প্রকাশভেদাদির উল্লেখে যে এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিবরণগুলির সমাধান সম্ভব নহে, কর্ণপূরের বিবরণের স্বরূপ-কথন-প্রসঙ্গে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐতিহাসিক ক্রমহীনতা

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঘটনা বা লীলাসমূহের ঐতিহাসিক ক্রম অনেক স্থলেই রক্ষিত হয় নাই। দুই একটি উদাহরণ এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণ অনুসারে, প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরেই গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত সর্বপ্রথম নীলাচলে গিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, প্রভুর নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আগমন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে গৌড়ীয় ভক্তদের সর্বপ্রথম নীলাচল-গমনের বিবরণ দিয়াছেন। মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায়, মুরারি নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভুর নিকটে রামাষ্টক বলিয়াছিলেন (কড়চা ॥ ২।৭); কিন্তু বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, প্রভু যখন নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তখন শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহেই মুরারি রামাষ্টক পাঠ করিয়াছিলেন। ঘটনার বর্ণনে এইরূপ ঐতিহাসিক ক্রমভঙ্গের উদাহরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আরও অনেক দৃষ্ট হয়। ক্রমের দিকে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের যে লক্ষ্য ছিল না, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—"এসব কথার নাহি জানি অনুক্রম। যে-তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥ ২।১৯।২৬০ ॥ এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি। যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৩।৪।৫১৪ ॥"

কবিরাজ গোস্বামী কিন্তু ভক্তদের নিকটে প্রভুর লীলার যে-ক্রমের কথা শুনিয়াছেন, সেই ক্রম অনুসারেই সমস্ত লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—"এবে কহি চৈতন্যলীলার ক্রম অনুবন্ধ ॥ চৈ. চ. ১।১৩।৫ ॥ গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান। মধ্য-অন্ত্য-লীলা—শেষ লীলার দুই নাম ॥ আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ চৈ. চ. ১।১৩।১৩-১৬ ॥"

এইরূপে জানা গেল, ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করিয়াছেন। সমস্ত লীলার এইরূপ ঐতিহাসিক ক্রম অন্য কোনও চরিতকারের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

১৪। শ্রীচৈতন্যচরিতরূপে শ্রীচৈতন্যভাগবতের অসম্পূর্ণতা

শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের সূত্র-কথনপ্রসঙ্গে রথের অগ্রভাগে ভক্তসঙ্গে প্রভুর নৃত্য (১।১।১৫০), প্রভুর সেতুবন্ধ পর্যন্ত গমন (১।১।১৫১), ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুর মথুরা-গমন

(১।১।১৫১), এবং মথুরায় প্রভুর অনেক বিহার (১।১।১৫২), রামানন্দ রায়ের উদ্ধার (১।১।১৫২), বারাণসী হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে নীলাচলে প্রভুর অষ্টাদশ বৎসর বাস—এ-সমস্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, গ্রন্থ-লিখনের আরম্ভে, উল্লিখিত লীলা-সমূহের বর্ণনের সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল ; নচেৎ সূত্র-কথনে তিনি এ-সমস্ত লীলার উল্লেখই করিতেন না। কোনও গ্রন্থে কি কি বিষয় কথিত হইবে, গ্রন্থের সূত্র-ভাগেই প্রাচীন কালে তাহা লিখিত হইত, এবং গ্রন্থশেষেও কোন্ অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ বিষয় কথিত হইয়াছে, সূত্রাকারে তাহার উল্লেখ করা হইত। ইহাই ছিল প্রাচীনকালের রীতি। কিন্তু বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, অন্ত্যখণ্ডের সূত্রে কথিত উল্লিখিত লীলাগুলির মধ্যে একটি লীলারও বর্ণনা করেন নাই। সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ।

ওড়ন-ষষ্ঠী-উপলক্ষ্যে, জগন্নাথের মাড়ুয়া-বসন-সম্বন্ধে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্তব্য এবং তাহার ফলে জগন্নাথ-বলরামের নিকটে বিদ্যানিধির শাস্তিরূপ কৃপা-প্রাপ্তির কথা বলিয়াই বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীও এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন (চৈ. চ. ২।১৬।৭৫-৮০)।

বিদ্যানিধি এবং ওড়ন-ষষ্ঠী-সম্বন্ধীয় ঘটনাটি কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, একবার যখন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বিদায়-কালে—"কুলীনগ্রামী পূর্ববৎ কৈল নিবেদন—। প্রভু ! আজ্ঞা কর আমার কর্তব্য সাধন॥ চৈ. চ. ২।১৬।৬৮॥" "পূর্ববৎ"-শব্দের তাৎপর্য এই—পূর্ববৎসরে, অর্থাৎ প্রভুর দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরবর্তী রথযাত্রার বৎসরে—১৪৩৪-শকে। সুতরাং কুলীনগ্রামবাসী এইবার যে প্রশ্ন করিলেন, তাহা করা হইয়াছিল ১৪৩৫-শকে। ১৪৩৫-শকের প্রশ্নের উত্তরে "প্রভু কহে—বৈষ্ণব-সেবা, নামসঙ্কীর্তন। দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥ তেঁহো কহে—কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ। তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন—॥ কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥ বর্ষান্তরে পুন তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল। বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল—॥ যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥ ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণবলক্ষণ—। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥ চৈ. চ. ২।১৬।৬৯-৭৪॥"

উল্লিখিত তিন রকম বৈষ্ণব-সম্বন্ধে, প্রভু প্রথম বৎসরে, অর্থাৎ ১৪৩৪-শকে, বলিয়াছেন—"যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥ ২।১৫।১০৭॥" ইহা হইতেছে বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ। যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনি "বৈষ্ণব"। ১৪৩৫-শকের উত্তর হইতেছে—"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে॥ ২।১৬।৭১॥", তিনি "বৈষ্ণবতর"। আর "বর্ষান্তরে—অর্থাৎ পরের বৎসরে, ১৪৩৬-শকে", প্রভুর উত্তর—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম॥ ২।১৬।৭৩॥", তিনি হইতেছেন "বৈষ্ণবতম"।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—১৪৩৫-শকেই প্রভু বৈষ্ণবতরের লক্ষণ বলিয়াছেন। উল্লিখিত লক্ষণের কথা বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা। বিদ্যানিধি সে বৎসর নিলাদ্রি রহিলা॥ স্বরূপ সহিতে তাঁর হয় সখ্যপ্রীতি। দুই জনায় কৃষ্ণকথা একত্রই স্থিতি॥ গদাধর পণ্ডিতে তেঁহো পুন মন্ত্র দিল। ওড়নষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল॥ জগন্নাথ পরেন তথা মাড়ুয়া বসন।

দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ সেই রাত্র্যে জগন্নাথ বলাই আসিয়া। দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া হাসিয়া ॥ গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ চৈ. চ. ২।১৬।৭৫-৮০ ॥

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—১৪৩৫-শকেই ওড়নষষ্ঠী ও বিদ্যানিধির প্রসঙ্গ ঘটিয়াছিল।

ওড়নষষ্ঠীর প্রসঙ্গ-কথনের পরে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই মত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল ! দক্ষিণ যাত্রা, আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে। রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥ পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা। রথ দেখি না রহিলা, গৌড়ে চলিলা ॥ চৈ. চ. ২।১৬।৮৩-৮৫ ॥" এ-স্থলে কথিত "পঞ্চম বৎসর" হইতেছে—প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী পঞ্চম বৎসর, অর্থাৎ ১৪৩৬ শক। গৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রার পরেই সেই বৎসর দেশে চলিয়া গেলে, প্রভু গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনে গমনের ইচ্ছা সার্বভৌম ও রামানন্দের নিকটে প্রকাশ করিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন "এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা। বিজয়াদশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান। বিজয়া দশমী দিনে করিল পয়াণ ॥ চৈ. চ. ২।১৬।৯২-৯৩ ॥" ১৪৩৬-শকের বিজয়া দশমীতেই প্রভু নীলাচল হইতে গৌড়ে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ১৪৩৭ শকের রথযাত্রার পূর্বেই নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের সর্বশেষ একাদশ অধ্যায়ে, ১৪৩৫-শকের ওড়নষষ্ঠীর প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়া থাকিলেও, ক্রমভঙ্গ করিয়া তৎপূর্বে, অন্ত্যখণ্ডের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে, ১৪৩৬-শকে প্রভুর বঙ্গদেশ-ভ্রমণের বিবরণও দিয়াছেন। কিন্তু ১৪৩৬-শকের পরবর্তী কালের কোনও লীলাই তিনি বর্ণন করেন নাই। ১৪৩৫-শকের পূর্ববর্তী, প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ যে তিনি বর্ণনা করেন নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৪৫৫-শকে প্রভুর অন্তর্ধান। সুতরাং ১৪৩৬ শক হইতে ১৪৫৫ শক পর্যন্ত এই উনিশ বৎসরের লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রভুর সন্ন্যাসের ২৪ বৎসরের মধ্যে ১৯ বৎসরের লীলাই বৃন্দাবন দাস বর্ণন করেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত যে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই তাহা জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল ॥ সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন। পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥ চৈ. চ. ১।৮।৪০-৪৪ ॥" কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যভাগবতকেই "চৈতন্যমঙ্গল" বলিয়াছেন।

চরিতকারদের কথিত গৌরের লীলার বিস্তৃত বর্ণনার কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—এই উভয় গ্রন্থই অসম্পূর্ণ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে; কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গার্হস্থ্যলীলার বিস্তৃত বর্ণনা নাই, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা উল্লেখমাত্র আছে। প্রভুর শেষ লীলার, অর্থাৎ সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলার, বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা নাই। এজন্যই বলা যায়, লীলার

বিস্তৃত বর্ণনার দিক্ দিয়া এই দুইটি গ্রন্থই অসম্পূর্ণ। তবে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষত্ব এই যে, গার্হস্থ্যলীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনও তাহাতে আছে, সন্ন্যাস-লীলার বিস্তৃত বর্ণনও আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে, সন্ন্যাস-লীলার এবং বঙ্গদেশ-ভ্রমণাদি অল্প কয়েকটি লীলার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া গেলেও, অধিকাংশ লীলার সম্বন্ধেই কিছু জানা যায় না। প্রভুর সমস্ত লীলার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, উভয় গ্রন্থের আলোচনাই আবশ্যক।

১৫। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভাষা

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভাষা সাধারণতঃ প্রাঞ্জল, মধুর এবং মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন এক একটি উক্তি আছে, যাহাতে শব্দগুলি দুর্বোধ্য না হইলেও, গ্রন্থকারের অভিপ্রায় প্রায় দুর্বোধ্য। এইরূপ স্থলে প্রকরণের সহিত, অথবা কোনও কোনও স্থলে অন্য কোনও গ্রন্থের উক্তির সহিত, মিলাইয়া অভিপ্রায় নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ কয়েকটি উক্তি এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

ক। দুর্বোধ্য উক্তি

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন দাস গুণ গান ॥ ১।২।২১৭ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান। বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১।২।২৮৫ ॥ এবং প্রতি অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ পয়ার।" ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"কেহো বোলে 'জাতিসর্প' তেঞি না লঙ্ঘিল ॥ ১।৩।৭৪ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"বেদদ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল পুরাণে। ১।৬।৬ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি। শিষ্য সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥ ১।৬।৬৪ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ় ॥ ১।৭।২১ ॥ ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥ ১।৭।২৩ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে। পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে ॥ ১।১০।৩২৩ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ। মারিলেন হেন দেখি জেঠা বলরাম ॥ ২।২৫।১৬৭ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে। নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥ ২।২৬।৫৭ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব অবতারে। পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে ॥ ২।২৩।৬৯ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"জগতেরে অদ্বৈত, মোরে দ্বৈতমায়া ॥ ২।২২।১১৫ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"ইতিমধ্যে সকলে বিশেষ দুই প্রতি। নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি ॥ ৩।৮।৯৬ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ। জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥ ৩।৯।১০০ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"বস্ত্র লাগি হইতে লাগিল রাত্রি শেষ ॥ ৩।১১।৯৩ ॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

খ। অপ্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত শব্দ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কতকগুলি শব্দ অপ্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

অবধি (=অপেক্ষায়)। ২।১।১২০॥ আদিবৃদ্ধ (=আদ্যোপান্ত)।। ২।১৯।২৪॥ উৰ্ব্বিষ্ট (=উৎপাত)। ১।১১।১০১॥ বিবর্ত্তন (=বিশেষ নৃত্য-সেবা-পূজাদি)। ২।৬।১২,৩১॥ পত্তন (=অদ্ভুত শোভা)। ২।২৩।১৮০॥ বিনয় (=ন্যায়রহিত)। ৩।১০।২৯০॥ সত্ত্ব (=ভগবত্তা)। ৩।১০।৩২২॥ কাপড়ির =কপটীর)। ৩।১১।৪৪॥ ইত্যাদি। সর্বত্র টীকা দ্রষ্টব্য।

গ। আঞ্চলিক এবং অপভ্রংশ-জাত শব্দ। বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে আঞ্চলিক শব্দের এবং অপভ্রংশ-জাত শব্দের অভাব নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে এতাদৃশ শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অনেকগুলি শব্দ পূর্বাঞ্চলীয় বলিয়াই মনে হয়। বাহুল্য-বোধে উল্লিখিত হইল না।

পাঠকদের সুবিধার নিমিত্ত কয়েকটি শব্দের বিশেষ অর্থ এ-স্থলে লিখিত হইতেছে। কেবল শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে নহে, অন্যান্য কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থেও এইরূপ বিশেষ অর্থে এই শব্দগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

"কেনে" এবং "কেন"। অধুনা আমরা যে অর্থে "কেন"-শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রাচীন কালে সেই অর্থেই "কেনে"-শব্দ ব্যবহৃত হইত, অর্থ—"কি হেতুতে, কি কারণে।" আর "কেন"-শব্দটি আমাদের আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এই "কেন" হইতেছে বাস্তবিক সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত "কিম্"-শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে হয়—"কেন"। ইহার অর্থ—"কি প্রকারে," "কি উপায়ে"। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সর্বত্র এই অর্থেই "কেন" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

"সবে" এবং "সভে"। "কেবল" বা "একমাত্র" অর্থেই শ্রীচৈতন্যভাগবতে "সবে"-শব্দের প্রয়োগ। আর "সকলে" বা "সকল লোকে" অর্থে "সভে"-শব্দের প্রয়োগ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে কয়েক স্থলে "একেশ্বর"-শব্দের উল্লেখ আছে। এক+ঈশ্বর=একেশ্বর, একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু এই অর্থে "একেশ্বর" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, ব্যবহৃত হইয়াছে—"একাকী" বা "একলা" অর্থে।

এইরূপ আরও কয়েকটি শব্দ আছে। টীকার যথাস্থানে সেগুলির তাৎপর্য লিখিত হইয়াছে।

ঘ। বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত সন্ধি। ব্যাকরণের "লোপঃ শাকল্যস্য"—এই সন্ধি-সূত্র অনুসারে অ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত এ-কারের স্থানে একবার 'অ' এবং আর একবার 'অয়্' হয়; 'অয়্' হইলে অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর অ-কারে যুক্ত হয়। যেমন, সখে+উহনম্=সখউহনম্ এবং সখয়ুহনম্। সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ সন্ধির বহুল প্রচলন আছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় তাহা দৃষ্ট হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ততঃ একস্থলে তাহা দৃষ্ট হয়। "সংক্রমণ-উত্তরায়ণদিবসে॥ ২।২৬।৫৭॥" এস্থলে—"সংক্রমণে+উত্তরায়ণদিবসে=সংক্রমণ উত্তরায়ণদিবসে—এইরূপ সন্ধি করা হইয়াছে।

ঙ। ঔদ্ধত্যময়ী ভাষার অপবাদ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে একাধিকস্থলে একটি উক্তি আছে এইরূপ :—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।

তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥ ১।৬।৪২৬॥ ১।১২।১৫৬॥ ২।১১।৬৪॥ ২।১৮।২২১॥ ২।২৩।৫২০॥ ৩।৭।১২৯॥

ইহা গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিজের উক্তি।

যে-প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে; সেই প্রসঙ্গের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল উল্লিখিত পয়ারটি গ্রহণ করিয়া, আধুনিক কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন, বৃন্দাবন দাস এস্থলে ঔদ্ধত্য বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা তাঁহার অসহিষ্ণুতা বা ঔদ্ধত্য-প্রকাশক বাক্য নহে; ইহা হইতেছে তাঁহার খেদোক্তি (১।৬।৪২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

বৃন্দাবন দাস ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত, শ্রীনিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য, পরম-ভাগবত। তাঁহার মধ্যে ঔদ্ধত্য বা অসহিষ্ণুতা সম্ভব নহে। মায়ার প্রভাবে, সংসারী লোকের দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে কতকগুলি আগন্তুক অভিমান জন্মে। সেই অভিমানে আঘাত লাগিলেই তাঁহার মধ্যে অসহিষ্ণুতা বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। কিন্তু সাধন-ভজনের ফলে, মায়ার প্রভাবের অতীত হওয়ায়, যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়, কোনওরূপ আগন্তুক অভিমানও তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা তখন নিজেদিগকে সর্বাপেক্ষা, এমন কি পুরীষের কীট হইতেও, হীন মনে করেন। প্রাকৃত ক্ষোভেও তাঁহারা ক্ষুব্ধ হয়েন না। তাঁহাদের পক্ষে তখন ঔদ্ধত্য-প্রকাশ সর্বতোভাবে অসম্ভব। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ছিলেন ভক্তির একজন অসাধারণ অধিকারী। তাঁহার মধ্যে অসহিষ্ণুতা বা ঔদ্ধত্যের উদয় কল্পনাতীত। তাঁহার অসাধারণ দৈন্যের কথা ১।চ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

দৈন্যবশতঃ যিনি তাঁহার গ্রন্থের কোনও স্থলেই আত্মপরিচয় দেন নাই, কেবলমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতুরূপেই স্বীয় জননী শ্রীচৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী দেবীর নাম প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি যে অসহিষ্ণুতা বা ঔদ্বত্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। তিনি ছিলেন সকলের পারমার্থিক হিতকামী। এজন্যই বহির্মুখদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চিত্তে খেদ জন্মিয়াছিল; উল্লিখিত বাক্যে তিনি তাঁহার খেদই প্রকাশ করিয়াছেন, অসহিষ্ণুতা বা ঔদ্বত্য প্রকাশ করেন নাই (১।৬।৪২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মহিমা

কোনও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক্ প্রতিপাদনেই গ্রন্থের সার্থকতা ও মহিমা। প্রতিপাদ্য বিষয় যদি সুষ্ঠুরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে,—গ্রন্থের মধ্যে কিছু কিছু দুর্বোধ্য উক্তি, কি দুর্বোধ্য শব্দ থাকিলেও, ঐতিহাসিক ক্রমহীনতাদি থাকিলেও, এমন কি গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেলেও, গ্রন্থের মহিমা ক্ষুন্ন হয় বলিয়া মনে হয় না।

পরবর্তী ২০-৫১-অনুচ্ছেদ-সমূহের আলোচনায় দেখা যাইবে, বিভিন্ন তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে যাহা জানা যায়, বৃন্দাবন দাসের পরবর্তী আচার্যগণের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান। সুতরাং পূর্ববর্তী ১৩-১৫ অনুচ্ছেদ-সমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—"অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ ১।১২।১৪৩॥" তদনুসারে তিনি চৈতন্যচরিতাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া থাকিলেও, তাঁহার বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, চৈতন্যচরিত-বর্ণন-প্রসঙ্গে গৌর-নিত্যানন্দের, ভক্তের এবং ভক্তির মহিমা কীর্তনই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁহার গ্রন্থে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। উল্লিখিত

মহিমা-সম্বন্ধে সমস্তই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, কিছু বাকী রাখেন নাই। এজন্যই বলা হইয়াছে, ১৩-১৫ অনুচ্ছেদ-সমূহে কথিত বিষয়গুলি সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে কিম্বদন্তীমূলক বলিয়া অনুমিত কতকগুলি বিবরণ থাকিলেও তাহাতে গ্রন্থের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যেহেতু, সে-সমস্ত বিবরণে গৌর-নিত্যানন্দাদির যে-মহিমা অভিব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা অবাস্তব নহে। কেননা, যে-সমস্ত বিবরণের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহের হেতু নাই, সে-সমস্ত বিবরণেও এতাদৃশ মহিমার বিকাশ দৃষ্ট হয়। বায়ুবেগে নিমগাছের ডাল আমগাছের ডালে আসিয়া পড়িলেও, আমগাছ আমগাছই থাকে, আমের মাধুর্যও তাহাতে ক্ষুণ্ন হয় না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা অপূর্ব। একথা বলার হেতু এই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্ববর্তী গৌরচরিত গ্রন্থ হইতেছে —মুরারি গুপ্তের কড়চা। তাহাতে গৌরের গার্হস্থ্যাশ্রমের লীলা মুরারি গুপ্ত সংক্ষেপে সূত্রাকারেই বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস সে-সমস্ত লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষ্যে গৌর-নিত্যানন্দের এবং ভক্ত-ভক্তির মহিমাও অপূর্বভাবে খ্যাপন করিয়াছেন। গৌরের মহিমা-খ্যাপনবিষয়ে, কর্ণপূর হইতেও বৃন্দাবন দাসের বিশেষত্ব বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। বৃন্দাবন দাস লীলার সহযোগে গৌরের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, যে-লীলায় যে-মহিমা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাতে, কথিত মহিমা-সম্বন্ধে কাহারও কোনও প্রশ্নের অবকাশ তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ণপূরের গ্রন্থে তাদৃশ বর্ণনার একেবারে অভাব নাই বটে; তবে তাহা অতি অল্প। আর, শ্রীনিত্যানন্দের লীলা ও মহিমা সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস যে-বিস্তৃত এবং চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়াছেন, কর্ণপূরের গ্রন্থে তাহার অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। গৌর-নিত্যানন্দের লীলার বিস্তৃত এবং বহুল বর্ণনায়, ভক্ত ও ভক্তির মহিমা শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, বর্ণনার অল্পতা এবং বিস্তৃতির অভাববশতঃ কর্ণপূরের গ্রন্থে তাদৃশী স্ফুর্তির সুযোগ বেশী ঘটে নাই।

এ-সমস্ত কারণে বলা যাইতে পারে—বৃন্দাবন দাসের পূর্ববর্তী মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে, এমন কি বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক কর্ণপূরের গ্রন্থ হইতেও, শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহুল প্রচারও তাহার জনপ্রিয়তার এবং মহিমার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। নিজস্বভাবে কোনও গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইলে নকল করিয়া লইতে হইত। বিশেষ আগ্রহ না জন্মিলে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের ন্যায় বিরাট গ্রন্থের নকল করার কষ্ট স্বীকার বা অর্থব্যয়ও সম্ভবপর নহে। তথাপি এই গ্রন্থ, সুদূর বৃন্দাবন পর্যন্তও গিয়াছিল। তৎপূর্বে বঙ্গদেশে যে ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে এই গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন এবং এই অনুশীলনে, গ্রন্থের মাধুর্য অনুভব করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখন পর্যন্তও বহু স্থানে বহু বৈষ্ণব এই গ্রন্থ নিত্য পাঠ করেন এবং পাঠ করিতে করিতে তাঁহারা অশ্রু-কম্প-পুলকান্বিতও হইয়া থাকেন এবং অনেকে শ্রীচৈতন্য-বুদ্ধিতে এই গ্রন্থের অর্চনাও করিয়া থাকেন। এ-সমস্তও হইতেছে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমার পরিচায়ক।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, বেদানুগত শাস্ত্র-সমূহে কথিত ভক্তি-সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম,

লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে, অতি সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্মের রহস্য এবং গৌর-নিত্যানন্দের তত্ত্বও, লীলাবর্ণনের ব্যপদেশে অতি সুন্দরভাবে প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ববর্তী অন্য কোনও গৌর-চরিতে এতাদৃশ বিবরণ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আর একটি অপূর্বত্ব এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের মধ্যে শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরই তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর এবং ভক্তগণের উক্তিতে এবং নিজের উক্তিতে, সর্বপ্রথমে জানাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই সম্বন্ধতত্ত্ব, উভয়েই উপাস্য, উভয়ের ধাম এবং উভয়ের সেবাপ্রাপ্তিই জীবের কাম্য, ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, সেই সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেমই হইতেছে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং সেই প্রেম লাভের নিমিত্ত গৌর-কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সাধন-ভক্তির, অর্থাৎ রাগমার্গের সাধনভক্তিরই, অনুষ্ঠান কর্তব্য। প্রেমের বা কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার তুলনায়, ভুক্তি-মুক্তি যে অকিঞ্চিৎকর, মোক্ষ যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী পুরুষার্থ নহে, তাহাও তিনিই সর্বপ্রথমে জানাইয়াছেন (পরবর্তী ৫১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে গৌর-নিত্যানন্দের, ভক্তির এবং ভক্তের মহিমা এমনই চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকটিত করিয়াছেন যে, শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর চিত্তও বিগলিত হইয়া যায় এবং তাঁহার মনোভাবেরও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে (তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বলিতেন)। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"অরে মূঢ়লোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥ কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥ বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥ চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥ ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥ চৈতন্যমঙ্গল যদি শুনে পাষণ্ডী যবন। সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥ মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥ বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥ নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥ তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত-বর্ণন। যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥ চৈ. চ. ১।৮।২৯-৩৮॥"

তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ যে আগ্রহের সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের আস্বাদন করিতেন, এবং নিত্যানন্দলীলা-বর্ণনে আবেশবশতঃ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই বলিয়া, শেষ লীলা বর্ণনের নিমিত্ত তাঁহারা যে কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥ সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥ বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ সদন। মহাযোগপীঠে তাহাঁ রত্নসিংহাসন॥ তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥ রাজসেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার। দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার॥ সহস্র সেবক, সেবা করে অনুক্ষণ।

সহস্র বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস। তাঁর যশ গুণ সর্ব্বজগতে বিস্তার ॥ সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর। মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥ সভার সম্মানকর্ত্তা, করেন সভার হিত। কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত ॥ কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ। সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস ॥ পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য। কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য ॥ তাঁহার অনন্তগুণ কে করু প্রকাশ। তাঁর প্রিয় শিষ্য ঞিহো পণ্ডিত হরিদাস ॥ চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস। চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ। কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ নিরন্তর শুনেন তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল। তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র। নিজ গুণামৃতে বাঢ়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥ তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈলা মোরে। গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ গোসাঞি। গোবিন্দের প্রিয় সেবক তাঁর সম নাই ॥ যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী। চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি। গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাই ॥ তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস। মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ। নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ॥ আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ। শেষ-লীলা শুনিতে সভার হৈল মন ॥ মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া। তা-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ * * * ॥ বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস। তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ চৈ. চ. ১।৮।৪৪-৭৭ ॥"

বৃন্দাবনবাসী যে-সকল ভক্ত সর্বদা শ্রীচৈতন্যভাগবতের আস্বাদন করিতেন, তাঁহারা যে সাধারণ লোক ছিলেন না, এ-স্থলে উদ্ধৃত কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। তাঁহাদের স্বরূপ জানাইবার উদ্দেশ্যেই, আমাদের নিজের কথায় কবিরাজের উক্তির মর্ম না লিখিয়া, আমরা তাঁহার সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। এ-সমস্ত মহাভাগবতগণ, বৃন্দাবন দাস-বর্ণিত গৌরের আদিলীলার আস্বাদনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বৃন্দাবন দাসের মধুর বর্ণনার অনুরূপভাবে, প্রভুর শেষ লীলা বর্ণনের নিমিত্ত তাঁহারা কবিরাজ গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনাই যে, শেষ লীলা শ্রবণের নিমিত্ত তাঁহাদের উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা যে কি অপূর্ব, এ-সমস্ত বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। কবিরাজ গোস্বামীও প্রভুর শেষলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—ধ্যানযোগে বৃন্দাবন দাসের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এবং তাঁহার কৃপার উপর নির্ভরতাপূর্বক। ইহাও বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের মহিমার দ্যোতক।

এতাদৃশ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেছে আবার বঙ্গভাষায় লিখিত সর্বপ্রথম গৌরচরিত-গ্রন্থ, যাহার সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥"

পূজ্যপাদ শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার এই অপূর্ব গ্রন্থে, ব্রজপ্রেমের নিগূঢ় রহস্য, শ্রীমদ্ভাগবত-সম্মত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত এবং শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মধুময়ী-লীলা, সরল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে কবিত্বের সঙ্গে, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, এবং সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

বহু ঐতিহাসিক উপাদানও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসরের পূর্বে বাঙ্গালাদেশের সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অবস্থা জানিবার নিমিত্ত যাঁহাদের আগ্রহ আছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের আলোচনা করিলে তাঁহারা বিশেষরূপে উপকৃত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থের প্রসঙ্গে "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে" (বাঁধানো দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৫৫ পৃষ্ঠায়) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক গ্রন্থ হইতে যে-অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"শ্রীচৈতন্যভাগবত—বঙ্গভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বঙ্গদেশে যে-কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। তাৎকালিন বৈষ্ণবদ্বেষী সমাজসম্বন্ধেও যে-সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের একখানি মূল্যবান্ পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে। ভক্তিমান্ পাঠক বিনয়সহকারে শ্রীচৈতন্যভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে, নয়নাশ্রুর মধ্য দিয়া ইহার এক সুন্দর রূপ দেখিতে পাইবেন। কঠোর ক্রোধপূর্ণ প্রাচীন রচনার মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর যে-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্ষেপ প্রাচীন চিত্রকরের উপযুক্ত; তাহা প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থায়ী ও ছবির ন্যায় উজ্জ্বল (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)।"

১৭। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আয়তনের পরিচয়

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আয়তনের পরিচয় দিতে হইলে তাহার শ্লোক-সংখ্যা এবং পয়ার-ত্রিপদীর সংখ্যার উল্লেখ আবশ্যক। তাহাই বলা হইতেছে। প্রথমে পয়ার-ত্রিপদীর সংখ্যা এবং তাহার পরে শ্লোক-সংখ্যা উল্লিখিত হইতেছে।

আদিখণ্ডে মোট পয়ার-ত্রিপদীর সংখ্যা—৩,১৭২ এবং মোট শ্লোক-সংখ্যা—৪৯। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে যথাক্রমে ১৬৭, ২০; দ্বিতীয়ে ২৮৫, ৭; তৃতীয়ে ৩১৫, ০; চতুর্থে ১৩৯, ০; পঞ্চমে ২০২, ১; ষষ্ঠে ৪৩৯, ১; সপ্তমে ২৫৫, ১; অষ্টমে ২৮৭, ০; নবমে ২০৯, ১; দশমে ৪০৫,৭; একাদশে ৩০৭, ৫ এবং দ্বাদশে ১৬২, ৬।

মধ্যখণ্ডে মোট পয়ার-ত্রিপদী—৫,৪৫১, শ্লোক—৩৬। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে ৪১৬, ৮; দ্বিতীয়ে
পঞ্চমে ১৬৮, ৪; ষষ্ঠে ১৭৭, ১; সপ্তমে ১৫৫, ২; অষ্টমে ৩২৭, ০;
৩৪৫, ৩; তৃতীয়ে ১৮৯, ১; চতুর্থে ৭৫, ১;
নবমে ২৪৮, ০; দশমে ৩১৯, ২; একাদশে ১০০, ০; দ্বাদশে ৬২, ০; ত্রয়োদশে ৩৯৮, ২; চতুর্দশে ৫৬, ০;
পঞ্চদশে ৯৮, ১; ষোড়শে ১৫০, ১; সপ্তদশে ১১৭, ১; অষ্টাদশে ২৩২, ২; উনবিংশে ২৭৪, ০; বিংশে ১৫৭, ২; একবিংশে ৮৬, ০; দ্বাবিংশে ১৪৭, ১; ত্রয়োবিংশে ৫৩৪, ৩; চতুর্বিংশে ১০৩, ০; পঞ্চবিংশে ২৭৭, ০; ষড়বিংশে ২৪১, ১।

অন্ত্যখণ্ডে মোট পয়ার-ত্রিপদী ৩,৬৪০, শ্লোক ৩৫। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে ২৮৬, ২; দ্বিতীয়ে ৪৯৯, ১; তৃতীয়ে ৫৩৭, ৯; চতুর্থে ৫১৭, ৬; পঞ্চমে ৬৩৪, ১; ষষ্ঠে ১২৩, ০; সপ্তমে ১৩৫, ৬; অষ্টমে ১৬৩, ৩; নবমে ১৭৬, ২; দশমে ৩৮৯, ৫; একাদশে ১৮১, ০।

সমগ্র গ্রন্থে মোট পয়ার-ত্রিপদী—১২,২৬৩, শ্লোক—১২০। ১২০টি শ্লোকের মধ্যে কোনও কোনওটি

একাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে। বাস্তবিক শ্লোকসংখ্যা হইতেছে ১০৭। পরিশিষ্টে গ্রন্থোল্লিখিত শ্লোকসূচীতে এই ১০৭টি শ্লোকের প্রথমাংশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৮। শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কাল

গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার গ্রন্থ-রচনার সময়-সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই; সুতরাং গ্রন্থ-রচনার সময় নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই।

গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের আদিখণ্ডেই লিখিয়া গিয়াছেন—"জয়, জয়, জয়, মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র। দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥ ১।৬।৪৩৪॥" অন্ত্যখণ্ডেও তিনি একথা বলিয়াছেন (৩।৭।১৩২)। ইহাতে বুঝা যায়, নিত্যানন্দ-প্রভুর তিরোধানের পরেই শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিত হইয়াছে। এই উক্তি হইতে গ্রন্থের রচনা-কাল-সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু জানিবার উপায় নাই।

গ্রন্থকারের জননী শ্রীনারায়ণী দেবী-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম নারায়ণী॥ অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'॥ ২।২।৩১৮-১৯॥" এ-স্থলে "অদ্যাপিহ"-শব্দ হইতে বুঝা যায়, গ্রন্থ-লেখার সময়ে নারায়ণী দেবী প্রকট ছিলেন না; অর্থাৎ নারায়ণী দেবীর তিরোভাবের পরেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেও গ্রন্থ-রচনার কাল নিশ্চিতরূপে জানা যাইতে পারে না।

আবার গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডে লিখিয়াছেন—মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিয়াছেন—"সুখে শ্রীনিবাস। তুমি বসি থাক ঘরে। আপনি আসিব সব তোমার দুয়ারে॥ ৩।৫।৬৩॥" এই প্রসঙ্গেই বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"অদ্যাপিহ শ্রীবাসের চৈতন্যকৃপায়। দ্বারে সব উপসন্ন হৈতেছে লীলায়॥ ৩।৫।৬৯॥" এই পয়ারোক্তির দুইটি তাৎপর্য হইতে পারে—এই গ্রন্থলেখার সময়ে, অন্ততঃ গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ড লেখার সময়ে, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রকট ছিলেন। অথবা, মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে, শ্রীবাসের অন্তর্ধানের পরেও তাঁহার গৃহদ্বারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিয়া থাকে। এই দুইটি তাৎপর্যের মধ্যে, যে-তাৎপর্যই গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহা হইতেও গ্রন্থ-রচনার সময় নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হইতে পারে না; যেহেতু, শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্তর্ধানের সময় নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই।

নিশ্চিত-সময়-নির্ধারণের উপযোগী প্রমাণের অভাব বলিয়া, কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী, স্ব-স্ব যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনাকাল-সম্বন্ধে যে-সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ গবেষক ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার-মহোদয়ের "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থ হইতে এ-স্থলে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। তাঁহার গ্রন্থের ১৮৬-৯২ পৃষ্ঠায়, এ-সম্বন্ধে মজুমদার-মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম হইতেছে এই—শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র ও শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরীর মতে ১৪৫৭ শকে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মতে "সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বেই গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মের পূর্বেই গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।" ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, শ্রীচৈতন্যভাগবত ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ১৪৯৫ শকে) রচিত হইয়াছিল। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন-মহাশয়ের মতে ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ১৪৭০ শকে) শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। মজুমদার-

মহাশয় স্বীয় অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন—"পূর্ব্ব পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া আপাততঃ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল।" মজুমদার-মহাশয় পূর্বোল্লিখিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য এই সমস্ত সময়ই হইতেছে অনুমান-মূলক। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, একজনের যুক্তি অপরজন স্বীকার করেন নাই। সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বেই গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল।" পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সময়ে বৃন্দাবনদাসের বয়স ছিল ১৪।১৫ বৎসরের কম। তাহার পূর্বে গ্রন্থারম্ভ কি সম্ভব? সেন মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মের পূর্বেই গ্রন্থটি পরিসমাপ্ত হইয়াছিল।" সম্ভবতঃ বীরচন্দ্র গোস্বামীর কোনও উল্লেখ শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাই বলিয়াই সেন মহাশয় এ-কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই, ১৪-অনুচ্ছেদে, বলা হইয়াছে, ১৪৩৫ শকের লীলাবর্ণনার পরেই বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। তখন পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহই হয় নাই, বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্ম হইবে কিরূপে? বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মের পূর্বে গ্রন্থসমাপ্তির অনুকূল কোনও প্রমাণই শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না। ডক্টর মজুমদার তাঁহার "আপাততঃ সিদ্ধান্তের" অনুকূলে যে-সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, অপর কেহ সে-সমস্ত যুক্তিরও খণ্ডন করিতে পারেন। তিনি নিজেও বোধ হয় তদ্রূপ আশঙ্কা করিয়াছেন বলিয়াই "আপাততঃ"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কালের সমস্যা অমীমাংসিতই থাকিয়া গেল। কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়ার উপযোগী প্রমাণ আমাদের জানা নাই বলিয়া আমরাও আলোচনা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম।

১৯। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের নাম

শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই গ্রন্থখানির নাম-সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী বা প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে।

প্রেমবিলাস-নামক গ্রন্থের ১৯-বিলাসে কথিত হইয়াছে—"চৈতন্যভাগবতের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। বৃন্দাবনে মহান্তেরা 'ভাগবত' আখ্যা দিল॥"

কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বহুস্থলে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সর্বত্রই তিনি "চৈতন্যমঙ্গল" বলিয়াছেন, একবারও "চৈতন্যভাগবত" বলেন নাই। ইহা হইতেছে—প্রথমে যে এই গ্রন্থের নাম "চৈতন্যমঙ্গল" ছিল, প্রেমবিলাসের এইরূপ উক্তির অনুকূল। কিন্তু বৃন্দাবনের মহান্তগণ যে গ্রন্থের নাম "চৈতন্যভাগবত" রাখিয়াছিলেন, কবিরাজ গোস্বামী তাহা কোনও স্থলেই বলেন নাই।

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থের ২৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায়, "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব"-নামক গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উদ্ধৃতি হইতে জানা যায়, ঠাকুর নরহরি সরকারের আদেশে লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-গ্রন্থখানি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন। লোচনদাসের গ্রন্থে "অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত। শ্রীনিত্যানন্দ বন্দ রোহিণীর সুত॥"—এই বাক্যটি দেখিয়া বৃন্দাবনদাস অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং লোচনদাসকে বলিলেন—"অদ্য হইতে তোমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও আমার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল।'

যখন এই ঘটনা হয়, তখন শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে এবং ইহার সৌরভ শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট পঁহুছিয়াছে। এই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন-দাসের গ্রন্থকে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দকে অভেদ মূর্ত্তিতে বর্ণনা করায় লোচনের নিকট নিত্যানন্দ-গত-প্রাণ বৃন্দাবনদাসের আর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। এই জন্য তিনি এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন যে, আমি প্রভুর ভগবত্তা বর্ণন করিয়াছি এবং লোচন মাধুর্য্য বর্ণন করিয়াছে। অতএব আমার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত হইল। বৃন্দাবনদাসের এই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।"

এক্ষণে সুধীবৃন্দের বিবেচনার জন্য কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

প্রথমে প্রেমবিলাসের উক্তিই আলোচিত হইতেছে। প্রেমবিলাসের বহু অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, এ-সম্বন্ধে গবেষকগণের মধ্যে মতভেদ নাই। প্রেমবিলাসের যে পয়ারটি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যে প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। সুতরাং ঐ উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

তারপর "শ্রীখণ্ডের প্রাচীন"-গ্রন্থের বিষয়। লোচনদাসের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে" এমন অনেক বিবরণ আছে এবং এমন একটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, যে-সমস্ত বৃন্দাবনদাসও স্বীকার করেন না এবং শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অনুগত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণও স্বীকার করেন না। এই অবস্থায়, লোচনদাসের গৌর-নিত্যানন্দের অভেদ বাক্যটিমাত্র দেখিয়াই যে বৃন্দাবনদাস তাঁহার নিজের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তাহা সুধীবৃন্দের বিচার্য।

বৃন্দাবনদাসের "ব্যবস্থাপত্র" দেখিয়া "শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন"—এ-কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহাদের প্রাপ্ত, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করিয়া "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" নাম রাখিয়াছেন, উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহা জানা যায় না। করিয়া থাকিলে, গ্রন্থের যে প্রতিলিপি বৃন্দাবনে গিয়াছিল, তাহাতে তাহা লিখিত হইত বলিয়াই মনে করা যায়। বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থের আস্বাদন করিতেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১৬-অনুচ্ছেদে)। সুতরাং বৃন্দাবনে এবং পার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহেও যে এই গ্রন্থের বহু প্রতিলিপি প্রচারিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক নহে। যাঁহারা এইরূপ প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই যে বৃন্দাবন-দাসের ব্যবস্থাপত্র পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহাদের প্রতিলিপিতে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" কাটিয়া "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" লিখিয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়।

উপরের উদ্ধৃতি হইতে আরও জানা যায়, যখন বৃন্দাবনদাস "ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন," "তখন শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে।" সুতরাং বঙ্গদেশের বহুস্থলেও যে এই গ্রন্থ প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই গ্রন্থ সুদূর বৃন্দাবন পর্যন্তও যখন গিয়াছিল, তখন তৎপূর্বেই যে বঙ্গদেশে তাহার বহুল প্রচার হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে অস্বাভাবিক কিছু মনে করা হইবে না। কিন্তু বৃন্দাবনদাসের "ব্যবস্থাপত্র" যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যায় না। কাহারা এই গ্রন্থের প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বৃন্দাবনদাসের জানিবার উপায় ছিল না। সকলেই যে

তাঁহার নিকট হইতেই প্রতিলিপি নিয়াছিলেন, তাহাও মনে করা যায় না। প্রতিলিপির প্রতিলিপি, তাহার প্রতিলিপি, ইত্যাদি ক্রমেই গ্রন্থ প্রচারিত হয়। সুতরাং সকলের নিকটে ব্যবস্থাপত্র-প্রেরণ বৃন্দাবনদাসের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তৎকালে কোনও সংবাদপত্রও ছিল না যে সংবাদপত্রের যোগে ব্যবস্থাপত্রের ঘোষণা করা যাইত। সুতরাং গ্রন্থের নাম প্রথমে যদি "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" থাকিত তাহা হইলে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-নামযুক্ত কোনও না কোনও প্রতিলিপি কোনও না কোনও স্থানে অবশ্যই পাওয়া যাইত। কিন্তু এ-পর্যন্ত বহু গবেষক ব্যক্তিগতভাবে এবং বহু সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানও অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-নামবিশিষ্ট কোনও পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ছিল, "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" ছিল না।

কোনও গ্রন্থের মহিমা এবং জনপ্রিয়তা কেবল তাহার নামের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে মুখ্যতঃ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপর এবং বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু প্রতিপাদনের উপর। একাধিক গ্রন্থকারের রচিত একই নামের গ্রন্থ প্রাচীন কালেও রচিত হইয়াছে। লোচনদাস "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" লিখিয়াছেন, জয়ানন্দও "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" লিখিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস "শ্রীচৈতন্যভাগবত" লিখিয়াছেন, ওড় কবি ঈশ্বরদাসও "শ্রীচৈতন্যভাগবত" লিখিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান হইতে জানা যায়, দুখানি "গৌরাঙ্গলীলামৃত" আছে—একখানির লেখকের নাম অজ্ঞাত, আর একখানির লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস এবং দুখানি "গৌরাঙ্গবিজয়"ও আছে—একখানির লেখক পরমানন্দ গুপ্ত এবং আর একখানির লেখক চূড়ামণি দাস। একাধিক লেখকের "বিদ্যাসুন্দর" এবং "মনসামঙ্গল" প্রভৃতি গ্রন্থও দৃষ্ট হয়। একই নামের একাধিক লেখকের গ্রন্থ থাকিলেও প্রত্যেকের গ্রন্থই প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। বৃন্দাবনদাসের এবং লোচনদাসের গ্রন্থের নামও যদি একই থাকিত, তাহা হইলেও পাঠকগণ প্রত্যেককেই তাঁহার গ্রন্থের প্রাপ্য মর্যাদা দিতেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথমে যদি "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" থাকিত, তাঁহার গ্রন্থের পরবর্তী লোচনদাসের "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" দেখিয়া বৃন্দাবনদাসের পক্ষে স্বীয় গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই যে "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ছিল, তাহাই বুঝা যায়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, প্রথম হইতেই যদি বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্যভাগবত" থাকিত, তাহা হইলে কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে পুনঃ পুনঃ "চৈতন্যমঙ্গল" কেন বলিয়াছেন, একবারও "চৈতন্যভাগবত" কেন বলেন নাই ?

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। এমনও হইতে পারে যে, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বলিয়াই কবিরাজ গোস্বামী তাহাকে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" বলিয়াছেন। চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থকে যেমন "চণ্ডীমঙ্গল", মনসার মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থকে যেমন "মনসামঙ্গল" বলা হয়, তদ্রূপ। বৃন্দাবনদাস নিজেও শ্রীচৈতন্যের মহিমাসূচক সঙ্কীর্তনকে "চৈতন্যমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন" বলিয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দ এবং গদাধর পণ্ডিতের প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে। বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে॥ ৩।৮।১২৩॥" বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্যভাগবত" থাকা সত্ত্বেও কবিরাজ যে শ্রীচৈতন্যের মহিমাত্মক বলিয়াই তাহাকে "চৈতন্যমঙ্গল" বলিয়াছেন, এইরূপ মনে করার হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে—"শ্রীচৈতনামঙ্গল"-নামবিশিষ্ট একখানি পুঁথিও পাওয়া যায় নাই।

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥ চৈ. চ. ১।৮।৩০॥"—কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তিতে এই গ্রন্থের নাম "শ্রীচৈতন্যভাগবত" থাকার ইঙ্গিত আছে কিনা এবং "ওরে মূঢ়লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল॥ চৈ. চ. ১৮।২৯॥"—কবিরাজের এই উক্তিতে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে "চৈতন্যমঙ্গল" বলার হেতুর ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন কিনা, তাহা সুধীবৃন্দের বিবেচ্য।

অন্যরকম যুক্তি দেখাইয়া ডকটর মজুমদারও তাঁহার গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আমার মনে হয়, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল।"

২০। শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌর-তত্ত্ব (২০-৪৩ অনুচ্ছেদ)

শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের কোনও স্থলেই কোনও তত্ত্ব-সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে একই স্থলে কোনও আলোচনা করেন নাই। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলাবর্ণনেই ছিল তাঁহার পরম আবেশ। লীলাবর্ণন-উপলক্ষ্যে তিনি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মুখে, ভক্তদের স্তবাদিতে এবং নিজের উক্তিতেও যাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই বিভিন্ন তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নির্ণয় করিতে হয়। কোনও স্থলে স্তবাদিতে, কোনও স্থলে বা অন্যকোনও প্রসঙ্গে, কোনও স্থলে বা স্পষ্ট উক্তিতে—এইরূপ বহুভাবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে সে-সমস্ত কথিত এবং আলোচিত হইতেছে।

২১। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-স্বরূপত্ব (২১-২৪ অনুচ্ছেদ)

স্পষ্ট উক্তিতে গৌরের কৃষ্ণত্ব-খ্যাপন। গ্রন্থকার বহু পয়ারে শ্রীগৌরচন্দ্রকে "কৃষ্ণ" বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পয়ারের পরিচায়ক অঙ্ক এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। যথা,—

১।১।১০৬, ১।১।১২৫, ১।২।৭৯, ১।৮।২৬২ (বনমালী-কৃষ্ণ), ১।৮।২৬৫, ১।৯।১৪৩ (বসুদেব-নন্দপুত্র), ১।১০।৪, ২।২।৪৮-৫৩, ২।৮।২৮৭, ২।২২।১৪, ২।২৩।২৮৫ (কংসারি), ২।২৩।৪৬২ (দ্বারকাবিহারী কৃষ্ণ), ২।২৪।১৫ (মদনগোপাল), ৩।১০।১৭০ (বৃন্দাবন রায়), ৩।১০।৩৭০ ইত্যাদি।

২২। গৌর-প্রসঙ্গে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গের উল্লেখে গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব-খ্যাপন

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোনও কোনও স্থলে গৌরের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া গৌরের কৃষ্ণত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

ক। "এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে॥ ১।৫।৪৭॥" গোকুলে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খ। নগর-ভ্রমণ-কালে প্রভু গোপগৃহে উপনীত হইলে কোনও কোনও গোপ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"আমার ঘরের যত ভাত। পূর্ব্বে যে খাইলা মনে নাহিক তোমাত॥ ১।৮।১১৯॥" অর্থাৎ গৌরচন্দ্র পূর্বে, অর্থাৎ গত দ্বাপরে, গোয়ালার "ভাত" খাইয়াছেন। এ-স্থলেও গৌরচন্দ্রকে ব্রজবিহারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বলা হইয়াছে।

গ। "পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ। সেই লীলা করে এবে শ্রীশচীনন্দন॥ ১।৮।১৪৫॥"

গোকুল হইতে মধুপুরীতে (মথুরায়) যাইয়া-ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ যে-লীলা করিয়াছিলেন, শ্রীশচীনন্দনও নবদ্বীপে তদনুরূপ লীলা করিতেছেন—এইরূপ উক্তিতে শচীনন্দন গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্বই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ঘ। একদিন প্রভু এক সর্বজ্ঞের নিকটে গিয়া বলিলেন—"তুমি সর্ব্বজান ভাল শুনি। বোল দেখি অন্যজন্মে কি আছিলাঙ আমি॥ ১।৮।১৫৫॥" তখন —'ভাল' বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি॰ চিন্তে মনে। জপিতে 'গোপালমন্ত্র' দেখে সেই ক্ষণে॥ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম। শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহাজ্যোতিধাম॥ নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দিঘরে। পিতা মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে॥ সেই ক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লই কোলে। সেই রাত্রে থুইলেন আনিঞা গোকুলে॥ পুন দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে। কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত দুই করে॥ ১।৮।১৫৬-৬০॥" এ-স্থলেও শচীনন্দন গৌরহরির কৃষ্ণস্বরূপত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

ঙ। "যে কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়। জলকেলি করিলেন এই দ্বিজ রায়॥ ২।২৩।১৯৭॥" এ-স্থলেও গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

চ। "পূর্ব্ব যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি। মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি॥ সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি। পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী॥ গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে। সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে॥ 'কয়া কয়া' বলি করতালি দেন জলে। জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব-মণ্ডলে॥ গোকুলের শিশুভাব হইল সভার। প্রভুও হইলা গোকুলচন্দ্র-অবতার॥ ৩।৯।১১২-১৬॥" এ-স্থলেও গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

এইরূপ উক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আরও দৃষ্ট হয়।

২৩। স্তব-পূজাদিতে কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপন

ক। ব্রহ্মাদিদেবগণের শচীগর্ভস্থ গৌরের স্তুতি। শচীদেহে প্রবিষ্ট গৌরের স্তবে ব্রহ্মাদিদেবগণ বলিয়াছেন—

"জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর। জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর॥ যে তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস। সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ॥ ১।২।১৪৯-৫০॥ সকল সংসার যাঁর ইচ্ছায় সংহারে। সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে নারে? তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে। অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা-সভারে॥ ১।২।১৫২-৫৩॥ কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ। বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥ ১।২।১৬৩॥ সর্ব্বলীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে। কৃষ্ণরূপে গোকুলে করিলা বহু রঙ্গে॥ ২।২।১৭৩॥" এ-সকল উক্তিতে শচীনন্দনের কৃষ্ণস্বরূপত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

খ। স্বগৃহে অদ্বৈতকর্তৃক মূর্ছিত গৌরের পূজা। একদিন গদাধরকে সঙ্গে লইয়া গৌরসুন্দর অদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপস্থ গৃহে গিয়াছিলেন। অদ্বৈত তখন জলতুলসী সহযোগে শ্রীকৃষ্ণপুজায় নিমগ্ন ছিলেন। "অদ্বৈত দেখিয়া মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িলা মূর্ছিত হই পৃথিবী উপর॥ ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। "এই মোর প্রাণনাথ' জানিল সকল॥ ২।২।১৩০-৩১॥" তখন অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণপুজার নিমিত্ত যে-সকল

উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত দিয়াই মূর্ছিত গৌরের চরণপূজা করিলেন। "সর্ব্বপূজা-সজ্জ লই নাম্বিলা তখনে॥ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঞি। চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে। পুনঃ পুন এই শ্লোক পঢ়ি নমস্করে॥ ২।২।১৩৪-৩৬॥"

শ্রীঅদ্বৈতের গৌর-নমস্কারের শ্লোকটি হইতেছে এই। "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ॥ ১।১৯।৬৫)।" শ্রীঅদ্বৈত "পুনঃ পুন শ্লোক পঢ়ি পড়য়ে চরণে। চিনিঞা আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥ পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে। জোড় হস্ত করি দাণ্ডাইলা পদতলে॥ ২।২।১৩৭-৩৮॥"

শ্রীঅদ্বৈত স্বীয় ভক্তির প্রভাবে, প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন—এই বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্রই তাঁহার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ। সেজন্যই তিনি "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"—ইত্যাদি শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে গৌরকে নমস্কার করিয়াছেন।

গ। ঐশ্বর্য-দর্শনের পরে অদ্বৈতকর্তৃক গৌরের পূজা। প্রভু যখন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন একদিন রামাই পণ্ডিতকে পাঠাইয়া শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতাচার্যকে নবদ্বীপে আনাইয়াছিলেন। প্রভুর অপূর্ব ঐশ্বর্য-দর্শনে অদ্বৈত প্রেমাবিষ্ট হইলে, প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"আমার পূজা কর।" তখন শ্রীঅদ্বৈত—"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে। চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে॥ চৈতন্য-চরণ ধুই সুবাসিত জলে। শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥ চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসীমঞ্জরী। অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ—পঞ্চ উপচারে। পূজা করে, প্রেমজলে বহে মহাধারে॥ পঞ্চশিখা জ্বালি পুন করয়ে বন্দনা। শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা॥ করিয়া চরণ-পূজা ষোড়শোপচারে। আর বার দিলা মাল্য বস্ত্র অলঙ্কারে॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যে পূজা করে পটল বিধানে। এই শ্লোক পঢ়ি করে দণ্ড-পরণামে॥ 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥' এই শ্লোক পঢ়ি আগে নমস্কার করি। শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারি॥ ২।৬।১০৪-১১॥"

অপরোক্ষ অনুভবের ফলে প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়াই, শ্রীঅদ্বৈত এ-স্থলে প্রভুর পূজা, নমস্কার এবং স্তব করিয়াছেন।

ঘ। তৈর্থিক বিপ্রের উক্তি। বালক গৌরের ঐশ্বর্য-দর্শনের পরে তৈর্থিক বিপ্রের উক্তি—'জয় বালগোপাল॥ ১।৩।২৯৪॥"

ঙ। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৌরস্তুতি। গৌরের ঐশ্বর্য-দর্শনের পরে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবত-ব্রহ্মস্তবের "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে * * পশুপাঙ্গজায়॥ ভা. ১০।১৪।১॥"-শ্লোকে গৌরের প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন,—

"বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার। নব-ঘন জিনি বর্ণ, পীতবাস যার॥ শচীর নন্দন-পায়ে মোর নমস্কার। নবগুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥ গঙ্গাদাস-শিষ্যপদে মোর নমস্কার। বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার॥ * *॥ শিঙ্গা, বেত্র, বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥ চারি বেদে যাঁরে ঘোষে 'নন্দের কুমার'। সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥ ২।২।২৬৯-৭৪॥"

এই স্তবে গৌরের নন্দ-নন্দন-কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

চ। প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে ভক্তগণের স্তব। শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রকাশ-কালে ভক্তগণ প্রভুকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

"জয় জয় জয় সর্ব্বজগতের নাথ। * * ॥ জয় আদিহেতু জয় জনক সভার। * * ॥ জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-জন-ত্রাণ। জয় জয় আব্রহ্ম-স্তম্বের মূল প্রাণ। * * ॥ জয় জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন॥ ২।৯।৫৩-৬০॥" এই স্তবেও গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ছ। শ্রীধরের স্তুতি। খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর স্তবে বলিয়াছেন,—

"জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-নাথ। জয় জয় শচী-পুণ্যবতী-গর্ভজাত॥ যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগরে। এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দরে॥ * * ॥ ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে। ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥ ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা। ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলা গোপরামা॥ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে। সে-তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলা আপনে॥ ২।৯।২০১-১৪॥"

এই স্তবেও গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

জ। হরিদাস ঠাকুরের গৌরস্তুতি। প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গৌরের স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ। পাতকীরে কর কৃপা, পড়িলু তোমাত॥ ২।১০।৫৭॥", "সভামধ্যে দ্রৌপদীরে করিতে বিবসন। আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন॥ সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণ তোমা স্মঙরিলা। স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥ ২।১০।৬৩-৬৪॥", "পাণ্ডুপুত্র স্মঙরিল দুর্ব্বাসার ভয়ে। অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে॥ চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির! হের দেখ আমি। আমি দিব মুনি-ভিক্ষা, বসি থাক তুমি॥ অবশেষ এক শাক আছিল হাণ্ডীতে। সন্তোষে খাইলা, নিজ সেবক রাখিতে॥ স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে। সেই মত ঋষি সব পালাইলা জলে॥ ২।১০।৭২-৭৫॥"

এ-স্থলেও গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঝ। মুকুন্দ দত্তের স্তব। প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে প্রভুর স্তবে মুকুন্দ দত্ত বলিয়াছেন,—

"বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন। যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥ ২।১০।২১৪॥", "যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী-হরণে। ২।১০।২১৭॥", "কুব্জা, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার। কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার॥ ভক্তিযোগে তোমারে পাইল সেই সব। সেই খানে মরে কংস—দেখি অনুভব॥ ২।১০।২২৭-২৮॥"

এ-স্থলেও গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

ঞ। জগাই-মধাইর স্তব। প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিয়া প্রভুর স্তুতি-প্রসঙ্গে জগাই-মাধাই বলিয়াছেন,—তোমাকর্তৃক আমাদের যে উদ্ধার, "নির্লক্ষ্য-উদ্ধার প্রভু ইহার যে নাম॥ যদি হেন বোল—কংস-আদি দৈত্যগণ। তাহারাও দ্রোহ করি পাইল চরণ॥ কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজ-মনে। নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্র-গণে॥ তোমাসনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে। ভয়ে তোমা নিরন্তর চিন্তিলেক মনে॥ * * ॥ দৈবে সে উপমা নহে অসুরা পূতনা। অঘ-বক-আদি যত, কেহ নহে সীমা॥ ২।১৩।২৭০-৭৯॥"

এ-স্থলেও গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপিত হইয়াছে।

২৪। শচী-জগন্নাথের স্বরূপ-কথনে গৌরের কৃষ্ণস্বরূপত্ব-খ্যাপন

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে নন্দ ও বসুদেব এবং শ্রীশচীমাতাকে দেবকী ও যশোদা বলিয়াছেন। "নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর। বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বধর্ম্মে তৎপর॥ ১।২।১৩২॥ কি কশ্যপ, দশরথ, বাসুদেব, নন্দ। সর্ব্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥ ১।২।১৩৪॥"

শচীমাতার প্রতি গৌরসুন্দরের উক্তি,—

"তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা। কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥ তথাও আমার তুমি আছিলা জননী। তুমি সেই দেবকী, দেবকী-পুত্র আমি॥ ২।২৬।৪৪-৪৫॥", "তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী। তোমারে সে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি॥ তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি। যাহা হৈতে সব হয়—তুমি সেই শক্তি॥ তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি। তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি॥ ৩।৪।২৪২-৪৫.॥"

এই সমস্ত উক্তিতে গৌরসুন্দরের কৃষ্ণস্বরূপত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

২৫। গৌরের পরব্রহ্মত্ব-কথন (২৫-২৭ অনু)

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্পষ্টভাবে এবং প্রকারান্তরেও, গৌরকে পরব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"পরব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দমূর্ত্তিময়॥ ২।১।১৬৬॥" এই পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"জগন্নাথ মিশ্র-পা'য় বহু নমস্কার। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ পুত্ররূপে যাঁর॥ ১।৬।৭৮॥"

"অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ—শ্রীচৈতন্যহরি॥ ১।১০।৮৮॥" পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানই "অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ।"

"প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার। তূষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ববেদ-সার॥ ১।১০।১৭৪॥" পরব্রহ্মই সমস্তবেদের সার—প্রতিপাদ্য বস্তু।

"চারিবেদ-শির-মুকুট চৈতন্য॥ ১।২।২১১॥" এই পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"চারি বেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে। সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥ ১।৬।১৪৭॥" টীকা দ্রষ্টব্য।

"জয় জগন্নাথ-পুত্র মহা-মহেশ্বর॥ ১।২।১॥" শ্রুতি পরব্রহ্মকেই মহা-মহেশ্বর বলিয়াছেন। ১।২।১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এইরূপ উক্তি আরও অনেক আছে।

২৬। সর্বভগবৎ-স্বরূপত্ব-কথনে গৌরের পরব্রহ্মত্ব-খ্যাপন

"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে", "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অনাদিকাল হইতেই অনন্ত-ভগবৎস্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপও তাঁহারই মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া অবস্থান করেন (১।৮।৯৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ লক্ষণ, বাসুদেব-নারায়ণাদি অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপেই এই লক্ষণ নাই। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ স্বয়ংভগবান্ কোনও

কোনও সময়ে, কোনও কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে, নিজের মধ্যে কোনও কোনও ভগবৎ-স্বরূপকে প্রদর্শন করেন। যে-ভগবৎ-স্বরূপকে প্রদর্শন করেন, তাঁহার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই স্বয়ংভগবান্ তাহা করিয়া থাকেন। ইহাতেই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্বভগবৎ-স্বরূপত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। শ্রীগৌরচন্দ্রে যে এই লক্ষণটি বিদ্যমান, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি উক্তি এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

ক। দিগ্‌বিজয়ীর নিকটে সরস্বতীর উক্তি। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে দেবী সরস্বতী বলিয়াছেন,—"আব্রহ্মাদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়। সকল জানিহ বিপ্র! উহান আজ্ঞায়॥ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি যত শুন অবতার। এই প্রভু সর্ব্ব বিপ্র! দুই নাহি আর॥ উঁহি সে বরাহরূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা। উঁহি যে নৃসিংহরূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা॥ উঁহি সে বামনরূপে বলির জীবন। যার পাদ-নখ হৈতে গঙ্গার জনম॥ উঁহি সে হইয়া অবতীর্ণ অযোধ্যায়। বধিলা রাবণ দুষ্ট অশেষলীলায়॥ উহানে সে বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলি। এবে বিপ্রপুত্র বিদ্যারসে কুতূহলী॥ ১।৯।১৩৮-৪৩॥"

খ। ব্রহ্মাদি দেবগণকর্তৃক শচীগর্ভস্থ গৌরের স্তব। শচীগর্ভস্থ গৌরের স্তবে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন,—

"তোমার আজ্ঞায় এক সেবক তোমার। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার॥ তথাপিহ তুমি সে-আপনে অবতরি। সর্ব্বধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি॥ সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি। তপোধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥ কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি। ধর্ম্ম স্থাপ, ব্রহ্মচারি-রূপে অবতরি॥ ত্রেতা যুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ। হই যজ্ঞ-পুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম্ম॥ স্রুক্-স্রুবহস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া। সভারে লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া॥ দিব্যমেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে। পূজা ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥ পীতবাস-শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি। পূজা কর মহারাজ-রূপে অবতরি॥ কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ। বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম॥ কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার। কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার॥ মৎস্যরূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর। কূর্ম্মরূপে তুমি সব জীবের আধার॥ হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার। আদি-দৈত্য দুই 'মধু' 'কৈটব' সংহার॥ শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার। নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য-বিদার॥ বলি ছল' অপূর্ব্ব-বামনরূপ হই। পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী॥ রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ-সংহার। হলধর-রূপে কর অনন্ত-বিহার॥ বুদ্ধরূপে দয়াধর্ম্ম করহ প্রকাশ। কল্কীরূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ॥ * *॥ সর্ব্ব-লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে। কৃষ্ণরূপে গোকুলে করিলা বহু রঙ্গে॥ ১।২।১৫৫-৭৩॥"

গ। অদ্বৈতের স্তব। গৌরের ঐশ্বর্য-দর্শনের পরে অদ্বৈতাচার্য তাঁহার গৌর-স্তবে বলিয়াছেন,—

"জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত-শয়ন। জয় জয় জয় সর্ব্বজীবের শরণ॥ তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥ তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন। তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন॥ তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন। তুমি গুহ-বরদাতা অহল্যা-মোচন॥ তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার। হিরণ্য বধিয়া নর-সিংহ নাম যার॥ সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজন কর নীলাচলমাঝ॥ তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া। তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥ ২।৬।১১৬-২২॥"

ঘ। শ্রীবাসপণ্ডিতের স্তব। গৌরকে স্তুতি করিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত বলিয়াছেন,—

"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর। তোমার চরণোদক গঙ্গা তীর্থবর॥ জানকীবল্লভ তুমি, তুমি নরসিংহ। অজ-ভব-আদি তোর চরণের ভৃঙ্গ॥ তুমি সে বেদান্তবেদ্য, তুমি নারায়ণ। তুমি সে ছলিলা বলি—হইয়া বামন॥ তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত-জীবন। তুমি নীলাচলচন্দ্র—সভার তারণ॥ ২।২।২৭৬-৭৯॥"

অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

এই সমস্ত স্তবোক্তি হইতে জানা গেল, প্রভু গৌরচন্দ্র সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত। এ-সমস্ত যে স্তাবকদের অতিশয়োক্তি নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, বিভিন্ন সময়ে শ্রীগৌরচন্দ্র নিজেকে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

২৭। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে গৌরের আত্ম-প্রকাশ

বিভিন্ন সময়ে শ্রীগৌর যে নিজের মধ্যে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রকটন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। শৈশবে তৈর্থিক বিপ্রের নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকটন। ১।৩।২৬৩-৭০॥

খ। শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে ষড়্‌ভুজরূপের প্রকটন। ২।৫।৮৮-৯০॥

গ। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে ষড়্‌ভুজরূপের প্রকটন। ৩।৩।১০১-২॥

ঘ। শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকটে নৃসিংহরূপের প্রকটন। ২।২।২৫৫-৫৯॥

ঙ। মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহ-রূপের প্রকটন। ২।৩।১৮-২৪॥

চ। অদ্বৈতাচার্যের নিকটে অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকটন। ২।৬।৭৪-৮৫॥

ছ। শচীমাতার নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকটন। ২।৮।৬৩-৬৬॥

জ। শিবের গায়নের স্কন্ধে শিব-রূপের প্রকটন। ২।৮।৯৬-১০১॥

ঝ। শ্রীধরের নিকটে কৃষ্ণ-বলরাম-রূপের প্রকটন। ২।৯।১৯০-৯৫॥

ঞ। মুরারিগুপ্তের নিকটে রাম-লক্ষ্মণ-সীতারূপের প্রকটন। ২।১০।৬-১০॥

ট। মাধাইর নিকটে চতুর্ভুজ-রূপের প্রকটন। ২।১০।১৯৩-৯৫॥

ঠ। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে রুক্মিণী-আদ্যাশক্তির আবেশ। ২।১৩। অধ্যায়॥

ড। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের নিকটে বিশ্বরূপের প্রকটন। ২।২৩।৪৭-৬০॥

যিনি প্রভুর যে স্বরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেই স্বরূপের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই অনুভব ছিল অচল, অটল। নিজের মধ্যে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রকটনে, শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বভগবৎ-স্বরূপতা, পরব্রহ্মত্ব, স্বয়ংভগবত্তা, অর্থাৎ নন্দ-নন্দনত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই বসুদেব-নন্দনও বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু সে-সকল স্থলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, এই নন্দ-নন্দনই বসুদেব-পুত্ররূপে কংস-কারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী ২২ঘ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সর্বজ্ঞের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে নন্দ-নন্দন বলিয়াও বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গৌরের এমন কতকগুলি ভাবের এবং লীলার কথা বলিয়াছেন, যে-সমস্ত নন্দনন্দন-কৃষ্ণের নাই, থাকিতেও পারে না। পরবর্তী ২৮-৩৫ অনুচ্ছেদে তাহা কথিত হইতেছে।

২৮। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাব

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাবের বিবরণ দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটি বিবরণ উল্লিখিত হইতেছে। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। আত্মপ্রকাশের পূর্বেও এবং পরেও তিনি ভক্তভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

আত্ম-প্রকাশের পূর্ববর্তী ভক্তভাব

ক। **শিষ্যদের সহিত "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ" কীর্তন।** গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রেমাবেশবশতঃ দশদিন পর্যন্ত প্রভুর অধ্যাপন বন্ধ। তাহার পরে শিষ্যদের লইয়া প্রভু বসিয়াছেন। নানা কথার পরে প্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, "পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ এত কাল ধরি। কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥" শিষ্যগণ বোলেন 'কেমন সঙ্কীর্ত্তন?' আপনে শিক্ষায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥—'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥' দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া। আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥ আপনে কীর্ত্তন-নাথ করয়ে কীর্ত্তন। চৌদিগে বেঢ়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম-রসে। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে॥ 'বোল বোল' বলি প্রভু চতুর্দ্দিগে পড়ে। পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে॥ গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া-নগর। ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর॥ নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর। কীর্ত্তন শুনিয়া সভে আইলা সত্বর॥ প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব-ভক্তগণ। পরম অপূর্ব্ব সভে ভাবে মনে মন॥ ২।১।৩৯৭-৪০৬॥"

শ্রীকৃষ্ণ কখনও হাতে তালি দিয়া অন্য লোকদের সহিত 'কৃষ্ণ'-নাম কীর্তন করেন না, তাঁহার এতাদৃশ প্রেমাবেশও হয় না। অথচ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও গৌরচন্দ্র প্রেমাবেশে 'কৃষ্ণ' নাম কীর্তন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভক্তভাবের পরিচায়ক।

খ। **শুক্লাম্বরের গৃহে।** গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে এক দিন প্রভু উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তগণও সে-স্থানে উপস্থিত। প্রভুকে দেখিয়া তাঁহারা "পরম আদরে সভে করেন সম্ভাষ। প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ॥ দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ। পঢ়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ॥ 'পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।' এতবলি স্তম্ভকোলে করিয়া পড়িলা॥ ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ব প্রভুর আবেশে। 'কোথা কৃষ্ণ' বলি পড়িলেন মুক্তকেশে॥ ২।১।৮০-৮৩॥ কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর। 'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ 'কৃষ্ণ রে প্রভু রে! মোর কোন্ দিগে গেলা।' এত বলি প্রভু পুন ভূমিতে পড়িলা॥ কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শ্রীশচীনন্দন। চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি কান্দে ভাগবতগণ॥ ২।১।৮৭-৮৯॥

ইহার পরে গদাধরকে প্রভু বলিয়াছিলেন—"গদাধর! তোমরা সুকৃতি। শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে

করিলা দৃঢ়মতি ॥ আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে। পাইলুঁ অমূল্য নিধি, গেল দিন-দোষে ॥ এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর। ধূলায় লোটায় সর্ব্বসেব্য কলেবর ॥ পুনঃ পুন হয় বাহ্য, পুনঃ পুন পড়ে। দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে ॥ মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে। সবেমাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বোলে ॥ ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর। 'কৃষ্ণ কোথা? বন্ধু সব! বোলহ সত্বর ॥ ২।১।৯৫-১০০ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের জন্য এইরূপ আর্তি, এইরূপ ক্রন্দন, এইরূপ প্রেমাবেশ—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম থাকিতে পারে না, তাহা থাকে ভক্তের মধ্যে। অথচ কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

গ। **গঙ্গাঘাটে ভক্তগণের সেবা।** "প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে। বৈষ্ণব-সভার সনে হয় দরশনে ॥ . শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে। প্রীত হৈয়া ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে ॥ 'তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে। মুখে কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে ॥ কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ! সব সত্য হয়। না ভজিলে কৃষ্ণ বাপ! বিদ্যা কিছু নয় ॥ কৃষ্ণ সে জগতপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন। দৃঢ় করি ভজ-বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥' আশীর্ব্বাদ শুনিঞা প্রভুর বড় সুখ। সভারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ॥ 'তোমরা সে কর সত্য করি আশীর্ব্বাদ। তোমরা বা কেনে অন্য করিবা প্রসাদ ॥ তোমরা সে পার কৃষ্ণ-ভজন দিবারে। দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে ॥ তোমরা সে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম। তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম ॥ তোমাসভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।' এত বলি কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঁই ॥ নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে। ধুতিবস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে ॥ কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥ সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে। 'কি কর কি কর' তবে বোলে বিশ্বম্ভরে ॥ এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর। আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর ॥ ২।২।৩৪-৪৭ ॥"

এ-স্থলেও প্রভুর ভক্তভাব—কৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা—দৃষ্ট হইতেছে।

ঘ। **নিজ গৃহে কীর্তন।** প্রভুর নিজের গৃহে—"সর্ব্বভক্তগণ সন্ধ্যাসময় হইলে। আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে ॥ ভক্তিযোগ-সম্মত যে-সব শ্লোক হয়। পঢ়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয় ॥ পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্যধ্বনি। শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি ॥ 'হরি বোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে। চতুর্দ্দিগে পড়ে, কেহো না পারে ধরিতে ॥ ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন। একবারে সর্ব্বভাব দিল দরশন ॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ। ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ ॥ সর্ব্ব-নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়। প্রভাতে বা কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায় ॥ এই মত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন। নিরবধি নিশি-দিশি করেন কীর্তন ॥ ২।২।২১৩-২০ ॥"

এ-স্থলেও প্রভুর ভক্তভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।

আত্মপ্রকাশের পরবর্তী ভক্তভাব

ঙ। **শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন।** আত্মপ্রকাশের পরে এক দিন ভক্তদিগের নিকটে প্রভু বলিলেন,—" 'ভাই সব! শুন মন্ত্রসার। রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমা-সভাকার ॥ আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ

সকল। নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন-মঙ্গল ॥ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকল-গণ-সনে। ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে ॥ জগত উদ্ধার হউক শুনি কৃষ্ণনাম। পরার্থে সে তোমরা সভার ধন প্রাণ ॥' সর্ব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিঞা উল্লাস। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস ॥ শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি-নিশায় কীর্ত্তন। কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ২।৮।১০৬-১১ ॥"

ভক্তবৃন্দের সহিত এইরূপে প্রভু, সন্ন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত, এক বৎসর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। "বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেন মতে ॥ ২।২।৩৪৩ ॥"

চ। শ্রীহরিবাসরে কীর্তন। শ্রীহরিবাসরে প্রভুর নৃত্য-কীর্তনের কথা বলা হইতেছে।

"শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন-বিধান। নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥ পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ। উঠিল কীর্তনধ্বনি—'গোপাল গোবিন্দ ॥' উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর। যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর ॥ ২।৮।১৩৮-৪০ ॥ গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সভে করেন কীর্ত্তন ॥ ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী। অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি ॥ ২।৮।১৪২-৪৩ ॥"—ইত্যাদি।

এ-স্থলেও প্রভুর ভক্তভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

২৯। শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাভাব (২৯-৩০ অনু)

মহাপ্রভু যে রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, শ্রীলবৃন্দাবনদাস কোনও স্থলে স্পষ্টকথায় তাহা বলেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে "রাধিকা"-শব্দটি কেবল মাত্র একস্থলেই দৃষ্ট হয়; তাহাও মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে নহে, গদাধরদাসের প্রসঙ্গে। "হইলা রাধিকাভাব গদাধরদাস ॥ ৩।৫।২৩৮ ॥" এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যভাগবতের কোনও স্থলেই 'রাধা' বা 'রাধিকা'-শব্দ আমাদের দৃষ্টিগোচরে পতিত হয় নাই। প্রভুর একটি লীলাকে তিনি "গোপীভাবের" লীলা বলিয়াছেন (২।২৫।১৭৮), "রাধাভাবের লীলা" বলেন নাই; কিন্তু সেই লীলাটি হইতেছে রাধাভাবের লীলা। শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর রাধাভাবময়ী লীলা অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। দুই-একটি এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

ক। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে লক্ষ্মী-কাচে নৃত্য-কালে, প্রভু "ক্ষণে বোলে—'চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।' গোকুল-সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥ ২।১৮।১৪৩ ॥"

গোকুল-সুন্দরী হইতেছেন—শ্রীরাধা। এ-স্থলে প্রভুর শ্রীরাধা-ভাবের কথাই বলা হইয়াছে।

খ। "গোপী গোপী" জপ। মহাপ্রভু—" 'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোন দিন জপে। শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহা কোপে ॥ 'কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে। শঠ ধৃষ্ট কিতব—ভজে বা তারে কে ॥ স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ। লুব্ধকের প্রায় নৈল বালির পরাণ ॥ কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।' যে কৃষ্ণ বোলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায় ॥ ২।২৪।১৬-১৯ ॥"

এ-স্থলে দুর্জয় মানবতী শ্রীরাধার ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ২।২৪।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গ। "বৃন্দাবন গোপী গোপী" জপ। "একদিন গোপীভাবে জগত-ঈশ্বর। 'বৃন্দাবন গোপী গোপী' বোলে নিরন্তর ॥ কোন যোগে তহিঁ এক পঢ়ুয়া আসিল। ভাব-মর্ম্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল ॥' 'গোপী গোপী' কেনে বোল নিমাঞি পণ্ডিত। 'গোপী গোপী' ছাড়ি 'কৃষ্ণ' বোলহ ত্বরিত ॥ কি পুণ্য জন্মিব 'গোপী

গোপী' নাম লৈলে। কৃষ্ণ নাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে॥' ভিন্নভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে। প্রভু বোলে—'দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জন ভজে॥ কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে। স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে॥ সর্ব্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে। কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে॥' এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভহাতে লৈয়া পঢ়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥ ২।২৫।১৭৮-৮৫॥"

এ-স্থলেও প্রভুর দুর্জয় মানবতী শ্রীরাধার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ২।২৪।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। শ্রীগৌরাঙ্গে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কয়েক স্থলে প্রভুর লীলার বর্ণনায় এমন কতকগুলি বিবরণ দৃষ্ট হয়, যাহা হইতে জানা যায় যে, প্রভুর মধ্যে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল। লীলার বিবরণে প্রভুর মধ্যে যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলি যে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ, তাহা অবশ্য গ্রন্থকার বলেন নাই। প্রত্যক্ষদর্শীর কথিত যে-বিবরণ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার নিজের কথায় সেই বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্ত বিবরণে "সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক" কথা ছিল না বলিয়া তিনিও সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের উল্লেখ করেন নাই। এ-সমস্ত যে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ, তাহা বোধ হয়, সেই প্রত্যক্ষদর্শীও বুঝিতে পারেন নাই। এজন্য বৃন্দাবনদাস, প্রভুর রাধাভাবের আবেশের বিবরণ-দান-কালে যেমন "রাধাভাব" লেখেন নাই, তদ্রূপ, সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাবের আবেশ বর্ণনার সময়েও "সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক" কথাটি লেখেন নাই। রোগীর লক্ষণ যেমনটি শুনিয়াছেন, তেমনটিই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, রোগ-নির্ণয়ের চেষ্টা তিনি করেন নাই। সম্ভবতঃ লীলা-বর্ণনে পরমাবেশ-বশতঃই এইরূপ হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার বিবরণের গুরুত্ব যে কেবল অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে, তাহাই নহে, বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রভুর মধ্যে যে সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকের লক্ষণ-সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এজন্য সংক্ষেপে সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকের লক্ষণ বলা হইতেছে।

সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিকের পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতে উদ্ভূত—অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ (ঘর্ম), স্বরভেদ, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য ও প্রলয় (মূর্ছা, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গাদির চেষ্টাশূন্যতা এবং মনের জ্ঞান-শূন্যতা)—এই আটটি প্রেম-বিকারকে বলে—সাত্ত্বিক-ভাব, অষ্টসাত্ত্বিক।

চিত্তস্থিত প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে, চিত্তের উপরে কৃষ্ণসম্বন্ধী সাত্ত্বিক-ভাবসমূহের প্রভাবেরও তারতম্য হইয়া থাকে। তাহার ফলে সাত্ত্বিকভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্ত এবং সূদ্দীপ্ত—এই পাঁচটি বৈচিত্রী ধারণ করে।

যে সাত্ত্বিকভাব স্বয়ং বা অপর কোনও সাত্ত্বিকভাবের সহিত মিলিত হইয়া অল্পমাত্র অভিব্যক্ত হয়, এবং যাহার বিকাশ গোপন করিতে পারা যায়, তাহাকে বলে ধূমায়িত সাত্ত্বিক।

দুইটি বা তিনটি সাত্ত্বিকভাব যদি একই সময়ে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে গোপন করিতে হইলে যদি অত্যন্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে জ্বলিত সাত্ত্বিকভাব।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তিনটি, চারিটি, বা পাঁচটি সাত্ত্বিকভাব যদি একই সময়ে উদিত হয় এবং তাহাদিগকে যদি কিছুতেই সম্বরণ করা না যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে **দীপ্ত সাত্ত্বিক**।

একই সময়ে যদি পাঁচটি বা ছয়টি বা সমুদয় সাত্ত্বিকভাব উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে **উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক** বলা হয়।

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক। সু+উদ্দীপ্ত=সূদ্দীপ্ত। সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত। মহাভাবে (অর্থাৎ কৃষ্ণকান্তা গোপী-দিগের প্রেমে) সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ততার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে, তাহাদিগকে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলে। (ভ. র. সি. ২।৩।৪৭)।

সাত্ত্বিক ভাবসমূহের সূদ্দীপ্ততা এইরূপ। **অশ্রুতে** গঙ্গাধারার ন্যায়, কখনও বা পিচকারি-ধারার ন্যায়, নয়ন হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়। **কম্পে** দাঁতগুলি খট্ খট্ করিতে থাকে, প্রত্যেকটি দাঁত যেন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নড়িতে থাকে। **পুলকে** বা রোমাঞ্চে রোম-মূলস্থিত মাংস ব্রণের (ফোঁড়ার) ন্যায়, বা শিমুল-কাঁটার মূল-দেশের ন্যায় হইয়া যায়। **স্বেদে** প্রচুর পরিমাণে এবং তীব্রবেগে ঘর্ম নির্গত হয়। **স্বরভেদে** কোনও শব্দই উচ্চারিত হয় না, শব্দের একটি বা দুইটি অক্ষরমাত্রের উচ্চারণ হয়, কখনও বা "গোঁ গোঁ" শব্দমাত্র উচ্চারিত হয়। **স্তম্ভে** দেহ কাষ্ঠ-পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া যায়। **বৈবর্ণ্যে** গাত্রবর্ণ সম্যক্‌রূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। **প্রলয়ে** শ্বাস-প্রশ্বাস এত ক্ষীণ হইয়া যায় যে, শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, উদর-স্পন্দন পর্যন্ত থাকে না।

শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব সূদ্দীপ্ত হয় না

শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ-কালে, একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হয়, অন্য কোনও গোপীতে নহে, শ্রীকৃষ্ণে তো কখনই নহে (উ. নী. ম.॥ স্থায়ি॥ ১৩২॥ ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য। ম. শ্রী. ১০।১৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মহাপ্রভুতে যদি সাত্ত্বিক ভাবের সূদ্দীপ্ততা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাধাভাবের আবেশ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গে যে সাত্ত্বিক ভাব-সমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গে সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব

ক। **কৃষ্ণবিরহে সূদ্দীপ্ত অশ্রু**। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করেন ক্রন্দন। আই দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন॥ 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বোলয়ে ঠাকুর। বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥ ২।১।৪২-৪৩॥"

এ-স্থলে কৃষ্ণবিরহে সূদ্দীপ্ত অশ্রু প্রকটিত হইয়াছে।

খ। **সূদ্দীপ্ত অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রলয়**। বিষ্ণুপাদ-পদ্ম-দর্শন করিয়া প্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভক্তবৃন্দের নিকটে শ্রীমান্ পণ্ডিত বলিয়াছেন—

প্রভু "নিভৃতে যে লাগিলেন কহিতে কৃষ্ণকথা। যে যে-স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা। পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে মাত্র নাম। নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥ সর্ব্ব অঙ্গ মহাকম্প—পুলকে পূর্ণিত। 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥ সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাই হইলা মূর্চ্ছিত। কথোক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত॥ শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা। হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥ ২।১।৬১-৬৫॥"

এ-স্থলে সুদ্দীপ্ত অশ্রু, কম্প, পুলক এবং প্রলয় প্রকটিত হইয়াছে।

গ। রত্নগর্ভ আচার্যের প্রসঙ্গে সুদ্দীপ্ত প্রলয়, অশ্রু, কম্প, পুলক। রত্নগর্ভ আচার্যের মুখে "শ্যামং হিরণ্যপরিধিং" ইত্যাদি ভাগবত (১০।২৩।২২)-শ্লোক শুনিয়া প্রভুর যে-অবস্থা হইয়াছিল, তাহার কথা প্রভুর শিষ্যগণ এইভাবে বলিয়াছিলেন,—

"—যত চমৎকার॥ যে কম্প, যে অশ্রু, যে বা পুলক তোমার। আমরা ত কোথাও কভু নাহি দেখি আর॥ কালি যবে পুঁথি তুমি চিন্তাহ নগরে। তখন পঢ়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥ ভাগবত-শ্লোক শুনি হইলা মূর্চ্ছিত। সর্ব্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ আমরা বিস্মিত॥ চৈতন্য পাইয়া তুমি যে কৈলে ক্রন্দন। গঙ্গায় আসিয়া যেন হইল মিলন॥ শেষে যে বা কম্প আসি হইল তোমার। শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার॥ আপাদ-মস্তকে হৈল পুলক-উন্নতি। লালা, ঘর্ম্ম, ধুলায় ব্যাপিত গৌর-জ্যোতি॥ ২।১।৩৪৭-৫৩॥"

এ-স্থলে প্রলয়, অশ্রু, কম্প ও পুলক—এই কয়টি সাত্ত্বিক ভাবের সুদ্দীপ্ততা প্রকটিত হইয়াছে।

ঘ। সুদ্দীপ্ত অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভ-প্রলয়। "মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে। কীর্ত্তন করেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে॥ ২।২।১৫৮॥ সর্ব্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ। দেখিতে সভার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ॥ যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ। কে কহিব তাহা, সবে পারে প্রভু 'শেষ'॥ শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে। লোচনে বহয়ে শত শত নদী-ধারে॥ কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ। ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥ ক্ষণে হয় আনন্দ-মূর্চ্ছিত প্রহরেক। বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥ হুঙ্কারে শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে। তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব তরে॥ সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়। ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥ ২।২।১৬০-৬৬॥"

এ স্থলে কম্প, অশ্রু, পুলক, প্রলয়, স্তম্ভ—এই কয়টি সাত্ত্বিক ভাবের সুদ্দীপ্ততা প্রকটিত হইয়াছে। অট্টহাসি ও হুঙ্কারাদি তদনুকূল ভাব।

ঙ। হরিবাসর-কীর্তনে সুদ্দীপ্ত স্বেদ-কম্প-প্রলয়। শ্রীহরিবাসর-কীর্তনে—"যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সভে 'হরি' বোলে অতি ভীত॥ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প। মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥ ক্ষণে ক্ষণে মহা-স্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥ কখনো বা হয় অঙ্গ জলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল॥ ক্ষণে ক্ষণে অদভুত বহে মহাশ্বাস। সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় এক পাশ॥ ২।৮।১৫৬-৬০॥"

এ স্থলে স্বেদ, কম্প, প্রলয়—এই তিনটি সাত্ত্বিক ভাবের সুদ্দীপ্ততা এবং বিরহিণী শ্রীরাধার উৎকট বিরহ-তাপ ও শ্বাস প্রকটিত হইয়াছে।

চ। সুদ্দীপ্ত অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রলয়। "কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে 'হরি'। শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥ মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে। গড়াগড়ি করেন নগরে মহারঙ্গে॥ যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়। তাহা দেখে নদীয়ার লোক সমুচ্চয়॥ শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্বদাসে। আলগ করিয়া নিঞা চলিলেন বাসে॥ ২।২৪।৯-১২॥"

এ স্থলে—অশ্রু, কম্প, পুলক, প্রলয়—এই কয়টি সাত্ত্বিক ভাবের সুদ্দীপ্ততা প্রকটিত হইয়াছে।

ছ। কাটোয়ায় সুদ্দীপ্ত অশ্রু। সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত প্রভু কাটোয়ায় উপনীত হইয়া কেশব ভারতীর

নিকটে বলিলেন—"তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণ-নাথ। নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥ ২।২৬।১৫১॥" তখন প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলে মুকুন্দাদি ভক্তগণ গান করিতে লাগিলেন। তখন—"অকথ্য অদ্‌ভুত ধারা প্রভুর নয়নে। তাহা কি কহিল হয় অনন্ত বদনে॥ পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল। তাহাতেই লোকে স্নান করিল সকল॥ সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে। স্ত্রী পুরুষে বালবৃদ্ধে 'হরি হরি' বোলে॥ ২।২৬।১৫৭-৫৯॥"

এ-স্থলে সূদ্দীপ্ত অশ্রু প্রকটিত হইয়াছে।

জ। ছত্রভোগে সূদ্দীপ্ত অশ্রু। সন্ন্যাসের পরে শান্তিপুর হইতে নীলাচল-গমনের পথে প্রভু যখন ছত্রভোগে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আহারের পরে, "আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন। 'কতদূর জগন্নাথ' বোলে ঘনে ঘন॥ মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্তন করিতে। আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥ পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগবাসী। সভে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠবিলাসী॥ অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম। কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥ কি বা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার। ভাদ্রমাসে যে-হেন গঙ্গার অবতার॥ পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল। তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার। এ-শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর॥ ৩।২।১১৯-২৫॥"

এ-স্থলে সূদ্দীপ্ত অশ্রু প্রকটিত হইয়াছে।

ঝ। সিন্ধুতীরে সমস্ত সাত্ত্বিক সূদ্দীপ্ত। নীলাচলে উপস্থিতির পরে, "হেন মতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর॥ সর্ব্বরাত্রি সিন্ধুতীরে পরম বিরলে। কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে॥ তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেমরসে। তাণ্ডব করেন দেখি সভে সুখে ভাসে॥ রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গর্জ্জন। স্বেদ, বহুবিধ বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ॥ যত ভক্তিবিকার—সকল একেবারে। পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে॥ যত ভক্তিবিকার—সভেই মূর্ত্তিমন্ত। সভেই ঈশ্বর-কলা মহাজ্ঞান বন্ত॥ ৩।৩।২০১-৬॥"

এ-স্থলে সমস্ত ভক্তিবিকারের (অর্থাৎ সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের) "মূর্ত্তিমন্ত" এবং "পরিপূর্ণ" ভাবে একই সময়ে উদয়ের কথা বলাতে সূদ্দীপ্ত অষ্টসাত্ত্বিকের কথাই বলা হইয়াছে; তন্মধ্যে "বহুবিধ বর্ণ হয়" বলাতে সূদ্দীপ্ত বৈবর্ণ্যই কথিত হইয়াছে।

ঞ। রামকেলিতে সূদ্দীপ্ত অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রলয়। নীলাচল হইতে প্রভু যখন বঙ্গদেশে রামকেলি গ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন প্রভুর আচরণ দেখিয়া কোটোয়াল রাজার নিকটে গিয়া প্রভুর রূপ-বর্ণনার পরে বলিয়াছিলেন—"নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ। তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥ এক দণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত। পাষাণ ভাঙ্গয়ে তভু অঙ্গ নহে ক্ষত॥ নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী। পনসের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী॥ ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়। সহস্র জনেও ধরিবারে শক্ত নয়॥ দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে। কত নদী বহে হেন না পারি বলিতে॥ কখনো বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়। অট্ট অট্ট হাস্যে প্রহরেক ক্ষমা নয়॥ কখনো মূর্চ্ছিত হয় শুনিঞা কীর্ত্তন। সভে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন॥ ৩।৪।৩৫-৪১॥"

এ-স্থলে—পুলক, কম্প, অশ্রু, প্রলয়—এই কয়টি সাত্ত্বিক ভাবের সূদ্দীপ্ততা দৃষ্ট হয়।

ট। প্রতাপরুদ্রের দৃষ্ট সূদ্দীপ্ত ভাব। নীলাচলে প্রভুর দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র

প্রভুর নৃত্য-দর্শন-কালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা বলা হইতেছে—"আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু। পরম অদ্ভুত!—যাহা নাহি দেখি কভু ॥ অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে। কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, পুলক ক্ষণে ক্ষণে ॥ হেন যে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে। হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে ॥ হেন যে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন। শুনিঞা প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ ॥ কখনো করেন হেন রোদন বিরহে। রাজা দেখে পৃথিবীতে যেন নদী বহে ॥ এই মত কত হয় অনন্ত বিকার। কত যায় কত হয় লেখা কত তার ॥ ৩।৫।১৪৮-৫৩ ॥"

এ-স্থলে বিশেষরূপে সুদ্দীপ্ত অশ্রু দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ বিবরণ আরও অনেক আছে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, বহু সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সুদ্দীপ্তরূপে উদিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই যখন সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব নয়, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরাধাও আছেন, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন—একই দেহে, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ + শ্রীরাধা, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ভঙ্গীতে যে গৌরের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপত্বের কথাও বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৩১। শ্রীগৌরাঙ্গ—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ (৩১-৩৬-অনু)

শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোনও স্থলেই স্পষ্ট কথায় তাহা বলেন নাই। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে যে-কয়টি বিশেষ কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার কথিত শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। তন্মধ্যে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের কথা পূর্ববর্তী ৩০-অনুচ্ছেদেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে পরবর্তী কয়েকটি (৩২-৩৬) অনুচ্ছেদে আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে।

৩২। শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোক

শ্রীগৌরচন্দ্রের অবতরণের হেতু বলিবার উপক্রমে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-হেতু বলিয়াছেন। "কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার। কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার ॥ তথাপি শ্রীভাগবত গীতায় যে কহে। তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে ॥ ১।২।১৩-১৪ ॥"

ইহার পরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অবতরণ-হেতু-সম্বন্ধে গ্রন্থকার গীতার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন —"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।" ইত্যাদি (গীতা ॥ ৪।৭) শ্লোক এবং "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।" ইত্যাদি (গীতা ॥ ৪।৮) শ্লোক। এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্মও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।—"ধর্ম্ম পরাভব হয় যখনে যখনে। অধর্ম্মের প্রভাবতা বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে। ব্রহ্মা-আদি প্রভুর পা'য় করেন নিবেদনে ॥ তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে। সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥ ১।২।১৫-১৭ ॥"

ইহার পরে গ্রন্থকার শচীনন্দন-গৌরচন্দ্রের অবতরণ-হেতু বলিয়াছেন। "কলিযুগে ধর্ম্ম হয়

'হরি-সঙ্কীর্ত্তন'। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥ এই কহে ভাগবতে সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার। 'কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র-অবতার॥' ১৷২৷১৮-১৯॥" পূর্বোক্তিগুলি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, "কীর্ত্তন-নিমিত্ত" শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগে শ্রীশচীনন্দন-গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ইহার পরে, গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির সমর্থনে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

"ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ভা. ১১৷৫৷৩১॥"

এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ভা. ১১৷৫৷৩২॥"

ইহার পরে বলা হইয়াছে—"কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম হরিসঙ্কীর্ত্তন। সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে। অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্বপরিকরে॥ ১৷২৷২০-২১॥"

কলিযুগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারের নিমিত্ত যে-ভগবৎস্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকে তাঁহার স্বরূপের কথা এবং উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তিনি যে শচীনন্দন গৌরচন্দ্র তাহাও বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। এই শ্লোক-কথিত ভগবৎ-স্বরূপের স্বরূপ-তত্ত্ব হইতেছে এই—তিনি "কৃষ্ণবর্ণ," "ত্বিষাকৃষ্ণ" এবং "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ"। তাঁহার উপাসনা হইতেছে—সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা তাঁহার যজন।

১৷২৷৫-৬-শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই শ্লোকের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে (সেই আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এ-স্থলে সেই আলোচনার স্থূল মর্ম প্রকাশ করা হইতেছে। যথা,

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোকে যে ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, এ-স্থলে তাঁহার কান্তি (বাহিরে দৃশ্যমান্ বর্ণ) হইতেছে—"অকৃষ্ণ—স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ"। তিনি আবার "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ"—অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ এবং উপাঙ্গও, অর্থাৎ তাঁহার দেহও, অস্ত্র এবং পার্ষদের কার্য করিয়া থাকে।

"সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ"-শব্দের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে দুইটি শ্রুতি-বাক্যের মর্ম অবগত হওয়ার প্রয়োজন। মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিদ্বয়ে এক "রুক্মবর্ণ" (স্বর্ণবর্ণ), কর্তা, ঈশ্বর পুরুষের কথা বলা হইয়াছে; তাঁহাকে "ব্রহ্মযোনি"ও, অর্থাৎ শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মের যোনি বা মূলও, বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মযোনি"-শব্দে এই রুক্মবর্ণ পুরুষের স্বয়ংভগবত্তার বা পরব্রহ্মত্বের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"—এই গীতাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের মূল বা ব্রহ্মযোনি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ বা শ্যামবর্ণ। কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতিদ্বয়ে যাঁহাকে "ব্রহ্মযোনি" বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—রুক্মবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ। প্রশ্ন হইতে পারে—তবে "ব্রহ্মযোনি" কি দুই জন?—একজন কৃষ্ণবর্ণ এবং একজন স্বর্ণবর্ণ? কিন্তু "ব্রহ্মযোনি" দুই জন হইতে পারেন না; যেহেতু, "ব্রহ্মযোনি" বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝায়। পরব্রহ্ম একাধিক হইতে পারেন না। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ইহার সমাধান হইতেছে এই যে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যে অনন্তভগবৎ-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, সেই অনন্তস্বরূপের মধ্যে এই "রুক্মবর্ণ পুরুষও" এক স্বরূপ এবং তিনিও ব্রহ্মযোনি বলিয়া তাঁহাতে স্বয়ংভগবত্তাও বিরাজিত। অর্থাৎ পরব্রহ্ম

স্বয়ংভগবানের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ এবং রুক্মবর্ণ স্বরূপ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ ; বাসুদেব-নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি স্বয়ংভগবান্ নহেন।

যাহা হউক, এই রুক্মবর্ণ পুরুষ-সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, যখনই কেহ এই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন করেন, তৎক্ষণাৎই সেই দর্শনকর্তার পূর্বসঞ্চিত পাপ-পুণ্য (অর্থাৎ মায়াজনিত সমস্ত কর্ম ও কর্মফল) বিধৌত হইয়া যায়, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, মায়ার কোনও দাগ পর্যন্ত তাঁহাতে থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেম লাভ করেন এবং প্রেমদাতৃত্ব-বিষয়ে রুক্মবর্ণ পুরুষের সহিত সাম্য লাভ করেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডক-শ্রুতি ॥ ৩।১।৩ ॥" শ্রুতিবাক্য হইতে ইহাও জানা যায় যে, এই রুক্মবর্ণ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণও হয়েন ; নচেৎ পুণ্যপাপবিশিষ্ট মায়াবদ্ধ সংসারী জীব তাঁহার দর্শন পাইবে কিরূপে ? তাঁহার দর্শনমাত্রেই যখন সকলেই মায়াবন্ধন হইতে নির্মুক্ত হইয়া, এমন কি অসুরও অসুরত্ব বিধৌত করিয়া, প্রেম লাভ করে, তখন দর্শন দিয়া নির্বিচারে প্রেমদানের নিমিত্তই যে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহাই জানা যায়। স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন স্বীয় পার্ষদগণের সহিতই তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পার্ষদগণও তাঁহার অবতরণের ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়া থাকেন। অসুর-সংহারের নিমিত্ত তিনি অস্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন ; সুতরাং অস্ত্রও তাঁহার অবতরণের জগৎ-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু রুক্মবর্ণ পুরুষের (অর্থাৎ তাঁহার দেহের, বা অঙ্গ-উপাঙ্গের) দর্শনমাত্রেই যখন অসুরের অসুরত্ব বিদূরিত হয় এবং অসুরও তৎক্ষণাৎ প্রেম লাভ করে, তখন বুঝা যাইতেছে—তাঁহার অঙ্গ-উপাঙ্গও অস্ত্র এবং পার্ষদের কার্য করিয়া থাকে। এ-জন্যই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য অনুসারে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাঁহাকে "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ" বলা হইয়াছে—তিনি তাঁহার অঙ্গোপাঙ্গরূপ অস্ত্রও পার্ষদের সহিত বর্তমান।

উল্লিখিত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোকের অন্তর্গত "ত্বিষাকৃষ্ণ—কান্তিতে অকৃষ্ণ"-শব্দের আলোচনায় জানা যায়,—হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার দ্বারা সর্বাঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়াই কৃষ্ণবর্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হেমবর্ণ (বা পীতবর্ণ বা গৌরবর্ণ) হইয়াছেন (শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে জানা গেল, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকে যে ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ এবং তিনিই শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষ। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—তিনিই শচীনন্দন গৌরচন্দ্র (শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষের এবং ভাগবত-কথিত ত্বিষাকৃষ্ণ-সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ-স্বরূপের সমস্ত লক্ষণই যে শ্রীগৌরাঙ্গে বিদ্যমান, উল্লিখিত শ্লোকব্যাখ্যায় তাহার প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে)।

শ্লোকস্থ "কৃষ্ণবর্ণ"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে—যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-মহিমাদি যিনি কীর্তন করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ। অথচ শ্লোক হইতে জানা যায়—স্বরূপতঃ তিনিও শ্রীকৃষ্ণই, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণেরই এক বিশেষ আবির্ভাব। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদি কীর্তন করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তভাবময়ত্বও জানা যাইতেছে। কৃষ্ণের নাম-গুণাদির কীর্তনেও তিনি পরমানন্দ অনুভব করেন এবং শ্রবণেও পরমানন্দ অনুভব করেন। এজন্যই তাঁহার উপাসনা হইতেছে—সঙ্কীর্তন-প্রধান উপচারের দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধান। উপাসনার তাৎপর্যই হইতেছে উপাস্যের প্রীতিবিধান।

ইহাও জানা গেল, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোক-কথিত ভগবৎস্বরূপ হইতেছেন কলিযুগের উপাস্য এবং তাঁহার উপাসনার প্রধান উপচার যখন সঙ্কীর্তন, তখন সঙ্কীর্তন-প্রচারও হইবে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

এই শ্লোকে যে ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, বৃন্দারনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—তিনিই শচীসুত গৌরচন্দ্র। এই শ্লোকে ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতেই জানা গেল—শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ।

৩৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি উক্তি

শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে॥ ২।২৩।১৫৩॥" অন্যত্রও তিনি লিখিয়াছেন, "গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি যায়॥ ২।২৩।২৩৬॥"

এ-স্থলেও গ্রন্থকার, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোকের অন্তর্গত "সাঙ্গাপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ"-শব্দটিরই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই শব্দটির উল্লেখেও জানা যাইতেছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন উক্ত ভাগবত-শ্লোক-কথিত রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ।

ক। **শ্রীধরের মুখে আর একটি উক্তি।** শ্রীধর মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন,—"রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে। হেনমতে নবদ্বীপে হইলা বাহিরে॥ ২।৯।২১১॥ ভক্তি লাগি সর্ব্বস্থানে পরাভব পায়্যা। জিনিঞা বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥ ২।৯।২১৬॥"

এ-স্থলে শ্রীধর বলিলেন, গৌরচন্দ্র স্বীয় শরীরের মধ্যে ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যাঁহার যে বস্তু আছে, তিনিই সেই বস্তু লুকাইয়া রাখিতে পারেন; যাঁহার যে বস্তু নাই, তাঁহার পক্ষে সেই বস্তু লুকাইয়া রাখার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। শ্রীধর বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গে প্রেমভক্তি আছে। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের কেবল কৃষ্ণস্বরূপত্বই সূচিত হইতেছে না; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম বা প্রেমভক্তি নাই। পূর্ণতমরূপে সেই ভক্তি আছে শ্রীরাধার মধ্যে। গৌর-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে বিরাজিত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীধরের উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে, তাঁহাতে পূর্ণতম ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধাও আছেন; শ্রীরাধার ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী বলিয়াই শ্রীগৌরের মধ্যে ভক্তি বিরাজিত। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, শ্রীধরের উক্তি হইতে তাহাই জানা গেল।

৩৪। নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্ব

স্বয়ংভগবান্ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই ব্রজপ্রেম—ব্রজের ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেম—দান করিতে পারেন না; কেন না, এতাদৃশ প্রেম-বস্তুটি হইতেছে একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি; সুতরাং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণব্যতীত এই প্রেম অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপেরই আয়ত্তে নাই—অপর কেহ দিতেও পারেন না। এজন্যই বলা হইয়াছে—"সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ লঘুভগবতামৃত-পূর্বখণ্ডে (৫।৩৭)-ধৃত প্রমাণ॥—পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের অনেক অবতার থাকুন; তাঁহারা সর্বতঃ মঙ্গল-প্রদও হইতে পারেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণব্যতীত এমন আর কে-ই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন? (অর্থাৎ আর কেহই নাই)।"

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে স্বয়ংভগবান্ প্রেমদ হইলেও, নির্বিচারে তিনি প্রেম দান করেন না, যোগ্যতার বিচার করেন। সাধকের চিত্তে যে-পর্যন্ত ভুক্তি-বাসনা (ইহকালে সুখভোগের বা পরকালে স্বর্গাদি-সুখভোগের বাসনা) এবং মুক্তি-বাসনা (সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনা) বিদ্যমান থাকে, সে-পর্যন্ত তিনি সাধককে ব্রজপ্রেম দান করেন না। "রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ। অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ভা. ৫।৬।১৮ ॥ পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তি ॥" এই শ্লোক হইতে জানা যায়—মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণভজনকারীদিগকে মুক্তি দান করেন ; কিন্তু কখনও কখনও ভক্তিযোগ (বা প্রেমভক্তি) দান করেন না। অর্থাৎ যে-পর্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সে-পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদান করেন না। স্বয়ং পার্বতীদেবীও একথা বলিয়া গিয়াছেন। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ প্রেমসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ পদ্মপুরাণ, পাতাল-খণ্ড ॥ ৪৬।৬২ ॥" এই শ্লোকে "প্রেমসুখ"-স্থলে "ভক্তিসুখ" পাঠান্তর আছে।

কিন্তু এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই যে অন্য এক স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপে নির্বিচারে প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন, তাহা তিনি নিজেই ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন।—"অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্ ॥ চৈ. চ.-ধৃত ১।৩।১৫-উপপুরাণ-শ্লোক ॥—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে ব্রহ্মন্ (ব্যাসদেব)! কোনও কোনও কলিতে আমিই (ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া) সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি (প্রেমভক্তি) গ্রহণ করাইয়া থাকি।" পাপহত লোকদিগকেও তিনি হরিভক্তি, অর্থাৎ প্রেমভক্তি, দান করেন, পাপহত লোকগণও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোনও কোনও কলিতে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাপহত লোকদিগকেও প্রেমভক্তি দান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, তখন তিনি নির্বিচারেই সকলকে প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন —সাধন-ভজনের বিচারও করেন না, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদির বিচারও করেন না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্তে মায়ার প্রভাব বর্তমান থাকে, পাপ-পুণ্যরূপ কর্মফল বিদ্যমান থাকে, কিংবা ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা বিরাজিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেহ প্রেম লাভ করিতে পারে না। সাধন-ভজনের ফলে মায়ার প্রভাব দূরীভূত হইতে পারে, মহতের কৃপায় ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাও দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কোনও কোনও কলিতে, (সকল কলিতে নহে) তিনিই সন্ন্যাসিরূপে পাপহত লোকদিগকেও প্রেমদান করেন। যাঁহারা পাপহত, তাঁহারা মায়াকবলিত, তাহা সহজেই বুঝা-যায়। যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রায়শঃ ভুক্তি-মুক্তি বাসনা থাকে—যাহা একমাত্র মহতের কৃপাতেই দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও কলিতে সন্ন্যাসিরূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন পাপহত লোকদিগকেও প্রেম দিয়া থাকেন, তখন সাধনরত, অথচ ভুক্তি-মুক্তিকামীদিগকেও যে তিনি প্রেম দিয়া থাকেন, তাহা কৈমুত্যন্যায়েই বুঝা যায়। ইহাতে ইহাও বুঝা যায় যে, তখন তাঁহার কোনও এক অচিন্ত্য প্রভাবেই লোকের মায়ামুগ্ধতা, পাপপুণ্যরূপ কর্মফল এবং ভুক্তি-মুক্তিবাসনাদিও দূরীভূত হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই লোকগণ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এইভাবে নির্বিচারে আপামর-সাধারণকে প্রেমদান—সাধন-ভজনাদিরূপ মূল্যের অপেক্ষা না রাখিয়া, বিনামূল্যে যাহাকে-তাহাকে প্রেমদান করা, যাহাকে-তাহাকে প্রেম বিলাইয়া দেওয়া—হইতেছে শ্রুতিকথিত রুক্সবর্ণ-পুরুষের এবং ভাগবত-কথিত 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ-স্বরূপের' অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপেরই,

একটি বিশেষ লক্ষণ (পূর্ববর্তী ৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরাঙ্গে যদি এই লক্ষণটি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও বুঝা যাইবে—শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তির উল্লেখপূর্বক তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও সর্বজনবিদিত। শ্রীকৃষ্ণ কোনও এক স্বরূপে যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া থাকেন, মহাভারতের সহস্রনাম-স্তোত্রের "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥"—এই বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়।

যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গে যে নির্বিচারে যাহাকে-তাহাকে প্রেম বিলাইয়া দেওয়ার লক্ষণটি বিদ্যমান ছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটি উক্তি উল্লিখিত হইতেছে।

ক। ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি। শচীগর্ভস্থ গৌরের স্তুতি-কালে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন—"কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ। বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্তন-ধর্ম্ম ॥ ১।২।১৬৩ ॥ সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ণ হৈব সকল-সংসার। ঘরে ঘরে হৈব প্রেমভক্তি-পরচার ॥ ১।২।১৭৫ ॥ এ-মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি। তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি ॥ মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি। আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥ জগতেরে তুমি প্রভু দিবা হেন ধন। তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥ ১।২।১৮১-৮৩ ॥"

খ। গ্রন্থকারের উক্তি। "হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদ্বীপে। গৃহস্থ হইয়া পঢ়ায়েন বিপ্ররূপে ॥ প্রেমভক্তি-প্রকাশ নিমিত্ত অবতার। তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা যে তাঁহার ॥ ১।১১।৫-৬ ॥"

গ। গয়ায় দৈববাণী। গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাপ্রাপ্তির পরে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন উন্মত্তের ন্যায় মথুরার দিকে ছুটিয়াছিলেন, তখন দৈববাণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি ॥ যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে। নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে ॥ তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে। অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে ॥ অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্ত্তন। জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন ॥ ১।১২।১২৮-৩১ ॥"

ঘ। অদ্বৈতের নিকটে প্রভুর উক্তি। অদ্বৈতের নিকটে প্রভুর উক্তি। যথা—"ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার। মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥ ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে। হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে ॥ অদ্বৈত বোলেন—'যদি ভক্তি বিলাইবা। স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ * * চণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গায়্যা ॥' অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার। প্রভু বোলে—'সত্য যে তোমার অঙ্গীকার' ॥ ২।৬।১৬৩-৬৮ ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ উক্তি আরও আছে। উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতে জানা গেল, নির্বিচারে যাহাকে-তাহাকে প্রেমভক্তি বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। একথা ভক্তগণও স্তবাদিতে বলিয়াছেন, দৈববাণীও বলিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেও বলিয়াছেন। তিনি যে বাস্তবিক নির্বিচারে প্রেম-বিতরণও করিয়াছেন, পরবর্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

৩৫। শ্রীগৌরাঙ্গকর্তৃক নির্বিচারে প্রেম-বিতরণ

ক। রত্নগর্ভ আচার্যের প্রসঙ্গ। প্রভুর আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া রত্নগর্ভ আচার্য প্রেম লাভ করিয়া-

ছিলেন। রত্নগর্ভ আচার্য "শ্যামং হিরণ্যপরিধিং"-ইত্যাদি ভা. ১০।২৩।২২-শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে, "দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন। তুষ্ট হৈয়া প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠনাথের আলিঙ্গনে। প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেই ক্ষণে॥ ২।১।২৯৯-৩০০॥"

পূর্বকথিত মুণ্ডক-শ্রুতি-বাক্য হইতে জানা গিয়াছে, প্রভুর দর্শনেই লোক প্রেম লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা নির্ভর করে প্রভুর ইচ্ছার উপরে। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে, কখনও দর্শনমাত্রেই তিনি প্রেম দান করেন, কখনও আলিঙ্গনের দ্বারাও করেন, কখনও কৃষ্ণনাম উপদেশাদি দ্বারাও প্রেম দান করিয়া থাকেন। প্রভুর নির্বিচারে প্রেমদানের সামর্থ্য না থাকিলে, কেবল তাঁহার আলিঙ্গনাদি লাভ করিয়াই কেহ প্রেম পাইতে পারেন না।

খ। **নারায়ণীদেবীর প্রসঙ্গ।** চারিবৎসরের বালিকা নারায়ণীদেবীকে প্রভু যখন বলিলেন "নারায়ণী! 'কৃষ্ণ' বলি কান্দ।" তখনই নারায়ণী কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়াছিলেন (২।২।৩১৮-২২)।

গ। **প্রভুকর্তৃক জগাই-মাধাইকে প্রেমদান** (২।১৩ অধ্যায়)।

ঘ। **সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে প্রেমদান** (৩।৩।১০৪-৭)।

ঙ। **বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অসংখ্য লোককে প্রেমদান** (৩।৩।৩১৮-৩৩)।

চ। **কুলিয়া গ্রামে লক্ষ লক্ষ লোককে দর্শনদানদ্বারা প্রেমদান** (৩।৩।৩৬৫-৪৩১)।

এইরূপ বিবরণ আরও অনেক আছে।

এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা গেল, প্রভু নানাভাবে অসংখ্য লোককে নির্বিচারে প্রেম দান করিয়াছেন। ইহাতে ইহাও জানা গেল যে, এই শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষ এবং ভাগবত-কথিত সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদস্বরূপ—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। পূর্ববর্তী ৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৬। ধামের উল্লেখে গৌরের স্বরূপ-কথন

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গৌরের ধাম নবদ্বীপকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়াছেন। যথা,—

"বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর, সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম, বেদে প্রকাশিব পাছে॥ ২।২৩।২৮৯॥"

কাজি-উদ্ধার-প্রসঙ্গে, নগর-কীর্তন-কালে, প্রেমাবেশে, "কেহো বোলে—'আমি শ্বেতদীপের বৈষ্ণব'। ২।২৩।৩১৮॥"

তাৎপর্য। গৌরের ধাম নবদ্বীপকে "শ্বেতদ্বীপ" বলার তাৎপর্য বিবেচিত হইতেছে।

কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥ সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥ চৈ. চ. ১।৫।১৪-১৬॥"

এই উক্তি হইতে জানা গেল, স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলোকধামেরই কয়েকটি নাম হইতেছে—গোকুল, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন। এই ধামটি হইতেছে সর্বব্যাপক—সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান—সর্বব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণতনুর ন্যায়। সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায়, এই ধামও লোক-নয়নের

গোচরীভূত নহে। শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজের ইচ্ছায়, ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ (অর্থাৎ লোক-নয়নের গোচরীভূত) হয়েন, তখন তাঁহার এই ধামও, তাঁহারই ইচ্ছায়, প্রকাশ লাভ করেন, অর্থাৎ লোক-নয়নের গোচরীভূত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহার এই ধাম গোলোকও তত্তৎ ভগবৎ-স্বরূপের ধামরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। "বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥ পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড॥ ৩৮।৭॥" অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণ যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ, তদ্রূপ সে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণের বৈকুণ্ঠাদি ধামও স্বয়ংধাম বৃন্দাবনের অংশাংশ।

ঋগ্ বেদে একটি মন্ত্র আছে এইরূপঃ—"তাং বাং বাস্তূন্যশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতিভূরি॥ ১।১৫৪।৬॥ যজুর্বেদেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ঋগ্ বেদের উল্লিখিত মন্ত্রে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোকের কথা জানা যায় এবং সেই ধাম যে সর্বব্যাপক, তাহাও জানা যায় (উক্ত ঋগ্ বেদ-বাক্যের অর্থ গৌ. বৈ. দ.॥ ১।১।৭৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম নবদ্বীপও যে শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্বেতদ্বীপ (অর্থাৎ গোলোক, গোকুল, বৃন্দাবন), তাহাও জানা যায়। এই ধামের উল্লেখে বৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণস্বরূপত্বের কথাই জানাইয়াছেন।

অন্য-তাৎপর্যও হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিতে এবং সেই উক্তির আলোচনার পূর্বেই জানা গিয়াছে—শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণই নহেন, পরন্তু রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের এক বিশেষ আবির্ভাব—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ-রূপ আবির্ভাব। তাঁহার ধাম নবদ্বীপও হইবে শ্রীকৃষ্ণের ধাম শ্বেতদ্বীপেরই (অর্থাৎ গোলোক-বৃন্দাবনেরই) এক বিশেষ আবির্ভাব। এইরূপ তাৎপর্য যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ইহা হইতেও জানা যায়, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক বিশেষ আবির্ভাব—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ।

৩৭। অদ্ভুত প্রেমবিকারের কথনে গৌরের স্বরূপ-কথন

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত প্রতি রাত্রিতে শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তন করিতেছিলেন। সেই কীর্ত্তনে "যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র। তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ॥ শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তনবিধান। নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥ পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ। উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'॥ উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর। যূথ যূথ হৈল যত গায়ন সুন্দর॥ ২।৮।১৩৭-৪০॥ চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে। বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে॥ হরি রাম রাম রাম॥ ধ্রু॥ যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে। লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥ ২।৮।১৪৬-৪৮॥ ক্ষণে ক্ষণে আপনে গায়ই উচ্চধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥ ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর। ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর॥ ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল। হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥ প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ। পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গন-ভ্রমণ॥ যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সভে 'হরি' বোলে অতি ভীত॥ ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে হয় মহাকম্প।

মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত (এ-স্থলে সূদ্দীপ্ত কম্প)।। ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে (এ-স্থলে সূদ্দীপ্ত স্বেদ বা ঘর্ম)।। কখনো বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল (এ-স্থলে তীব্র বিরহ-তাপ)।। ক্ষণে ক্ষণে অদভুত বহে মহাশ্বাস। সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ (এ-স্থলে তীব্র বিরহ-দুঃখের লক্ষণ)।। ২।৮।১৫২-৬০।।" প্রভুর মধ্যে নানা ভাবের আবেশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। "যখন যে ভাব হয়, সে-ই অদভুত। নিজনামানন্দে নাচে জগন্নাথসুত।। ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে। না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে।। গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি (এ-স্থলে সূদ্দীপ্ত বৈবর্ণ্য)। ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি।। অলৌকিক হৈয়া প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে। যে বলিতে যোগ্য নহে, তাহা প্রভু ভাষে'।। ২।৮।১৮০-৮৩।। চতুর্দ্দিকে শ্রীহরিমঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তন। মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।। ২।৮।১৯২।। কলিযুগে আশংসিল শ্রীভাগবতে। এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাসসুতে।। ২।৮।১৯৯ (এ-স্থলে ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি শ্লোকের কথাই বলা হইয়াছে)।। শঙ্কর নারদ আদি যার দাস্য পায়্যা। সর্ব্বৈশ্বর্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হৈয়া।। সেই প্রভু আপনেই দন্তে তৃণ ধরি। দাস্যযোগ মাগে সব সুখ পরিহরি।। ২।৮।২০৬-৭।। দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। চৌদিগে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর।। ২।৮।২১৪।। নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত-জীবন। আবেশের অন্ত নাহি হয় ঘনে ঘন।। যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে' শচীসুতে।। ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি। তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি (এ-স্থলে সূদ্দীপ্ত স্তম্ভ)।। সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয়। অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীত হয়।। কখনো দেখিয়ে অঙ্গ—গুণ দুই তিন। কখনো স্বস্থাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ (হস্ত-পদাদি অঙ্গ কখনও স্বাভাবিক অবস্থা হইতে দুই-তিন-গুণ দীর্ঘ হয়, আবার কখনও বা স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অতিশয় ক্ষীণ—অত্যন্ত খর্ব—হইয়া যায়)।। কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, আনন্দ সদায় (বিরহে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি হয়, তখনই কৃষ্ণের সহিত মিলনের ভাবে পরমানন্দের উদয় হয়)।। ২।৮।২১৮-২৩।।"

আলোচনা। এক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত উক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে।

মহাপ্রভু যে ভক্তভাবের আবেশেই নৃত্য এবং কীর্তন করিতেছিলেন বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একাধিকবার তাহা বলিয়া গিয়াছেন। আবার, "প্রভু জগতের প্রাণ।। ২।৮।১৩৮।।" শচীনন্দন—"গোপাল গোবিন্দ ২।৮।১৩৯, হরি রাম রাম রাম।। ২।৮।১৪৭।।" —এ-সমস্ত "নিজনামানন্দে নাচে জগন্নাথসুত।। ২।৮।১৮০।।"—ইত্যাদি বাক্যে বৃন্দাবনদাস ইহাও জানাইয়া গিয়াছেন, যিনি ভক্তভাবে নৃত্য-কীর্তন করিতেছিলেন, সেই জগন্নাথসুত হইতেছেন "গোপাল গোবিন্দ"—ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। —বলা হইয়াছে, "গোপাল গোবিন্দ" তাঁহার নিজেরই নাম।

আবার "কখনও বা হয় অঙ্গ জলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল।। ক্ষণে ক্ষণে অদভুত বহে মহাশ্বাস।। ২।৮।১৫৯-৬০।।"—ইত্যাদি উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর মধ্যে তীব্র বিরহের ভাবও বিদ্যমান ছিল।

এইরূপে জানা গেল—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও, তীব্র বিরহের ভাবে আবিষ্ট হইয়া, ভক্তভাবে, শ্রীকৃষ্ণের "গোপাল গোবিন্দ"—ইত্যাদি নাম শ্রবণ ও কীর্তন করিতেছিলেন। ভক্তভাবে নামকীর্তন শ্রবণাদির ফলে তাঁহার মধ্যে সাত্ত্বিকভাবের উদয়ও হইয়াছিল এবং কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য

এবং স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব সূদ্দীপ্ততাও লাভ করিয়াছিল (সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ পূর্ববর্তী ৩০-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই যে সাত্ত্বিকভাব সূদ্দীপ্ত হয় না এবং শ্রীরাধার মধ্যেও কেবল শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কালেই যে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সূদ্দীপ্ত হয়, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে (পূর্ববর্তী ৩০-অনুচ্ছেদে)। যে-সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায় একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই উদিত হইতে পারে, সেই সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক যখন শ্রীগৌরাঙ্গে দৃষ্ট হইতেছে, তখন সন্দেহাতীতভাবেই জানা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরাধাও বিরাজিত। শ্রীগৌরাঙ্গ যে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, এ-কথাও যখন বৃন্দাবনদাস বলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে অবস্থিত শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাব উদিত হওয়াতেই সাত্ত্বিকভাবসমূহ সূদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সাত্ত্বিকভাবের সূদ্দীপ্ততা শ্রীরাধার পক্ষে অদ্ভুত নহে; শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায় ইহা বরং তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং তদনুগত শাস্ত্রে শ্রীরাধার সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকের কথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন, "যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে॥ ২।৮।২১৯॥" কি রকম অদ্ভুত বিকার (যাহা ভাগবতে, অর্থাৎ ব্রজে শ্রীরাধার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না, সেইরূপ অদ্ভুত বিকার কি), তাহাও বৃন্দাবনদাস বলিয়া গিয়াছেন—হস্তপদাদি অঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে—দুই-তিন-গুণ দীর্ঘতা, কখনও বা অত্যন্ত ক্ষীণতা বা খর্বতা (২।৮।২২২), কখনও বা "দুই গুণ হয় দুই আঁখি (২।৮।১৮২॥ অর্থাৎ কখনও কখনও শ্রীগৌরাঙ্গের চক্ষু দুইটি দ্বিগুণ বড় হইয়া যায়)।" ইত্যাদি। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন, নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভুর দেহে উল্লিখিতরূপ অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকাশ পাইয়াছিল। কবিরাজগোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন, সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে অবস্থান-কালেও প্রভুর মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত প্রেমবিকার প্রকাশ পাইত। তিনি লিখিয়াছেন—"লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-শিরোমণি॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৭৬॥" প্রভুর যে-সমস্ত শাস্ত্রলোকাতীত অবস্থার কথা কবিরাজগোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কথিত এবং এ-স্থলে আলোচ্য বিবরণের অনুরূপ অবস্থার কথা এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে। "প্রভুর পড়িয়াছে দীর্ঘ —হাত পাঁচ ছয়। অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥ একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত। অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তা'ত॥ হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থি-সন্ধি যত। একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥ চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা। চৈ. চ. ৩।১৪।৬০-৬৩॥ পেটের ভিতর হস্ত পদ—কূর্ম্মের আকার। মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার॥ অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল। বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ বিহ্বল॥ চৈ. চ. ৩।১৭।১৫-১৬॥" প্রত্যক্ষদর্শী দাসগোস্বামীও তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুতে প্রভুর এই লীলার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দাসগোস্বামী এবং কবিরাজগোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন—কৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবের আবেশেই কখনও কখনও প্রভুর এইরূপ অবস্থা হইত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহের ভাব তো ব্রজেরই ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীরাধা সেই ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইলেই পূর্বোল্লিখিত অদ্ভুত প্রেমবিকার, অর্থাৎ হস্ত-পদাদির অদ্ভুত বিকৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধার মধ্যে ব্রজে এইরূপ বিকারের কথা জানা যায় না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় এইরূপ। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আছেন ভিতরে, আর শ্রীরাধা আছেন বাহিরে—স্বীয় প্রেমের প্রভাবে নিজের দেহকে বিগলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্যাম অঙ্গকে স্বীয় প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধা বিরাজিত। শ্রীগৌরাঙ্গের যে-অঙ্গ বিকৃত হয়, তাহা হইতেছে বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গ। অস্থি-সন্ধি যখন ভিন্ন হইয়া যায়, তখন অস্থি-সন্ধির উভয় পার্শ্বে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সন্ধিস্থলের উপরিস্থ চর্ম—যাহা হইতেছে বস্তুতঃ শ্রীরাধারই অঙ্গ, তাহা—বিচ্ছিন্ন হয় না, কিন্তু তাহাও দীর্ঘ হইয়া যায়—কিছু পরিমাণে বিকৃত হয়। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্তির তীব্রতায় শ্রীরাধার যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের উপরে তাহার প্রভাব সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও সম্যক্‌রূপে দুর্দমনীয়, শ্রীরাধার পক্ষে তদ্রূপ দুর্দমনীয় না হইলেও অনেকটা দুর্দমনীয়। যেহেতু, তাহাতে শ্রীরাধার অঙ্গও কিছুটা বিকৃত হয়, শিথিল হইয়া যায়। ইহাতে মনে হয়—রাধা-প্রেমের অদ্ভুত প্রভাব শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধির বিষয়ীভূত করাই যেন শ্রীরাধার অভিপ্রায়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি-জন্মাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ কোনওরূপ দুঃখ অনুভব করেন না, বরং পরমানন্দই অনুভব করেন। যখন প্রভু খর্বাকৃতি বা কূর্মাকৃতি হইয়া পড়েন, তখনও তাঁহার এক অঙ্গ অপর অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাঁহার চর্মরূপ শ্রীরাধার অঙ্গও অনুরূপভাবে শিথিল হইয়া পড়ে। তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণ কোনওরূপ দুঃখ অনুভব করেন না, বরং পরমানন্দই অনুভব করেন। যেহেতু শ্রীরাধার যে-প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী অবস্থা জন্মে, তাহা হইতেছে স্বরূপতঃই আনন্দ (২।১।৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এজন্যই কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, প্রভু কূর্মের আকারে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও—'বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ বিহ্বল॥ চৈ. চ. ৩।১৭।১৬॥" প্রস্তাবিত-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী॥ ১২।৪খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, মহাপ্রভুর দীর্ঘাকৃতি এবং খর্বাকৃতিরূপ অদ্ভুত প্রেমবিকারের কথা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার আলোচনায় জানা গেল, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের পক্ষেই এতাদৃশ অদ্ভুত প্রেমবিকার সম্ভব বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ এবং সেই আলোচনায় ইহাও জানা গেল যে, এতাদৃশ অদ্ভুত প্রেমবিকার হইতেছে গৌরের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের বলবত্তম প্রমাণ।

৩৮। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাবের রহস্য

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের নামই ভক্তি বা প্রেমভক্তি। শ্রীরাধার মধ্যেই পূর্ণতম প্রেম সর্বদা বিরাজিত। তাঁহার মধ্যে অবস্থিত প্রেমস্তরের পারিভাষিক নাম—মাদন, পূর্ণতম-বিকাশময় প্রেমস্তর। এই মাদন সর্বভাবোদগমোল্লাসী বলিয়া ইহাকে স্বয়ংপ্রেমও বলা যায়। স্বয়ংভগবানের ভগবত্তা যেমন অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তার হেতু, তদ্রূপ মাদনের প্রেমসম্ভারই হইতেছে অন্যান্য প্রেমস্তরের হেতু। এতাদৃশ প্রেম বা ভক্তি শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই নাই। শ্রীরাধা হইতেছেন—নিখিল-ভক্তকুল-মুকুটমণি, শ্রীরাধার মধ্যেই পূর্ণতম ভক্তভাব বিরাজিত। শ্রীরাধার সহিত মিলিত-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলিয়াই, শ্রীগৌরাঙ্গেও পূর্ণতম ভক্তভাব বিরাজিত। ইহাই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাবের রহস্য। এতাদৃশ ভক্তভাব হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপগত ভাব।

৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গের নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্বের রহস্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার মধ্যেই পূর্ণতম প্রেম বিরাজিত। যাহা অক্ষয়, অব্যয়, তাহাকেই পূর্ণ বা পূর্ণতম বলা হয়। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ শ্রুতি॥" যথেচ্ছ ব্যয় করা সত্ত্বেও, এমন কি সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলেও, যাহা পূর্ববৎ পূর্ণ ই থাকে, সেই প্রেমের নামই পূর্ণ প্রেম বা পূর্ণতম প্রেম। শ্রীরাধা হইতেছেন এতাদৃশ পূর্ণ বা অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী এবং শ্রীরাধার সহিত মিলিতস্বরূপ বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গও হইতেছেন অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী।

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণরতি হইতেছে স্বরূপতঃই আনন্দরূপ। "রতিরানন্দ-রূপৈব॥ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু॥" প্রেম স্বরূপতঃই পরম মধুর, অনির্বচনীয়-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময়। আবার, প্রেম যতই ঘনীভূত হইতে থাকে, তাহার মাধুর্যও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে—অগ্নিপাকে ইক্ষুরস যতই ঘনীভূত বা গাঢ় হইতে থাকে, তাহার আস্বাদ্যত্বও যেমন ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তদ্রূপ। শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেম হইতেছে প্রেমের ঘনীভূততম বা গাঢ়তম স্তর; সুতরাং ইহার মাধুর্য বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বও হইতেছে সর্বাতিশায়ী। শ্রীরাধার সহিত মিলিত-স্বরূপ বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন এতাদৃশ পরমতম মধুর পূর্ণতম আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী। তিনি এই প্রেমের আস্বাদনও করিতেছেন। যেহেতু, যাঁহার মধ্যে প্রেম বিরাজিত, প্রেমের স্বরূপগতধর্মবশতঃ প্রেমই নানাভাবে নিজেকে আস্বাদিত করাইয়া থাকে (মশ্রী॥ ১২।৪ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সহিত একই স্বরূপে মিলিত হওয়ার, একটা হেতুও হইতেছে শ্রীরাধাপ্রেমের আস্বাদন (মশ্রী॥ ১২।১,৪ অনুচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য)।

লৌকিক জগতেও দেখা যায়, যিনি কোন পরম মধুর বস্তুর আস্বাদনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, অপরকেও তাহা আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার আগ্রহ জন্মে। তবে লৌকিক বস্তু পরিমিত বলিয়া তাহা তিনি সকলকে দিতে পারেন না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী এবং তিনি যাহা সর্বদা আস্বাদন করিতেছেন, তাহা হইতেছে পূর্ণ—অখণ্ড, অক্ষয় এবং অব্যয় এবং তাহার মাধুর্যও অপরিমিত। সেই বস্তুটির আস্বাদন সকলকে পাওয়াইবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যাগ্রহও স্বাভাবিক এবং সেই প্রেমবস্তুটি অক্ষয়-অব্যয় বলিয়া তাহার বিতরণে কোনওরূপ সঙ্কোচের ভাবও আসিতে পারে না। অর্থাৎ সকলকে তাহা আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের যে-অত্যাগ্রহ, তাহা সঙ্কোচিত হওয়ারও কোনও হেতু থাকে না। এজন্য নির্বিচারে সকলকে প্রেমদান করার নিমিত্ত তাঁহার আগ্রহ থাকে সর্বদা অস্তিমিত, তিনি নির্বিচারে সকলকে প্রেম বিলাইয়া দিতে থাকেন এবং তাহাতে নিজেও তিনি পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ নির্বিচারে, যাহাকে-তাহাকে, প্রেম বিলাইয়া দিতে সমর্থ। ইহাই হইতেছে তাঁহার নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্বের রহস্য এবং ইহাও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী একটি ধর্ম।

৪০। শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য ও তাহার রহস্য

ক। ঐশ্বর্যের অদ্ভুতত্ব মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও কোনও সময়ে ঐশ্বর্য-প্রকাশ-কালে তিনি নিজেকে অদ্ভুত রূপেও প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন তৈর্থিক বিপ্রের নিকটে। এই বিপ্র ছিলেন বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, বালগোপাল-কৃষ্ণমন্ত্রেই তিনি তিন বার ভোগ নিবেদন

করিয়াছিলেন এবং তিন বারই উলঙ্গ নিমাই আসিয়া তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। শেষবারও নিবেদিতান্ন ভোজন করিতে দেখিয়া বিপ্র যখন "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন, তখন—"প্রভু বোলে—'অয়ে বিপ্র ! তুমি ত উদার। তুমি আমা ডাকি আন, কি দোষ আমার ।। মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান। রহিতে না পারি আমি আসি তোমা-স্থান ।। আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব' তুমি। অতএব তোমারে দিলাও দেখা আমি ।।' সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অষ্টভুজ রূপ ।। এক হস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়। আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার। সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার ।। নব গুঞ্জা বেঢ়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে। চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে ।। হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল। বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকর কুণ্ডল ।। চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর। নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ।। অপূর্ব্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেই খানে। বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষগণে ।। গোপ গোপী গাবীগণ চতুর্দ্দিগে দেখে। যত ধ্যান করে তা'ই দেখে পরতেকে ।। অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ। আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন ।। ১।৩।২৬৬-৭৭ ।।"

এই বিবরণ হইতে জানা গেল—তৈর্থিক বিপ্র এক অদ্ভুত এবং অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণরূপ দেখিলেন—অষ্টভুজ শ্রীকৃষ্ণ। তাহাও আবার বৃন্দাবনে, কদম্ববৃক্ষের তলে, গোপ-গোপী-গাভীগণ-বেষ্টিত, দুই হস্ত নবনীত-ভোজন-রত, দুই হস্ত মুরলীবাদন-রত, আর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই দ্বিভুজ ; মথুরা দ্বারকায়ও দ্বিভুজ, তবে কখন কখনও চতুর্ভুজও হয়েন। কিন্তু অষ্টভুজ শ্রীকৃষ্ণের কথা কোনও শাস্ত্র হইতেই জানা যায় না। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। একই রূপে এবং একই সময়ে মুরলীবাদন এবং নবনীত-ভোজন-ইহাতেও বাল্য ও কৈশোরের অদ্ভুত সমাবেশ। নবনীত-ভোজন এবং মুরলীবাদনের সঙ্গে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মও ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলার এক অদ্ভুত সমাবেশের পরিচায়ক। এই অদ্ভুত বিবরণটি তবে কি বৃন্দাবনদাসের কল্পনা ? না, তাহা হইতে পারে না। কেননা, কৃষ্ণদাস কবিরাজও বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা স্বীকার করিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—"অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিন বার। পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ।। চৈ. চ. ১।১৪।৩৪ ।।" মিথ্যা ঘটনার কল্পিত বিবরণ কবিরাজগোস্বামী কখনও গ্রহণ করিতেন না। তবে এই অদ্ভুতত্বের হেতু কি ? তাহা বলা হইতেছে।

পুরাণাদিতে দেখা যায়, ভগবান্ যখন কোনও ঐশ্বর্য প্রকটিত করেন, তখন কোনও কোনও স্থলে, ঐশ্বর্যের অদ্ভুত প্রকাশ এবং সমাবেশ থাকে। শ্রীমদ্‌ভাগবত-বর্ণিত ব্রহ্মমোহন-লীলাতেও তাহা দৃষ্ট হয়। আমরা এক নারায়ণের কথাই জানি, অসংখ্য নারায়ণ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। আবার আমরা জানি, এক নারায়ণের অধীনেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ; কিন্তু অসংখ্য নারায়ণের কথা যেমন জানি না, তেমনি অসংখ্য নারায়ণের প্রত্যেকের অধীনে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথাও আমরা জানি না। আবার, এক নারায়ণের অধীন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকলে যে মূর্ত হইয়া একই সময়ে একই স্থানে সেই নারায়ণের স্তবস্তুতি করিয়া থাকে, ইহাও আমরা জানি না। কিন্তু ব্রহ্মমোহন-লীলায় এই সমস্তই দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস এবং বৎসপাল-গোপশিশু ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই নানালঙ্কারভূষিত পীত-কৌষেয়বাসা শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধর চতুর্ভুজ-নারায়ণ হইলেন। প্রত্যেক নারায়ণের অধীনেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকলেই মূর্ত হইয়া,

একই সময়ে এবং একই স্থানে, স্বীয় ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি নারায়ণের স্তব-স্তুতি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অসংখ্য বৎস এবং বৎসপাল ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মা এ-স্থলে অসংখ্য নারায়ণই দেখিয়াছিলেন। এ-স্থলে ঐশ্বর্যের বিকাশ যেমন অপূর্ব এবং অদ্ভুত, বিবিধ ঐশ্বর্যের সমাবেশও তেমনি অপূর্ব এবং অদ্ভুত।

ব্রহ্মমোহন-লীলায় উল্লিখিতরূপ অদ্ভুত এবং অপূর্ব ঐশ্বর্য-প্রকটনের একটা হেতুও বোধ হয় ছিল। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা-দর্শনের অভিলাষী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী বৎসপাল এবং বৎসদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এতাদৃশ অদ্ভুত এবং অপূর্ব ঐশ্বর্যের প্রকটন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথিত তৈর্থিক বিপ্র যে ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্যের সমাবেশ দেখিয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মমোহন-লীলায় প্রকটিত ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যের সমাবেশের ন্যায়ই অদ্ভুত এবং অপূর্ব। এই অদ্ভুতত্বের হেতুও আছে। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—তৈর্থিক বিপ্র "যত ধ্যান করে, তা'ই দেখে পরতেকে॥ ১।৩।২৭০॥" আবার প্রভুও বিপ্রকে বলিয়াছেন—"আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি। অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি॥ ১।৩।২৬২॥" এই দুইটি উক্তির তাৎপর্য আলোচিত হইতেছে। সেই বিপ্র ছিলেন বালগোপালের উপাসক। সুতরাং তাঁহার মুখ্য ধ্যেয় বস্তু ছিলেন বালগোপাল, যশোদাদুলাল, নবনীত-ভোজন-লোলুপ বালকৃষ্ণ। এই বালগোপালের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, তাঁহার মনে জাগিত—ইনিই কংস-কারাগারে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহার চিত্তে এ-কথা জাগ্রত থাকিত, ততক্ষণ তাঁহার মনে শঙ্খ-চক্রাদিধারী কৃষ্ণের কথাই জাগ্রত থাকিত; সুতরাং ততক্ষণ বস্তুতঃ তাঁহার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানই চলিত। এইরূপে যখন তিনি নবনীত-ভোজনরত কৃষ্ণের কথা ভাবিতেন, তখন তাঁহার বালগোপালের ধ্যানই চলিত। আবার, বালগোপালের কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলার কথাও তাঁহার মনে পড়িত—পৌগণ্ডে এবং কৈশোরে বিবিধ লীলার কথা, বেশ-ভূষার কথা, পরিকরগণের কথা—এ-সমস্তও তাঁহার মনে পড়িত। তখন বস্তুতঃ সেই-সেই লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানই তাঁহার চলিত। এ-সমস্ত দেখিবার নিমিত্তও বোধ হয় সময় সময় তাঁহার ইচ্ছা জাগ্রত হইত। বিপ্রের এ-সকল ধ্যেয়বস্তুর দর্শনের বাসনা-পূরণের নিমিত্তই বিপ্রের সমস্ত অভীষ্টবস্তু প্রভু তাঁহাকে দেখাইলেন—একই রূপে, একই সময়। তাহাতেই অদ্ভুত সমাবেশের উদয় হইয়াছিল।

ষড়্-ভুজরূপাদির প্রকটনেও ঐশ্বর্যের এতাদৃশ অদ্ভুত এবং অপূর্ব প্রকাশ এবং সমাবেশ লক্ষিত হয়।

খ। **শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট।** শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট। স্বয়ংভগবান্ হইলেও তিনি নিজেকে "নর" বলিয়াই মনে করেন, ভগবান্ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার যে কোনও ঐশ্বর্য আছে, তাহাও তিনি মনে করেন না। (১।১।২-শ্লোক-ব্যাখ্যায় "জগন্নাথসুত"-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ—নন্দ-যশোদাদি, কি সুবল-মধুমঙ্গলাদি, কি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ—হইতেছেন তাঁহারই স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ—সুতরাং জীবতত্ত্ব নহেন। কিন্তু তাঁহারাও নিজেদিগকে "নর" বলিয়াই মনে করেন এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেও তাঁহাদেরই একজন—"নর"—বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে "নর" বলিয়া মনে করিলেও এবং তাঁহার অনাদিসিদ্ধ পরিকরগণও তাঁহাকে "নর" বলিয়া মনে করিলেও, বাস্তবিক তিনি তো স্বয়ংভগবান্; সুতরাং পূর্ণতম ঐশ্বর্যও তাঁহার মধ্যে থাকিবেই। যেহেতু, ভগবানের ঐশ্বর্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপশক্তিরই একটি রূপ—সুতরাং তাঁহার স্বরূপভূত।

ভগবানের সেবা করা বা লীলার সহায়তা করা হইতেছে তাঁহার ঐশ্বর্যের স্বরূপানুবন্ধী কার্য। ব্রজলীলাতেও তাহা দৃষ্ট হয়। ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই ঐশ্বর্যের বিকাশ আছে। কিন্তু সেই ঐশ্বর্যকে তাঁহার পরিকরগণও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করেন না, শ্রীকৃষ্ণও তাহা মনে করেন না ; ঐশ্বর্য যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন না এবং কোনও কোনও স্থলে তাঁহার পরিকরগণও তাহা জানিতে পারেন না ; যেমন, রাসলীলায়। শত কোটি গোপীর সঙ্গে রাসবিলাস আরম্ভ হইয়াছে। প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত-ভাবে নিজের নিকটে পাইয়া, প্রাণঢালা সেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের নিমিত্ত প্রত্যেক গোপীরই ইচ্ছা জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের ইচ্ছা বলিয়া ইহা হইতেছে বাস্তবিক গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। যুগপৎ শতকোটি গোপীর এই প্রেমের প্রভাবে, একই সময়ে এবং একই সঙ্গে, অথচ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, শত কোটি গোপীর নিকটে থাকিয়া, যুগপৎ তাঁহাদের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত, প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণেরও ইচ্ছা জন্মিল। তাঁহার এই ইচ্ছা জানিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য-শক্তি, শত কোটি গোপীর প্রত্যেকের পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রকটিত করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও তাহা জানিতে পারিলেন না, কোনও গোপীও তাহা জানিতে পারিলেন না। প্রত্যেক গোপীই তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে স্বীয় প্রাণবল্লভকে একান্তভাবে নিজের নিকটে পাইয়া তাঁহার সেবায় তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন, অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ বা অনুসন্ধানও তাঁহার ছিল না; সুতরাং অন্য গোপীদের নিকটেও যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তাহা জানিবার সুযোগও তাঁহার ছিল না। শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ অবস্থা। যদি তাঁহরা জানিতে পারিতেন যে, সকল গোপীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন, তাহা হইলে আর রাসলীলা হইত না, ভয়ে ও বিস্ময়ে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন। যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা জানিয়াই তাঁহার ঐশ্বর্য আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ-পূরণরূপ সেবা করিয়াছেন। ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহায়কারিণী শক্তি। ইহাকে যোগমায়াও বলে, লীলাশক্তিও বলে।

শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কোনওরূপ ইচ্ছা না জাগিলেও, প্রয়োজন-বোধে লীলাশক্তি যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার আনুকূল্য করিয়া থাকেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় ; যেমন, অঘাসুর-বধে। অঘাসুর-বধের দিন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন অসংখ্য বৎস এবং অসংখ্য বৎসপাল গোপশিশুগণ। বৎসদিগকে অগ্রবর্তী করিয়া গোপশিশুগণ পর্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। একস্থলে তাঁহারা দেখিলেন, পর্বতের একটি অংশ যেন সুবৃহৎ একটি সর্পের আকার-বিশিষ্ট, সর্পটি যেন "হা" করিয়া পড়িয়া আছে, তাহার উপরের ওষ্ঠ আকাশের উর্ধ্ব দিকে সূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছে, একটি বিস্তীর্ণ পথের আকারে তাহার জিহ্বা ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পর্বতের এইরূপ অঙ্গসন্নিবেশের কথা বলাবলিও করিতেছিলেন। পর্বতের গুহায় প্রবেশ করার জন্য তাঁহাদের কৌতূহল জন্মিল এবং বৎসদিগকে অগ্রবর্তী করিয়া তাঁহারা পর্বতগুহায় প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের পশ্চাতে। তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের জন্য আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। যেহেতু, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, ঐটি পর্বতের অঙ্গভঙ্গী নহে—অঘাসুর এক বিরাট সর্পের আকারে, সকলকে গ্রাস করার জন্য মুখব্যাদন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া গোপশিশুদের অনুসরণ করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা পূর্বেই অঘাসুরের উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও অঘাসুরের কণ্ঠদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইলে, তাঁহার কলেবর এইরূপ বিরাট আকার ধারণ করিল যে, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অঘাসুর প্রাণত্যাগ করিল। যাহা হউক, এ-স্থলে লক্ষিতব্য বিষয় হইতেছে এই। প্রথমতঃ, ঐটি যে

পর্বতের অঙ্গভঙ্গী, না অন্য কিছু, তাহা জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে-বাসনা জন্মিয়াছিল, তাহার কোনও ইঙ্গিত পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। অথচ তিনি জানিতে পারিলেন—ঐটি হইতেছে অঘাসুর। কিরূপে তিনি ইহা জানিলেন, সেই অনুসন্ধানও তাঁহার ছিল না। জানিয়াছেন—এইমাত্র। দ্বিতীয়তঃ, অঘাসুরের, কণ্ঠদেশ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন, তাঁহার দেহ বিরাট আকার ধারণ করুক—এইরূপ কোনও ইচ্ছাও তাঁহার জাগে নাই। যিনি নিজেকে "নরমাত্র" মনে করেন, তাঁহার মধ্যে এইরূপ ইচ্ছা জাগিবার সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না। অথচ, তখন তাঁহার দেহ বিরাট আকার ধারণ করিয়া অঘাসুরের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা না জাগিলেও, অঘাসুরের নিধনের নিমিত্ত, তাঁহার লীলাশক্তিই তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন—ঐটি অঘাসুর এবং যথাসময়ে তাঁহার দেহকেও বিরাট আকার ধারণ করাইয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল, নিজের ঐশ্বর্য আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে না করিলেও, তাঁহার ঐশ্বর্য বা লীলাশক্তি, তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া, কখনও কখনও বা তাঁহার ইচ্ছা না জন্মিলেও, তাঁহার লীলার আনুকূল্যার্থ, স্বীয় প্রভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয় বিবেচিত হইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন শ্রীরাধার সহিত একই দেহে মিলিত শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট। শ্রীরাধাও তদ্রূপ। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গও যে নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট, তাহা সহজেই জানা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি যখন স্বয়ংভগবান্, তখন তাঁহার ঐশ্বর্য থাকিবেই এবং তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া এবং কখনও কখনও তাঁহার কোনও ইচ্ছা না জাগিলেও প্রয়োজন-বোধে, তাঁহার লীলাশক্তি যথাযথভাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিবেনই।

গ। উপসংহার—শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য ও তাহার রহস্য। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ংভগবান্ হইলেও নর-অভিমান-বিশিষ্ট এবং তাঁহার স্বরূপগতভাব হইতেছে—ভক্তভাব বা দাস্যভাব (পূর্ববর্তী ২৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তথাপি, তাঁহার মধ্যে অনেক ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইয়াছে (পূর্ববর্তী ২৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার মধ্যে গোপীভাবও প্রকাশ পাইত ; এই গোপীভাবও বস্তুতঃ ভক্তভাবেরই অন্তর্গত।

শ্রীল মুরারি গুপ্ত প্রভুসম্বন্ধে তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—"গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। আত্মতন্ত্রঃ স্বাত্মরতঃ শিক্ষয়ন্ স্বজনানয়ম্॥ কড়চা॥ ৩।৩।১৭॥—এই স্বাধীন স্বাত্মারাম প্রভু নিজ-জনগণকে শিক্ষাদানের জন্য কখনও গোপীভাবে, কখনও দাসভাবে (ভক্তভাবে), আবার কখনও বা ঈশ্বরভাবে বিরাজ করিতেছেন।" কড়চায় আরও বলা হইয়াছে,—"ক্বচিদীশ্বরভাবেন ভৃত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্। এবং নানাবিধাকারৈর্নৃত্যন্ লোকানশিক্ষয়ৎ॥ কড়চা॥ ২।৪।৪॥—কখনও বা ঈশ্বর-ভাবে ভৃত্যগণকে নানাবিধ বর প্রদান করেন। এইরূপে নানাবিধ আকার-প্রকটনপূর্বক নৃত্য করিতে করিতে ইনি লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।" এবং "নানাবতারানুকৃতিং বিতন্বন্ রেমে নৃলোকাননুশিক্ষয়ংশ্চ॥ কড়চা॥ ১।১৬।১৩॥—কখনও কখনও বা লোকশিক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ অবতারের অনুকরণ করিয়া বিহার করেন।"

মুরারি গুপ্তের এই সকল উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকটনের একটি উদ্দেশ্য ছিল—নিজ-জনগণকে শিক্ষাদান, ভক্তগণকে নানাবিধ বর দান, এবং লোকদিগকে শিক্ষা দান। কিন্তু তিনি নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া আপনা হইতে ঐশ্বর্য-প্রকটন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-প্রকটনের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্য-প্রকটনও হইতেছে তাঁহার লীলা-শক্তিরই কার্য।

ব্রজলীলায় লীলাশক্তি যখন শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকটিত করিতেন, তখন তাঁহার নর-অভিমানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তাহা করিতেন (গৌ. বৈ. দ. ॥ বাঁধান প্রথম খণ্ডে ১২।১৩৭-অনুচ্ছেদ, ৩৫৪-৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐশ্বর্য যে প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সভাকার-স্থানে। অসর্ব্বজ্ঞ হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥ 'কিছু নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ। বলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ॥ কৃষ্ণ মোর প্রাণধন কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম। তোমরা আমার ভাই! বন্ধু জন্ম জন্ম॥ কৃষ্ণদাস্য বই মোর আর নাহি গতি। বলিহ আমারে পাছে হয় অন্য মতি॥' ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন। হেন প্রাণ নাহি কারো—করিব কথন॥ ২।১৬।৩২-৩৬॥"

এই কয় পয়ারে গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জানাইলেন, দাস্যভাব বা ভক্তভাবই প্রভুর একান্ত হার্দ; কোনও কারণে কখনও দাস্যভাবের কিছু ব্যতিক্রম হইলেই প্রভু প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইতেন। ঈশ্বর-ভাব বা ঐশ্বর্যের প্রকটন হইতেছে দাস্যভাবের বিরোধী। ঈশ্বর-ভাবকে প্রভু "উপাধিক (ঔপাধিক) চাঞ্চল্য" মনে করিতেন। যাহা স্বরূপগত নহে, পরন্তু আগন্তুক, তাহাকেই উপাধিক (ঔপাধিক) বলা হয় (২।৩।১৬৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। দাস্যভাব বা ভক্তভাবই প্রভুর স্বরূপগত বলিয়া এবং ঈশ্বর-ভাব তাহার প্রতিকূল বলিয়া প্রভু ঈশ্বর-ভাবকে উপাধিক বলিতেন এবং ঈশ্বর-ভাবের প্রকটনকে তাঁহার চাঞ্চল্যও বলিতেন। সেজন্য প্রভু কখনও ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইলে, অর্থাৎ লীলাশক্তি কখনও তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকটিত করিলে, ঈশ্বর-ভাব তিরোহিত হইয়া গেলে তিনি ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"আমি কি কোনও উপাধিক চাঞ্চল্য করিয়াছি? তোমরা আমার জন্মে-জন্মের বান্ধব। যদি দাস্যভাব ত্যাগ করিয়া উপাধিক কিছু কখনও করি, তোমরা আমাকে জানাইয়া দিবে। কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত হইলে প্রাণ রাখার সার্থকতা কিছু নাই। কৃষ্ণদাস্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি জানিতে পারিলে আমি তৎক্ষণাৎই প্রাণত্যাগ করিব।" প্রভুর কথা শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না; যেহেতু, তাঁহারা তো দেখিয়াছেন, প্রভু ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন। সে-কথা বলিলে প্রভু না জানি প্রাণত্যাগ করিতেই উদ্যত হয়েন।

বৃন্দাবনদাস এক দিনের বিশেষ বিবরণও দিয়াছেন। ঈশ্বর-ভাবের আবেশে প্রভু একদিন বলিয়াছিলেন—"সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার। ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার॥ বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে। মোর ভক্তস্থানে যার আছে অপরাধে॥ সে অধম সভারে না দিমু প্রেমযোগ। নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥' শুনিঞা আনন্দে ভাসে সব ভক্তগণ। ক্ষণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥ 'কি চাঞ্চল্য করিলাঙ?' প্রভু জিজ্ঞাসয়ে। ভক্তসব বোলে—'কিছু উপাধিক নহে॥' সভারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন। 'অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ'॥ ২।৫।৫০-৫৫॥"

এ-স্থলে প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্তগণ যখন বলিলেন—"উপাধিক কিছু নহে", তখন প্রভু মনে করিলেন, দাস্যভাব ছাড়া অন্য কোনও ভাব তিনি প্রকাশ করেন নাই। এজন্য তিনি পরমানন্দে ভক্তদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, ঈশ্বর-ভাবে প্রভু যাহা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও স্মৃতি তাঁহার ছিল না। তবে কিছু যেন করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা তাঁহার ছিল। অস্পষ্ট ধারণা বলিয়াই তিনি ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে এ-স্থলে যে-দুইটি বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম বিবরণে দৃষ্ট হয়, "খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব" অর্থাৎ ঈশ্বর-ভাবের আবেশ তিরোহিত হইয়া যাওয়ার পরেই, অর্থাৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেই, প্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তিনি "উপাধিক চাঞ্চল্য" করিয়াছেন কিনা। দ্বিতীয় বিবরণ হইতে জানা যায়, "ক্ষণেকে সুস্থির" হইয়া, অর্থাৎ বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াই প্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম ?" উভয় স্থলেই বাহ্যদশা-প্রাপ্তির পরে জিজ্ঞাসা। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু যে ঈশ্বর-ভাব বা ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও স্মৃতিই তাঁহার ছিল না ; তবে কিছু একটা যেন করিয়াছেন—এইরূপ একটা অস্পষ্ট ধারণা তাঁহার ছিল। অস্পষ্ট ধারণাই বা কেন ?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লীলাশক্তিই প্রভুর ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া থাকেন, জ্ঞাতসারে প্রভু কখনও নিজে ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন না। সে-জন্যই ঐশ্বর্য-প্রকাশের কথাও তিনি জানিতে পারেন না। বাহ্যদশায়, কিছু একটা করিয়াছেন বলিয়া যে প্রভুর অস্পষ্ট ধারণা, তাহাও লীলাশক্তিরই কার্য। প্রভু স্বরূপতঃ যে ভক্তভাবময়, সমুজ্জ্বলরূপে তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই লীলাশক্তি প্রভুর মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা জাগাইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই স্বরূপতঃ ভক্তভাবময় প্রভু ভক্তগণের নিকটে তাঁহার চাঞ্চল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল, প্রভু নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনও ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন না। প্রভুর মধ্যে কোনও ইচ্ছা জাগ্রত হইলে, কখনও কখনও ইচ্ছা জাগ্রত না হইলেও, লীলার অনুরোধে, প্রভুর লীলাশক্তিই ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া থাকেন। ইহাতে ইহাও জানা যায় যে, প্রভুর ইচ্ছা-পূরণের নিমিত্ত যদি ঐশ্বর্য-প্রকটনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেই লীলাশক্তি ঐশ্বর্য প্রকটিত করেন। আর, প্রভুর কোনও ইচ্ছা জাগ্রত না হইলেও, ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশের নিমিত্ত, কিংবা লোকশিক্ষার নিমিত্ত, অথবা জগৎ-সম্বন্ধে প্রভুর অবতরণের কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্তও, প্রয়োজন-বোধে লীলাশক্তি যথাযথভাবে প্রভুর ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া থাকেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতেও প্রভুর লীলাশক্তির এতাদৃশ প্রভাবের কথা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—নীলাচলে রথের অগ্রভাগে, প্রভু—"কভু একমূর্ত্তি হয়—কভু বহুমূর্ত্তি। কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥ লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান। ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥ পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈল বৃন্দাবনে। অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥ চৈ. চ. ২।১৩।৬৩-৬৫॥"

কবিরাজ-গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—একদিন প্রভু গৌড়ীয় ভক্তদের সহিত নীলাচলে জগন্নাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিলেন। "বেঢ়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কথোক্ষণ। মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥ চারিদিগে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়। মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায়॥ বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা। চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা॥ অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়। আর সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়॥ আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর। শ্রীবাস নাচেন আর সম্প্রদায়-ভিতর॥ মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন। তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন॥ চারি দিকে নৃত্যগীত করে যত জন। সভে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন॥ চারি-জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে

অভিলাষ। সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥ দর্শনে আবেশ তাঁর, দেখিমাত্র জানে। কেমতে চৌদিকে দেখে, ইহা নাহি জানে ॥ পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে। চৌদিগের সখা কহে—চাহে আমাপানে ॥ চৈ. চ. ২।১১।২০৭-১৬ ॥" একই সময়ে চারি জনের নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত প্রভুর অভিলাষের কথা জানিয়া লীলাশক্তিই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন ; অথচ লীলাশক্তির এই প্রভাবের কথা প্রভু জানিতে পারেন নাই। প্রভু "কেমতে চৌদিকে দেখে, ইহা নাহি জানে ॥"

ঘ। **ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি-বিষয়ে ব্রজপরিকর এবং নবদ্বীপ-পরিকরদের পার্থক্য।** আনুসঙ্গিকভাবে, এ-স্থলে ব্রজপরিকর এবং নবদ্বীপ-পরিকরদের ঐশ্বর্য্যের অনুভব-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দেখিলেও তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলিয়া মনে করেন না, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা কখনও ভগবান্ বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই সেই পরিকরদের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন এবং যখন লীলাশক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকটিত করেন, তখন তাঁহার পরিকরগণ সেই ঐশ্বর্যকে তাঁহার ঐশ্বর্য বলিয়াই অনুভব করেন, তাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ও মনে করেন এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে, নানাবিধ উপচারে তাঁহার অর্চনাদিও করেন এবং স্তব-স্তুতিও করিয়া থাকেন। প্রভুর মহাপ্রকাশাদিতেই তাহা দৃষ্ট হয়। ইহার হেতু কি?

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ হইতেই ইহার হেতু পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু নবদ্বীপবাসী ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বলিতেন, "তোমাসভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই। ২।২।৪৩ ॥" এবং "এত বলি কারো পায়ে ধরে সেই ঠাঞি ॥ নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে। ধূতিবস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে ॥ ২।২।৪৩-৪৪ ॥" এ-সমস্ত বলিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে। বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥ সাজি বহে, ধুতি বহে, লজ্জা নাহি করে। ২।২।৫৬-৫৭ ॥" কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে বৈষ্ণবের সেবা আবশ্যক, প্রভু নিজে আচরণ করিয়া তাহা জীবগণকে জানাইয়াছেন।

প্রভু নিজে তুলসী-সেবা ও গোবিন্দ-পূজা করিতেন। "স্নান করি গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর। চলিলা পঢ়ুয়াবর্গ যথা যার ঘর ॥ বস্ত্র পরিবর্ত করি ধুইলা চরণ। তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥ যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন। আসিয়া বসিলা প্রভু করিতে ভোজন ॥ ২।১।১৮৩-৮৫ ॥" প্রভু নিজেই শ্রীগোবিন্দ। তাঁহার নিজের জন্য গোবিন্দ-পূজনের কোনও প্রয়োজনই নাই। তাঁহার ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানও কেবল জীবশিক্ষার নিমিত্তই।

এইরূপে দেখা গেল, নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে ভজনশিক্ষা দেওয়াই প্রভুর উদ্দেশ্য এবং ইহা তাঁহার অবতরণের জগৎ-সম্বন্ধীয় একটি হেতুও। তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল।

কবিরাজ-গোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণের মুখে উল্লিখিতরূপ কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। "চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥ চৈ. চ. ১।৩।১২-১৫ ॥

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। চৈ. চ. ১।৩।১৭-১৯॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥ চৈ. চ. ১।৩।২০-২১॥"

ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার পরিকরগণও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনুকূল্য করিয়া থাকেন। প্রভু নিজেও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার পরিকরগণের দ্বারাও করাইয়াছেন এবং এইরূপেই তিনি জীবকে ভজন শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং"-শ্লোক হইতে জানা যায়, প্রভুই বর্তমান কলির উপাস্য (১।২।৫-৬ শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার কথা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—সুতরাং উপাস্য, সে-কথাও (পরবর্তী ৫১ক-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য), বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পরমার্থভূত-বস্তু-লাভের নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনাও আবশ্যক। কিন্তু প্রভু ভক্তভাবময় বলিয়া নিজের উপাসনার উপদেশ দিতে পারেন না, ভক্তগণের দ্বারাই তাহা করাইতে হইবে। ভক্তগণও নিজেদের আচরণের দ্বারাই জীবকে গৌরের উপাসনা শিক্ষা দিবেন। তাঁহারা যদি গৌরের ঐশ্বর্য বা ভগবত্তা উপলব্ধি না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌরের অর্চনা-স্তবাদি সম্ভব নয়, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা জগতের জীবকে গৌর-ভজনের আদর্শ প্রদর্শনও সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্তই লীলাশক্তি গৌর-পরিকরদের মধ্যে গৌরের ঐশ্বর্যের বা ভগবত্তার উপলব্ধি জন্মাইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তভাবময় নহেন। সুতরাং ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেজন্য নিজের আচরণের দ্বারা জীবকে ভজনশিক্ষা দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং তাঁহার পরিকরবৃন্দের দ্বারা ভজনাদর্শ-প্রদর্শনের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। এ-জন্যই লীলাশক্তির পক্ষে, ব্রজপরিকরদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের বা ভগবত্তার উপলব্ধি উৎপাদনের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

৪১। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথ, নারায়ণ, বৈকুণ্ঠ-নায়ক ইত্যাদি উক্তি

পূর্ববর্তী ২১-২৭-অনুচ্ছেদের উক্তি এবং আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। আবার, পূর্ববর্তী ২৯-৩৭-অনুচ্ছেদের উক্তি এবং আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বই কথিত হইয়াছে।

তথাপি কিন্তু ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অনেক স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গকে নারায়ণ, বৈকুণ্ঠনাথ, বৈকুণ্ঠ-নায়ক ইত্যাদিও বলিয়াছেন। এইরূপ কয়েকটি স্থল নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

নারায়ণ॥ ১।৭।১৫৫, ১।৭।১৫৯, ১।১২।১০৬, ২।১৮।২২২

বৈকুণ্ঠনাথ॥ ১।৭।৪, ১।১০।১৫৮, ১।১২।৪, ১।১২।১৩০, ২।২৩।২৯৬

বৈকুণ্ঠের চূড়ামনি॥ ১।৮।২৮০, ২।৭।৭৫

বৈকুণ্ঠ-নায়ক॥ ১।৭।১৮১, ১।১০।১৪৬, ১।১০।১৮৩, ১।১০।২১২, ১।১১।৫, ২।১।৩০০, ২।২৩।৪, ২।২৩।৩২৫, ২।২৩।২৬৭, ২।২৫।৭১

বৈকুণ্ঠের পতি ॥ ১।১০।৯৭, ১।১২।১২৫

বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ ১।১২।১৭, ২।১৬।১৩২, ২।২৩।২৮৯, ২।২৬।৮৯, ৩।১।২

বৈকুণ্ঠের নাথ ॥ ১।১০।৯১, ২।৮।৩২৫

বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥ ২।৯।৩৪, ২।৯।১২১

বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ২।২৩।২৩৬, ২।২৩।২৬৪

লক্ষ্মীকান্ত ॥ ১।১।১, ৩।১।১

লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ১।১০।২৭, ১।১০।৪৭, ১।১০।৩৯০, ১।১০।৩৯৪

উপরে যে-নামগুলি উল্লিখিত হইল, যথাশ্রুত বা রূঢ়ি অর্থে এই সমস্ত নামেই পরব্যোমাধিপতি বা বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণকে বুঝায়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বৃন্দাবনদাস বহুস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাদি-সম্বন্ধে তিনি যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বই কথিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে শ্রীগৌরাঙ্গকে বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ঐ সমস্ত নামেও যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোনও কোনও স্থলে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপই তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপের নাম—নারায়ণ। আবার, স্বয়ংভগবান্ নন্দ-যশোদা-তনয়ের একটি নামও নারায়ণ। উদ্ধব নন্দ-যশোদা-তনয়কে "নারায়ণ" বলিয়াছেন। নন্দ-যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী॥ ভা. ১০।৪৬।৩০॥" ব্রহ্মস্তবের "নারায়ণস্ত্বং ন হি"—ইত্যাদি ভা. ১০।১৪।১৪-শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকেই মূলনারায়ণ বলিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তি (অংশরূপ মূর্ত্তি) বলিয়াছেন (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মূলনারায়ণ, বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। শ্রীগৌরাঙ্গকে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও, যে-যে স্থলে বৃন্দাবনদাস তাঁহাকে "নারায়ণ" বলিয়াছেন, সে-সে স্থলে নারায়ণ-শব্দে মূলনারায়ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার অভিপ্রেত। যেহেতু, যে-শ্রীগৌরাঙ্গকে তিনি "নারায়ণ" বলিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গই যে অনন্ত ভগবৎস্বরূপের আশ্রয়, গৌরের ঐশ্বর্য-কথন-প্রসঙ্গে তিনি তাহা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া গিয়াছেন। বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণের মধ্যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ থাকিতে পারেন না।

বৃন্দাবনদাস যে-যে স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গকে বৈকুণ্ঠনাথাদি বলিয়াছেন, সে-সে স্থলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, যে তাঁহার অভিপ্রেত, "বৈকুণ্ঠ"-শব্দের অর্থ-বিচার করিলেও তাহা জানা যায়। বৈকুণ্ঠ-শব্দে মায়াতীত ভগবদ্ধামকে এবং মায়াতীত ভগবৎস্বরূপকেও বুঝায় (১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বৈকুণ্ঠের নায়ক, বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর প্রভৃতি শব্দে সমস্ত ভগবদ্ধামের অধীশ্বরকেও বুঝাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসও প্রভুকে "সর্ব্ববৈকুণ্ঠাদিনাথ" বলিয়া গিয়াছেন। "ভক্তগণসঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে। সর্ব্ববৈকুণ্ঠাদিনাথ কীর্ত্তনে বিহরে॥ বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে। বিহরেন প্রভু ভক্তি-আনন্দ-সাগরে॥ ৩।৩।২৫৪-৫৫॥" যিনি "ভক্তি-আনন্দ-সাগরে বিহার" করেন, তিনি যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, পূর্ব-প্রদত্ত বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায় এবং তাঁহাকেই বৃন্দাবনদাস "সর্ব্ববৈকুণ্ঠাদিনাথ" বলিয়াছেন। তিনি কখনও বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপ হইতে

পারেন না; কেননা বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও নহেন, এবং শ্রীরাধার সহিত তাঁহার মিলিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না। আবার, "বৈকুণ্ঠের নাথ-আদি" শব্দে সর্ব-ভগবৎস্বরূপের অধীশ্বর বা মূলকেও বুঝাইতে পারে। সর্বভগবৎ-স্বরূপের মূল হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ। বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপ সর্বভগবৎ-স্বরূপের মূল হইতে পারেন না।

যে-যে প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গকে "বৈকুণ্ঠনাথ-আদি" বলিয়াছেন, সেই সেই প্রসঙ্গের আলোচনাতেও উল্লিখিতরূপ তাৎপর্যই অবগত হওয়া যায়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

দৈববাণীর বাক্যে বৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে। অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিবা কীর্তন। জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি ধন॥ ১।১২।১৩০-৩১॥" জগৎকে "প্রেমভক্তিধন বিলাইয়া দেওয়া", রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপেরই কার্য, "শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথের"—বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপের—কার্য হইতে পারে না।

বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, নগরে নগরে সর্বলোকের মুখে অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি "শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর। সন্তোষে পূর্ণিত সব হয় কলেবর॥ ২।২৩।২৯৬॥" এ-স্থলে প্রভুকে "বৈকুণ্ঠনাথ" বলা হইয়াছে। আবার এই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে, এই "বৈকুণ্ঠনাথের" দর্শনেই "অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নগরিয়া নদীয়ার। কৃষ্ণ-রস-উন্মাদ হৈল সভাকার॥ ২।২৩।৩১২॥" যে-বৈকুণ্ঠনাথের দর্শনে "অর্বুদ অর্বুদ নগরিয়া কৃষ্ণ-রস-উন্মাদ বা প্রেমোন্মত্ত" হইয়াছিলেন, তিনি অনন্তবৈকুণ্ঠের অধিপতি এবং শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণই, তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপ হইতে পারেন না।

প্রভু যখন ঈশ্বরাবেশে বিষ্ণুখট্টার উপরে বসিয়াছিলেন, তখন "দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে। পূজা করি সভে স্তব লাগিলা করিতে॥ ২।৯।৫০॥" স্তব-কালে অন্য কথার সঙ্গে ভক্তগণ বলিয়াছেন—"জয় জয় পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন॥ ২।৯।৬০॥" সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে—"পরম-প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি। ২।৯।৭৫॥" দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে যাঁহার পূজা এবং যিনি "পূতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন", তিনি যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহাকেই এ-স্থলে "বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি" বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপকে নহে। "বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি"—সমস্ত ভগবদ্ধামের, অথবা সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের চূড়ামণি, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

তপন মিশ্রের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইলা ব্রাহ্মণ॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন। পরানন্দ সুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন॥ ১।১০।১৪৫-৪৬॥" যাঁহার আলিঙ্গন-প্রাপ্তিমাত্রে তপন মিশ্র "প্রেমে পুলকিত অঙ্গ" হইয়াছেন, সেই বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপই, তিনি বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপ হইতে পারেন না।

রত্নগর্ভ আচার্যের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"দেখিয়া তাঁহার ভক্তিযোগের পঠন। তুষ্ট হইয়া প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন॥ পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গনে। প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হৈলা সেই ক্ষণে॥ ২।১।২৯৯-৩০০॥" যাঁহার আলিঙ্গন-প্রাপ্তিমাত্রে রত্নগর্ভ "প্রেমে পূর্ণ" হইলেন, সেই বৈকুণ্ঠ-নায়ক রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপই, বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ-স্বরূপ হইতে পারেন না। বৈকুণ্ঠ-নায়ক—সমস্ত ভগবদ্ধামের এবং সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নায়ক, স্বয়ংভগবান্।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর। তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥ ২।১৬।১৩২॥" এই প্রসঙ্গে শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভুর উক্তি।—"প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার। জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার॥ ২।১৬।১৩৫॥" "প্রেমভক্তি বিলাইতে" যে-"বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে"র অবতার, তিনি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপই, তিনি বৈকুণ্ঠের চতুর্ভুজ-স্বরূপ হইতে পারেন না।

"প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নাথ সে বিহরে॥ ২।৮।৩২৫॥" রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের পক্ষেই "প্রেমরসে" বিহার সম্ভব, বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ স্বরূপের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং এ-স্থলেও রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপকেই "বৈকুণ্ঠের নাথ" বলা হইয়াছে।

অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ অনাবশ্যক।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল, বৈকুণ্ঠনাথাদি-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোনও কোনও স্থলে শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অভিপ্রেত, বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণ তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

বৃন্দাবনদাস কোনও কোনও স্থলে মহাপ্রভুকে ত্রিদশের রায়ও বলিয়াছেন।

নবদ্বীপে প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ-কালে অদ্বৈত-মিলন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়। উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥ 'নাঢ়া আইসে, নাঢ়া আইসে' বোলে বারে বারে। নাঢ়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে॥' ২।৬।৬১-৬২॥ জানিঞাও নাঢ়া মোরে চালয়ে সদায়॥ এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে। মোরে পরীক্ষিতে নাঢ়া পাঠাইল তোরে (রামাঞি পণ্ডিতেরে)॥ আন গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহারে। প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥ ২।৬।৬৭-৬৯॥" রামাঞির মুখে প্রভুর আদেশ জানিয়া সস্ত্রীক অদ্বৈত প্রভুর নিকটে আসিলেন। "আইলা নির্ভয় পদ, হইলা সম্মুখে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে॥ ২।৬।৭৩॥" শ্রীঅদ্বৈত "নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে" যে-"অপরূপ বেশ" দেখিলেন, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণেরই এক অদ্ভুত রূপ (২।৬।৭৪-৮৫ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

যিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখাইলেন, তিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ হইতে পারেন না। তাঁহাকেই এ-স্থলে "ত্রিদশের রায়" বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ "ত্রিদশের রায়"-শব্দে স্বয়ংভগবান্‌কেই বুঝায় (১।৪।৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও "ত্রিদশের রায়"-শব্দটি দৃষ্ট হয়। "মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়। না পারি রাখিতে চিত্ত তোমায় মিশায়॥ ২।১৮।৮০॥" এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণকেই "ত্রিদশের রায়" বলা হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোনও কোনও স্থলে মহাপ্রভুর মুখে প্রভুকে ক্ষীরোদশায়ীও বলিয়াছেন। যেমন, ঈশ্বর-ভাবে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বলিয়াছেন—"শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে। নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥ ২।৬।৯৪॥" প্রভুর মধ্যে যে-ক্ষীরোদশায়ী বিরাজিত, সেই ক্ষীরোদশায়ীর বাক্যই এ-স্থলে লীলাশক্তি প্রভুর মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন (২।৬।৯৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্যত্রও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

ইহাদ্বারা প্রভুর স্বয়ংভগবত্তাই খ্যাপিত হইয়াছে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—যে-যে স্থলে বৃন্দাবনদাস মহাপ্রভুকে

বৈকুণ্ঠনাথাদি, কি ত্রিদশের রায়, অথবা ক্ষীরোদশায়ীও, বলিয়াছেন, সেই সেই স্থলে প্রভুর কৃষ্ণস্বরূপত্ব, কোনও কোনও স্থলে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বই, তাঁহার অভিপ্রেত, অন্য কিছু তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহার গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সর্বত্রই বৃন্দাবনদাস গৌরসম্বন্ধে এই তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

৪২। শ্রীগৌরাঙ্গকর্তৃক অসুর-সংহারের রহস্য

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতরণের হেতু-কথন-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গীতার (৪।৭, ৮ এই) দুইটি শ্লোক এবং ভাগবতের (১১।৫।৩১,৩২—এই দুইটি) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (১।২।৩-৬-শ্লোক)। গীতা-শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায়—যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আর, ভাগবত-শ্লোকদ্বয় হইতে জানা যায়, বর্তমান কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ-নাম-গুণাদি কীর্তন করেন এবং তাঁহার অঙ্গ-উপাঙ্গও অস্ত্র এবং পার্ষদের কার্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ। মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিদ্বয়ে এই "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ"-বাক্যের তাৎপর্য এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার (শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষের, দর্শনেই যে-কোনও লোক, এমন কি অসুর-পর্যন্তও, পূর্বসঞ্চিত পাপ-পুণ্যরূপ কর্মফল হইতে সম্যক্‌রূপে বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ করেন। শ্রুতিকথিত এই রুক্মবর্ণ পুরুষই ভাগবত-কথিত সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-স্বরূপ এবং তিনিই হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ (১।২।৫-৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া কংসাদি অসুরগণের এবং কংস-চর পূতনা-বক-অঘাসুরাদির প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন এবং দ্বাপরের যুগধর্মও প্রচার করিয়াছেন। অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের অধিকারিণী পরমকরুণাময়ী শ্রীরাধা কাহারও প্রাণ বিনাশ করেন নাই, সকল জীবকে প্রেমদান করিয়া তাঁহার করুণা প্রকাশ করিতে পারিলেই তাঁহার পরমানন্দ হইত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই শ্রীরাধার মিলিত-স্বরূপ। অসুর-প্রকৃতি জগাই-মাধাইর প্রাণ-বিনাশের নিমিত্ত তিনি তাঁহার চক্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এ-স্থলে বোধ হয় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্বই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি জগাই-মাধাইর প্রাণ বিনাশ করেন নাই, তাঁহাদের অসুরত্ব বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেম দান করিয়াছেন। এ-স্থলে বোধ হয় তাঁহার—শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ-স্বরূপত্ব এবং ভাগবত-কথিত সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-স্বরূপত্ব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ মিলিত-স্বরূপত্ব—প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপে জানা গেল—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ অসুরের প্রাণ বিনাশ করেন নাই, পরন্তু অসুরের অসুরত্ব বিনাশ করিয়া তাঁহাকে প্রেমদান করিয়াছেন। ইহাই হইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গ-কর্তৃক অসুর-বিনাশের রহস্য—অসুরের প্রাণ-বিনাশ নহে, পরন্তু অসুরত্ব-বিনাশ এবং প্রেমদান। যাঁহার অসুরত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, তিনি আর অসুর থাকেন না।

এজন্য পদকর্তাও বলিয়াছেন—"রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে, অসুরেরে করিলে সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিলে, প্রাণে কারে না মারিলে, চিত্তশুদ্ধি করিলে সভার।" যাঁহার দর্শনেই অসুরের অসুরত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে অসুরের প্রাণ-বিনাশের প্রশ্নও উঠিতে পারে না, অসুর-সংহারের জন্য অস্ত্র-ধারণের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

৪৩। উপসংহার—শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌরতত্ত্ব

পূর্ববর্তী ২০-৪২-অনুচ্ছেদসমূহের উক্তি এবং আলোচনা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম হইতেছে এইরূপ ঃ—

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নহেন, তিনি হইতেছেন, একই বিগ্রহে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাব এবং নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্ব—অসুরেরও প্রাণ বিনাশ না করিয়া, অসুরত্ব-বিনাশ-পূর্বক অসুরকেও প্রেমদাতৃত্ব। কলির যুগধর্ম নাম-সঙ্কীর্তনের প্রচার এবং নির্বিচারে যাহাকে-তাহাকে প্রেম বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্তই এবং নিজের আচরণের দ্বারা পারমার্থিক ভজন-শিক্ষাদানের নিমিত্তই, সপার্ষদে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অবতরণ।

৪৪। গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবনদাসের উক্তির ঐক্য

শ্রীলমুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহা কথিত হইতেছে। কড়চার বিভিন্ন স্থানে, তিনি গৌরকে বিভিন্ন ভগবদ্‌বাচক নামে অভিহিত করিয়াছেন। সমস্ত উক্তির উল্লেখ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কয়েকটি শ্লোকের পরিচায়ক অঙ্ক এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে এবং কোন্ কোন্ শ্লোকে কি কি ভগবদ্‌বাচক নামে গৌরকে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে।

অখিলেশ্বর ॥ ২।৮।২৬

অচ্যুত ॥ ১।১৫।৬

অজ ॥ ২।১০।১৩

ঈশ্বর ॥ ২।৫।২০

জগৎপতি, জগদাদি, বিভু ॥ ১।১।২

জগদীশ্বর ॥ ২।৬।২৫

জনার্দন (নন্দগেহ-কুতূহল-প্রদর্শক) ॥ ১।৬।৮

জগদ্‌যোনি, অজ, স্বয়ংপ্রভু ॥ ১।২।১১

মধুসূদন ॥ ২।৮।২

ভগবান্ ॥ ১।১৩।২৯, ১।১৩।৩০, ১।১৪।১০, ১।১৪।১৭, ২।২।২১, ২।২।২৫, ২।৪।২১, ২।৫।৩১, ২।৬।২, ২।৬।১৪, ২।৬।১৮, ২।৭।১৯, ৪।২।১০

অনাদি ভগবান্ ॥ ২।১০।৬

স্বয়ংভগবান্ ॥ ১।১২।১৯, ২।১৮।১০

স্বয়ংভগবান্, স্বাত্মতন্ত্র, জগতের পরম কারণ ॥ ২।১৩।৫

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১।৭।২৫, ১।১৪।১, ২।১।৮, ২।১৮।১৪

দ্বাপরে মৃদ্‌ভাণ্ড-ভঞ্জনের জন্য যশোদাকর্তৃক বন্ধনপ্রাপ্ত কৃষ্ণ ॥ ১।৬।১২

নবীন কৃষ্ণ ॥ ২।৯।২

বনমালী কৃষ্ণ ॥ ২।১০।১৪

রাধিকা-প্রাণনাথ ॥ ৪।৮।৬

শ্রীহরি বা হরি ॥ ১।১।৩, ১।১।৪, ১।১০।২৬, ১।১১।১৪, ১।১২।১৮, ১।১৪।৬, ১।১৫।১, ১।১৫।২, ১।১৫।১৮, ১।১৬।৫, ১।১৬।২০, ২।১।৮, ২।২।১, ২।২।১১, ২।৪।৩৫, ২।১০।৫, ২।১০।১০, ২।১৮।২৫

স্বয়ংহরি ॥ ১।৮।১৫, ১।১০।১৭, ২।১৪।৩

নন্দকিশোর ॥ ৪।২।১১

এই বিবরণ হইতে জানা গেল—মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চার সর্বত্রই শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা এবং নন্দ-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে রাধিকা-প্রাণনাথও বলিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে নানাবিধ অবতারের (ভগবৎ-স্বরূপের) অনুকরণ (নিজের মধ্যে প্রকটন) করিয়াছেন, তাহাও মুরারি গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন (১।১৬।১৩) এবং শ্রীগৌরাঙ্গকর্তৃক স্বীয় দেহে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রকটনের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। যথা, নৃসিংহরূপের প্রকটন (২।১১।৮), শিবরূপ-প্রকটন (২।১১।১৩-১৭), বলদেবরূপ-প্রকটন (২।১৪।১-১৫), কৃষ্ণরূপ-প্রকটন (২।১১।৩-৪), ইত্যাদি। ইহাতেও শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ংভগবত্তা বা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপত্বই খ্যাপিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাসও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণস্বরূপত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২১-২৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তভাবের কথাও বলিয়া গিয়াছেন (১।১৬।১২-১৩, ২।১।১৯-৩০, ২।২।১-৪ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবিহ্বলতার কথা এবং অশ্রু-আদি সাত্ত্বিকভাবের কথাও মুরারি গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন (২।১।১০, ২।১।১৯-২০, ২।২।৫-৭, ২।৩।২৪—ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রেমরসামৃতাব্ধিও বলিয়াছেন (২।৩।২)। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে গোপাঙ্গনাভাব-বিভাবিত কৃষ্ণ (২।১০।১৫), গোপীভাব-বিভাবিত কৃষ্ণ (২।১৫।৭), রাধিকা-রস-বিনোদ (৩।১৫।১৮), রাধাভাবাপন্ন মাধুর্য-রস-লম্পট (৩।১৫।২৩), গোপাঙ্গনাভাব-বিভাবিত শ্রীনন্দপুত্র (৩।১।১৮), রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু (৩।১।১৮), রাধামাধবয়োরৈক্যাৎ তত্তদ্‌ভাববিভাবিত (৪।৮।১০) ইত্যাদিও বলিয়াছেন। এ-সমস্ত বিবরণ হইতে জানা গেল—মুরারি গুপ্তের কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল শ্রীকৃষ্ণই নহেন, পরন্তু একই দেহে শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ এবং সেজন্যই তাঁহার ভক্তভাব, গোপীভাব, রাধাভাব এবং প্রেমবিহ্বলতাদি।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও এ-সমস্ত কথাই বলিয়া গিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২৮-৩১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতরণের হেতুসম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় বলিয়াছেন—প্রেমভক্তি-বিতরণ এবং কীর্তন-প্রচারের জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন (২।২।৯), তিনি ধর্মীদিগের যুগধর্মাচরণের নিমিত্ত হরিনাম-সঙ্কীর্তনের উপদেশ করিয়াছেন (১।১।৪-৫), ত্রিজগৎকে হরিসঙ্কীর্তন-পরায়ণ করিয়াছেন (১।২।২২), নিজে ভজন করিয়া জনগণকে ভজনশিক্ষা দিয়াছেন (১।২।১৩), বৃন্দাবন-মাধুর্য স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকেও আস্বাদন করাইয়াছেন (১।২।১৩)।

সঙ্কীর্তনারম্ভে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যে কীর্তন প্রচার এবং সকলকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন, নিজে আচরণ করিয়া যে জীবগণকে ভজনশিক্ষা করাইয়াছেন, সর্বত্র যে হরিনাম-সঙ্কীর্তন প্রচার করিয়াছেন—ইত্যাদি কথা বৃন্দাবনদাসও বলিয়া গিয়াছেন।

মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন—শ্রীগৌরাঙ্গ কাহাকেও সংহার করেন নাই, পরন্তু অসুরদিগেরও চিত্ত-শোধন করিয়াছেন (২।৩।২১)। বৃন্দাবনদাসের কথিত বিবরণ হইতেও তাহাই জানা যায় (পূর্ববর্তী ৪২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্তের উক্তির সহিত বৃন্দাবনদাসের উক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান। সাক্ষাদ্‌ভাবে মহাপ্রভুর লীলাদি দর্শন করিয়া তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত যে অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কড়চায় তিনি তাহা প্রায়শঃ সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর বৃন্দাবনদাস প্রত্যক্ষদর্শীদের কথিত যে-বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তত্ত্ব-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই, পার্থক্য কেবল তত্ত্ব-কথনের প্রকারে—একজন সূত্রাকারে, অপর জন একটু বিস্তৃত আকারে, তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

৪৫। গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবনদাসের উক্তির ঐক্য

কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহা কথিত হইতেছে। কবিরাজ-গোস্বামী অতি বিস্তৃতভাবেই গৌর-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এ-স্থলে দিগ্‌দর্শনরূপে দু'য়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে।

"স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ-পরম মহত্ত্ব॥ 'নন্দসুত' বলি যারে ভাগবতে গাই। সে-ই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥ চৈ. চ. ১।২।৫-৬॥"

শ্রীগোবিন্দ-সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা, গীতা ও ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরিশেষে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, "সেইত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥ চৈ. চ. ১।২।১৮॥"

শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু—কৃষ্ণেরস্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্—তিন তাঁর রূপ॥ চৈ. চ. ১।২।৫৩॥" তাহার পরে বলা হইয়াছে—"সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥ চৈ. চ. ১।২।৯১॥ চৈতন্যগোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥ চৈ. চ. ১।২।১০২॥"

কবিরাজ-গোস্বামীর এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—স্বয়ংভগবান্, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন শ্রীচৈতন্য বা শ্রীগৌরাঙ্গ। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও যে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবিরাজ-গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন,—"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ॥ মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধা, কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি রাধাভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার। চৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৭॥"

একথাই কবিরাজ আরও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন—"রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে

বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্যগোসাঞি। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥ চৈ. চ. ১।৪।৪৯-৫০ ॥”

এ-সমস্ত উক্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী জানাইলেন—শ্রীচৈতন্য বা শ্রীগৌরাঙ্গ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নহেন, পরন্তু একই দেহে শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি হইতেও যে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের কথা জানা যায়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবিরাজ লিখিয়াছেন—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—“রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥ চৈ. চ. ১।৪।৫০ ॥” কোন্ রসের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত একই স্বরূপে মিলিত হইয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা বিস্তৃতভাবে বলিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. ১।৪।৫২-২২৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। সে-স্থলে বলা হইয়াছে, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাসনা অপূর্ণ থাকে—শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য কিরূপ এবং শ্রী মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে-সুখ অনুভব করেন, তাহাই বা কিরূপ—এই তিনটি বস্তু জানিবার নিমিত্ত তিনটি বাসনা। শ্রীকৃষ্ণের কথায় কবিরাজ বলিয়াছেন—“এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥ রাধাভাব অঙ্গীকরি—ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥ চৈ. চ. ১।৪।২২১-২৩ ॥” “বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥ চৈ. চ. ১।৪।২২১ ॥”—এই বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম ॥ “প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ চৈ. চ. ১।৪।৪৪ ॥” শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম নাই, থাকিতেও পারে না। তাহা আছে শ্রীকৃষ্ণের পরিকর ভক্তদের মধ্যে, তন্মধ্যে শ্রীরাধার মধ্যে তাহার পূর্ণতম বিকাশ। তাই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পূর্ণতম রূপে আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন প্রেমের বিষয়মাত্র, আর শ্রীরাধিকাদি প্রেমের আশ্রয়। আশ্রয়জাতীয় প্রেমই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করাইতে পারে, বিষয়জাতীয় প্রেম পারে না। শ্রীকৃষ্ণে বিষয়জাতীয় প্রেম বলিয়া, মাধুর্য-আস্বাদনের পক্ষে তাহা হইতেছে বিজাতীয় প্রেম বা বিজাতীয় ভাব। বস্তুতঃ স্বীয় মাধুর্যের আস্বাদনের বাসনাই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অপূর্ণ-বাসনা, অন্য বাসনাগুলি আনুষঙ্গিক। স্বীয় মাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে প্রয়োজন হইতেছে শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হওয়া। শ্রীরাধার প্রেমের আশ্রয় হইতে হইলে শ্রীরাধার সহিত একই স্বরূপে মিলন অপরিহার্য। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন।

স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁহার কড়চাতেও এ-সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥” এবং

“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥”

স্বরূপদামোদরের কড়চায় উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়কে অবলম্বন করিয়াই কবিরাজ-গোস্বামী পূর্বকথিত বিবরণ দিয়াছেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরু ব্রজের তৎকালীন শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীও উল্লিখিতরূপ তত্ত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্ব-কথন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীপাদরূপগোস্বামীর শ্রীচৈতন্যাষ্টক হইতে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাহা জানা যায়। শ্লোক দুইটি এই ঃ—

"সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা। বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ।। প্রথম চৈতন্যাষ্টক ।। ২ ।।"
এবং

"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে-দ্যুতিমিহ প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং-নঃ কৃপয়তু ।। দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টক ।। ৩ ।।"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুতে মহাপ্রভুর বহু দিব্যোন্মাদলীলার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই দাসগোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের খ্যাপন করিয়াছেন। যেহেতু, শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই দিব্যোন্মাদের প্রকাশ সম্ভব নহে।

মহাপ্রভু যে নিজেকে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ-রূপে প্রকটিত করিয়া রায় রামানন্দকে দেখাইয়াছিলেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. ২।৮।২২০-৪০ পয়ার দ্রষ্টব্য)। স্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারেই যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর এই লীলার বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. ২।৮।২৬৩)। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্ব-সম্বন্ধে স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোস্বামিগণের উক্তির সহিতও বৃন্দাবনদাসের বিবরণের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

কবিকর্ণপূরও শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্ত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাস্তনীড়ং রাধাকৃষ্ণাখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্। যস্যচ্ছায়া ভবাধ্ব-শ্রম-শমনকরী ভক্তসঙ্কল্পসিদ্ধের্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ ।। চৈ. চ. না. ।। ১।৭।।" এই বিষয়ে কর্ণপূরের সহিতও বৃন্দাবনদাসের ঐক্য বিদ্যমান।

যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গের অবতরণের হেতু-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"নাম প্রেম প্রচারিতে এই অবতার ।। চৈ. চ. ১।৪।৪ ।।" শ্রীকৃষ্ণ—"প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার। চৈ. চ. ১।৪।৮৬-৮৭ ।।" কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন—"এই মত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। * * দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ। আপনে আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন ।। সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ।। এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ।। চৈ. চ. ১।৪।৩৩-৩৭ ।।"

এই বিষয়েও কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির সহিত বৃন্দাবনদাসের উক্তির সম্যক্ ঐক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের নির্বিচার-প্রেমদাতৃত্বের কথাও কবিরাজ বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং"-শ্লোকের আলোচনা করিয়া কবিরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষ তাহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ।। জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে। অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ।। ভক্তির বিরোধী—কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার

'কল্মষ' নাম সেই মহাতম ॥ বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়। করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে। চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন ॥ চৈ. চ. ১।৩।৪৬-৫২ ॥"

এ-সমস্ত উক্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গের নির্বিচার-প্রেমদাতৃত্বের কথাই বলা হইয়াছে। যেহেতু, শ্রীগৌরাঙ্গ কেবল দর্শন-দানদ্বারাই, যে-কোনও লোকের, সমস্ত কল্মষ দূরীভূত করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রেম দান করিয়া থাকেন। এই বিষয়েও কবিরাজ-গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনদাসের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান (পূর্ববর্তী ৩৪, ৩৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—মহাপ্রভু "এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ চৈ. চ. ১।৪।৩৭ ॥" এ-স্থলে কবিরাজ মহাপ্রভুর ভক্তভাবের কথা বলিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসও তাহা বলিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কবিরাজ বলিয়াছেন, মহাপ্রভু "আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার।" বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত বিবরণ হইতেও তাহাই জানা যায় (৪০-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—গৌরতত্ত্ব ও গৌরের অবতরণের হেতু, গৌরের নির্বিচারে প্রেমদাতৃত্ব, গৌরের ভক্তভাব এবং নিজের আচরণের দ্বারা ভজনশিক্ষাদানাদি-সম্বন্ধে, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির সহিত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তির বা বিবরণের কোনও পার্থক্যই নাই, সর্বত্র সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

৪৬। বিরুদ্ধমত-সম্বন্ধে আলোচনা

ক। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয়-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের তৃতীয় বারের সম্পাদকীয় বক্তব্য। এই সম্পাদকীয় বক্তব্য হইতে জানা যায়, প্রভুপাদ চারিবৎসর যাবৎ অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার আদেশে শ্রীলসত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম. এ, বি. এল. মহাশয় এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ সংশোধনাদি করিয়াছেন। উল্লিখিত "সম্পাদকীয় বক্তব্য" বসুমহাশয়েরই লিখিত ; যেহেতু, উক্ত বক্তব্যের নিম্নে বসুমহাশয়ের নামই দৃষ্ট হয়। এই বক্তব্য প্রভুপাদের অনুমোদিত কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই।

এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের এক স্থলে বসুমহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীচৈতন্যভাগবত ও পরবর্তী লীলাগ্রন্থ ও তত্ত্বগ্রন্থ পড়িতে গেলে একটি ভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। শ্রীলকবিকর্ণপূর ও গোস্বামিগণ শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে একটি বিশেষ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সর্বাবতারের অবতারী শুদ্ধ মাধুর্যরস বিস্তারকারী শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কথা ঐ সকল গ্রন্থের কোথাও ইঙ্গিতে, কোথাও বা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। * * *। কিন্তু শ্রীলচৈতন্যভাগবতের কোথাও শ্রীচৈতন্যতত্ত্বে এই 'রাধাভাবদ্যুতি-সমন্বিতং নৌমি তং কৃষ্ণস্বরূপং' এই কবিতা বা ইহার অনুরূপ কোনও ভাবের কথা পাওয়া যায় না। * *। তবে ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস এ-তত্ত্ব কি জানিতেন না? আর যদি জানিতেন, তবে তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই কেন? আমাদের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যভাগবত বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বপ্রথম জীবনীগ্রন্থ। ইহার পূর্বে কথোপকথনের ভাষায় শিষ্টজনগণের পঠিতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। * * *। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সাহসপূর্বক শ্রীচৈতন্যলীলা কীর্তন করিলেও শ্রীবৃন্দাবনদাস লীলাসংক্রান্ত নিগূঢ় রহস্য

প্রকাশ করেন নাই। এজন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐশ্বর্যপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীনারায়ণের লীলাকাহিনীই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব বিশদ্‌ভাবে বর্ণনার যে-অভাব শ্রীলবৃন্দাবনদাস রাখিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীর সাক্ষাদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন।"

এ-স্থলে বসুমহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন, এইরূপ ধারণা অপর কেহও পোষণ করিতে পারেন মনে করিয়া, বিশেষতঃ প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয়ের সম্পাদিত গ্রন্থের "সম্পাদকীয় বক্তব্যে" এই কথাগুলি ব্যক্ত করা হইয়াছে বলিয়া, এ-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া, এ-স্থলে দু'চারিটি কথা বলা হইতেছে।

বসুমহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীলচৈতন্যভাগবতের কোথাও শ্রীচৈতন্যতত্ত্বে এই 'রাধাভাবদ্যুতিসমন্বিতং নৌমি তং কৃষ্ণস্বরূপং' এই কবিতা বা ইহার অনুরূপ কোনও ভাবের কথা পাওয়া যায় না।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। শ্রীগৌরাঙ্গ যে "রাধাভাব-দ্যুতিসমন্বিত কৃষ্ণস্বরূপ" বৃন্দাবনদাস ঠাকুর একথা স্পষ্টভাবে কোনও স্থলে বলেন নাই, ইহা সত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, একথাও বৃন্দাবনদাস স্পষ্টভাবে কোনও স্থলে বলেন নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার বর্ণনায় তিনি যে শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পূর্ববর্তী ২০-৪৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং "শ্রীচৈতন্যভাগবতে সাহসপূর্বক শ্রীচৈতন্যলীলা কীর্তন করিলেও শ্রীবৃন্দাবনদাস লীলাসংক্রান্ত নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করেন নাই"—বসুমহাশয়ের এই উক্তির সার্থকতা কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না এবং তাঁহার—"শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব বিশদ্‌ভাবে বর্ণনার যে-অভাব শ্রীলবৃন্দাবনদাস রাখিয়া গিয়াছেন, * * * শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন"—এই উক্তিরও কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। যেহেতু, গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন নাই, এমন কোনও তথ্য কবিরাজ-গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সন্ন্যাসের পূর্বপর্যন্ত প্রভুর রাধাভাবময়ী যে-সকল লীলা বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামী সে-সকল লীলার বিস্তৃত বর্ণন করেন নাই। সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের দিব্যোন্মাদ-লীলাদি কবিরাজ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন; এবং তাহাতে প্রলাপ-বাক্যের স্ফুরণও দেখাইয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনায় প্রলাপ বাক্যের উল্লেখ নাই। তাহার হেতু বোধ হয় এই যে, প্রলাপ হইতেছে দিব্যোন্মাদের কয়েকটি লক্ষণের মধ্যে একটি লক্ষণমাত্র। দিব্যোন্মাদময়ী সকল লীলাতে প্রলাপ থাকে না। কবিরাজ-গোস্বামী মহাপ্রভুর দীর্ঘাকৃতি-খর্বাকৃতি-ধারণরূপ যে-লীলার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রলাপের বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া তিনি বলেন নাই। প্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ববর্তীকালে যে-দিব্যোন্মাদলীলার কথা বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, সেই লীলাতে প্রলাপ-বাক্যের বিকাশ হয় নাই বলিয়াই তিনি তাহার কথা লিখেন নাই। প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলা উভয়েই বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণিত দিব্যোন্মাদ নূতন কথা নহে। প্রলাপবাক্যময়ী দিব্যোন্মাদলীলা দিব্যোন্মাদলীলার একটি বৈচিত্রী মাত্র। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-সম্বন্ধে কবিরাজ বলিয়াছেন—"লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। হেনভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-শিরোমণি॥ চৈ. চ. ৩।১৪।৭৬॥" প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীলবৃন্দাবনদাসও এইরূপ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন "যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে॥ চৈ. ভা. ২।৮।২১৯॥"

(পূর্ব্ববর্তী ৩৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা গেল, গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলেন নাই, এমন কোনও তথ্যই কবিরাজ-গোস্বামী প্রকাশ করেন নাই।

"শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব"-সম্বন্ধে "শ্রীলবৃন্দাবনদাস যে-অভাব রাখিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীর সাক্ষাদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী" যে "তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন", ইহা যে প্রকৃত ব্যাপার নহে, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। গৌর-তত্ত্ব-বিষয়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অভাব পূরণের জন্য বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ কবিরাজ-গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন—এ-কথা কবিরাজ বলেন নাই। তিনি বরং বলিয়াছেন "অরে মূঢ়লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল॥ চৈ. চ. ১।৮।২৯॥" শ্রীচৈতন্যের মহিমা-বর্ণনে বৃন্দাবনদাস যে কোনও অভাব রাখিয়া যায়েন নাই, কবিরাজের এই উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। একথা তিনি আরও বলিয়াছেন। "বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥ চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা॥ চৈ. চ. ১।৮।৩১-৩২॥" কবিরাজ-গোস্বামীর প্রতি বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের আদেশ-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার। (শ্রীলবৃন্দাবনদাস) বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥ বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন। সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥ নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥ সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥ চৈ. চ. ১।৮।৪২-৪৫॥ আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ। শেষলীলা শুনিতে সভার হৈল মন॥ মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া। তা-সভার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥ চৈ. চ. ১।৮।৬৬-৬৭॥"

কবিরাজ-গোস্বামীর এ-সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—গৌরের তত্ত্ব-প্রকাশ-বিষয়ে শ্রীলবৃন্দাবনদাস কোনও অভাবই রাখিয়া যায়েন নাই, গৌরের শেষলীলা-বর্ণনের অভাবই রাখিয়া গিয়াছেন এবং সেই শেষলীলা-বর্ণনের নিমিত্তই বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ কবিরাজ-গোস্বামীকে আদেশ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বসুমহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীনারায়ণের লীলাকাহিনীই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের কোন্ কোন্ স্থলে "ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীনারায়ণের লীলাকাহিনীই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে", বসুমহাশয় তাহার উল্লেখ করেন নাই। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলাকাহিনীই এবং তাঁহাদের তত্ত্বই তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্র বিশেষ-ভাবে প্রচার করিয়াছেন, "ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীনারায়ণের লীলাকাহিনী বিশেষভাবে প্রচার" করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ বলিয়াছেন এবং বিভিন্ন ভক্তের গৌর-স্তবে শ্রীগৌরাঙ্গেরই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের লীলা-কথার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, বিস্তৃত বর্ণনা করেন নাই। ইহা না করিলে গৌরের তত্ত্বই প্রকাশ পাইত না। আর, ভক্তগণের গৌর-স্তবে কোনও কোনও স্থলে অজামিল-উদ্ধারের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয় নাই। এইরূপ উল্লেখও করা হইয়াছে কেবল শ্রীগৌরাঙ্গেরই নারায়ন-স্বরূপের নামের মহিমা-প্রদর্শনের নিমিত্ত। ইহা না করিলেও শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব এবং মহিমা সম্যক্ প্রকাশ পাইত না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীনারায়ণের লীলাকাহিনী কোনও স্থলেই প্রচার করেন নাই।

মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশাদি লীলা-বর্ণনে শ্রীলবৃন্দাবনদাস গৌরের ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই ঐশ্বর্যও শ্রীগৌরাঙ্গেরই, অথবা শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যে-শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই, ঐশ্বর্য। তাহা শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য নহে; যেহেতু, শ্রীনারায়ণ স্বয়ংভগবান্ নহেন বলিয়া তাঁহার এতাদৃশ ঐশ্বর্য থাকিতে পারে না। শ্রীলবৃন্দাবনদাস যদি গৌরের এই ঐশ্বর্যের কথা না বলিতেন, তাহা হইলে গৌরের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্ব, স্বয়ংভগবত্তা এবং পরব্রহ্মত্বই প্রকাশ পাইত না। বৃন্দাবন-দাসের পূর্ববর্তী মুরারি গুপ্তও শ্রীগৌরাঙ্গের এতাদৃশ ঐশ্বর্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত গৌরের লীলায় প্রত্যক্ষভাবে যাহা দর্শন করিয়াছেন এবং দর্শন করিয়া যে-অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কড়চায় তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং বৃন্দাবনদাসও প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদের কথিত বিবরণ অনুসারে, তাহারই বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছে, মুরারি গুপ্ত এবং বৃন্দাবনদাস তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। এ-সমস্ত ঐশ্বর্যময়ী লীলাতে যে গৌরের স্বয়ংভগবত্তা, পরব্রহ্মত্ব এবং কৃষ্ণস্বরূপত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জানাইবার নিমিত্তই তাঁহারা এ-সমস্ত লীলার বর্ণনা দিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম, তখন পূর্ণতম ঐশ্বর্যও তাঁহাতে থাকিবে এবং লীলাশক্তির প্রভাবে, প্রয়োজন অনুসারে, সেই ঐশ্বর্য বিকশিতও হইবে। তাহা যে বিকশিত হইয়াছিল, মুরারি গুপ্ত এবং বৃন্দাবনদাস তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্বয়ংভগবানের সমস্ত লীলার, এমন কি শুদ্ধ-মাধুর্যময়ী লীলারও, ভিত্তি হইতেছে তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য। সর্বলীলা-মুকুট-মণি, পরম-শুদ্ধ-মাধুর্যময়ী রাসলীলা-বর্ণন-কালেও ব্যাসদেব এবং শুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্, ব্রহ্ম, বিষ্ণু ইত্যাদি বলিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-প্রতিপাদক অপূর্ব-ঐশ্বর্য-বিকাশের কথাও বলিয়াছেন। তাহা না বলিলে, রাসলীলা ভগবল্লীলা হইত না, তাহা হইয়া পড়িত প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কেলিবিশেষ।

যাঁহারা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মাধুর্যময়ী লীলায় তাঁহার সেবা কামনা করেন, তাঁহারাও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—ইহা জানিয়াই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণতম ঐশ্বর্যের অধিকারী, তাহা জানিয়াই, ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ভগবদ্‌বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চন-বন্দনাদি এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনাদি করিয়া থাকেন। অবশ্য অন্তশ্চিন্তিত দেহে, অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যখন তাঁহারা তন্ময় হইয়া পড়েন এবং অভীষ্ট-লীলারসে নিমজ্জিত হইয়া আত্মস্মৃতিহারা হইয়া পড়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের বা ঐশ্বর্যের কথা তাঁহাদের মনে স্থান পায় না, ঐশ্বর্যের বিকাশ হইলেও সেই ঐশ্বর্যের অনুসন্ধানও তখন তাঁহাদের থাকে না। কিন্তু তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। বিস্তীর্ণ জলাশয়ে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া যাঁহারা জলকেলি করেন, জলকেলিকালে, জলাশয়ের তীর-সম্বন্ধেও তাঁহাদের জ্ঞান থাকে না। তথাপি কিন্তু জলাশয় তীরহীন হইয়া যায় না। কেলির অবসানে তাঁহারা তীরেই আসিয়া দণ্ডায়মান হয়েন। ভক্তদের লীলাবেশ অন্তর্হিত হইলেও তাঁহারা আবার ভগবদ্‌বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনাদি করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ পরমেশ্বর, অর্থাৎ পূর্ণতম ঐশ্বর্যের অধিপতি বলিয়াই তাঁহার কার্যাবলীকে "লীলা" বলা হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্ ॥ গীতা ॥"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁহার ঐশ্বর্যের বর্ণনাদ্বারা তাঁহার ভগবত্তার কথা না

বলিয়া, কেবল তাঁহার ভক্তভাবময়ী লীলার কথা বলিলে, তাহা প্রাকৃত জগতের কোনও উপাসক-বিশেষের আচরণ বলিয়াই লোকের নিকটে প্রতীয়মান হইত এবং তাঁহার রাধাভাবময়ী লীলাও প্রাকৃত-উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিবিশেষের উন্মাদ-রোগের বিকার বলিয়াই প্রতীয়মান হইত; তাহা স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দরের লীলা বলিয়া লোকের প্রতীতি জন্মিত না। সুতরাং মুরারি গুপ্ত বা বৃন্দাবনদাস যে শ্রীগৌরাঙ্গের ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অনাবশ্যক তো নহেই, বরং শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপতত্ত্ব-প্রকাশের নিমিত্ত, তাহা ছিল অপরিহার্য।

যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যভাগবতে অনেক স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গকে "নারায়ণ" বলা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় বসুমহাশয় মনে করিয়াছেন, শ্রীলবৃন্দাবনদাস বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণের ঐশ্বর্যাত্মিকা লীলাই বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু যে-যে স্থলে বৃন্দাবনদাস শ্রীগৌরাঙ্গকে "নারায়ণ" বলিয়াছেন, সে-সে স্থলে "নারায়ণ" শব্দে যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার অভিপ্রেত এবং কোনও কোনও স্থলে, একই বিগ্রহে শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণই যে তাঁহার অভিপ্রেত, শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উক্তির উল্লেখপূর্বক, তাহা পূর্বেই (৪১ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সে-সে স্থলেও বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের লীলা বর্ণিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ অথবা শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের লীলাই কথিত হইয়াছে।

খ। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান-নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার-মহোদয় কর্তৃক রচিত এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৩৯ খৃঃ অঃ)। মজুমদার-মহাশয় যে অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত, মহাপ্রভু-সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থের ও প্রবন্ধাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থখানিই তাহার প্রমাণ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আলোচনায় ডক্টর মজুমদার-মহাশয় এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা ভক্তদিগের পক্ষে হৃদয়-বিদারক। এ-স্থলে দু'একটি কথার উল্লেখ করা হইতেছে।

একস্থলে (তাঁহার গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায়) মজুমদার-মহাশয় লিখিয়াছেন—"মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, স্বরূপদামোদর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনীকে একেবারে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ফেলিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। এরূপ চেষ্টা বৃন্দাবনদাসই প্রথম করেন এবং সেই জন্যই তাঁহার গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত।"

মজুমদার-মহাশয় অন্যত্রও একথা লিখিয়াছেন। "গয়া গমনের পূর্বে বিশ্বম্ভর মিশ্রের জীবনী বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিয়া বর্ণন করিয়াছেন (১৯৭ পৃঃ)।"

কিন্তু বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের, অথবা বিশ্বম্ভর মিশ্রের, জীবনীকে একেবারে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ফেলিবার বা ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছেন—যুক্তির অনুরোধে ইহা স্বীকার করিলেও, এইরূপ একটি প্রশ্ন কি উঠিতে পারে না যে, ব্যাসদেব এবং শুকদেব কাহার ছাঁচে ফেলিয়া বা ঢালিয়া কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন? বস্তুতঃ, ব্যাসদেব এবং শুকদেব কাহারও ছাঁচে ফেলিয়া বা ঢালিয়া কৃষ্ণলীলার বর্ণন করেন নাই। বাস্তবিক যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহারা তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধেও যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল, ভক্তদের মুখে শুনিয়া বৃন্দাবনদাসও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

মুরারি গুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে যাহা দর্শন এবং অনুভব করিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চার প্রথম প্রক্রমের প্রথম সর্গে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোকেই শ্রীগৌরাঙ্গকে

জগৎপতি, জগদাদি এবং হরি বলিয়া গিয়াছেন। কড়চার ১।২।১১-শ্লোকেও তিনি বিশ্বরূপের অনুজ বিশ্বম্ভরকে জগদ্‌যোনি, অজ এবং স্বয়ংপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরের আবির্ভাব-কথন-প্রসঙ্গেও মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চায় ১।৫।২-৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—"অচ্যুত জগন্নাথ মিশ্রের মনে প্রবেশ করিলেন, সেই মহত্তেজ তিনি শচীদেবীর চিত্তে আহিত করিলেন। তাহাতে শচীদেবী অত্যন্ত তেজোময়ী হইলেন।" শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থও ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

কংস-কারাগারে ব্রহ্মাদি দেবগণ যেমন দেবকীর গর্ভস্তুতি করিয়াছিলেন, মুরারি গুপ্তও ব্রহ্মাদিদেবগণ-কর্তৃক শচীগর্ভ-স্তুতির কথা বলিয়া গিয়াছেন (কড়চা ॥ ১।৫।৬-১৪ শ্লোক)।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ের যে-সমস্ত লক্ষণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত হইয়াছে, গৌরের আবির্ভাব-সময়েরও তদনুরূপ লক্ষণ মুরারি গুপ্ত বর্ণন করিয়াছেন (কড়চা ॥ ১।৫।১৫-২২ শ্লোক)।

ডক্‌টর মজুমদার-মহোদয়ের কথায় বলিতে গেলে, এ-স্থলে মুরারি গুপ্ত কি গৌরের জন্মলীলাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার "ছাঁচে ঢালিয়া" বর্ণন করেন নাই? এই অবস্থায় মজুমদার-মহাশয় কিরূপে বলিলেন যে, বৃন্দাবনদাসই সর্বপ্রথমে গৌরের লীলাকে কৃষ্ণলীলার ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিয়াছেন? বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গে "ঢালাঢালির" কোনও প্রশ্নই নাই। যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল, মুরারি গুপ্ত এবং বৃন্দাবনদাস তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

"ছাঁচে ঢালা"—কথাটি হইতে মনে হয়, মজুমদার-মহাশয়ের বক্তব্য বোধ হয় এই যে, "বিশ্বম্ভর মিশ্র" মানুষই ছিলেন, বৃন্দাবনদাস তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে খাড়া করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যিনি নকল অবতারদের সম্বন্ধে অতি তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন (১।১০।৮১-৮৬ এবং ২।২৩।৪৭৯-৮৯ পয়ার দ্রষ্টব্য), সেই বৃন্দাবনদাস নিজে যে একজন নকল অবতার খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সুধীবৃন্দ তাহা বিবেচনা করিবেন।

আধুনিক কালের অবতারদের এবং তাঁহাদের অনুগত লোকদিগের, আচরণের কথা মনে করিয়াই বোধ হয় ডক্‌টর মজুমদার এ-সকল কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কে বাস্তব ভগবৎস্বরূপ এবং কে তাহা নহেন, তাহা নির্ণয়ের একটি উপায় শ্রুতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—সেই পরাবর স্বয়ংভগবানের দর্শন পাইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি, দেহ-দৈহিক বস্তুতে মমতা এবং তজ্জন্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য আকাংক্ষাদি সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যায়)। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডকশ্রুতি ॥ ২।২।৮ ॥"

যাঁহারা আধুনিক অবতারদের অনুগত এবং সর্বদা সেই অবতারদের দর্শন পাইতেছেন, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে উল্লিখিত শ্রুতিকথিত লক্ষণগুলি কি দৃষ্ট হয়? সেই অবতারদের মধ্যেই কি সেই লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়? বরং তদ্বিপরীত লক্ষণই—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনাই—দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন এবং অনুভব যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে উল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল, বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। মুরারি গুপ্ত প্রভুর স্বরূপ অনুভব

করিয়াছিলেন। প্রভু কখন বা অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার পূর্বেই নিজের প্রাণত্যাগ করার উদ্দেশ্যে মুরারি গুপ্ত একখানা তীক্ষ্ণধার কাটারি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেহের এবং দৈহিক সুখের প্রতি মমতা থাকিলে তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইতেন না। শ্রীবাস পণ্ডিত স্বীয় পরিজনবর্গের জীবিকা নির্বাহের উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহের জন্য কখনও চেষ্টা করিতেন না, তদ্রূপ চেষ্টার কথাও তাঁহার মনে জাগিত না। দেহাত্মবুদ্ধি থাকিলে কখনও এইরূপ অবস্থা হইতে পারে না। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন এবং শ্রীরামাদি ভক্তগণ পরমানন্দে কীর্তন করিতেছিলেন। এমন সময়, শ্রীবাসের ঘরের মধ্যে তাঁহার পুত্র পরলোক গমন করিয়াছেন দেখিয়া নারীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ক্রন্দন শুনিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্র গতাসু হইয়াছেন। তখন তিনি নারীগণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "তোমরাত সব জান কৃষ্ণের মহিমা। সম্বর ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ ক্ষমা॥ অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম। অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম॥ হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য। গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মা-আদি ভৃত্য॥ এ সময়ে যাহার হইল পরলোক। ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥ কোন কালে এ-শিশুর ভাগ্য পাই যবে। 'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে॥ ** অন্য যেন কেহো এ আখ্যান না শুনয়ে। পাছে ঠাকুরের নৃত্যসুখ-ভঙ্গ হয়ে॥ কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়। তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্বথায়॥ ২।২৫।২৯-৩৬॥" শ্রীবাসের বাক্যে নারীগণ সুস্থির হইলেন। প্রভুর কীর্তন-স্থানে পুনরায় আসিয়া— "পরমানন্দে সঙ্কীর্তন করয়ে শ্রীবাস। পুনঃপুন বাঢ়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥ ২।২৫।৩৮॥" প্রভুর স্বরূপ-মহিমার অপরোক্ষ অনুভবে শ্রীবাস পণ্ডিতের হৃদয়গ্রন্থি সম্যক্‌রূপে ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়াই পুত্রের প্রতি ব্যবহারিক মমত্ববুদ্ধিও তাঁহার লোপ পাইয়াছিল, ক্রন্দন-রতা নারীগণকে তিনি উল্লিখিতরূপে সান্ত্বনা দিতে পারিয়াছিলেন এবং পুত্রের মৃত্যু দেখিয়াও তিনি পুনরায় প্রভুর সঙ্কীর্তনে আসিয়া পরমানন্দে কীর্তন করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার উল্লাসও পুনঃপুন বৃদ্ধি পাইতেছিল।

আবার, শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যে অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ বিরাজিত, বহু স্থলে প্রভু তাহা দেখাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সর্ব-ভগবৎ-স্বরূপত্ব এবং পরব্রহ্মত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীলমুরারি গুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে তাহার দর্শন এবং অনুভব লাভ করিয়া তাঁহার কড়চায় জানাইয়া গিয়াছেন এবং বৃন্দাবনদাসও তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখের উক্তি পাইয়া, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। আধুনিক তথাকথিত অবতারদের কাহারও মধ্যে এইরূপ কোনও মহিমা কি কখনও দৃষ্ট হয় বা হইয়াছে? মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেম-বিকারাদিই কি কখনও তাঁহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে? নিত্যকিশোরত্ব, গুম্ফ-শ্মশ্রুহীনতা, অজরত্ব, বিমৃত্যুতা, নিরাময়ত্ব, স্বহস্তের চারিহস্ত-পরিমিত-দেহত্বাদি ভগবৎ-স্বরূপের সাধারণ দৈহিক লক্ষণাদিই কি এই তথাকথিত অবতারদের আছে? শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ংভগবান, এ-সমস্তই তাহার প্রমাণ। শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় বৃন্দাবনদাস ঠাকুর গৌরের তত্ত্ব এবং মহিমার উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এজন্যই তিনি মুরারি গুপ্তের আনুগত্যে প্রভুর ভগবত্তার বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। নকল অবতার খাড়া করার প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে কিরূপে আসিতে পারে?

ডক্টর মজুমদার অন্যত্রও লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য আর একটি কারণে ক্ষুন্ন

হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস যখন গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তখন শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কবি নিমাইকে কৃষ্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া বাল্যলীলা বর্ণন করিয়াছেন। ইত্যাদি ১৯৬ পৃঃ।"

মজুমদার-মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৭০ শকে। ১৯২ পৃঃ)। তাঁহার মতে তখনই, অর্থাৎ প্রভুর তিরোভাবের পরেই "শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।"

তিনি আরও বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যলীলার ঐতিহ্যবিচারে আমি নবদ্বীপ-লীলা-বিষয়ে মুরারির বর্ণনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইব। ঐ প্রসঙ্গে মুরারির উক্তির সহিত অন্যের বর্ণনার বিরোধ হইলে মুরারিকেই স্বীকার করিব। ৮১ পৃঃ।" যে-মুরারির প্রতি মজুমদার-মহাশয়ের এতাদৃশী শ্রদ্ধা, সেই মুরারি গুপ্তই কিন্তু তাঁহার কড়চার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রক্রমে (এই দুই প্রক্রমেই প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা কথিত হইয়াছে), নিমাইকে ভগবান্, স্বয়ংভগবান্, অনাদি ভগবান্, জগতের পরম-কারণ, শ্রীকৃষ্ণ, বনমালী কৃষ্ণ প্রভৃতি বলিয়া গিয়াছেন (পূর্ববর্তী ৪৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রভু যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহায় নবদ্বীপ-লীলা-কালেই মুরারি গুপ্ত-প্রভৃতি ভক্তগণ অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। অথচ, মুরারি গুপ্তের উক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্বকই মজুমদার-মহাশয় বলিয়াছেন— শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা-কালে অর্থাৎ প্রভুর অন্তর্ধানের ১৫ বৎসর পরে "শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" মজুমদার-মহাশয়ের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির চেষ্টাতেই "শ্রীচৈতন্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল", অর্থাৎ বাস্তব অভিন্নত্ব নয়, গ্রন্থাদিতে অভিন্নত্বের কথা, সাধারণ লোকের বিশ্বাসযোগ্যরূপে, প্রচার।

ডক্টর মজুমদার বৃন্দাবনদাসের কথিত কয়েকটি বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে করেন না (১৯৭-৯৯ পৃঃ)। কিন্তু এই বিবরণগুলির ঐতিহাসিকত্বের প্রমাণ এই যে, কবিরাজ-গোস্বামী এই বিবরণ-গুলির বাস্তবত্ব জানিয়াই তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত যে-সকল বিবরণের সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর প্রাপ্ত বিবরণের সঙ্গতি নাই, সে-সমস্ত বিবরণ যে কবিরাজ গ্রহণ করেন নাই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (পূর্ববর্তী ৬-১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, শ্রীলবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত যদি অনৈতিহাসিক-বিবরণ-বহুলই হইত এবং মানুষ-বিশ্বম্ভর-মিশ্রের কৃষ্ণস্বরূপত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টার স্থলই হইত, তাহা হইলে, গ্রন্থের বহুল প্রচারের নিমিত্ত কোনও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব-সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাপক আদর থাকিত কিনা, গোবিন্দদাসের কড়চা বা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায়ই ইহা কয়েকজন সমালোচক সাহিত্যিকের গৃহেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিত কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

ডক্টর মজুমদার-মহোদয়ের করেকটি উক্তি আলোচিত হইল। অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

উপসংহারে নিবেদন এই যে, আমাদের মনে হয়, যে-কোনও গ্রন্থেরই আলোচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত— গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ের এবং প্রতিপাদ্য-বিষয়ের অবগতি। তাহাতেই গ্রন্থালোচনার সার্থকতা। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, গ্রন্থের তাৎপর্য প্রকাশের প্রয়াসে গ্রন্থের অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতে পারে না,

সমালোচকের নিজস্ব অভিপ্রায়ই প্রকাশ পাইবে। ইক্ষুদণ্ডের রসটুকুকে বাদ দিয়া কেবল ছোবড়ার বিশ্লেষণে ইক্ষুদণ্ডের স্বরূপ প্রকাশ পায় না।

৪৭। শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব

ভূমিকার আয়তন-বৃদ্ধির আশঙ্কায়, গৌর-তত্ত্বের ন্যায় বিস্তৃতভাবে অন্য কোনও তত্ত্বের আলোচনা করা হইবে না। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথাতেই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হইবে।

গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে, বলরামের তত্ত্ব ও মহিমা বর্ণন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই বলরামই অনন্তদেবরূপে এবং "শেষ"-রূপে বিরাজিত (চৈ. ভা. ১।১।৬-৫৫)। তাহার পরে, গ্রন্থকার বলিয়াছেন—এই বলরামই হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ। "'দ্বিজ', 'বিপ্র', 'ব্রাহ্মণ' যে হেন নাম-ভেদ। এই মত 'নিত্যানন্দ' 'অনন্ত' 'বলদেব'॥ ১।১।৫৯॥"

শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং যে-স্বপ্নের কথা তিনি পরের দিন ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায়, প্রভুও নিত্যানন্দকে ব্রজের বলরাম বলিয়াছেন (চৈ. ভা. ২।৩।১৪১-৪৯)।

মহাপ্রভু অন্যত্রও নিত্যানন্দকে ব্রজের বলরাম বলিয়াছেন। "নন্দগোষ্ঠে তুমি বসি বৃন্দাবন-সুখে। ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥ ৩।৮।৬৪॥ যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি। শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি॥ বৃন্দাবন-ক্রীড়ার যতেক শিশুগণ। সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন॥ সেই ভাব সেই কান্তি সেই সর্ব্বশক্তি। সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠ-ভক্তি॥ ৩।৮।৬৭-৬৯॥"

মুরারি গুপ্তও অবধূত নিত্যানন্দকে মুষল-লাঙ্গল-বেত্রধারী নীলাম্বর কৃষ্ণাগ্রজ (বলরাম) বলিয়াছেন (কড়চা॥ ২।৯।১১-১২।)

কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন—"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ—দুই ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ—কৃষ্ণলীলার সহায়॥ সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ॥ চৈ. চ. ১।৫।৩-৫॥"

স্বরূপদামোদরের কড়চার আনুগত্যে কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বলরাম-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, সেই বলরামই হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ। এইরূপে জানা গেল—নিত্যানন্দতত্ত্ব-সম্বন্ধেও বৃন্দাবনদাসের সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলরামকে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়াছেন। "আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব॥ ১।১।৩৬॥" কবিরাজ-গোস্বামীও যে তাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ—দুই ভিন্ন মাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥ চৈ. চ. ১।৫।৩-৪॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, ঈশ্বর-তত্ত্ব হইলেও শ্রীবলরাম ভক্তভাবময়। নানা প্রকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যথা, "সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন। গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ

আসন॥ আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে। ১।১।৩১-৩২॥" বলরাম গরুড়-রূপে শ্রীকৃষ্ণের বাহনও। "অনন্তের অংশে শ্রীগরুড় মহাবলী। লীলায় বহেন কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥ ১।১।৩৩॥" আবার সহস্রবদন শ্রীঅনন্তদেব-রূপে বলরাম ভক্তিরসে নিমজ্জিত হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশঃকীর্তন করিয়াও থাকেন। "সভার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়। সহস্রবদন প্রভু ভক্তিরসময়॥ ১।১।৩৫॥ সহস্রবদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর। গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥ ১।১।৪৮॥" শ্রীবলরাম হইতেছেন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। "সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ। যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃপুন॥ ১।১।৩৯॥" সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তারূপে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-পালনরূপ সেবা করিয়া থাকেন। আবার তিনি সহস্রবদন অনন্তরূপে স্বীয় মস্তকে মহীকে বহন করিয়াও থাকেন। "অনন্তা পৃথিবী, গিরি-সমুদ্র সহিতে। যে প্রভু ধরয়ে শিরে, পালন করিতে॥ সহস্র ফণার এক ফণে বিন্দু যেন। অনন্ত বিক্রম না জানয়ে 'আছে' হেন॥ ১।১।৪৬-৪৭॥" ইহা হইতেছে জগতের পালনার্থ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-পালনরূপ সেবা।

এতাদৃশ শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়া নিত্যানন্দও ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং ভক্তভাবময়। এজন্য শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দকে "ধরণীধরেন্দ্র (১।১।১৬৪)", "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম (১।২।৩৬)", "শ্রীঅনন্তধাম (১।২।১২৪)", "কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ বলরাম (১।২।১২৭)"—ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ-সকল কথা বলিয়াছেন। বলরামের একটি নাম সঙ্কর্ষণ, তিনি হইতেছেন মূল সঙ্কর্ষণ। "শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥ আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করেন ধরি চারি কায়॥ সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) আজ্ঞার পালন। শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥ সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ। চৈ. চ. ১।৫।৬-৯॥" যে "চারি কায়" ধরিয়া বলরাম "সৃষ্টিলীলা কার্য্য করেন" সেই চারি কায় (স্বরূপ) হইতেছেন—পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ (বা মহাবিষ্ণু), গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ এবং ক্ষীরোদকশায়ী নারায়ণ (চৈ. চ. ১।৫।৩,৭,১৫ এবং ১৬-শ্লোক)। শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক চৈ. চ. ১।৫ পরিচ্ছেদে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—মূল সঙ্কর্ষণ বলরামের অংশ হইতেছেন দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ, তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ এবং তাঁহার অংশ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। সুতরাং সৃষ্টিলীলা-কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট—পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী—এই চারি স্বরূপ হইতেছেন মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামের অংশাংশ। ক্ষীরোদশায়ী হইতেছেন জগতের পালনকর্তা। এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই—"শেষরূপে ধরেন ধরণী। কাহাঁ আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি॥ সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল। সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল॥ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার। যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার॥ সেইত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥ সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ-গান। নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান॥ সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে॥ ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥ এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে॥ সেইত অনন্ত যাঁর কহি 'এক কলা'। হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা॥ চৈ. চ. ১।৫।১০০-১০৮॥"

বলরামের ভক্তভাবের কথা কবিরাজ-গোস্বামী আরও বলিয়াছেন। "আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়। যার ভাব শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়॥ তেঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা। চৈ. চ. ১।৬।৬৩-৬৪॥" "মূল ভক্ত-অবতার—শ্রীসঙ্কর্ষণ॥ চৈ. চ. ১।৬।৯৮॥", "ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৫॥"

এতাদৃশ ভক্তভাবময় বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া নিত্যানন্দেরও ভক্তভাব। "অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি। সর্ব্ব-অবতার-লীলা করি সভারে দেখাই॥ এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ। সেই ভাবে কহে—'মুঞি চৈতন্যের দাস॥' কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য লীলা। পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥ বৃষ হৈয়া কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সংবাহন॥ আপনাকে 'ভৃত্য' করি, কৃষ্ণ 'প্রভু' জানে। 'কৃষ্ণের কলার কলা' আপনাকে মানে॥ চৈ. চ. ১।৫।১১৬-২০॥", "শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥ চৈ. চ. ১।৫।১৩৪॥"

এইরূপে দেখা গেল, ঈশ্বর-স্বরূপ হইলেও, শ্রীনিত্যানন্দ যে ভক্তভাবময়, সেই বিষয়েও বৃন্দাবনদাসের সহিত কবিরাজের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

ক। **শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা।** শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়, শ্রীনিত্যানন্দ প্রায় সর্বদাই প্রেমানন্দ-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি প্রায়শঃই থাকিত না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে জানা যায়, শৈশব হইতেই শ্রীনিত্যানন্দের ভগবদনুরক্তি ছিল। সমবয়স্ক শিশুদের লইয়া তিনি ভগবল্লীলার অভিনয় করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র শৈশব-ক্রীড়া। "শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু (নিত্যানন্দ) যত ক্রীড়া করে। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে॥ ১।৬।২১৫॥" তখনও তাঁহার অপূর্ব প্রেমাবেশ। প্রেমাবেশ-জনিত—রোদনে শ্রীনিত্যানন্দের নয়নে "নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ॥ ১।৬।২৩৭॥" ভগবল্লীলার অভিনয়-কালেও তিনি ভাবাবেশে বাহ্যস্মৃতি-সংজ্ঞাহীন হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন, তাঁহার দেহে তখন জীবনীশক্তির অস্তিত্বও লক্ষিত হইত না (১।৬।২৫৯-৬৪)।

দ্বাদশ বৎসর বয়স্কাল পর্যন্ত এইভাবে খেলা-ধূলা করিয়া, এক সন্ন্যাসীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন এবং একাকী বিশ বৎসর-কাল নানাতীর্থ ভ্রমণ করিলেন। এই সময়ে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমাবেশ-জনিত বাহ্যানুসন্ধানহীনতাবশতঃ সন্ন্যাসের আচরণ-পালনও তাঁহার পক্ষে সকল সময় সম্ভবপর হইত না, তিনি তুরীয়াতীত অবধূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন—"অবধূতরূপে করে তীর্থপর্যটনে॥ ১।৬।৩৩৩॥" তীর্থভ্রমণ-কালে শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীর দর্শনমাত্রেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। "মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥ নিত্যানন্দ দেখিমাত্র শ্রীমাধবপুরী। পড়িলা মূর্চ্ছিত হই আপনা' পাসরি॥ ১।৬।৩৫৯-৬০॥ ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুই জনে। অন্যোহন্যে গলায় ধরি করেন ক্রন্দনে॥ বনে গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে। হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে॥ প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে। পৃথিবী হইয়া সিক্ত ধন্য হেন মানে॥ কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাঞি। ১।৬।৩৬৩-৬৬॥" শ্রীনিত্যানন্দ যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন,

তখন তিনি জগন্নাথ—"দেখিমাত্র হইলেন আনন্দে মূর্চ্ছিতে। পুন বাহ্য হয়, পুন পড়ে পৃথিবীতে ॥ কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার। কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ॥ ১।৬।৪০১-২ ॥" বিশবৎসর তীর্থ-ভ্রমণ-কালেও শ্রীনিত্যানন্দের অদ্ভুত প্রেমাবেশ ছিল।

নানাতীর্থ-ভ্রমণ-কালে শ্রীনিত্যানন্দ মথুরাতেও গিয়াছিলেন। সর্বশেষে আর একবার মথুরায় (ব্রজমণ্ডলে) আসিলেন। সেস্থানে তিনি "নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাত্রি ॥ আহার নাহিক—কদাচিত দুগ্ধপান। সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান ॥ ১।৬।৪০৬-৭ ॥" বৃন্দাবনে অবস্থানকালে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে শ্রীনিত্যানন্দের দিবা-রাত্রি-জ্ঞানও ছিল না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধও ছিল না। সে-স্থানে তিনি বোধ হয় সর্বত্র তাঁহার প্রাণ কানাইকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তিনি যেন দ্বাপর-যুগের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই—"নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে। শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে খেলা-ধুলা খেলে ॥ ১।৬।৪১১ ॥" তাঁহার প্রাণ-কানাইকে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক সময়ে তাঁহার মনে হইল, প্রাণ-কানাই তখন নবদ্বীপে গৌরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্ত ভাবে। ইহা নিত্যানন্দ স্বরূপের মনে জাগে ॥ ১।৬।৪০৮ ॥" কিন্তু—"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে। আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥ ১।৬।৪০৯ ॥"—ইহা ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎই নবদ্বীপে আসিলেন না, মথুরাতেই (বৃন্দাবনেই) থাকিলেন। "এই মানসিক করি নিত্যানন্দ-রায়। মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥ ১।৬।৪১০ ॥" কিন্তু তখনও তিনি দ্বাপরের বলরাম-ভাবেই আবিষ্ট থাকিতেন। "হুঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্ব জন্মস্থান ॥ নিরবধি বাল্যভাব, আন্ নাহি স্ফুরে। ধুলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥ আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়। বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায় ॥ ২।৩।১১৫-১৭ ॥" তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর; কিন্তু সেই জ্ঞান তাঁহার ছিল না, তিনি তখনও বাল্যভাবাবিষ্ট হইয়া বালকের ন্যায় আচরণ করিতেন।

এদিকে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে শ্রীগৌরচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মনে মনে তাহা উপলব্ধি করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নন্দনাচার্যের গৃহে গিয়া উঠিলেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু নন্দনাচার্যের গৃহে গেলেন। গিয়া দেখিলেন—"বসিয়া আছয়ে এক পুরুষ-রতন। সভে দেখিলেন—যেন কোটিসূর্য্যসম ॥ অলক্ষিত আবেশ—বুঝন নাহি যায়। ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ, হাসয়ে সদায় ॥ ২।৩।১৭৭-৭৮ ॥" শ্রীনিত্যানন্দ তখনও প্রেমাবিষ্ট, তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্রও ছিল না, ইঁহারা যে সে-স্থানে গিয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারেন নাই।

একটি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক পাঠ করার নিমিত্ত মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতকে আদেশ করিলে, শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের রূপব্যঞ্জক "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ" ইত্যাদি (ভা. ১০।২১।৫) শ্লোকটির আবৃত্তি করিলেন। "শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ। পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া—নাহিক চেতন ॥ ২।৪।৮ ॥" প্রভুর আদেশে শ্রীবাস পুনঃ পুনঃ শ্লোকটি পড়িতে লাগিলেন। শ্লোক শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে নিত্যানন্দ চেতন হইলেন। তখনও শ্লোকের আবৃত্তি চলিতেছিল। শুনিয়া নিত্যানন্দের প্রেম অত্যধিকরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। হুঙ্কার, গর্জন, লম্ফ, ভূমিতে গড়াগড়ি, ক্রন্দনাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিত্যানন্দ অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ভক্তগণ স্থির করার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে স্থির করিতে পারিলেন না। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজের কোলে ধরিলেন এবং বোধ হয় এতক্ষণে তাঁহার প্রাণ-কানাইর কোল পাইয়া নিত্যানন্দও

নিস্পন্দ হইয়া মহাপ্রভুর কোলে পড়িয়া রহিলেন। এইরূপে দেখা গেল নন্দনাচার্যের গৃহেও শ্রীনিত্যানন্দের অদ্ভুত প্রেমাবেশ প্রকটিত হইয়াছিল।

পরের দিনই আষাঢ়ী পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমাতে সন্ন্যাসীদের পক্ষে ব্যাসপূজার বিধি। নিত্যানন্দও সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রেমাবেশে তিনি এমনি বাহ্যজ্ঞানহারা যে, ব্যাসপূজার কথাও তিনি যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুই তাঁহাকে তাহা জানাইলেন। স্থির হইল, শ্রীবাসের গৃহে এবং শ্রীবাসের পৌরোহিত্যে নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা হইবে। নিত্যানন্দকে লইয়া সকলে শ্রীবাসগৃহে আসিলেন। ব্যাস-পূজার অধিবাস-কীর্তন আরম্ভ হইল। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ—উভয়েই প্রেমাবেশে বিহ্বল। "চিরদিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই। দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে একঠাঁই॥ হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জ্জন। কেহো মূর্চ্ছা যায়, কেহো করয়ে ক্রন্দন॥ কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছিত। ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত॥ ২।৫।২১-২৩॥ পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়। আপনা না জানে দোঁহে আপন-লীলায়॥ বাহ্য দূর হৈল, বসন নাহি রহে। ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরন না যায়ে॥ ২।৫।২৬-২৭॥" কীর্তনের পরে প্রভু এবং ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে গেলেন, নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস-গৃহে। কোনও এক ভাবের আবেশে—"কথো রাত্র্যে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া। নিজ দণ্ড-কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥ ২।৫।৬৪॥" প্রাতঃকালে সংবাদ পাইয়া প্রভু আসিয়া দেখিলেন—"বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর॥ ২।৫।৬৮॥" তখন "দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া। চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈয়া॥ শ্রীবাসাদি সভেই চলিলা গঙ্গাস্নানে। দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায়ে আপনে॥ চঞ্চল সে নিত্যানন্দ, না মানে বচন। তবে একবার প্রভু করয়ে গর্জ্জন॥ কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়। গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়'॥ সাঁতরে গঙ্গার মাঝে নির্ভয় শরীর। চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির॥ নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর। 'ব্যাসপূজা আসি ঝাট করহ সত্বর'॥ শুনিঞা প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে। স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে॥ ২।৫।৬৯-৭৫॥"

ব্যাসপূজার পরে শ্রীবাস মালা আনিয়া নিত্যানন্দের হাতে দিয়ে বলিলেন—"শুন শুন নিত্যানন্দ! এই মালা ধর। বচন পঢ়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥ শাস্ত্রবিধি আছে—মালা আপনে সে দিবা॥ ২।৫।৮১-৮২॥" কিন্তু শ্রীবাসের বাক্য—"যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'। কিসের বচন পাঠ—প্রবোধ না লয়॥ কিবা বোলে ধীরে ধীরে—বুঝন না যায়। মালা হাথে করি পুন চারিদিকে চায়॥ প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার। 'না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার'॥ শ্রীবাসের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর। ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর॥ প্রভু বোলে—'নিত্যানন্দ! শুনহ বচন। মালা দিয়া ঝাট কর ব্যাসের পূজন॥' দেখিলেন নিত্যানন্দ—প্রভু বিশ্বম্ভর। মালা তুলি দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥ ২।৫।৮১-৮৮॥"

ব্যাসপূজার পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। সেই কীর্তনেও—"নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঞি। মহামত্ত দুই ভাই—কারো বাহ্য নাঞি॥ ২।৫।১৫১॥"

এ-পর্যন্ত যে-বিবরণ উল্লিখিত হইল, তাহাতে জানা যায়—বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবাস-ভবনে ব্যাসপূজার দিন পর্যন্ত, প্রায় সর্বদাই নিত্যানন্দ প্রেম-মত্ত, বাহ্যজ্ঞানহারা। ইহার পরেও নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও নিত্যানন্দের সেই অবস্থার কথাই জানা যায়।

যাহা হউক, শ্রীবাসের গৃহেই নিত্যানন্দ বাস করিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীবাসকে 'বাপ' এবং

শ্রীবাসগৃহিণী মালিনীদেবীকে 'মা' বলিতেন। সর্বদা তাঁহার বাল্যভাবের আবেশ। "অহর্নিশ বাল্যভাবে বাহ্য নাহি জানে। নিরবধি মালিনীর করে স্তন-পানে॥ কভু নাহি দুগ্ধ—পরশিলে মাত্র হয়। এ-সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয়। চৈতন্যের নিবারণে কারেও না কহে। নিরবধি শিশুরূপ মালিনী দেখয়ে॥ (এ-সকল উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে, লীলাশক্তি ঈশ্বর-তত্ত্ব নিত্যানন্দের কিছু ঐশ্বর্যও প্রকটিত করিয়াছেন)।

বাল্যভাবের আবেশে নিত্যানন্দ—"আপনি তুলিয়া হাথে ভাত নাহি খায়। পুত্রপ্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥ ২।১১।৩০ ।।" বাল্যভাবের আবেশে তিনি দিগম্বর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, নাচিতেন, হাসিতেন, লম্ফপ্রদানও করিতেন, কখনও বা খাইতে বসিলে ঘরময় অন্ন ছড়াইতেন।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলিলেন—"শুন নিত্যানন্দ! কাহারো সহিত পাছে কর' তুমি দ্বন্দ্ব॥ চঞ্চলতা না করিরা শ্রীবাসের ঘরে।" শুনি নিত্যানন্দ বিষ্ণু-স্মঙরণ করে॥ 'আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা। আপনার মত তুমি কারো না বাসিবা॥' বিশ্বম্ভর বোলে—'আমি তোমা ভালে জানি।' নিত্যানন্দ বোলে—'দোষ কহ দেখি শুনি'॥ হাসি বোলে গৌরচন্দ্র—'কি দোষ তোমার? সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর' অবতার'॥ নিত্যানন্দ বোলে—'ইহা পাগলে সে করে। এ-ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে'॥ ২।১১।১২-১৭॥ প্রভু বোলে—'তোমার অপকীর্ত্তি আমি পাই। সেই ত কারণে আমি তোমারে শিখাই'॥ হাসি বোলে নিত্যানন্দ—'বড় ভাল ভাল। চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবে সর্ব্বকাল॥ নিশ্চয় বলিলা তুমি—আমিত চঞ্চল।' এতবলি প্রভু চাহি হাসে খল খল॥ আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম্ম করে। দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥ জোড়ে জোড়ে লাফ দেই হাসিয়া হাসিয়া। সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥ ২।১১।১৯-২৩॥ ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর—'এ কি কর' কর্ম্ম। গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম্ম॥ এখনি বলিলা তুমি—'আমি কি পাগল?' এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল॥ যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ। নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু মাঝ॥ আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন। এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন॥ ২।১১।২৫-২৮॥"

এ-সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—প্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ যে কথাবার্তা বলিয়াছেন, তাহাও ভাবের আবেশে, তখনও তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

শচীমাতার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত একদিন প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত নিজগৃহে বসিয়া আছেন, "হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল। আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল। বাল্যভাবে দিগম্বর হৈলা দাণ্ডাইয়া। কাহারো না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ প্রভু বোলে—'নিত্যানন্দ! কেনে দিগম্বর?' নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর॥ প্রভু বোলে—'নিত্যানন্দ! পরহ বসন।' নিত্যানন্দ বোলে—'আজি আমার গমন॥' প্রভু বোলে—'নিত্যানন্দ! ইহা কেনে করি?' নিত্যানন্দ বোলে—'আর খাইতে না পারি॥' প্রভু বোলে—'এক এড়ি, কহ কেনে আর?' নিত্যানন্দ বোলে—'আমি গেলুঁ দশ বার॥' ২।১১।৭০-৭৫॥ চৈতন্যের ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ রায়। এক শুনে, আর কহে, হাসিয়া বেড়ায়॥ আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন। বাহ্য নাহি, হাসে পদ্মাবতীর নন্দন (নিত্যানন্দ)॥ ২।১১।৭৮-৭৯॥"

এ-সমস্ত বিবরণ হইতে জানা গেল—নবদ্বীপে অবস্থান-কালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমাবেশে প্রায়শঃই বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া থাকিতেন। বত্রিশ-তেত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক হইলেও তিনি বাল্যভাবাবিষ্ট হইয়া নিজেকে শিশু মনে করিতেন এবং শিশুর ন্যায় আচরণ করিতেন—মালিনীদেবীর কোলে বসিয়া তাঁহার স্তন পান করিতেন,

মালিনীদেবী মুখে ভাত তুলিয়া দিলেই আহার করিতেন। খাইতে বসিয়া ঘরময় ভাত ছড়াইতেন, কখনও বা দিগম্বর হইয়া মাথায় কাপড় বাঁধিতেন, শিশুর ন্যায় লম্ফ-ঝম্প দিতেন, কখনও বা খলখল করিয়া হাসিতেন। গঙ্গাস্নান করিতে গেলে বালকের ন্যায় কেবল সাঁতার কাটিতেন এবং কুম্ভীর দেখিলে ধরিতে যাইতেন।

প্রভুর কৃপায় ভক্তগণ জানিতেন, শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ বলরাম, বাল্যভাবের আবেশেই তিনি উল্লিখিতরূপ আচরণ করেন। এ-সমস্ত আচরণ দেখিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন, নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি কখনও ম্লান হয় নাই। মহাপ্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দের নৃত্যকীর্তন-কালে নিত্যানন্দও প্রেমাবেশে নৃত্যাদি করিতেন।

কিন্তু ভক্তিহীন বহির্মুখ লোকগণ নিত্যানন্দের উল্লিখিতরূপ আচরণের রহস্য বুঝিতে পারিতেন না; তাই তাঁহারা প্রেম-পাগল নিত্যানন্দকে সাধারণ পাগল বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার নিন্দাও করিতেন। অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রেম-কলহে শ্রীঅদ্বৈত নিন্দাচ্ছলে নিত্যানন্দের স্তুতিই করিতেন (পরবর্তী ৪৮-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে অদ্বৈতের ব্যজস্তুতির যথাশ্রুত অর্থে নিত্যানন্দের নিন্দাই বুঝাইত। ভক্তিহীন বহির্মুখ লোকগণ অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্বাভাবিকী প্রীতির রহস্য অনুভব করিতে পারিতেন না বলিয়া নিন্দার্থকেই সত্য অর্থ মনে করিয়া নিত্যানন্দের নিন্দার উপকরণ পাইতেন।

বহির্মুখ লোকদিগের এ-সকল নিত্যানন্দ-নিন্দার কথা শ্রীলবৃন্দাবনদাস বহুস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার সাংঘাতিক কুফল-সম্বন্ধেও লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজের বলরাম। বলরাম হইতেছেন মূল ভক্ত-অবতার, সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দও মূল ভক্ত-অবতার। তিনি হইতেছেন—"কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা (১।২।৩৬, ১।২।১২৭)", "কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ বলরাম (১।২।১২৭)।" নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামের কৃপাব্যতীত কেহই ব্রজের শুদ্ধাভক্তি পাইতে পারেন না। এজন্যই শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—"সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। যে ডুবিব, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥ ১।৬।৪২২॥ সাক্ষাতেই দেখ সভে এই ত্রিভুবনে। নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে॥ চৈতন্যের আদিভক্ত নিত্যানন্দ-রায়। চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥ অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কহে। তানে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়ে॥ ১।৬।৪১৭-১৯॥" বৃন্দাবনদাস আরও বলিয়াছেন —"যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল সকলে॥ ৩।৫।৩০৩॥" অর্থাৎ ব্রজের কান্তাভাবের আনুগত্যময়ী সেবাও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাতেই পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার "প্রার্থনায়" একথা বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল, যে ছায়ায় জগত জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥ সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে, বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥ অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই-পদ পাসরিয়া, অসত্যেরে সত্য করি মানি। নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইয়ের চরণ-দুখানি॥" এ-সমস্ত কারণে কবিরাজ-গোস্বামীও বলিয়াছেন—"অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া। চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥ চৈ. চ. ১।৮।১২॥" শ্রীনিত্যানন্দকে না মানিলে যে সর্বনাশ হয়, কবিরাজ-

গোস্বামী তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে তাঁহার গৃহে অহোরাত্র-সঙ্কীর্তন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া নিত্যানন্দপ্রভুর এক প্রিয়শিষ্য মীনকেতন রামদাস আসিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কবিরাজের ভ্রাতার কিছু বাদানুবাদ হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করিতেন; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে তাঁহার কেবল বিশ্বাসের আভাস মাত্র ছিল। তাহাতে মীনকেতন রামদাসের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। এই প্রসঙ্গে কবিরাজ লিখিয়াছেন—"তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে॥ দুই ভাই (শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ) একতনু—সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥ একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। অর্দ্ধ-কুক্কুটীর ন্যায় তোমার প্রমাণ॥ কিংবা দুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড। একে মানি, আরে না মানি—এই মত ভণ্ড॥ ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥ চৈ. চ. ১।৫।১৫২-৫৬॥" যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দকে মানেন না, স্বীয় ভ্রাতার উপলক্ষণে, কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের সকলকেই ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তাঁহাদের যে সর্বনাশ হয়, তাহাও জানাইলেন।

পরমার্থভূত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত যে নিত্যানন্দের ভজন অপরিহার্য, সেই নিত্যানন্দের নিন্দার ফল যে কিরূপ সাংঘাতিক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই, যাঁহারা নিত্যানন্দের আচরণের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেন, কবিরাজ-গোস্বামীর ন্যায় শ্রীলবৃন্দাবনদাসও তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং ইহা-দ্বারা জগতের জীবকে নিত্যানন্দ-নিন্দার সাংঘাতিক কুফলের কথাই জানাইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবনদাসের দীক্ষাগুরু ছিলেন বলিয়াই যে তিনি নিত্যানন্দ-নিন্দকদের তিরস্কার করিয়াছেন, তাহা নহে। নিত্যানন্দের স্বরূপ-তত্ত্বের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি এইরূপ করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ বলরাম হইলেও বলরাম অপেক্ষা তাঁহার একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বলদেব বলরাম-স্বরূপে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের পরিকর এবং নিত্যানন্দ-স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকর। যিনি যেই স্বরূপের পরিকর, সেই স্বরূপের লীলার অনুকূলভাবেই তাঁহার মহিমা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গের যে-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, বলরাম-স্বরূপ অপেক্ষা নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহিমাও সেই বৈশিষ্ট্যের অনুকূলই হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে স্বয়ংভগবান্ নির্বিচারে কাহাকেও প্রেম দান করেন না; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ স্বয়ংভগবান্ নির্বিচারে যাহাকে-তাহাকে প্রেম বিলাইয়া দেন। সুতরাং কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা বলরাম ইচ্ছাসত্ত্বেও কাহাকেও নির্বিচারে প্রেমদান করিতে পারেন না; যেহেতু, নির্বিচারে প্রেমদানের প্রয়াস হইবে, তিনি যাঁহার পরিকর, সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিমতের বিরোধী। পরিকরদের কর্তব্যই হইতেছে—ভগবানের ইচ্ছার অনুকূলভাবে ভগবানের লীলার আনুকূল্য-বিধান। সুতরাং ব্রজলীলায়, বলরাম-স্বরূপের করুণা-সিন্ধু থাকে, প্রেমদান-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যোগ্যতা-বিচারের প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধ। সেই বলরামই যখন নিত্যানন্দরূপে, সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপের পরিকর হয়েন, তখন তাঁহার করুণা-সিন্ধুর সেই যোগ্যতা-বিচারের প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধতা থাকে না; যেহেতু, শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েনই নির্বিচারে প্রেম বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত। এজন্য শ্রীনিত্যানন্দ-রূপে শ্রীবলরামও নির্বিচারে সকলকে ব্রজ-প্রেম বিলাইয়া দিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দের এতাদৃশী করুণা হইতেছে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বেরই স্বাভাবিক ধর্ম। শ্রীনিত্যানন্দের এইরূপ মহিমাই পদকর্তা বলিয়া গিয়াছেন—"নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।

আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥ প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে। ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে ॥ দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সভাকারে যাচে ॥ আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মোহান। ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বাণ ॥—শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ॥"

৪৮। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অদ্বৈত-তত্ত্ব

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—"অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ রায়। এক মূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥ চৈ. ভা. ২।৬।১৪৭ ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈতে অভেদ প্রেম জান ॥ চৈ. ভা. ২।৬।১৫০ ॥"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন স্বরূপতঃ একই তত্ত্ব, লীলাতে তাঁহাদের দুই রূপে প্রকাশ। অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দের এক স্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজের বলরাম বলিয়া, শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন বলরামেরই এক প্রকাশ বা স্বরূপ বা অংশ।

অন্যত্র মহাপ্রভুর মুখে শ্রীলবৃন্দাবনদাস প্রকাশ করাইয়াছেন—"অদ্বৈতের বাক্যে মহাক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর। অদ্বৈত-মহিমা ক্রোধে বোলয়ে বিস্তর ॥ 'সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার। তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার ॥ ২।১৬।৬১ ॥ তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী খ্যাতি যার। কারে তুমি নাহি কর' শূলেতে সংহার ॥ ২।১৬।৬৩ ॥"

এ-স্থলে প্রভু অদ্বৈতকে শূলপানি শিব বলিলেন। শিবই হইতেছেন প্রলয়-কালে জগতের সংহার-কর্তা।

অন্যত্রও প্রভু এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত-সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"আচার্য 'মহেশ' হেন মোর চিত্তে লয় ॥ ৩।৪।৪৬৬ ॥ বুঝিলাঙ—আচার্য মহেশ-অবতার। এই মত হাসি প্রভু বোলে বার বার ॥ ৩।৪।৪৬৮ ॥" এ-স্থলেও প্রভু অদ্বৈত আচার্যকে মহেশ বা শিব বলিয়াছেন।

মুরারি গুপ্ত অদ্বৈতাচার্যকে "ঈশ্বরস্য কলয়া বিজাতোঽদ্বৈতবর্য্যঃ ॥ কড়চা ॥ ২।১৬।৪ ॥" এবং "ঈশ্বরাংশঃ ॥ ২।১৮।২৯ ॥" বলিয়াছেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস শ্রীঅদ্বৈতকে বলরামের এক স্বরূপ বা অংশ বলিয়াছেন। তাহার সহিত কড়চার উক্তির সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। যেহেতু, শ্রীঅদ্বৈত বলরামের অংশ হইলে ঈশ্বরাংশই হয়েন। বলরাম যে ঈশ্বর-তত্ত্ব তাহা পূর্বেই (৪৭-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে।

অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরাংশ—সুতরাং ঈশ্বর-তত্ত্ব—হইলেও, তিনি যে ভক্তভাবময় ছিলেন, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহুস্থলে তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটি স্থলের উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্বেও অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণপূজা করিতেন, ভক্তদের সহিত কৃষ্ণকথার আলোচনা করিতেন (১।৫।২৭-৩৬)।

জগদ্বাসী জীবের বহির্মুখতা-দর্শনে ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলে, অদ্বৈতাচার্য তাঁহাদিগকে প্রবোধ দান করিয়া বলিয়াছিলেন—"পাইবা পরমানন্দ সভেই নিশ্চয় ॥ এবে বড় বাসোঁ মুঞি হৃদয়ে উল্লাস। হেন বুঝি 'কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ ॥' সভে কৃষ্ণ গাওসিয়া পরম হরিষে। এথাই দেখিবা কৃষ্ণ

কৃথোক দিবসে॥ তোমা 'সভা' লই হইব কৃষ্ণের বিলাস। তবে সে অদ্বৈত হঙ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥ ১।৫।১০৩-১০৬॥"

গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে—"ঠাকুরের (প্রভুর) প্রেম দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ। পরম বিস্মিত হৈল সভাকার মন॥ পরম সন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে। সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥ ২।২।৩-৪॥", "শুনিঞা অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা। পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥ ২।২।৭॥" একথা বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত পূর্বরাত্রিতে তাঁহার এক স্বপ্নের কথা বলিলেন, যে-স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে গীতার পাঠের অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার অবতরণের হেতুর কথাও বলিয়াছেন (২।২।৮-১৯)। পরে শ্রীঅদ্বৈত ভক্তদিগকে বলিলেন—"বড় সুখী হইলাঙ এ-কথা শুনিয়া। আশীর্ব্বাদ কর সভে 'তথাস্তু' বলিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে। কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল সংসারে॥ ২।২।২৬-২৭॥"

প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিয়া অদ্বৈতাচার্য যে প্রভুর পূজা ও স্তবাদি করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতরূপে তাহাও কথিত হইয়াছে (২।৬।৭১-১২৯)। তিনি প্রভুর কীর্তনে প্রেমাবেশে নৃত্যও করিয়াছিলেন (২।৬।১৩৭-৪৪)।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন—"চৈতন্য-চরণ-সেবা কাজ॥ ২।১০।১৪১॥, অদ্বৈতের প্রভু গৌর॥ ২।১০।১৫২॥, 'সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।' একথায় অদ্বৈতেরে প্রীত বহুতর॥ ২।১০।১৬১॥" ইত্যাদি।

শ্রীঅদ্বৈত ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। সে-জন্য প্রভু তাঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। প্রভু যখন স্বীয় স্বাভাবিক ভক্তভাবে থাকিতেন, তখন অদ্বৈতকে স্বীয় চরণ-স্পর্শ করিতে দিতেন না। প্রভুর মনে কষ্ট হইবে মনে করিয়া অদ্বৈতও তাহা করিতেন না। কিন্তু "ভাবাবেশে প্রভু যে-সময়ে মূর্চ্ছা পায়। তখনে অদ্বৈত চরণের পাছু যায়॥ দণ্ডবত হই পড়ে চরণের তলে। পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥ কখনো বা নিছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে। কখনো বা ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা করে॥ ২।১৬।৪৪-৪৬॥"

শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তভাব-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বহু উক্তি আছে। বাহুল্য-বোধে আর উল্লিখিত হইল না।

এক্ষণে অদ্বৈত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি কথিত এবং আলোচিত হইতেছে।

শ্রীলস্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায়, অদ্বৈত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ। তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥ অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ চৈ. চ. ১।১।১২-১৩ শ্লোক॥ —জগৎকর্তা যে মহাবিষ্ণু (অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ) মায়াদ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি করেন, তাঁহারই অবতার হইতেছেন এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য। শ্রীহরির সহিত অদ্বৈত (অর্থাৎ অভিন্ন) বলিয়া যিনি 'অদ্বৈত' নামে খ্যাত এবং কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য নামে খ্যাত, আমি সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্যের শরণ গ্রহণ করি।"

শ্রীলস্বরূপদামোদর এ-স্থলে বলিলেন—অদ্বৈতাচার্য হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার। কারণার্ণবশায়ী ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া অদ্বৈতও ঈশ্বর-তত্ত্ব, ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বর হইলেও শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন ভক্তাবতার, ভক্তভাবময়। ভক্তভাবময় বলিয়াই তিনি কৃষ্ণভক্তির উপদেশ করেন।

শ্রীঅদ্বৈত-সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাসের উক্তির সহিত শ্রীলস্বরূপদামোদরের উক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

শ্রীলস্বরূপদামোদরের উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়কে অবলম্বন করিয়াই কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ১।৬-পরিচ্ছেদে অদ্বৈত-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। স্বরূপদামোদরের শ্লোকদ্বয়ের মর্ম তিনি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥ মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য। তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥ যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥ ইচ্ছায় অনন্তমূর্ত্তি করেন প্রকাশে। এক এক মূর্ত্ত্যে করে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশে॥ সে-পুরুষের অংশ অদ্বৈত—নাহি কিছু ভেদ। শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ॥ সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে। কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে॥ জগত মঙ্গলাদ্বৈত—মঙ্গল গুণধাম। মঙ্গল চরিত্র সদা, মঙ্গল যাঁর নাম॥ কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার। এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার॥ চৈ. চ. ১।৬।৩-১০॥"

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। তিনিই আবার গর্ভোদকশায়ী পুরুষ-রূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত। এতাদৃশ মহাবিষ্ণুর অংশই হইতেছেন শ্রীঅদ্বৈত। অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদ নাই বলিয়া মহাবিষ্ণু এবং অদ্বৈতের মধ্যেও স্বরূপতঃ ভেদ নাই। মহাবিষ্ণু মায়ার সহায়তাতেই অনন্তকোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। মঙ্গলগুণধাম অদ্বৈত, মায়ার উপাদানাংশ প্রধানকে লইয়া মহাবিষ্ণুর সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করেন।

শ্রীঅদ্বৈত কিভাবে সৃষ্টিকার্যে মহাবিষ্ণুর সহায়তা করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

"মায়া যৈছে দুই অংশ—নিমিত্ত উপাদান। মায়া—নিমিত্ত হেতু, উপাদান প্রধান॥ পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া। বিশ্ব সৃষ্টি করেন নিমিত্ত-উপাদান লঞা॥ আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ। অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥ নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ। উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন॥ যদ্যপি সাংখ্য মানে—প্রধান কারণ। জড় হৈতে কভু নহে জগত সৃজন॥ নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে। ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত নির্ম্মাণে॥ অদ্বৈতরূপে করে শক্তিসঞ্চারণ। অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ॥ অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আর এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥ সেই নারায়ণের অঙ্গ মুখ্য অদ্বৈত। 'অঙ্গ'-শব্দে 'অংশ' কহে শ্রীভাগবত॥ (এ-স্থলে ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের ১০।১৪।১৪-শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে)। ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়। মায়ার সম্বন্ধ নাহি—এই শ্লোকে কয়॥ অংশ না কহিয়া কেনে কহ তারে অঙ্গ। অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥ মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম॥ চৈ. চ ১।৬।১১-২২॥"

এই উক্তিগুলির তাৎপর্য হইতেছে এই :—বেদান্ত বলেন, ঈশ্বরই হইতেছেন বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই। অব্যবহিতভাবে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই হইতেছেন জগতের বাস্তব নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। স্বয়ং মহাবিষ্ণুরূপে তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং অদ্বৈতরূপে তিনি উপাদান-কারণ।

মায়িক জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত জড়রূপা মায়ার প্রয়োজন। মায়ারও দুইটি বৃত্তি আছে—নিমিত্ত এবং উপাদান। মুখ্য নিমিত্ত এবং উপাদান ঈশ্বর বলিয়া মায়া হইতেছে বাস্তবিক গৌণ নিমিত্ত এবং গৌণ উপাদান। মায়া জড়রূপা বলিয়া নিজের কার্যসামর্থ্য নাই। ঈশ্বরই মায়াতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চারিত করিয়া মায়াকে সৃষ্টির যোগ্যতা দিয়া থাকেন। তিনি মুখ্য নিমিত্ত-কারণ মহাবিষ্ণুরূপে মায়ার নিমিত্তাংশে শক্তি-সঞ্চার করেন এবং অদ্বৈতরূপে মায়ার উপাদানাংশে শক্তি-সঞ্চার করেন। সুতরাং অদ্বৈতরূপে মহাবিষ্ণু হইতেছেন বিশ্বের মুখ্য উপাদান কারণ। মায়াতে তাঁহারা শক্তি-সঞ্চার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মায়িক বস্তু নহেন, তাঁহারা চিদানন্দময়—মহাবিষ্ণুও চিদানন্দময়, তাঁহার অংশ শ্রীঅদ্বৈতও চিদানন্দময়। ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর সহিত ভেদ নাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের নাম "অদ্বৈত"।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর অংশরূপ অবতার বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতও ঈশ্বর-তত্ত্ব—ঈশ্বর। এই অংশে কবিরাজ-গোস্বামীর সহিত শ্রীলবৃন্দাবনদাসের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান। মহাপ্রভুও অদ্বৈত আচার্যকে "দৈবত ঈশ্বর" বলিয়াছেন (চৈ. চ. ১।১২।৩২)।

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই বলা হইয়াছে—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু হইতেছেন শ্রীবলরামের (অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের) অংশ। অংশও অংশীর তত্ত্বতঃ অভেদ বলিয়া, মহাবিষ্ণু—সুতরাং মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈতও—এবং বলরাম (বা নিত্যানন্দ)—এই উভয়ের মধ্যেও ভেদ নাই। অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে যে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে তাহাই জানা গেল। শ্রীলবৃন্দাবনদাসও তাহাই বলিয়াছেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—"এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায়॥ ২।৬।১৪৭॥" সুতরাং এই বিষয়েও কবিরাজ-গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনদাসের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীঅদ্বৈতকে শিবও বলা হইয়াছে। এবিষয়েও কবিরাজের সহিত যে বৃন্দাবনদাসের বিরোধ নাই, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—গর্ভোদকশায়ীও মহাবিষ্ণুর এক অংশ-স্বরূপ; সুতরাং গর্ভোদশায়ীর অংশ-সমূহও হইবেন তত্ত্বতঃ মহাবিষ্ণুর অংশ। গর্ভোদশায়ী হইতে যে তিন গুণাবতারের—ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (পালন-কর্তা) এবং শিব (সংহার-কর্তা)—এই তিন গুণাবতারের—অভ্যুদয় হয়, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা বলিয়া গিয়াছেন (চৈ. চ. ১৫ পরিচ্ছেদে)। সুতরাং তত্ত্বতঃ সংহার-কর্তা শিবও মহাবিষ্ণুর অংশ। অদ্বৈতও মহাবিষ্ণুর অংশ বলিয়া তাঁহাতে শিবের অবস্থান অযৌক্তিক এবং তত্ত্ববিরোধী নহে। অদ্বৈতে যে সদাশিব আছেন, কবি কর্ণপূরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন (গৌ. গ. দী॥ ৭৬)। অংশীর মধ্যে অংশ থাকেন।

যাহা হউক, অদ্বৈতাচার্যের ভক্তভাবের কথা যে শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীও যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

অদ্বৈতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণারাধনের কথা কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন। "গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥ চৈ. চ. ১।৩।৮৭॥"

পূর্বোদ্ধৃত স্বরূপদামোদরের দ্বিতীয় শ্লোকের বিবৃতি-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন :—

শ্রীঅদ্বৈত "পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ববিশ্বের সৃজন। অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন॥ জীব নিস্তারিল কৃষ্ণ-ভক্তি করি দান। গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥ ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি

কার্য্য। অতএব নাম তাঁর হইল 'আচার্য্য'॥ বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য। দুই নাম মিলনে হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য'॥ চৈ. চ. ১।৬।২৩-২৬॥", "অদ্বৈত-আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য। তাঁর তত্ত্ব নামগুণ— সকল আশ্চর্য্য॥ যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে। স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥ যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার। যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার॥ আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার। জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥ চৈ. চ. ১।৬।২৯-৩২॥", "চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান। আপনাকে করেন তাঁর দাস-অভিমান॥ সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে। 'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে॥ কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥ মুঞি সে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ। দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥ চৈ. চ. ১।৬।৩৮-৪১॥", অদ্বৈত আচার্য—"এই মত নাচে গায় করে অট্টহাস। লোকে উপদেশে—হও চৈতন্যের দাস॥ চৈ. চ. ১।৬।৪৭॥", "চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৩॥", "ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেই ভাবে অনুগত, তাঁর অংশগণে॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৫॥", সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥ তাঁহার প্রকাশ-ভেদ অদ্বৈত আচার্য্য। কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য॥ বাক্যে কহে—'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'। 'মুঞি তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর॥ জলতুলসী দিয়া করে কায়েতে সেবন। ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৮-৮১॥", "অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার। ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥ মূল ভক্ত-অবতার—শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন॥ চৈ. চ. ১।৬।৯৭-৯৮॥"

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—ঈশ্বর-তত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যের ভক্তভাব-বিষয়েও কবিরাজ-গোস্বামীর সহিত এবং স্বরূপদামোদরের সহিতও শ্রীলবৃন্দাবনদাসের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

ক। **শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের কলহ।** শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—"এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায়॥ ২।৬।১৪৭॥" অর্থাৎ তত্ত্বতঃ তাঁহারা এক বা অভিন্ন, কৃষ্ণলীলার সহায়তার নিমিত্ত দুই স্বরূপে বিরাজিত। এই অনুচ্ছেদে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, মহাবিষ্ণুরূপ অদ্বৈত হইতেছেন নিত্যানন্দরূপ বলরামের অংশ। অংশ ও অংশীর অভেদবিবক্ষাতেই তাঁহাদের অভেদ। হস্ত-পদাদি, দেহের অঙ্গীভূত বলিয়া দেহ হইতে বাস্তবিক অভিন্ন; হস্ত-পদাদি আবার দেহের অংশও। অংশী দেহের প্রতি অংশ হস্ত-পদাদির এবং অংশ হস্ত-পদাদির প্রতি অংশী দেহের স্বাভাবিকী প্রীতি দৃষ্ট হয়; যেহেতু, তাহারা উভয়ে উভয়ের রক্ষণের এবং সুস্থতাদির নিমিত্ত প্রয়াসী। তদ্রূপ অংশী নিত্যানন্দ এবং অংশ অদ্বৈতের মধ্যেও স্বাভাবিকী প্রীতি বিরাজিত এবং তাঁহাদের এই প্রীতিও অভিন্ন, অর্থাৎ নিত্যানন্দের প্রতি অদ্বৈতের এবং অদ্বৈতের প্রতি নিত্যানন্দের প্রীতির মধ্যে কোনও ভেদ নাই, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি সম্যক্‌ভাবে একরূপ। শ্রীলবৃন্দাবনদাসও এ-কথাই বলিয়াছেন। "নিত্যানন্দ অদ্বৈতে অভেদ প্রেম জান॥ ২।৬।১৫৩॥"

নিত্যানন্দের দর্শনে, তাঁহার প্রতি এতাদৃশী প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িলে, অদ্বৈত কখনও কখনও এমন কথা বলিতেন, যথাশ্রুত অর্থে যাহাকে গালাগালি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা গালাগালি নয়। তাহা ব্যাজস্তুতিমাত্র—নিন্দার ছলে স্তুতি বা নিত্যানন্দের স্বরূপ-তত্ত্ব-প্রকাশ। যেহেতু, তাহা শুনিয়া

নিত্যানন্দও রুষ্ট হইতেন না, বরং হর্ষের হাসিই হাসিতেন এবং পরিশেষে পরস্পরের গলাগলি-কোলাকোলিই প্রকাশ পাইত। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে এই উক্তির সমর্থক একটি বিবরণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

মহাপ্রভুর নিকটে শাস্তি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অদ্বৈতাচার্য ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ-খ্যাপন করিতেছেন জানিয়া নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া যে-দিন প্রভু শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতকে শাস্তি দিলেন, সেই দিন অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু আহারে বসিয়াছেন, হরিদাসও দ্বারে বসিয়া ভোজন করিতেছেন। "ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মাত্র শেষ। নিত্যানন্দ হইলা পরম-বাল্যাবেশ ॥ সর্ব্বঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস। প্রভু বোলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস ॥ দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নিহেন জ্বলে। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে (অর্থাৎ বাস্তবিক ক্রোধাবেশ নহে, ক্রোধাবেশের ছল বা ভাব মাত্র) ॥ জাতি-নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ। কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ ॥ গুরু নাহি, বোলয় 'সন্ন্যাসী' করি নাম। জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় -কোন্ গ্রাম ॥ কেহো ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি। ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা হাথী ॥ ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত। এখনে আসিয়া হৈল ব্রাহ্মণের সাথ ॥ নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিব সর্ব্বনাশ। সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস ॥' ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগ্ বাস। হাথে তালি দিয়া নাচে, অট্ট্ অট্ট হাস (বাস্তব ক্রোধাবেশ হইলে অট্টহাসির সহিত নৃত্য সম্ভব হয় না) ॥ অদ্বৈত-চরিত্র দেখি হাসে গৌর রায়। হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি (বোধ হয় দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি) দেখায় ॥ শুদ্ধহাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে। কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে ॥ ক্ষণেকে হইল বাহ্য, কৈল আচমন। পরস্পর সন্তোষে করিলা আলিঙ্গন ॥ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলি। প্রেমরসে দুই প্রভু মহাকুতূহলী ॥ প্রভুবিগ্রহের দুই বাহু দুই জন। প্রীত বই অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ ॥ তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা। বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা ॥ ২।১৯।২৪২-৫৬ ॥"

উল্লিখিত বাক্যসমূহে শ্রীঅদ্বৈতের উক্তির যথাশ্রুত অর্থ বা নিন্দার্থ অতি পরিষ্কার। নিন্দাচ্ছলে তিনি যে নিত্যানন্দের স্তুতি করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। জাতি নাশ করিলেক ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ আমাদের জাত্যভিমান নষ্ট করিয়াছেন। আমরা ব্রাহ্মণ, সমস্ত ঘরে অন্ন ছড়াইয়া দেওয়া ব্রাহ্মণের গৃহে সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ ; তাহাতে ব্রাহ্মণ-সমাজকর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 'আমি ব্রাহ্মণ'—এইরূপ জাত্যভিমান থাকিলেই উল্লিখিতরূপ ভাবনা সম্ভব। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ কৃপা করিয়া সেই অভিমান দূর করিয়া দিয়েছেন। **কোথা হৈতে আসি** ইত্যাদি—এ-স্থলে শ্রীনিত্যানন্দকে মদ্যপ বলা হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ কখনও মদ্য পান করিতেন না ; ললিতপুরের বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আগ্রহে যখন গৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার গৃহে ফলাহারে বসিয়াছিলেন, তখন সেই সন্ন্যাসী 'আনন্দ—মদ্য' আনয়নের প্রস্তাব করিলে শ্রীনিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন—"তবে আমার রড়—তাহা হইলে আমি দৌড়াইয়া পালাইয়া যাইব।" নিত্যানন্দের মদ্যপানের অভ্যাস থাকিলে এ-কথা কখনও বলিতেন না। সুতরাং এ-স্থলে 'মদ্যপ'-শব্দে শ্রীঅদ্বৈতের গূঢ় অভিপ্রায় হইতেছে—প্রেম-মদিরা-পানরত। **গুরু নাহি**—নিত্যানন্দ হইতেছেন শ্রীবলরাম—সুতরাং—ঈশ্বর-তত্ত্ব ; ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তিনি নিজেই জগদ্‌গুরু, বাস্তবিক তাঁহার কোনও গুরু থাকিতে পারে না। **বোলয় সন্ন্যাসী** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ হইতেছেন ব্রজের বলরাম ; বলরাম হইতেছেন মূল ভক্ত-তত্ত্ব, তাঁহার ভক্তি অনাদিসিদ্ধ, কোনওরূপ সাধন-ভজন-লব্ধ নহে। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের ভক্তিও হইতেছে অনাদিসিদ্ধ ; ভজন-

সাধনের কোনও প্রয়োজনই তাঁহার নাই ; সুতরাং ভজন-সাধনের নিমিত্ত সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রয়োজনও তাঁহার নাই। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ন্যায় তাঁহার সন্ন্যাসও হইতেছে স্বরূপানুবন্ধিনী একটি লীলামাত্র। তদনুসারেই তিনি নিজেকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত করেন। **জন্ম বা না জানিয়ে ইত্যাদি**—ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া নিত্যানন্দরূপ বলরামের জন্মাদি নাই, থাকিতেও পারে না ; যেহেতু, তিনি হইতেছেন অজ—জন্মরহিত। প্রকটলীলা-কালে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ন্যায় তাঁহার জন্মও হইতেছে বাস্তবিক জন্মের অনুকরণ মাত্র, মানুষের ন্যায় বাস্তব জন্ম নহে (১।১।২-শ্লোকব্যাখ্যায় 'জগন্নাথসুতায়'-শব্দের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহার জন্মের কথা কেহই জানে না ; যাঁহার জন্মই নাই, তাঁহার জন্মের কথা লোকে কিরূপে জানিবে এবং তাঁহার জন্মস্থানের প্রশ্নই বা কিরূপে উঠিতে পারে ? আবার যাঁহার জন্মই নাই, তাঁহার কোনওরূপ জাতিও থাকিতে পারে না, কুলও থাকিতে পারে না। তবে দ্বারকা-মথুরাদিতে বলরামের যে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয়, তাহা হইতেছে লীলানুরোধে একটি অভিমান মাত্র, অর্থাৎ লীলাশক্তির প্রভাবে জাত একটি দৃঢ়া প্রতীতি মাত্র। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীমূলক এ-সকল বাক্যে বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। **শ্রীনিত্যানন্দ ঢুলিয়া ঢুলিয়া ইত্যাদি**—প্রেমবিহ্বলতাবশতঃ ঢুলিয়া ঢুলিয়া সর্বত্র বিচরণ করেন। ইহাদ্বারা শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে। **ঘরে ঘরে পশ্চিমার ইত্যাদি**—শ্রীনিত্যানন্দ পশ্চিমার (পশ্চিম দেশীয় লোকদের) ঘরে ঘরে ভাত খাইয়াছেন। এই উক্তির গূঢ় রহস্য হইতেছে এইরূপ। বিশ বৎসর পর্যন্ত তীর্থভ্রমণ-কালে শ্রীনিত্যানন্দ ভারতবর্ষের সর্বত্রই বিচরণ করিয়াছেন, কেবল পশ্চিম দেশে নহে। তথাপি কেবল 'পশ্চিমার—পশ্চিমদেশীদিগের' বলার রহস্য হইতেছে এই যে—ব্রজ, দ্বারকা ও মথুরা এই তিনটি শ্রীকৃষ্ণধামই নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তত্রত্য লোকাগণও নবদ্বীপবাসীদের পক্ষে পশ্চিমা লোক। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন যতদিন তাঁহারা ব্রজে ছিলেন, ততদিন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলরামও, শ্রীকৃষ্ণসর্বস্ব এবং শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজপরিকরদের গৃহে ভোজন করিয়াছেন এবং যখন মথুরায় এবং মথুরা হইতে দ্বারকায় গিয়াছেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণসর্বস্ব এবং শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ পরিকরদের গৃহে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলরামও আহার করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের উক্তির গূঢ় তাৎপর্য হইতেছে এই যে—যে-বলরাম দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া, পশ্চিম দিকে অবস্থিত ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের গৃহে ভোজন করিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন সেই বলরামই, অপর কেহ নহেন। এই বাক্যে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন। **এখনে আসিয়া ইত্যাদি**—এক্ষণে (এই গৌরলীলা-কালে) শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং **নিত্যানন্দ-মগ্যপ ইত্যাদি**—প্রেম-মদিরা-পানরত শ্রীনিত্যানন্দ সকলের সর্বনাশ করিবেন—স্বীয় অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য প্রভাবে আমাদের সকলের জাত্যভিমান-বিষয়সম্পত্তি-প্রভৃতিতে সর্ববিধ আসক্তি দূরীভূত করিবেন, ভগবচ্চরণে আমাদের রতি জন্মাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। শ্রীঅদ্বৈতের এই উক্তিতে শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিস্তৃত আলোচনা ২।১৯।২৪৫-৪৯ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ-কলেবর-বৃদ্ধির আশংকায় অতঃপর ব্যাজস্তুতির আর বিশেষ আলোচনা করা হইবে না।

শ্রীবাস-গৃহে প্রভু ঐশ্বর্য-প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত তখন শান্তিপুরে। তাঁহাকে আনিবার নিমিত্ত প্রভু রামাই-পণ্ডিতকে পাঠাইলেন এবং রামাইকে বলিলেন,—'অদ্বৈতকে বলিও যে, নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়াছেন।' অদ্বৈত নবদ্বীপে অসিয়া প্রভুর ঐশ্বর্য দর্শন করিলেন, তাহার পরে, "নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি

ক্যরি হাসে ॥ হাসি বোলে—'ভাল হৈল, আইলা নিতাই। এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥ যাইবা কোথায়, আজি এড়িমু বান্ধিয়া।' ক্ষণে বোলে 'প্রভু' ক্ষণে বোলে 'মাতালিয়া' ॥ অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়। একমূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায় ॥ ২।৬।১৪৪-৪৭ ॥ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ-প্রেম জ্ঞান'। এই অবতারে জানে সেই ভাগ্যবান্ ॥ যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার। সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ—ঈশ্বর-ব্যাভার ॥", "এ-দুইর প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর। দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর ॥ ২।৬।১৫০-৫২ ॥" ২।৬।১৫১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কবিরাজ-গোস্বামীও উল্লিখিতরূপ বিবরণ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কথিত ব্যাপার ঘটিয়াছিল প্রভুর সন্ন্যাসের পূর্বে। কবিরাজের কথিত ব্যাপার—সন্ন্যাসের পরে। কবিরাজের কথিত বিবরণ হইতে জানা যায়, অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধে ব্যাজস্তুতি করিয়াছেন।

সন্ন্যাসের পরে কাটোয়া হইতে বাহির হইয়া প্রেমাবেশে প্রভু তিন দিন তিন রাত্রি রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই তিন দিবসের মধ্যে প্রভুর এবং তাঁহার সঙ্গীদেরও, জলস্পর্শ পর্যন্ত হয় নাই। নিত্যানন্দ কৌশলে প্রভুকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভোজনের নিমিত্ত অদ্বৈত নানাবিধ উপচার প্রস্তুত করিয়াছেন। অদ্বৈত সে-সমস্ত উপচারের সহিত গৌর ও নিত্যানন্দকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন দিয়াছেন। ভোজনে বসিয়া—"নিত্যানন্দ কহে—'কৈল তিন উপবাস। আজি পারণা করিতে ছিল বড় আশ ॥ আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে। অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে ॥' আচার্য্য কহে—'তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী। কভু ফলমূল খাও, কভু উপবাসী ॥ দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলে মুষ্ট্যেক অন্ন। ইহাতে সন্তোষ হও, ছাড় লোভ মন ॥' নিত্যানন্দ কহে—'যবে কৈলে নিমন্ত্রণ। তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥' শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত। কহিলেন তারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥ 'ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে। সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে? তুমি খাইতে পার দশ-বিশ চাউলের অন্ন। আমি তাহা কাহাঁ পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ? যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন তাহা খাঞা উঠ। পাগলাই না করহ—না ছড়াইহ ঝুট ॥' চৈ. চ. ২।৩।৭৬-৮৪ ॥" আচার্যের আগ্রহে প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিলেন। কিন্তু "নিত্যানন্দ কহে—'মোর পেট না ভরিল। লঞা যাহ তোর অন্ন, কিছু না খাইল।' এত বলি এক গ্রাস ভাত হাতে লঞা। উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥ ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে। ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে ॥ অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে। পরম পবিত্র মোরে করিল এই ঢঙ্গে ॥' (কিন্তু আচার্য মুখে নিত্যানন্দকে বলিলেন) 'তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল। তোর জাতি কুল নাহি—সহজে পাগল ॥ আপন-সমান মোরে করিবার তরে। ঝুটা দিলি, বিপ্র বলি ভয় না করিলি ॥" নিত্যানন্দ কহে—'এই কৃষ্ণের প্রসাদ। ইহাকে ঝুটা কহিলে তুমি—কৈলে অপরাধ ॥ শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন। তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥' আচার্য্য কহে 'না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ। সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম ॥ চৈ. চ. ২।৩।৭৬-৯৮ ॥" গূঢ় অর্থ গৌ. কৃ. ত. টীকায় দ্রষ্টব্য।

আর এক দিন নীলাচলে গুণ্ডিচা-মার্জনের দিন ভোজনকালে—"অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি। দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই। অদ্বৈত কহে—'অবধূত সঙ্গে এক পংক্তি। ভোজন করি, না জানিয়ে হবে কোন্ গতি ॥ প্রভু ত সন্ন্যাসী; উহার নাহি অপচয়। অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥

'নান্নদোষেণ মস্করী' এই শাস্ত্রের প্রমাণ। গৃহস্থব্রাহ্মণ আমার এই দোষ-স্থান ॥ জন্ম কুল শীলাচার না জানি যাহার। তার সঙ্গে এক পঙক্তি—বড় অনাচার ॥" নিত্যানন্দ কহে—'তুমি অদ্বৈত আচার্য্য। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তি-কার্য্য ॥ তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে। এক বস্তু বিনা দ্বিতীয় না মানে ॥ হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন। না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥' এই মত দুই জনে করে বোলাবুলি। ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে, যৈছে গালাগালি ॥ চৈ. চ. ২।১২।১৮৬-৯৩ ॥" গূঢ় অর্থ গৌ. কৃ. ত: টীকায় দ্রষ্টব্য।

ভক্তগণ অদ্বৈত-নিত্যানন্দের এ-সকল উক্তি-প্রত্যুক্তির রহস্য জানিতেন। শুনিয়া পরস্পরের প্রতি উভয়ের গাঢ়প্রেম অনুভব করিয়া, তাঁহারা পরমানন্দও অনুভব করিতেন। কিন্তু ভক্তিহীন বহির্মুখ লোকগণ রহস্য বুঝিতে না পারিয়া, যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ করিতেন এবং কেহ কেহ অদ্বৈতের পক্ষ, কেহ কেহ বা নিত্যানন্দের পক্ষ গ্রহণ করিয়া, কেহ কেহ অদ্বৈতকে, কেহ কেহ বা নিত্যানন্দকে, নিন্দাও করিতেন এবং ইহাদ্বারা নিজেদের সর্বনাশ আনয়ন করিতেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"যে না বুঝি দোঁহার কলহ-পক্ষ ধরে। এক বন্দে আর নিন্দে', সেই জন মরে ॥ ২।৬।১৫৩ ॥"

যে-নিত্যানন্দের কৃপাব্যতীত কেহ প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে না, সেই নিত্যানন্দের নিন্দা যে সর্বনাশকরী, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে-অদ্বৈত-সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"প্রেমভক্তি বাঞ্ছা যদি করহ এখনে। তবে ধরি পড় এই অদ্বৈত-চরণে ॥ ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈত-মহাশয়। অদ্বৈতের কৃপায়ে সে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ৩।১০।২৫১-৫২ ॥", সেই অদ্বৈতের প্রতি অবজ্ঞায় কিরূপ সর্বনাশ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাহা হউক, অদ্বৈত-নিত্যানন্দের প্রেম-কোন্দল হইতেছে পরস্পরের বিষয়ে তাঁহাদের অভেদ-প্রেমেরই এক অভিব্যক্তি এবং ইহা তাঁহাদের স্বরূপ-তত্ত্বেরই স্বাভাবিক ধর্ম।

৪৭। শ্রীচৈতন্যভাগবতে গদাধর-তত্ত্ব

গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন :—

"সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥ ২।১৮।১১৪ ॥" তিনি আরও বলিয়াছেন :—

"আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারে বার। 'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার' ॥ ২।১৮।১১৫ ॥"

শ্রীচৈতন্য হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের ধাম হইতেছে—গোলোক বৃন্দাবন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের বৈকুণ্ঠ হইতেছে গোলোক-বৃন্দাবন (পূর্ববর্তী ১-অনুচ্ছেদ এবং ১।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং গদাধর পণ্ডিত যদি শ্রীচৈতন্যের "বৈকুণ্ঠের পরিবার" হয়েন, তাহা হইলে তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের একজন ব্রজ-পরিকর, তাহাই জানা গেল।

শ্রীগদাধরকে আবার "কৃষ্ণের প্রকৃতি" বলা হইয়াছে (২।১৮।১১৪)। প্রকৃতি-শব্দের অর্থ শক্তি। এ-স্থলে "প্রকৃতি" বলিতে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিকেই বুঝায়। যেহেতু, চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর হইতে পারেন না।

রূঢ়ি-অর্থে "পরিবার"-শব্দে পত্নীকে বুঝায়। প্রভু বলিয়াছেন—"গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥

২।১৮।১১৫ ॥" এই রূঢ়ি-অর্থ হইতে বুঝা যায়—গদাধর হইতেছেন ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, শ্রীরাধা বা ললিতাদি কৃষ্ণকান্তাদের কোনও একজন।

এই প্রসঙ্গে প্রভুর আর একটি উক্তিও বিবেচনার যোগ্য। নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরের ভিক্ষার নিমিত্ত গৌড় হইতে এক মান চাউল আনিয়াছিলেন। তাহা তিনি নীলাচলে গদাধরকে দিলে, গদাধরও শ্রীনিত্যানন্দকে সে-স্থানে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। রান্না করিয়া গদাধর স্বীয় সেব্য শ্রীগোপীনাথের ভোগ লাগাইয়াছেন। "হেন কালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥ প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি। বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥ 'গদাধর গদাধর' ডাকে গৌরচন্দ্র। সম্ভ্রমে বন্দেন গদাধর পদদ্বন্দ্ব ॥ হাসিয়া বোলেন প্রভু 'কেন গদাধর। আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর? আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নাহি। না দিলেও তোমরা বলেতে আমি খাই ॥ ৩।৮।১৩৮-৪২ ॥"

এ-স্থলে প্রভু বলিলেন—তিনি নিত্যানন্দ ও গদাধর হইতে ভিন্ন নহেন। নিত্যানন্দ স্বয়ং বলরাম বলিয়া এবং বলরাম আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর বিলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ গৌরচন্দ্রের সহিত যে নিত্যানন্দের তত্ত্বতঃ ভেদ নাই, তাহা বুঝা গেল। শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি গদাধরের সহিত প্রভুর ভেদ না থাকার হেতু এই যে, গদাধর প্রভুর চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি বলিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায়, প্রভু গদাধরকে তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। প্রভুর এই উক্তি হইতেও জানা গেল—গদাধর হইতেছেন প্রভুর স্বরূপ-শক্তি, ব্রজলীলার শ্রীরাধা-ললিতাদির কোনও একজন, অথবা তাঁহাদের সমবায়। কবি কর্ণপূর তাঁহার গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন, নবদ্বীপ-লীলার একই পরিকরেও ব্রজলীলার একাধিক পরিকর দৃষ্ট হয়, আবার নবদ্বীপ-লীলার একাধিক পরিকরেও ব্রজলীলার একই পরিকরের ভাব দৃষ্ট হয়।

গদাধর পণ্ডিত-সম্বন্ধে কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন—"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥ নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতরা যথা ॥ পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দর-বল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥ ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী ন খলু গদাধর এষ ভূ-সুরেন্দ্রঃ। হরিরয়মথবা বা স্বয়ৈর শক্ত্যা ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ ॥ ধ্রুবানন্দ-ব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ। স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ ॥ অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয্যগাৎ ত্রিরূপতাম্। অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরঃ পণ্ডিতঃ ॥ গৌ. গ. দী. ॥ ১৪৭-৫৩ ॥" কর্ণপূরের এই সকল উক্তির মর্ম হইতেছে এই যে—গদাধর পণ্ডিত তত্ত্বতঃ শ্রীরাধা। স্বরূপদামোদরেরও এইরূপ অভিমত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে কর্ণপূর বলিয়াছেন, শ্রীরাধাস্বরূপ-গদাধরে ললিতাও প্রবেশ করিয়াছেন।

কর্ণপূরের এ-সকল উক্তিতে প্রভুকথিত "বৈকুণ্ঠের পরিবার"-বাক্যের রূঢ়ি-অর্থই সমর্থিত হইতেছে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত হইতেছেন—গৌরচন্দ্রের ব্রজলীলার পরিবার—জায়া বা বধূ শ্রীরাধা। শ্রীশুকদেবও শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের "বধূ" বলিয়াছেন—"কৃষ্ণবধ্বঃ। ভা. ১০।৩৩।৭ ॥" "বধূ"-শব্দের অর্থ—জায়া এবং পুত্রবধূ। "বধূর্জায়া স্নুষায়াঞ্চ।"

শ্রীরাধা হইতেছেন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ, সুতরাং স্বরূপতঃ হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-

শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা শক্তি। স্বরূপদামোদরও বলিয়াছেন—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিঃ।" পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা-যায়, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই। "রাধিকা পরদেবতা। * *। সাতু সাক্ষান্মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥ প. পু. পা.॥ ৫০।৫৩-৫৫॥" উক্ত পুরাণে আরও দেখা যায়, শ্রীরাধা নারদকে বলিয়াছেন—"অহঞ্চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে॥ অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যকামকলাত্মকঃ। সত্যং যোষিৎ-স্বরূপোঽহং যোষিচ্চাহং সনাতনী॥ অহঞ্চ ললিতা-দেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা। আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥ প. পু. পা.॥ ৪৪।৪৪-৪৬॥—যাঁহাকে রাধিকা বলা হয়, সেই আমিই ললিতা দেবী (অর্থাৎ ললিতাও আমারই এক প্রকাশ)। নিত্য-কামকলাত্মক বাসুদেবও আমিই। আমি সত্যই রমণীস্বরূপ, আমিই সনাতনী নারী। আমিই ললিতা দেবী এবং আমিই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণে এবং আমাতে সত্য সত্যই ভেদ নাই।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—বৃন্দাবনদাস গদাধরকে "কৃষ্ণের প্রকৃতি" বলিয়াছেন। স্বয়ং প্রভু গদাধরকে তাঁহার "বৈকুণ্ঠের পরিবার" বলিয়াছেন। কর্ণপূরের, শুকদেবের এবং শ্রীরাধিকার উল্লিখিত উক্তি হইতে গদাধর-সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাসের এবং প্রভুর উক্তির সার্থকতা জানা গেল।

কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির তাৎপর্যও উল্লিখিতরূপই। স্বরূপদামোদরের কড়চার আনুগত্যে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি॥ চৈ. চ. ১।১।২৩॥ গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার। 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি গণন যাঁহার॥ চৈ. চ. ১।৭।১৫॥"

কবিরাজ-গোস্বামীর উল্লিখিত উক্তিতে, "গদাধর পণ্ডিতাদি" এবং "গদাধর আদি" বাক্যদ্বয়ের অন্তর্গত "আদি"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই;—ব্রজলীলায় শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরী-আদি সকলেই নবদ্বীপলীলার উপযোগী স্বরূপে নবদ্বীপে বিরাজমান।

শ্রীরাধা গদাধর পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "আদি"-শব্দে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরী প্রভৃতিও যথাযোগ্য স্বরূপে নবদ্বীপ-লীলাতে বর্তমান। গদাধর এবং তাঁহারা সকলেই হইতেছেন প্রভুর "নিজ-শক্তি", "প্রভুর শক্তি-অবতার"। "নিজশক্তি" বলিতে স্বীয় স্বরূপভূতা শক্তিকেই, স্বরূপ-শক্তিকেই, বুঝায়।

এইরূপে দেখা গেল—গদাধর-তত্ত্ব-সম্বন্ধেও কবিরাজ-গোস্বামী, কর্ণপূর এবং স্বরূপদামোদরের সহিত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ঐক্য বিদ্যমান।

৫০। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবাসাদি ভক্তগণের তত্ত্ব

শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন ঃ—"কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম হরিসঙ্কীর্ত্তন। সব প্রকাশিলেন শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে। অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে॥ প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্বপরিকর। জন্ম লভিলেন সভে মানুষ-ভিতর॥ কি অনন্ত, কি শিব, বিরিঞ্চি, ঋষিগণ। যত অবতারের পারিষদ আপ্তগণ॥ ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভার। কৃষ্ণ সে জানেন, যার অংশে জন্ম যার॥ কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে। কেহো রাঢ়ে, ওড়দেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে॥

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ। নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন॥ নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার। অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥ নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্যগোসাঞি॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ-গ্রামে। কোনো মহাপ্রিয়ের সে জন্ম অন্যস্থানে॥ শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥ ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর। শ্রীহট্টে এ-সব বৈষ্ণবের অবতার॥ পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান। চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥ চাটিগ্রামে হইল ইহা সভার প্রকাশ॥ বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥ ১।২।২০-৩৩।"

এ-সকল উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হইতেছেন মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ ভক্ত।

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ভক্তগণ যখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু যেভাবে ভক্তবৃন্দকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাহাও বলিয়াছেন ঃ—

"প্রভু বোলে—'তোমরা চিন্তহ কি কারণ। তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥ তোমা সভার জ্ঞান—আমি সন্ন্যাস করিয়া। চলিলাঙ আমি তোমা-সভারে ছাড়িয়া॥ সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে। তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥ সর্ব্বকাল তোমরা সকল মোর সঙ্গ। এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥ ২।২৬।৬-৯॥"

প্রভুর নিজমুখের এ-সকল উক্তি হইতেও জানা গেল—প্রভুর সঙ্গী-ভক্তগণ হইতেছেন তাঁহার নিত্য-পরিকর। শ্রীলবৃন্দাবনদাস বহু স্থলে এইরূপ তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কবিরাজ-গোস্বামীও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীলস্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্॥ চৈ. চ. ১।১।১৪-শ্লোক॥—ভক্তরূপ (স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য), ভক্তস্বরূপ (নিত্যানন্দ), ভক্তাবতার (শ্রীঅদ্বৈত), ভক্তাখ্য (শ্রীবাসাদি) এবং ভক্তশক্তিক (শ্রীগদাধরাদি)—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণকে (শ্রীচৈতন্যকে) নমস্কার করি।"

এই শ্লোকের বিবৃতিতে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর। অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥ রাসাদিবিলাসী ব্রজললনা-নাগর। আর যত দেখ সব—তাঁর পরিকর॥ সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥ একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব—চৈতন্য ঈশ্বর। ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥ কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব—। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥ ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি। ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥ ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি। এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই॥ এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুব চরণ॥ এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি মানি। চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—আরাধক জানি॥ শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ। শুদ্ধভক্ত-তত্ত্বমধ্যে সভার গণন॥ গদাধর আদি প্রভুর শক্তি-অবতার। 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি গণন যাঁহার॥ যাঁহা সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার। যাঁহা সভা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার॥ যাঁহা সভা লৈয়া করেন প্রেম আস্বাদন। যাঁহা সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন॥ এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া। পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া। পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন॥ যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥ পুনঃ পুন পিয়া পিয়া হয় মহামত্ত। নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥ পাত্রাপাত্র

বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাঁহা পায় করে প্রেমদান॥ লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাণ্ডার—প্রেম শতগুণ বাড়ে॥ চৈ. চ. ১।৭।৫-২২॥"

এ-সকল উক্তি হইতে জানা গেল—দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম তত্ত্বের ন্যায়, চতুর্থ শ্রীবাসাদি কোটি কোটি ভক্ততত্ত্বের সহিতও প্রভুর "নিত্য বিহার," অর্থাৎ শ্রীবাসাদি ভক্তগণও হইতেছেন প্রভুর নিত্যপরিকর।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীবাসাদি ভক্তগণের তত্ত্ব-সম্বন্ধেও কবিরাজ-গোস্বামীর এবং স্বরূপদামোদরের সহিত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

৫১। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

পূর্ববর্তী ২০-৫০-অনুচ্ছেদসমূহে যে-সকল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, শ্রীলবৃন্দাবনদাস কোনও তত্ত্ব-সম্বন্ধেই একস্থলে কোনওরূপ ধারাবাহিক আলোচনা করেন নাই। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের লীলা-মহিমা-বর্ণনেই ছিল তাঁহার পরম আবেশ। লীলা-মহিমা-বর্ণন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে, তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং বলাইয়াছেন, তাহা হইতেই বিভিন্ন তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নির্ণয় করার চেষ্টা করা হইয়াছে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধেও সেই কথা। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন স্থলে তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং বলাইয়াছেন, তাহা হইতেই সাধ্যসাধন-সম্বন্ধেও তাঁহার অভিমত-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার সমস্ত উক্তির উল্লেখ সম্ভব নয়, কয়েকটি উক্তিমাত্র উল্লিখিত হইবে।

তৎপূর্বে সাধ্যসাধন-সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। সাধনের ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেই সাধ্য বলে।

বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র, জীবের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত, মুখ্যতঃ তিনটি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন—সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব। যাহার সহিত জীবের অনাদি অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই হইতেছে সম্বন্ধ-তত্ত্ব এবং তাহাই হইতেছে সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত, তাহাই হইতেছে জীবের বেদ্য, জানিবার বস্তু। বৈদিক শাস্ত্র হইতে জানা যায়, সেই বস্তুটি হইতেছেন—পরব্রহ্ম পরমাত্মা। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—গীতার এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি (১৫।১৫) হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সর্ববেদ-বেদ্য সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা। পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিতই জীবের অনাদি অবিচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধ; সুতরাং তিনিই হইতেছেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব, বেদ্য বস্তু, উপাস্য।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি (১।৪।৮ এবং ২।৪।৫) হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম পরমাত্মাই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয়। প্রিয়ত্ব-বস্তুটি স্বরূপতঃই পারস্পরিক বলিয়া জীবও তাঁহার প্রিয়। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে-অনাদি অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ, তাহা হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। এজন্যই বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥ ১।৪।৮॥—আত্মাকেই, অর্থাৎ পরমাত্মা পরব্রহ্মকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, (তিনি আত্মাকে প্রিয়রূপে পাইবেন এবং) তাঁহার প্রাপ্ত প্রিয়বস্তু কখনও পরিমিত আয়ুষ্কাল-বিশিষ্ট (অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত) হয় না।" (বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী॥ ১৬।২-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য হইতেছে—প্রিয়সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা (উপাসনা=সেবা)। সেবার বিনিময়ে প্রিয়ের নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া হইতেছে প্রিয়ত্ব-বিরোধী। সুতরাং প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) সেবা হইতেছে—নিজের জন্য ভুক্তি-মুক্তি-প্রভৃতির বাসনা সম্যক্রূপে পরিত্যাগপূর্বক কেবল কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। ইহাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য (মশ্রী ॥ ১৬।২-অনু দ্রষ্টব্য)।

প্রয়োজন-তত্ত্ব। কিন্তু কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার নিমিত্ত অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন হইতেছে—তাদৃশী সেবার বাসনার। সেবার বাসনা চিত্তে না থাকিলে, সেবা হয় না, তাহা হয় যান্ত্রিকী সেবার ন্যায় নিরর্থক। এই কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ চৈ. চ. ১।৪।১৪১ ॥" (মশ্রী ॥ ১৬।২-ঙ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই প্রেমেরই নামান্তর হইতেছে—প্রেমভক্তি, বা ভক্তি, অর্থাৎ সাধ্যা ভক্তি (যাহা সাধনের ফলে পাওয়া যায়)। সুতরাং কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম বা প্রেমভক্তিই হইতেছে—সাধ্যবস্তু। জীবের স্বরূপানুবন্ধি-কর্তব্য কৃষ্ণসুকৈ-তাৎপর্যময়ী সেবার নিমিত্ত ইহার অপরিহার্য প্রয়োজন আছে বলিয়া, এই প্রেম হইতেছে প্রয়োজন-তত্ত্ব।

অভিধেয়-তত্ত্ব। প্রেম-প্রাপ্তির নিমিত্ত অবশ্য-কর্তব্যরূপে যে-উপায়ের বা সাধনের কথা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাই হইতেছে অভিধেয়-তত্ত্ব। এই অভিধেয় হইতেছে সাধন-ভক্তি। বৃহদারণ্যকও বলিয়াছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥ ২।৪।৫ ॥" এ-স্থলে পরব্রহ্ম পরমাত্মার শ্রবণ-মনন-ধ্যানের (স্মরণের) কথাই বলা হইয়াছে। শ্রবণ-মননাদি হইতেছে সাধন-ভক্তির অঙ্গ। প্রেমপ্রাপ্তির জন্য যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নির্গুণ-ভক্তিযোগ বলে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে বলিয়াছেন—"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ভা. ৩।২৯।১১-১২ ॥ —(কপিল দেব প্রথমে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী—এই ত্রিবিধা গুণময়ী ভক্তির কথা বলিয়াছেন এবং গুণময়ী ভক্তি যে মায়িক গুণের দ্বারা বহুবিধ ভেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাও বলিয়াছেন। তাহার পরে নির্গুণ ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছেন) আমার গুণ-শ্রবণ-মাত্রে সর্বান্তর্যামী পুরুষোত্তম আমাতে, সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধানশূন্যা) এবং অব্যবহিতা (অর্থাৎ গুণময়ী ভক্তিতে যে-ভেদদর্শন আছে, সেই ভেদদর্শন বর্জিতা ॥ স্বামিপাদ।) যে-মনোগতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।" এই প্রসঙ্গে কপিলদেব আরও বলিয়াছেন—"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ভা. ৩।২৯।১৩ ॥ —যাঁহারা আমার সেবাই (অর্থাৎ কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই) কামনা করেন, তাঁহারা নিজেরা তো সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তিই চাহেন না, আমি উপযাচক হইয়া তাহা দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।" ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তাৎপর্যই প্রকাশ পাইয়াছে।

জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাইতে হইলে যে-সাধন আবশ্যক, ভগবান্ কপিলদেব তাহাকে নির্গুণ ভক্তিযোগ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য-বিষয়-কথন-প্রসঙ্গে এই

সাধনকে "পরম ধর্ম" বলা হইয়াছে এবং তাহার লক্ষণও কথিত হইয়াছে। "ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্মৎসরাণাং সতাম্ ॥ ভা. ১।১।২ ॥ —এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্‌ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধানলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি॥" এই টীকার তাৎপর্য—"এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে পরম-ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। যাহাতে ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ কপট প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হয়, তাহাই পরম ধর্ম। এ-স্থলে (অর্থাৎ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব-শব্দে) প্র-শব্দে মোক্ষ-বাসনাও (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কামের কথা দূরে, মোক্ষের—পঞ্চবিধা মুক্তির—বাসনাও) যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাই বলা হইয়াছে। (তবে কিসের জন্য পরম-ধর্মের অনুষ্ঠান ?) কেবলমাত্র ঈশ্বরের (অব্যবহিত পূর্ববর্তী "জন্মাদ্যস্য যতো"—ইত্যাদি শ্লোকে কথিত পরব্রহ্মশ্রীকৃষ্ণের) আরাধনা-লক্ষণ ধর্মই পরম ধর্ম। (রাধ্-ধাতু—সন্তোষে। আরাধন—সম্যক্ সন্তোষ-সাধন। কেবলমাত্র ঈশ্বরের সম্যক্ সন্তোষ বা সম্যক্ প্রীতিই যে ধর্মের লক্ষণ, তাহাই পরম ধর্ম)। ধর্ম, অর্থ ও কামের (অর্থাৎ ভুক্তির) কথা তো দূরে, মোক্ষও হইতেছে "কৈতব—কপটতা"। কেননা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বাসনায় ফলাভিসন্ধান—নিজের জন্য কিছু চাওয়া—বিদ্যমান। যাহাতে এতাদৃশ ফলাভিসন্ধান থাকে, তাহা কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ (কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা যাহার লক্ষণ, তাদৃশ) ধর্ম হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিতে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রতিপাদ্য-বিষয়ের কথনেও, বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্যই প্রকাশ পাইয়াছে—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য এবং তাহার প্রাপ্তির সাধন হইতেছে—নিগুণ ভক্তিযোগ, বা নির্মৎসর সাধুদিগের পরম-ধর্ম।

যাহা হউক, চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকিলে যে প্রেম পাওয়া যায় না, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে শ্রীপার্বতীদেবীর বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। "ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ প্রেমসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ৪৬।৬২ ॥"

বৃহদারণ্যকে "প্রেম"-শব্দটি নাই ; কিন্তু অন্য শ্রুতিতে তাহা দৃষ্ট হয়। "স হোবাচ যাজ্ঞ্যবল্ক্যস্তৎ পুমান্ আত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ॥ ইতি শতপথশ্রুতৌ॥"—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর "ভক্তিসন্দর্ভঃ"-নামক গ্রন্থের ২৩৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রমাণ। সারার্থ—জীব আত্মহিতের নিমিত্ত প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজন (সেবা) করিবে।

এইরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—**সম্বন্ধ-তত্ত্ব** হইতেছেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই জীবের উপাস্য। **অভিধেয়-তত্ত্ব** হইতেছে সাধনভক্তি, নির্গুণ-ভক্তিযোগ, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনাবর্জিত পরম-ধর্ম। গোপালপূর্বতাপনীশ্রুতিও বলেন—" ওঁ কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ ১।১ ॥ ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবামুষ্মিন্ মনঃকল্পনম্ ॥ ১।৩ ॥" গোপালোত্তরতাপনীও বলেন—

"বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥ ১৮ ॥" তিনিই জীবের উপাস্য। আর, প্রয়োজন-তত্ত্ব হইতেছে কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম বা প্রেমভক্তি।

এক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে।

ক। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সম্বন্ধ-তত্ত্ব-সূচক বাক্যঃ

(১) শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

(সংসারী জীব, অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ অনাদিকাল হইতেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। সম্বন্ধ-তত্ত্বের, বা তাঁহার ধাম বা পরিকরত্ব-প্রাপ্তির নিমিত্ত সম্বন্ধ-তত্ত্বের ভজন বা উপাসনাই জীবের কর্তব্য। সুতরাং, যাঁহার প্রাপ্তির, বা যাঁহার ধাম বা পরিকরত্ব-প্রাপ্তির কথা বলা হয় এবং যাঁহার ভজনের বা উপাসনার উপদেশ দেওয়া হয়, তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে)।

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"—বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি। ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়া করি ॥ ১।৯।১৮২ ॥"

গদাধর পণ্ডিতের প্রতি—"প্রভু বোলে—'গদাধর! তোমরা সুকৃতি। শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ় মতি ॥ ২।১।৯৫ ॥"

পঢ়ুয়াদের প্রতি "প্রভু বোলে—'সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন ॥ কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর। অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ কৃষ্ণের, চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে। ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্যকথনে ॥ ২।১।১৪৫-৪৭ ॥" সম্বন্ধ-তত্ত্বই সর্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

পঢ়ুয়াদের প্রতি প্রভুর উক্তি—"করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন। সেবকবৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥ হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতিমতি। পঢ়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি ॥ দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥ ২।১।১৫০-৫২ ॥ কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে ॥ ২।১।১৫৪ ॥, পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান ॥ অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন। কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন ॥ ২।১।১৫৭-৫৮ ॥ শুন ভাই সব! সত্য আমার বচন। ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদ পদ্ম-ধন ॥ ২।১।১৬২ ॥"

শচীমাতার নিকটে প্রভুর উক্তি—"জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥ চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি। কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥ ২।১।১৯৮-৯৯ ॥ কৃষ্ণের সেবক জীব, কৃষ্ণের মায়ায়। কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায় ॥ ২।১।২২৮ ॥ অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে। কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥ এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি। মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বোল 'হরি' ॥ ২।১।২৩১-৩২ ॥"

পঢ়ুয়াদের প্রতি প্রভুর উক্তি—"এই মত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি। হেন কৃষ্ণে ভাই সব! কর দৃঢ়ভক্তি ॥ ২।১।৩২৭ ॥ অঘ-বক-পূতনারে যে কৈল মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥ ২।১।৩৩০ ॥ যাবত আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবত কৃষ্ণের পাদপদ্মে কর ভক্তি ॥ কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন। চরণে ধরিয়া বোলোঁ—'কৃষ্ণে দেহ' মন ॥ ২।১।৩৩৪-৩৫ ॥"

প্রভুর প্রতি শ্রীবাসাদি ভক্তগণের উপদেশ—"কৃষ্ণ ভজিলে সে বাপ সব সত্য হয়। না ভজিলে বিদ্যা রূপ কিছু নয়॥ কৃষ্ণ সে জগত-পিতা, কৃষ্ণ সে জীবন। দৃঢ় করি ভজ বাপ! কৃষ্ণের চরণ॥ ২।২।৩৭-৩৮॥"

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের প্রতি প্রভুর আদেশ—"শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস! সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা'॥ ২।১৩।৬-৭॥"

নগরবাসীদের প্রতি নিত্যানন্দ-হরিদাসের উপদেশ—"আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে। 'বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥ কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই একমন॥' ২।১৩।১৪-১৫॥"

জগাই-মাধাইর প্রতি নিত্যানন্দ-হরিদাসের উপদেশ—"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥ তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥ ২।১৩।৮১-৮২॥"

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি—"ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই॥ ২।২০।৯৫॥"

সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ গৃহত্যাগের রাত্রিতে ভক্তদের প্রতি—"আজ্ঞা করে প্রভু সভে—'কৃষ্ণ গাও গিয়া॥ বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন॥ যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার। তবে কৃষ্ণব্যতিরিক্ত না গাইব আর॥ কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বোলহ বদনে॥ ২।২৬।৭৩-৭৬॥"

কাটোয়ার কেশবভারতীর প্রতি প্রভুর উক্তি—"'অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়। পতিত-পাবন তুমি মহা কৃপাময়॥ তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণ-নাথ। নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত'॥ কৃষ্ণদাস্য বই যেন মোর নহে আন। হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান॥ ২।২৬।২৫০-৫২॥"

প্রভুর নিকটে সার্বভৌমের উক্তি—"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ ভজন। তাহারে সে বলি 'যোগী-সন্ন্যাসী' লক্ষণ॥ ৩।৩।৩৮॥"

শ্রীলবৃন্দাবনদাসের উক্তি—"পরম নিগূঢ় এ-সকল কৃষ্ণকথা। ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥ ৩।৩।১৪৬॥"

বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে—"ঈষত হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি। আশীর্ব্বাদ করেন—'কৃষ্ণেতে হউ মতি॥ বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ হউ সভার জীবন-ধন-প্রাণ॥ ৩।৩।৩২২-২৩॥"

শ্রীলবৃন্দাবনদাসের উক্তি—"এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়। ভক্তসেবা হৈতে সে সভেই কৃষ্ণ পায়॥ ৩।৩।৪৭৭॥"

এ-স্থলে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে যে-সকল উক্তি উদ্ধৃত হইল, তৎসমস্ত হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—**নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব।**

পূর্বোল্লিখিত শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য হইতেও যে তাহাই জানা যায়, পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু

বলিয়াছেন—"বেদশাস্ত্রে কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥ বেদাদি সকল শাস্ত্রে—কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ। চৈ. চ. ২।২০।১২৬-২৭॥" শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে প্রভু যে-সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২০-২১ পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে তাহা বর্ণন করিয়া, সর্বশেষে প্রভুর উক্তিতে বলিয়াছেন—"এইত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার। বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার॥ চৈ. চ. ২।২২।২॥"

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণই যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, সেই বিষয়ে শ্রীলবৃন্দাবনদাসের সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান এবং মহাপ্রভুর উক্তির সহিতও বৃন্দাবনদাসের উক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

(২) **শ্রীগৌরাঙ্গের সম্বন্ধ-তত্ত্ব-সূচক বাক্য।** কিন্তু সম্বন্ধ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে অন্যরূপ বাক্যও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দৃষ্ট হয়। কয়েকটি উক্তি এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীলবৃন্দাবনদাসের উক্তি—"যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা। তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা॥ ১।১২।১৫৯॥", "এ-সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ। ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহে তার মন॥ ২।৮।৩২৬॥"

প্রভুর প্রতি মুরারি গুপ্তের উক্তি—"সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার। তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥ ২।১০।২৩॥"

শ্রীলবৃন্দাবনদাসের উক্তি—"যত যত শুন যার মহত্ত্ব বড়াঞি। চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাই॥ ২।১০।১৫৪॥", "ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়। তাহার আলাপে হয়, সুকৃতির ক্ষয়॥ ২।১০।১৫৮॥", "মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন। সেহো মুকুন্দের সঙ্গে হইব গায়ন॥ ২।১০।২৬১॥" (এ-স্থলে মুকুন্দের সঙ্গে গৌর-পার্ষদত্ব-প্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে), "ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥ বড় কীর্ত্তি হইলে চৈতন্য নাহি পাই। ভক্তিবশ সবে প্রভু—চারিবেদে গাই॥ ২।১০।২৭৬-৭৭॥", "চৈতন্যের ভক্ত'—হেন নাহি যার নাম। যদি বা সে বস্তু, তভু তৃণের সমান॥ নিত্যানন্দ কহে—'আমি চৈতন্যের দাস'। অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ॥ তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি। নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি॥ ২।১০।২৯৯-৩০১॥", "পক্ষিমাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম। সেহো সত্য পাইবেক চৈতন্যের ধাম॥ ২।১০।৩১৬॥"

ভক্তগণের প্রতি প্রভুর উক্তি—"জন্ম জন্ম তোমরা পাইবে মোর সঙ্গ। তোমাসভার ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ॥ ২।১০।২৮৫॥"

মাধাইর নিকটে নিত্যানন্দের উক্তি—"যে জন চৈতন্য ভজে, সে-ই মোর প্রাণ। যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ॥ না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়। মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায়॥ ২।১৫।৬৭-৬৮॥"

বৃন্দাবনদাসের উক্তি—"বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর। ভক্তি বিনে জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥ ২।২২।১৬॥", "প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে। হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে॥ ৩।১।২৭০॥", "যে শুনয়ে এ-সব চৈতন্য-গুণগ্রাম। সে যায় সংসার তরি শ্রীচৈতন্যধাম॥ ৩।৩।১৪৫॥", "ভজ ভজ আরে ভাই! চৈতন্য-চরণে। অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে॥ যাহার স্মরণে সর্ব্ব-তাপ-বিমোচন। ভজ ভজ সেই ন্যাসিমণির চরণ॥ ৩।৩।৪১৩-১৪॥", "এ-সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষমনে। শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে॥ ৩।৩।৫৩৪॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্ ॥" ইত্যাদি ১১।৫।৩২-শ্লোকে বর্তমান কলি-যুগের উপাস্য-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে—তিনি যে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ, তাহাও সেই শ্লোকে বলা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের অবতরণের হেতু-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীলবৃন্দাবনদাস এই ভাগবত-শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বৃন্দাবনদাসের এইরূপ অভিপ্রায় জানা যায় যে, শ্রীমদ্ভাগবতে যে-উপাস্যস্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। "সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে ॥ ২।২৩।১৫৩ ॥" এবং "গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়। সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে নাচি যায় ॥ ২।২৩।২৩৬ ॥"—এ-সকল বাক্যেও বৃন্দাবনদাস তাহাই বলিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে বুঝা যায়, বৃন্দাবনদাস প্রভুর উপাস্যত্বের কথাই বলিয়াছেন।

এ-স্থলে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে যে-কয়টি উক্তি উদ্ধৃত হইল, তৎসমস্ত হইতে জানা যায়—**শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব।**

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে শ্রীচৈতন্যের শ্রুতিবেদ্যত্বের কথা বলিয়া শ্রীচৈতন্য যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। যথা, "সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা। বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো র্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥" শ্রীচৈতন্য যে সর্বদা উপাস্য, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার প্রথম চৈতন্যাষ্টকের প্রথম শ্লোকে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। যথা, "সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং বহদ্ভির্গীর্বাণৈ-র্গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ। স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্ স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো-র্যাস্যতি পদম্ ॥" এ-স্থলে শ্রীচৈতন্যের সর্বদা উপাস্যত্বের কথা বলিয়াও শ্রীপাদরূপগোস্বামী জানাইলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীগৌরাঙ্গ যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, এই বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের সহিত রূপগোস্বামীর ঐক্য বিদ্যমান। শ্রীপাদ রূপ হইতেছেন কবিরাজ-গোস্বামীর একজন শিক্ষাগুরু। তাঁহার উক্তিও শ্রীরূপের উক্তির অনুরূপ। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের ১।৪-পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের উল্লিখিত "সুরেশানাং দুর্গং"—ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃতও করিয়াছেন। কবিরাজ-গোস্বামী বহু স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনের এবং প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। যথা,

"প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন। চৈতন্যচরণে পায় গাঢ়প্রেমধন ॥ চৈ. চ. ২।৯।৩৩২ ॥ হেন শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা। চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ চৈ. চ. ৩।১০।১৫৭ ॥ হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন। সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন ॥ অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া। চৈতন্যনিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ চৈ. চ. ১।৮।১১-১২ ॥ ইহা যেই শুনে, সে-ই গৌরচন্দ্র পায়। সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয় ॥ চৈ. চ. ২।১৩।১৯৯ ॥" ইত্যাদি। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের একটি উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—"চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম। চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥ চৈ. চ. ২।১।২৪ ॥"

কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হওয়ার অনেক পূর্বে শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয় মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ বৃন্দাবনবাসী শ্রীললোকনাথ গোস্বামীর নিকটে দীক্ষা-গ্রহণ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর

নিকটে ভক্তিশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আনুগত্যেই ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার "প্রার্থনায়" লিখিয়া গিয়াছেন—

"কৃষ্ণচৈতন্যদেব, রতি মতি তারে সেব, প্রেমকল্পতরু দাতা ॥", "আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ। না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষকূপে, দগ্ধ হৈল এ-পাঁচ পরাণ ॥", "পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥", "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥"—ইত্যাদি।

শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুরের এ-সকল উক্তি হইতে জানা যায়, তিনিও এবং শ্রীজীব-লোকনাথাদি গোস্বামীগণও, শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীলবৃন্দাবনদাসের সহিত পরবর্তী আচার্য্যের ঐক্যই দৃষ্ট হয়।

(৩) উভয় স্বরূপকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলার রহস্য। শ্রীলবৃন্দাবনদাস এবং তৎপরবর্তী নরোত্তমদাস এবং কবিরাজ-গোস্বামী পর্যন্ত, সকলেই যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ—এই উভয় স্বরূপকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরব্রহ্ম-পরমাত্মা স্বয়ংভগবান্, সুতরাং তিনি সম্বন্ধ-তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যও সেই শ্রীকৃষ্ণই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যও সম্বন্ধ-তত্ত্ব। কিন্তু কেবল এই তথ্যটুকু জানাইবার নিমিত্তই যে উভয় স্বরূপকে সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। একথা বলার হেতু কথিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ—এই উভয়ই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ বলিয়াই যদি উভয়কে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—সুতরাং পরমার্থভূত-বস্তু লাভের নিমিত্ত উপাস্য বা ভজনীয়—বলা হইত, তাহা হইলে, হয় শ্রীকৃষ্ণের, আর না হয় শ্রীচৈতন্যের ভজন করিলেই জীব পরমার্থভূত বস্তু লাভ করতে পারিতেন, উভয়-স্বরূপের উপাসনার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে উভয় স্বরূপের ভজনের কথাই যে জানা যায়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

উভয়-স্বরূপের ভজনের উপদেশ-সূচক বহু বাক্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বহু বাক্যে উভয় স্বরূপের প্রাপ্তি এবং উভয়-স্বরূপের ধাম-প্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে। দু'য়েকটি উক্তি এ-স্থলেও পুনরুল্লিখিত হইতেছে। যথা,—

"দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণ নাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম ॥ ২।১।১৫২ ॥ ভক্তসেবা হৈতে সে সভেই কৃষ্ণ পায় ॥ ৩।৩।৪৭৭ ॥"—এ সমস্ত উক্তি হইতে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির এবং কৃষ্ণধাম-প্রাপ্তির কথা জানা যায়।

আবার, "বড় কীর্ত্তি হইলে চৈতন্য নাহি পাই ॥ ২।১০।২৭৭ ॥ পক্ষিমাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম। সেহো পাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥ ২।১০।৩১৬ ॥ বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর ॥ ২।২২।৬ ॥ সে যায় সংসার ছাড়ি শ্রীচৈতন্যধাম ॥ ৩।৩।১৪৫ ॥"—এ-সমস্ত উক্তি হইতে শ্রীচৈতন্য-প্রাপ্তির এবং শ্রীচৈতন্যের ধাম-প্রাপ্তির কথা জানা যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ হইলেও তিনি কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নহেন, তিনি হইতেছেন একই বিগ্রহে শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের এক আবির্ভাব-বিশেষ এবং তাঁহার ধাম নবদ্বীপও

হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক-বৃন্দাবনের এক আবির্ভাব-বিশেষ (পূর্ববর্তী ৩৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বতোভাবে একরূপ নহেন, তাঁহাদের ধামও সর্বতোভাব একরূপ নহে এবং সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাপ্তিও এক রকম নহে এবং শ্রীকৃষ্ণের ধাম-প্রাপ্তি এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ধামপ্রাপ্তিও এক রকম নহে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গের যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ধাম অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গের ধামেরও বৈশিষ্ট্য আছে। এইরূপ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই শ্রীচৈতন্যভাগবতে পৃথক পৃথকভাবে উভয় স্বরূপের প্রাপ্তি এবং উভয় স্বরূপের ধাম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে।

স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রেমের বিষয় এবং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রেমের আশ্রয়। উভয় স্বরূপের ধামে উভয় স্বরূপের প্রাপ্তিতে, অর্থাৎ উভয়-স্বরূপের সেবা-প্রাপ্তিতেই, স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপের প্রাপ্তির পূর্ণ সার্থকতা। সে-জন্যই উভয় স্বরূপের প্রাপ্তি এবং উভয় স্বরূপের ধাম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দের উপদেশ হইতেও তাহা জানা যায়। প্রভুর আদেশে তিনি নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। আবার, মাধাইর নিকটে তিনি বলিয়াছেন—"যে জন চৈতন্য ভজে, সেই মোর প্রাণ॥ ২।১৫।৬৭॥" শ্রীনিত্যানন্দ যে গৌরের আদেশকে বাতিল করিয়া নিজের আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহা কল্পনারও অতীত। উভয়-স্বরূপের সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত, শ্রীনিত্যানন্দ উভয় স্বরূপেরই ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

বৃন্দাবনদাসের পরবর্তী আচার্যগণও তদ্রূপই বলিয়াছেন। শ্রীললোকনাথ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর শিক্ষার শিষ্য নরোত্তমদাস তাঁহাদেরই আনুগত্যে, তাঁহার প্রার্থনায়, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা যেমন বলিয়াছেন, তেমনি আবার শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনের কথাও বলিয়াছেন। যথা,—"রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে মরণে। তাঁর স্থান (ধাম) তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রি দিনে।" ইত্যাদি॥ "হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু। মনুষ্য-জনম পাঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥" ইত্যাদি॥ আবার, "আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ-চরণ। না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ-বিষ-কূপে, দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ॥" ইত্যাদি॥ তাঁহার উভয় স্বরূপের ভজনেচ্ছার উদ্দেশ্য যে উভয় স্বরূপের ধামে উভয় স্বরূপের প্রাপ্তি, স্বীয় গুরুদেব লোকনাথ গোস্বামীর চরণে প্রার্থনা-প্রসঙ্গে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যথা,—"হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পাদদ্বন্দ্বে। কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হঙ পূর্ণকাম। হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥"

উভয় স্বরূপের ভজন-রীতির একটি ইঙ্গিতও শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা হইতে জানা যায়। "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥ কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন। রতন-বেদীর উপর বসাব দু'জন॥ শ্যাম-গৌরী-অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥"-ইত্যাদিরূপে রাধাকৃষ্ণের সেবা প্রার্থনা করিয়া শ্রীলনরোত্তমদাস উপসংহারে বলিয়াছেন— "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস।" ইহা হইতে জানা যায়, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস"-রূপেই তিনি রাধাকৃষ্ণের সেবার অভিলাষ করেন। তাৎপর্য এই যে— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবার যোগেই রাধাকৃষ্ণের সেবা অভিলষিত। তাঁহার প্রার্থনায় তিনি অন্যত্রও বলিয়া গিয়াছেন—"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রস-সার। গৌরাঙ্গের মধুর লীলা,

যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥ যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি। গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী ॥ ** ॥ গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যে বা ডুবে, সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ! বলি ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥" এ-সকল উক্তি হইতেও জানা গেল, গৌরাঙ্গ-গুণে "ঝুরিতে—তন্ময় হইতে"—পারিলেই রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে, গৌর-প্রেম-রসার্ণবের তরঙ্গে ডুবিতে পারিলেই রাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ হইতে পারা যায়, রাধামাধবের অন্তর জানিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ সেবা করা যায়। ইহা হইতেও গৌর-ভজনের যোগে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কথা জানা যায়।

বৃন্দাবনের শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামীর শিক্ষার শিষ্য কবিরাজ-গোস্বামীও, তাঁহাদের আনুগত্যে, এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার তাৎপর্যও উল্লিখিতরূপই। তিনি বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিগে বহে যাহা হৈতে। সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মন-হংস চরাহ তাহাতে ॥ চৈ. চ. ২।২৫।২২৩ ॥" এই উক্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী জানাইলেন—চৈতন্যলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে বিচরণ করিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলার শত শত ধারার মধ্যে সাধকের অভীষ্ট যে-কোনও ধারায় প্রবেশ লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যলীলারসে নিমগ্ন হইতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণলীলার স্ফুরণ হইতে পারে। ইহা হইতেও জানা গেল—শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনের যোগেই শ্রীকৃষ্ণভজন কর্তব্য। ইহার পরে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অক্ষয় সরোবরের মহিমাও কীর্তন করিয়াছেন। যথা—"কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে (যে গৌরলীলারূপ সরোবরে) প্রফুল্ল পদ্মবন, তার মধু কর আস্বাদন। প্রেমরস-কুমুদবনেও প্রফুল্লিত রাত্রিদিনে, তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ নানাভাবে ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ, যাতে সভে করেন বিহার। কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল, ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥ সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হৈয়া, সদা তাঁহা করহ বিলাস। খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ, অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ চৈ. চ. ২।২৫।২২৫-২৭ ॥ চৈতন্যলীলা-মৃতপূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য। সাধুগুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সে-ই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ চৈ. চ. ২।২৫।২২৯ ॥" উভয় স্বরূপের লীলারসের আস্বাদনেই যে মাধুর্যের প্রাচুর্য, তাহাই কবিরাজ-গোস্বামী এ-স্থলে জানাইলেন।

এইরূপে দেখা গেল—উভয় স্বরূপের ভজনের কথা এবং তাহার ফলের কথা, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে যাহা জানা যায়, পরবর্তী আচার্যগণও তাহাই বলিয়াছেন।

খ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অভিধেয়-তত্ত্ব। সম্বন্ধ-তত্ত্ব-প্রাপ্তির অনুকূল সাধনের নামই অভিধেয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে যখন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ—এই উভয়কেই সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তখন শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে অভিধেয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও হইবে উভয়স্বরূপ-প্রাপ্তির অনুকূল অভিধেয় বা সাধন।

এক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে অভিধেয়-তত্ত্ব-সূচক কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত এবং স্থলবিশেষে আলোচিত হইতেছে।

শচীমাতার নিকটে প্রভুর উক্তি—"—আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম। সত্য কৃষ্ণচরণ-কমল-গুণধাম ॥ সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ কীর্তন। সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের যে-যে জন ॥ ২।১।১৯০-৯১ ॥"

এ-স্থলে কৃষ্ণ-নাম-গুণ শ্রবণ-কীর্তনের (উপলক্ষণে শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা সাধন-ভক্তির) কথাই বলা হইয়াছে।

পঢ়ুয়াগণের প্রতি প্রভুর উক্তি—"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ নাম। অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান ॥ ২।১।৩২৮ ॥"

এ-স্থলে কৃষ্ণনামের শ্রবণ-কীর্তন এবং কৃষ্ণ-চরণ ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। শ্রবণ-কীর্তন এবং ধ্যানও নববিধা সাধন-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত।

পঢ়ুয়াদের প্রতি প্রভু আরও বলিয়াছেন—"চরণে ধরিয়া বালোঁ—'কৃষ্ণে দেহ মন' ॥ ২।১।৩৩৫ ॥" এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ-মননের কথা, অর্থাৎ নববিধা সাধনভক্তির অন্তর্ভুক্ত "স্মরণের" কথা এবং শ্রুতিকথিত "শ্রোতব্যো মন্তব্যো" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "মন্তব্যের" কথা বলা হইয়াছে।

স্বীয় ছাত্র-শিষ্যদের প্রতি প্রভু বলিয়াছেন—"পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ এতকাল ধরি। কৃষ্ণের কীর্তন কর' পরিপূর্ণ করি ॥ ২।১।৩৯৭ ॥" তখন—"শিষ্যগণ বোলেন—'কেমন সঙ্কীর্তন?' আপনে শিক্ষায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥' দিশা দেখাইয়া প্রভু হাথে তালি দিয়া। আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ২।১।৩৯৮-৪০০ ॥" এই প্রসঙ্গে প্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছেন—"তোমরা সকল লহ কৃষ্ণের শরণ। ২।১।৩৮৩ ॥" প্রভু এই বাক্যে শিষ্যদিগকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া, নাম-সংকীর্তনরূপ ভজনাঙ্গের উপদেশ দিলেন। ইহাও নববিধা সাধনভক্তির একটি অঙ্গ।

প্রভুকর্তৃক প্রেরিত হইয়া রামাঞি পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্যের নিকটে যাইয়া, প্রভুর কথিত আদেশ আচার্যকে জানাইয়াছেন। যথা—"ষড়ঙ্গ পূজার বিধিযোগ্য সজ্জ লৈয়া। প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া ॥ ২।৬।৩২ ॥" এ-স্থলে গৌরের ষড়ঙ্গ-পূজার আদেশে নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে অর্চনাঙ্গের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

নগরিয়াগণ প্রভুর নিকটে আসিলে—"প্রভু বোলে 'কৃষ্ণভক্তি হউক সভার। কৃষ্ণগুণ নাম বই না বলিহ আর ॥' আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ। 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ ॥ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥' প্রভু বোলে—'কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইব সভার। সর্ব্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর ॥ ২।২৩।৭৩-৭৭ ॥" এ-স্থলে প্রভু ষোলনামাত্মক মহামন্ত্র জপের উপদেশ দিয়াছেন (টীকা দ্রষ্টব্য)। তপন মিশ্রকেও প্রভু উল্লিখিত মহামন্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমনের প্রাক্কালেও প্রভু ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম লহ সভে বসি গিয়া ঘরে ॥ ৩।২।২৪ ॥" সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উক্তি—"নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণভজন। তাহারে যে বলি সে 'যোগী সন্ন্যাসী' লক্ষণ ॥ ৩।৩।৩৮ ॥" ভজ-ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং ভজন-শব্দের অর্থও সেবা। এ-স্থলে কৃষ্ণ-ভজন-শব্দে নববিধা সাধনভক্তিকেই বুঝাইতেছে।

সার্বভৌম আরও বলিয়াছেন—"যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিব উদ্ধার। তবে শিখাসূত্র-ত্যাগে কোন্ লভ্য তার ॥ ৩।৩।৫৬ ॥" এ-স্থলেও সাধনভক্তির কথাই বলা হইয়াছে।

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ-নামগুণাদির শ্রবণ-কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ-মনন-ধ্যান এবং অর্চনাদি, অর্থাৎ নববিধা সাধন-ভক্তিই হইতেছে অভিধেয়।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়" বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন। অর্চন, স্মরণ, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ ॥ ১৮ ॥"

শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা-কথা বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন। যথা, শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—"তবে সাধন-ভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ-প্রেম মহাধন ॥ শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার স্বরূপ-লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ চৈ. চ. ২।২২।৫৫-৫৬ ॥ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ।। চৈ. চ. ২।২২।৬৭ ।।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই নববিধা সাধনভক্তির কথা জানা যায়। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ভা. ৭।৫।২৩, ২৪ ॥" পাদসেবন—পরিচর্যা। (এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য চৈ. চ. ২।৯।১৮-১৯-শ্লোকব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এই শ্লোকদ্বয়ের সার মর্ম হইতেছে এই যে—ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে সাক্ষাদ্‌ভাবে যদি শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে নববিধা সাধনভক্তি।

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল, অভিধেয়-তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা বলা হইয়াছে, পরবর্তী আচার্যগণের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান এবং তাহা শ্রীভাগবতেরও সম্মত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিবেচ্য। কবিরাজ-গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২২ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকট মহাপ্রভু দুই রকমের সাধনভক্তির কথা বলিয়াছেন—বিধিমার্গের সাধনভক্তি এবং রাগানুগামার্গের সাধনভক্তি।

গীতা (৭।১৪-১৬) হইতে এবং অন্যান্য শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেও জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনেই মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি বা মোক্ষ পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনব্যতীত তাহা পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের এতাদৃশ বিধির কথা জানিয়া মোক্ষলাভের জন্য যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সাধনভক্তিকে বলে বিধিমার্গের সাধনভক্তি। প্রাণের টানে, বা শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভে তাঁহাদের ভজন-প্রবৃত্তি নহে। বিধিমার্গের সাধকগণ সালোক্যাদি-চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন; কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা কৃষ্ণধাম-প্রাপ্তি, অর্থাৎ কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা-প্রাপ্তি, তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর, শ্রীকৃষ্ণসেবার অর্থাৎ কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার, নিমিত্ত লোভবশতঃ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের সাধনভক্তিকে বলে রাগানুগামার্গের সাধনভক্তি। তাঁহারাই নিতান্ত আপনজন ভাবে, অর্থাৎ প্রিয়রূপে, শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের ধাম পাইতে পারেন। তাঁহাদের ভজন-প্রবর্তক হইতেছে কৃষ্ণসেবার জন্য লোভ।

এই দুই রকম সাধনভক্তির মধ্যে কোন্ রকমের সাধনভক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবতের অভিপ্রেত, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য।

শচীগর্ভস্থিত শ্রীগৌরাঙ্গের স্তবে ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন,—"এ-মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি। তুমি বিলাইবা বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তি।। মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি। অমিসব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥ জগতেরে তুমি প্রভু দিবা হেন ধন। তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥ ১।২।১৮১-৮৩ ॥" এ-স্থলে শ্রীলবৃন্দাবনদাস "বেদগোপ্য বিষ্ণুভক্তির" কথা বলিয়াছেন—যাহার নিমিত্ত ব্রহ্মাদিরও অভিলাষ এবং মুক্তি পাইলেই যাঁহারা নিজেদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে যাহা দেওয়া হয় না। ইহা হইতেছে প্রেমভক্তি।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট মহাপ্রভুর উক্তিতেও বৃন্দাবনদাস প্রেমভক্তির কথাই বলিয়াছেন।—"হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে। যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে।। ১।১২।১০৮ ॥"

পঢ়ুয়াদের নিকটেও প্রভুর ঐরূপ উক্তি। "আগম বেদান্ত আদি যত দরশন। সর্ব্বশাস্ত্র কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥ ২।১।১৪৮ ॥"

শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—"যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে। নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে।। ৩।৫।৩০৩ ॥" গোপীগণের ভক্তি হইতেছে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী প্রেমভক্তি।

প্রভুর উক্তিরূপে শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়। 'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥ ২।২১।১৫ ॥" এ-স্থলে বলা হইল, শ্রীভাগবত বলেন—ভক্তিই হইতেছে একমাত্র পুরুষার্থ। জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি। এই ভক্তি হইতেছে বৃহদারণ্যক-কথিত কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী ভক্তি এবং "ধর্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র"-ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত ভা. ১।১।২ শ্লোকে কথিত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনাহীনা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী ভক্তি, অর্থাৎ প্রেমভক্তি।

এইরূপে জানা গেল, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সর্বত্রই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী প্রেমভক্তির কথাই বলিয়াছেন। সালোক্যাদিচতুর্বিধা মুক্তির অনুকূল বিধিমার্গের সাধনভক্তির কথা তিনি কোনও স্থলেই বলেন নাই। রাগানুগা-মার্গের সাধনভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলেই সেই শুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের, অর্থাৎ প্রেমভক্তির, উদয় হইতে পারে। এইরূপে জানা গেল, যদিও শ্রীলবৃন্দাবনদাস "রাগানুগা ভক্তি" বলিয়া কোনও স্থানে উল্লেখ করেন নাই, তথাপি বিভিন্ন স্থানে তাঁহার উক্তি হইতে জানা যায়—রাগানুগা মার্গের সাধনভক্তিই তাঁহার অভিপ্রেত।

শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুরও তাঁহার "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়" রাগানুগা মার্গের ভজনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। "রাগের ভজন পথ, কহি এ অভিমত, লোক-বেদ-সার এই বাণী ॥ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা ॥ ৪৮ ॥" এ-কথা বলিয়া তিনি রাগমার্গের ভজনরীতির কথা বলিয়াছেন।

মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"-নামক গ্রন্থে রাগমার্গের ভজনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। বৃন্দাবনবাসী শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের ভজনও ছিল রাগমার্গের ভজন এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত সাধক ভক্তগণ তাঁহাদের ভজন-প্রণালীর আনুগত্যেই ভজন করিয়া থাকেন।

প্রেমভক্তি-বিতরণ এবং নাম-সংকীর্তন-প্রবর্তনের নিমিত্তই যে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের সর্বত্রই যে তাহা বলা হইয়াছে, এবং শ্রীলবৃন্দাবনদাস যে তাঁহার গ্রন্থে সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তির

অনুকূল কোনও সাধন-পন্থার কথা বলেন নাই, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের সূচনা-কথন-প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১।৩ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, এই বিষয়েও কবিরাজ-গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান। এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যথেচ্ছ বিহার করিয়াছেন এবং তাহার পরে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্তর্ধানের পরে অপ্রকট গোলোকে বসিয়া তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়াছেন। "চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর-প্রীত॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥ সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ * * যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয়, অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে। তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥ এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥ চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥ চৈ. চ. ১।৩।১২-২৩॥"

উল্লিখিত পয়ারগুলির সার মর্ম ঃ—শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে আলোচনা করিতেছেন—"বহুকাল পর্যন্ত জগতে প্রেমভক্তি বিতরণ করি নাই। পূর্বকল্পে যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখন প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলাম, তাহার পরে এখন পর্যন্ত আর বিতরণ করা হয় নাই। অথচ, প্রেমভক্তিব্যতীতও জগতের জীবের অবস্থান নাই, অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যে (কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবায়) জীব অবস্থিত হইতে পারে না। জগতে যাঁহারা ভক্তিমার্গে ভজন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বিধিমার্গেই আমার ভজন করিয়া থাকেন; কিন্তু বিধিমার্গের ভজনে ব্রজভাব (ব্রজপ্রেম বা শুদ্ধা প্রেমভক্তি—যাহাব্যতীত জীব তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যে অবস্থিত হইতে পারে না, সেই প্রেমভক্তি) প্রাপ্তির যোগ্যতা জন্মে না (এই উক্তি হইতে জানা গেল, জীব যাহাতে প্রেমভক্তি পাইতে পারে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা) ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত—অর্থাৎ বিধিমার্গের ভজনে প্রবৃত্ত জগদ্বাসী জীবের মনোভাব মদ্‌বিষয়ক ঐশ্বর্য-জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত, আমার ঐশ্বর্যের জ্ঞানই তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু এতাদৃশ ঐশ্বর্য-জ্ঞানে মদ্‌বিষয়ক প্রেম শিথিল হইয়া যায়, গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না। এইরূপ শিথিলীকৃত প্রেমে আমার প্রীতি জন্মে না (ইহা হইতে জানা গেল—গাঢ় নির্মল, ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের হার্দ)। ঐশ্বর্যজ্ঞানের সহিত বিধিমার্গের ভজন করিলে সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য—এই চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া আমার ঐশ্বর্যপ্রধান ধাম বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, ব্রজলোকে যাওয়া যায় না। তাই আমি সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি অবতীর্ণ হইব এবং অবতীর্ণ হইয়া কলির যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তিত করিব এবং ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের ভক্তি বিতরণ করিব, সেই প্রেম লাভ করিয়া জগতের জীব যেন প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে পারে (এই উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, জগতের জীবকে ব্রজপ্রেম-দানের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুল)।

আমার অংশ কলির যুগাবতার অবতীর্ণ হইলেও যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তিত করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তো ব্রজপ্রেম দিতে পারিবেন না; যেহেতু, আমাব্যতীত আমার অপর কোনও স্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে সমর্থ নহেন (ব্রজপ্রেম-দানই যে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত হার্দ, এই উক্তিতে তাহা আরও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে)। আমি নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিব (পূর্বেই বলা হইয়াছে, নিখিল ভক্তকুল-মুকুট-মণি শ্রীরাধার সহিত একই বিগ্রহে মিলিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তভাব সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং এই উক্তি হইতে জানা যায়, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন) এবং নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তির ভজন শিক্ষা দিব। আমার পরিকরদের সহিতই আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব।" এইরূপ ভাবনা করিয়া কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতেও পরিষ্কারভাবেই অবগত হওয়া যায় যে, নাম-সংকীর্তনের প্রবর্তন এবং প্রেমভক্তি-বিতরণের নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তিও তাহাই। এইরূপে দেখা গেল, এই বিষয়েও কবিরাজগোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনদাসের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে ভজন-প্রণালীর উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা বস্তুতঃ রাগানুগামার্গের ভজনই; বিধিমার্গের ভজনোপদেশ শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'সনাতন-শিক্ষায়', শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রসঙ্গে, মহাপ্রভুকর্তৃক সনাতনের নিকটে রাগমার্গের ভজনের উপদেশের কথা বলিয়াছেন, আবার বিধিমার্গের ভজনের বিবরণও দিয়াছেন। অথচ শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিধিমার্গের ভজনের কোনও উল্লেখই নাই। ইহার হেতু কি? হেতু বোধ হয় এই—পূর্বোল্লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, প্রেমপ্রাপ্তির অনুকূল রাগমার্গের ভজনোপদেশই প্রভুর মুখ্য কার্য, বিধিমার্গের ভজনের কথা প্রসঙ্গক্রমে আনুষঙ্গিক ভাবেই বলা হইয়াছে, তাহার মুখ্যতা নাই। মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন কাশীতে, প্রভুর সন্ন্যাসের পরে, শেষ লীলায়, বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রভুর শেষ লীলা—সুতরাং বারাণসীলীলাও—বর্ণিত হয় নাই। এ-জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিধিমার্গের ভজনের উল্লেখও দৃষ্ট হইতে পারে না।

গ। **শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রয়োজন-তত্ত্ব।** বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হইয়াছে, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার নিমিত্ত অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে প্রেম—সম্বন্ধ-তত্ত্ববিষয়ক প্রেম। এ-জন্য প্রেমই হইতেছে প্রয়োজন-তত্ত্ব। শ্রীলবৃন্দাবনদাসের অভিপ্রায়ও যে তাহাই, তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটি উক্তি উল্লিখিত এবং আলোচিত হইতেছে।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—"নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র—দুই-দরশন। যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥ ১।৬।৩৯৪॥, সাক্ষাতেই দেখ সভে এই ত্রিভুবনে। নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেম-ধনে॥ ১।৬।৪১৭॥, নিত্যানন্দ-স্বরূপের তীর্থ-পর্যাটন। যেই ইহা শুনে, তারে মিলে প্রেমধন॥ ১।৬।৪৩৮॥" শ্রীলবৃন্দাবনদাস

এ-সকল উক্তিতে কৃষ্ণ-প্রেমকেই "ধন" বলিয়াছেন—জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা প্রাপ্তি-বিষয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু (ধন) হইতেছে—কৃষ্ণপ্রেম।

নিমাঞি পণ্ডিতের প্রতি ভক্তদের উপদেশ-কথন-প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস ভক্তদের মুখে প্রকাশ করিয়াছেন—"পঢ়ে কেনে লোক ? কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল,তবে বিদ্যায় কি করে ॥ ১।৮।৪৯ ॥, ১।৮।২৫১ ॥" কৃষ্ণ-ভক্তি = কৃষ্ণপ্রেম।

দিগ্ বিজয়ীর প্রতি প্রভুর উক্তি—"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। 'কৃষ্ণপাদ-পদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়' ॥ ১।৯।১৭৮ ॥" এই উক্তির মর্মও পূর্বোক্তরূপ।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—"তাবত রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি মানে। ভক্তিসুখ-মহিমা যাবত নাহি জানে॥ রাজ্যাদিসুখের কথা, সে থাকুক দূরে। মোক্ষসুখ অল্প মানে কৃষ্ণ-অনুচরে॥ ১।৯।১৯৪-৯৫ ॥" ভক্তিসুখ—প্রেমসুখ। প্রেমসুখের তুলনায়, রাজ্যাদিসুখের (অর্থাৎ ভুক্তির) কথা তো দূরে, মোক্ষসুখও অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে প্রেমেরই পরম-পুরুষার্থতা কথিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে প্রভুর উক্তি—"হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে। যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥ ১।১২।১০৮ ॥"

শচীমাতার নিকটে প্রভুর উক্তি—"সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়। অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥ ২।১।১৯২ ॥ যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥ জৈমিনি মহাভারতে আশ্বমেধিকে পর্বণি।" এ-স্থলেও কৃষ্ণভক্তির বা কৃষ্ণপ্রেমের পরম-পুরুষার্থতা কথিত হইয়াছে।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর উক্তিতেও প্রেমভক্তির পরম-পুরুষার্থতা সূচিত হইয়াছে। প্রভু নিত্যানন্দকে বলিয়াছেন—"বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি। তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥ ২।৪।৩৬ ॥ তোমার সে প্রেমভক্তি, তুমি প্রেমময়। বিনে তুমি দিলে, কারো ভক্তি নাহি হয়॥ ২।৫।৯৭ ॥"

শ্রীলবৃন্দাবনদাসের উক্তি—"পুণ্ডরীক-গদাধর দুইর মিলন। যে পঢ়ে যে শুনে, তারে মিলে প্রেমধন॥ ২।৭।১৫৪ ॥, খোলাবেচা শ্রীধর—তাহার এই সাক্ষী। ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি॥ ২।৯।২৩৯ ॥, ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥ প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণচরণারবিন্দে। সে-ই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব না নিন্দে॥ ২।৯।২৪৩-৪৪॥, জাতি কুল ক্রিয়া ধ্যানে কিছু নাহি করে। প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে॥ ২।১০।৯৮ ॥"

প্রভুর উক্তি—"সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়। 'প্রেমরূপ ভাগবত'—চারি বেদে কয়॥ ২।২১।১৫ ॥"

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উক্তি—"কৃষ্ণপদ-ভক্তি সে সভার মূল তত্ত্ব॥ সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন। অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন॥ এবংবিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ ভক্তি। হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহাশক্তি॥ ৩।৩।৮৩-৮৫ ॥ 'আত্মারামাশ্চ মুনয়োর্নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥' ভা. ১।৭।১০ ॥" এ-স্থলে মুক্তি অপেক্ষাও ভক্তির (প্রেমের) উৎকর্ষময়ত্ব কথিত হইয়াছে। শ্রুতিও একথা বলেন—"মুক্তা হ্যেতমুপাসতে ইতি॥ শ্রীপাদ জীবগোস্বমীর 'প্রীতিসন্দর্ভে'র ৩২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত সৌপর্ণ-শ্রুতি-বাক্য।"

দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর উক্তি—"শুন বিপ্র ! ভাগবতে এই বাখানিবা। 'ভক্তি' বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা ॥ আন্ত-মধ্য-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়। বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয় ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি। মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ শক্তি ॥ মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে। হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥ ৩৩৪৯৫-৯৮ ॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকটে মহাপ্রভুর এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—বিষ্ণুভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমই (বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ"—ইত্যাদি ভা. ১০।৩৩।৩৯-শ্লোকে রাসলীলাবিহারী শ্রীকৃষ্ণকেই "বিষ্ণু" বলা হইয়াছে). হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু। যাঁহারা মুক্তিকামী, ভগবান্ তাঁহাদিগকে মোক্ষদান করেন, কিন্তু এই বিষ্ণুভক্তি বা প্রেম দান করেন না। আবার মুক্তগণও এই প্রেমলাভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহা হইতে জানা গেল—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থেরও অতীত হইতেছে এই প্রেম, প্রেম হইতেছে পঞ্চম-পুরুষার্থ বা পরম-পুরুষার্থ। যেহেতু, ইহার উপরে আর কোনও পুরুষার্থই নাই এবং থাকিতে পারে না। কেননা, এই প্রেম লাভ হইলেই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাওয়া যাইতে পারে। যাহা স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, তাহার উপরে জীবের আর কোনও কাম্য বস্তু থাকিতে পারে না। দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকটে প্রভু এই বিষ্ণুভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমকে "নিত্য সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়ও" বলিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ বলায়, ইহা যে জন্য পদার্থ নহে, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে যে এই প্রেমের উদয় হয়—প্রভুর উক্তি হইতে ইহাই জানা গেল।

এইরূপে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন উক্তি হইতে জানা গেল—কৃষ্ণপ্রেমই হইতেছে প্রয়োজন-তত্ত্ব। পরবর্তী আচার্যগণও, এবং শ্রীলসনাতন গোস্বামীর নিকটে মহাপ্রভুও, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীলনরোত্তম-দাস ঠাকুর, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ আক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছেন—"গোরা পঁহু না-ভজিয়া মৈনু। প্রেম-রতন ধন হেলায় হারাইনু।" প্রেম যে প্রয়োজন-তত্ত্ব, এই উক্তি হইতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার প্রার্থনায় প্রায় সর্বত্রই তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"সেবা-অভিলাষ মাগে নরোত্তমদাস।" সেবার অভিলাষই হইতেছে—প্রেম। তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতেও তিনি এই প্রেমলাভের অনুকূল ভজনাদির কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"এবে শুন ভক্তিফল (সাধনভক্তির ফল) —প্রেম 'প্রয়োজন'। চৈ. চ. ২।২৩।২ ॥, নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ চৈ. চ. ২।২২।৫৭ ॥, পঞ্চম পুরুষার্থ এই—কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ চৈ. চ. ২।২৩।৫২ ॥" সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে প্রভু এই কৃষ্ণপ্রেমকে (বা কৃষ্ণভক্তিকে) পরম-পুরুষার্থও বলিয়াছেন। "প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য ! না কর বিস্ময়। ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয় ॥ চৈ. চ. ২।৬।১৬৬ ॥"

কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী-প্রমুখ সন্ন্যাসীদের নিকটেও মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম—পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমামৃতানন্দ সিন্ধু। মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ চৈ. চ. ১।৭।৮১-৮২ ॥ পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ চৈ. চ. ১।৭।১৩৭ ॥"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" এবং "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই

প্রয়োজন-তত্ত্ব পরম-পুরুষার্থ প্রেমের স্বরূপ-মহিমাদিই খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুগত কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে এই প্রেমের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীলবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন উক্তি হইতে প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, পরবর্তী আচার্যগণের এবং পরবর্তী-কালে মহাপ্রভুর, উক্তি হইতেও তাহাই জানা যায়। এই অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে পরবর্তী আচার্যগণের সহিত বৃন্দাবনদাসের সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান এবং বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থোক্তির সহিত মহাপ্রভুর পরবর্তী উক্তির সহিতও সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

এই অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল—সম্বন্ধ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গই উপাস্য-তত্ত্ব, প্রেম হইতেছে সাধ্যবস্তু এবং তাহার সাধন হইতেছে সাধনভক্তি। ইহাই হইতেছে শ্রীচৈতন্যভাগবতের অভিপ্রায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সাধনভক্তি হইতেছে বাস্তবিক রাগমার্গের সাধনভক্তি।

এই অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে আরও জানা গেল— গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যদের মধ্যে শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরই—মহাপ্রভুর উক্তিতে, ভক্তগণের উক্তিতে এবং নিজের উক্তিতে—সর্বপ্রথমে জানাইয়াছেন যে,—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ—উভয়েই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, উভয়ের ধাম এবং উভয়ের সেবাপ্রাপ্তিই জীবের কাম্য, ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, সেই সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেমই হইতেছে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং সেই প্রেম-লাভের নিমিত্ত গৌর-কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সাধনভক্তিরই, অর্থাৎ রাগানুগা-মার্গের সাধনভক্তিরই, অনুষ্ঠান কর্তব্য। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, তাহার তুলনায় ভুক্তি-মুক্তি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, মোক্ষ যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী পুরুষার্থ নহে, পরন্তু প্রেমই স্বরূপানুবন্ধী পুরুষার্থ, সুতরাং প্রেমই যে পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ, শ্রীলবৃন্দাবন দাসই সর্বপ্রথমে তাহা জানাইয়াছেন।

ঘ। সপরিকর ভগবানের উপাসনা। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য। শ্রীলবৃন্দাবনদাস কৃষ্ণপ্রাপ্তি এবং কৃষ্ণের ধাম-প্রাপ্তির কথা এবং গৌর-প্রাপ্তি এবং গৌরের ধাম-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ স্ব-স্ব ধামে স্ব-স্ব পরিকরদের সহিতই বিরাজিত এবং পরিকরদের সহিতই লীলায় বিলসিত। সুতরাং কৃষ্ণপ্রাপ্তি বলিলে, স্বীয় ধামে পরিকরদের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিই সূচিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির তাৎপর্যও হইতেছে –শ্রীকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তি। সুতরাং কৃষ্ণ-প্রাপ্তির তাৎপর্য হইতেছে, স্বীয়ধামে পরিকরদের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তি। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারি ভাবের লীলায় বিলসিত—দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্য-ভাব এবং কান্তাভাব। এই চারি ভাবের পরিকরগণও ভিন্ন ভিন্ন। লোক ভিন্নরুচি এবং ভিন্নপ্রকৃতি বলিয়া সাধকভক্ত এই চারিটি ভাবের মধ্যে কোনও একটি ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা কামনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যিনি যে-ভাবের সেবাকামী, তিনি সেইভাবের পরিকরদের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবাই কামনা করেন। সেইভাবের সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে—সেই ভাবের অনুরূপ প্রেম বা ভক্তি। ভক্তের কৃপাব্যতীত প্রেম-লাভ—সুতরাং সেবা-লাভ—হইতে পারে না। শ্রীলবৃন্দাবনদাসও বলিয়াছেন—"ভক্তসেবা হৈতে সে সভেই

কৃষ্ণ পায় ॥ ৩।৩।৪৭৭ ॥" এবং তিনি মহাপ্রভুর মুখেও বলাইয়াছেন—"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া। যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥ সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে। তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥ ২।১৯।২০৭-৮॥" মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন—"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ চৈ.চ. ২।২২।৩২॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের "রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্ গৃহাদ্ বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদ-রজোঽভিষেকম্॥ ভা. ৫।১২।১২॥" এবং "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ভা. ৭।৫।৩২॥"—এই শ্লোকদ্বয়ও সে-কথাই বলিয়াছেন। ভগবৎ-পরিকরগণ হইতেছেন সর্বভক্ত-মুকুটমণি। সুতরাং সাধক যে-ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবাকামী, সেই ভাবের পরিকর-ভক্তদের কৃপা, তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য। তাঁহাদের কৃপা পাইতে হইলে, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকারপূর্বক তাঁহাদের সেবাও অপরিহার্য। শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন—"নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥ চৈ. চ. ২।২২।৯১॥", তাহার তাৎপর্য হইতেও তাহা জানা যায়। সুতরাং সাধকের পক্ষে স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার সঙ্গে, স্বীয়ভাবানুকূল লীলায় শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের উপাসনাও, অর্থাৎ সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই, অবশ্যকর্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনাসম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। সপরিকর গৌরের ভজনের কথা শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি হইতেও জানা যায়। গৌরের পরিকর হইতেছেন—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। শ্রীনিত্যানন্দকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে। ভজিলেহ সে আমার প্রিয় কভু নহে॥ ২।৫।৯৯॥" এ-স্থলে গৌরের সহিত নিত্যানন্দের ভজনের অবশ্যকর্তব্যতা জানা গেল। আবার, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত হইতেছেন "এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায়॥ ২।৬।১৪৭॥", "নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ প্রেম জান॥ ২।৬।১৫০॥" নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত—"এ দুইর প্রীতি যেন অনন্ত শঙ্কর। দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর॥ ২।৬।১৫২॥" মহাপ্রভুও শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে বলিয়াছেন—"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া। যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥ সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে। তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥ ** তুমি ত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়। তোমারে লঙ্ঘিয়া দৈবে নাশ হয় দঢ়॥ ২।১৯।২০৭-১১॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল, গৌরের সেবার সঙ্গে অদ্বৈতের এবং (শ্রীবাসাদি)-গৌরভক্তবৃন্দের সেবাও অপরিহার্য। গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামি-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"সত্য সত্য গদাধর—কৃষ্ণের প্রকৃতি॥ আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারে বার। 'গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার'॥ ২।১৮।১১৪-১৫॥" নিত্যানন্দ ও গদাধর-সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আমি ত তোমারা দুই হৈতে ভিন্ন নাহি॥ ৩।৮।১৪২॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল, গদাধরের ভজন না করিলে গৌর প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। এইরূপে দেখা গেল—গৌর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর এবং শ্রীবাসাদি ভক্ত-বৃন্দ, ইঁহাদের সকলের, অর্থাৎ সপরিকর গৌরের, সেবাই সাধকের অবশ্যকর্তব্য। স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় এই পাঁচ জনকে পঞ্চতত্ত্ব বলিয়াছেন। "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্॥ চৈ. চ. ১।১৪-শ্লোক॥—ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক শ্রীগদাধর—এই

পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণকে (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) নমস্কার করি ॥ (চৈ. চ. ১।৭।৪-১৯ পয়ারসমূহে এই শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য)। শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের অনুগত সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ অদ্যাপিও সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গের এবং সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। এই আলোচনা হইতে জানা গেল, উল্লিখিত পঞ্চতত্ত্বের উপাসনার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতেও দৃষ্ট হয়।

৫২। গৌরলক্ষ্মী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী

মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রূঢ়ি-অর্থে "লক্ষ্মী" বলিতে বৈকুণ্ঠের নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনীকে বুঝাইলেও ব্যাপক অর্থে ভগবৎ-কান্তামাত্রকেই "লক্ষ্মী" বলা হয়। এ-জন্যই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে "গৌরলক্ষ্মী" বলা হইল।

লক্ষ্মী দেবীর পিতার নাম বল্লভ আচার্য (১।৭।৫৫), অথবা বল্লভ মিশ্র (১।৭।৭৬)। পূর্বলীলায় তিনি ছিলেন রুক্মিণী দেবীর পিতা ভীষ্মক (১।৭।১০২)। কবি কর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন, বল্লভাচার্য ছিলেন জনক ও ভীষ্মক (৪৪) এবং লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ছিলেন—জানকী ও রুক্মিণী (৪৫)। জানকী ও রুক্মিণী—এই উভয় স্বরূপই লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীতে বিদ্যমান। সুতরাং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-কান্তা, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। গৌর ও লক্ষ্মী দেবীর বিবাহ, লৌকিক বিবাহের ন্যায় হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে।

রুক্মিণী দেবী যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, সীতাদেবী যেমন শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যকান্তা—সুতরাং তাঁহাদের কান্তাত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত যেমন কোনও বিবাহানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, তথাপি যেমন নরলীল শ্রীকৃষ্ণ এবং নরলীল শ্রীরামচন্দ্র যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন এবং অন্যান্য পরিকরদের সহিত রুক্মিণী এবং সীতাকেও অবতারিত করেন, তখন যেমন নরব্যবহারের অনুকরণে রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হয়, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত শচীনন্দনের বিবাহও তদ্রূপ—একটি লীলামাত্র। প্রভুর মধ্যে তো শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণও বিরাজিত। জানকী-রুক্মিণী স্বরূপা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করিয়া প্রভু বোধ হয় তাঁহাদেরই প্রকটকালের একটি লীলা প্রকটিত করিয়াছেন।

এক এক সময়ে লীলাশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর বৈভবও প্রকটিত করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মী হইলেন বিদ্যমান। শচীগৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম ॥ নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে। পরম অদ্ভুত জ্যোতি লখিতে না পারে ॥ কখনো পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা। উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা ॥ কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়। পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায় ॥ আই চিন্তে—'বুঝিলাঙ কারণ ইহার। এ-কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ॥ অতএব জ্যোতি দেখি, পদ্মগন্ধ পাই। পূর্ব্বপ্রায় দরিদ্রতা-দুঃখ এবে নাই ॥ এই লক্ষ্মী বধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে। কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে ॥' ১।৭।১২০-২৬ ॥"

লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী গৃহস্থ-বধূর এবং পতিসেবার আদর্শও দেখাইয়া গিয়াছেন। মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপনের পরে প্রভু শিষ্যবর্গকে লইয়া মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান করিতেন। "পঢ়াইয়া প্রভু দুই-প্রহর হইলে। তবে শিষ্যগণে লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে ॥ গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কথোক্ষণ। গৃহে আসি করে প্রভু

শ্রীবিষ্ণুপূজন ॥ তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি। ভোজনে বসেন গিয়া বলি 'হরি হরি' ॥ লক্ষ্মী দেই অন্ন, খাএ বৈকুণ্ঠের পতি। নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥ ভোজন-অন্তরে করি তাম্বূল-ভক্ষণ। শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥ ১।৮।৯৯-১০৩ ॥"

প্রভুর গৃহে "কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ-বিশ। সভা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ ॥ সেই ক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে। কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥ ঘরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে মনে। 'কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে' ॥ চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে। সকল সম্ভার আনি দেই সেই ক্ষণে ॥ তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে। রান্ধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি বৈসে ॥ সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া। তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১।১০।১৪-১৯ ॥"

প্রভুর গৃহে যত দুঃখিত লোক আসিতেন, প্রভু সকলকেই অন্নাহার করাইয়া তৃপ্ত করিতেন। সকলের জন্য—"একেশ্বর লক্ষ্মী দেবী করেন রন্ধন। তথাপিহ পরম সন্তোষযুক্ত মন ॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী। দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢ়ে অতি ॥ ১।১০।৩৭-৩৮ ॥"

আবার—"উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহকর্ম্ম। আপনে করেন সব, সে-ই তান ধর্ম্ম ॥ দেবগৃহে করেন যে স্বস্তিক-মণ্ডলী। শঙ্খ-চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, সুবাসিত জল। ঈশ্বর-পূজার সজ্জ করেন সকল ॥ নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। ততোধিক শচীর সেবায় তান মন ॥ লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর। মুখে কিছু না বোলেন, সন্তোষ অন্তর ॥ কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ। বসিয়া থাকেন পদমূলে অনুক্ষণ ॥ অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র-পদতলে। মহাজ্যোতির্ম্ময় অগ্নিপুঞ্জ শিখা জ্বলে ॥ কোন দিন মহাপদ্মগন্ধ শচী আই। ঘরে দ্বারে সর্ব্বত্র পায়েন, অন্ত নাই ॥ ১।১০।৩৯-৪৬ ॥"

পূর্ববঙ্গে গমনের সময়ে, "লক্ষ্মীপ্রতি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর। আইর সেবন করিবারে নিরন্তর ॥ ১।১০।৫০ ॥"

প্রভু পূর্ববঙ্গে গিয়াছেন। "এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে। অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে ॥ নিরবধি করে দেবী আইর সেবন। প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥ নামেরে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে। ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে ॥ একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন। চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন ক্ষণ ॥ ঈশ্বর-বিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে। ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥ নিজ প্রতিকৃতি দেহ থুই পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভুপাশে অতি অলক্ষিতে ॥ প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়। ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয় ॥ ১।১০।৯৮-১০৪ ॥" (১।১০।১০৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রভুর পূর্ববঙ্গে অবস্থান-কালেই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইলেন। শচীদেবী শোকে-দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। অনতিকাল পরে প্রভুও গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং "পত্নীর বিজয় শুনি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি। ক্ষণেক রহিলা কিছু হেটমাথা করি ॥ প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার। তূষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ববেদসার ॥ লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া। কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্য্যচিত্ত হৈয়া ॥ ১।১০।১৭৩-৭৫ ॥" প্রভু জননীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। "মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে। ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিবে কেমনে ॥ এই মত কালগতি—কেহো কারো নহে। অতএব সংসার 'অনিত্য' বেদে কহে ॥ ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার। সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥ অতএব যে হইল

ঈশ্বর-ইচ্ছায়। হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায়॥ স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি। তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী॥ ১।১০।১৭৬-৮০॥" লোকব্যবহারের অনুকরণে প্রভু জননীকে প্রবোধ দিলেন এবং জগদ্‌বাসী জীবগণকেও শিক্ষা দিলেন।

৫৩। গৌরলক্ষ্মী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

পূর্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু আবার বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর শূন্যস্থান পূরণের নিমিত্ত শচীমাতাও চিন্তিত হইলেন এবং মনে মনে নিজের পুত্রের জন্য যোগ্য কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"হেন মতে বিদ্যারসে আছেন ঈশ্বর। বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর॥ সর্ব্বনবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে। পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে॥ সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান্। দয়াশীল স্বভাব —শ্রীসনাতন নাম॥ অকৈতব, পরম-উদার, বিষ্ণুভক্ত। অতিথি-সেবন, পর-উপকারে রত॥ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবংশ-জাত। পদবী 'রাজপণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥ ব্যবহারেও পরম-সম্পন্ন একজন। অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ॥ তাঁর কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায় সেই জগন্মাতা॥ শচীদেবী তানে দেখিলেন সেই ক্ষণে। সেই কন্যা পুত্রযোগ্যা বুঝিলেন মনে॥ শিশু হৈতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান। পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি বই নাহি আন॥ আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে। নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥ আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ। 'যোগ্য পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ'॥ গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা। 'এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা'॥ রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্বগোষ্ঠী-সনে। প্রভুরে করিতে কন্যাদান নিজ-মনে॥ ১।১০।২১৮-৩০॥"

শচীমাতা ঘটক-রূপে কাশীনাথ মিশ্রকে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের নিকটে পাঠাইলেন। রাজপণ্ডিতও পরমানন্দে সম্মত হইলেন। রাজপুত্রোচিত আড়ম্বরের সহিত প্রভুর বিবাহ হইল। বুদ্ধিমন্ত খান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। প্রভুর এই পত্নীর নাম শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (১।১০।২৩৯, বৃন্দাবনদাস ইহার পরে প্রায় সর্বত্রই বিষ্ণুপ্রিয়াকে "লক্ষ্মী" বলিয়াছেন—বোধ হয় গৌর-লক্ষ্মী বলিয়া)।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা শ্রীসনাতন-মিশ্রকে "নগ্নজিত, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত" তুল্য বলিয়াছেন (১।১০।৩৭৫)। তাহা হইলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হইলেন দ্বারকানাথ-শ্রীকৃষ্ণমহিষীদের তুল্য। কবি কর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সনাতন মিশ্রকে "সত্রাজিৎ" এবং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে "ভূস্বরূপিণী সত্যভামা" বলিয়াছেন (৪৭-৪৮)। সত্যভামারূপেও বিষ্ণুপ্রিয়া হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-মহিষী। সুতরাং তিনি জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা। পূর্ব অনুচ্ছেদে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর বিবাহ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ-সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য—বিষ্ণুপ্রিয়া নিত্যকান্তা বলিয়া কান্তাত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত বিবাহের প্রয়োজন না থাকিলেও, নরসমাজে প্রচলিত রীতির অনুসরণে, নরলীল প্রভুর মধ্যে বিরাজিত দ্বারকানাথরূপেই বোধ হয় প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া প্রকট কালের একটি লীলা প্রকটিত করিলেন (২।১০।২১০-১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

কিছুদিন পরে প্রভু গয়ায় গেলেন। গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে—"লক্ষ্মীর জনককুলে

আনন্দ উঠিল। পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥ ২।১।১৭ ॥ লক্ষ্মীর—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ॥" প্রভুর তখন কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদের অবস্থা। সর্বদাই "'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করেন ক্রন্দন। আই দেখে পূর্ণ হয় সকল অঙ্গন ॥ 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বোলয়ে ঠাকুর। বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ॥ ২।১।৪২-৪৩ ॥" শুদ্ধবাৎসাল্যের প্রভাবে প্রভুর এইরূপ অবস্থার কারণ শচীমাতা কিছুই বুঝিতে পারেন না। "কিছু নাহি বুঝে আই কোন বা কারণ। করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ॥ ২।১।৪৪ ॥" বিশ্বরূপের ন্যায় নিমাইও বা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়েন, ইহা ভাবিয়া শচীমাতা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের চিত্তকে সংসারের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে শচীমাতা গৌরলক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া প্রভুর নিকটে বসাইতেন; কিন্তু প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, তাঁহার চিত্ত সর্বদা কৃষ্ণরসে তন্ময়। "পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে। পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে ॥ 'স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ। অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেহ বর। সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥' লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্রসমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চা'য় ॥ নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন। 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বোলে অনুক্ষণ ॥ কখনো কখনো যে হুঙ্কার করয়ে। ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়ে ॥ রাত্র্যে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে। বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে ॥ ২।১।১৩১-৩৭ ॥"

এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, প্রভু নিজে তো বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে কখনও যাইতেনই না, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া প্রভুর নিকটে কখনও বসাইলেও প্রভু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেন না। বিষ্ণুপ্রিয়া যে সেখানে ছিলেন, তাহাও বোধ হয় প্রভু জানিতে পারেন নাই—এমনই অন্যানুসন্ধান-রহিত পরমাবেশ ছিল প্রভুর। আবার, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর নিকটে বসাইলেও, প্রভুর প্রেম-হুঙ্কার শুনিয়া তিনি ভয়ে পলায়ন করিতেন। রাত্রিকালেও কৃষ্ণরসাবেশে প্রভুর নিদ্রা থাকিত না; কৃষ্ণ-বিরহ-ভাবের আবেশে অস্থির হইয়া প্রভু কখনও বসিয়া থাকিতেন, কখনও বা উঠিতেন, আবার কখনও বা ভূমিতে পড়িতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন প্রভুর নিকটে থাকিতেন কিনা, জানা যায় না; থাকিলেও ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হওয়াব্যতীত তাঁহার আর অন্য কাজ কিছুই থাকিত না।

এই সময়ে প্রভু যখন আহারে বসিতেন, তখন শচীমাতা তাঁহার সম্মুখে বসিতেন, বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের মধ্যে থাকিয়াই ভোজন দর্শন করিতেন। গঙ্গাস্নানের পরে—"যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন। আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন ॥ তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন। মায়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন ॥ ২।১।১৮৫-৮৬ ॥" শচীমাতাই প্রভুকে অন্ন আনিয়া দিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া আনিয়া দিলেন না। অন্ন দিয়া—"সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা। গৃহের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥ ২।১।১৮৮ ॥" এই সময়ে প্রেমাবেশে প্রভু "ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়। লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥ ২।২।৮৭ ॥" লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে করিয়াই যে প্রভু তাঁহাকে "মারিবারে—প্রহার করার নিমিত্ত" উদ্যত হইতেন, তাহা নহে। ভক্তভাবে, অর্থাৎ দুর্জয়-মানে মানবতী শ্রীশ্রীরাধার ভাবে, যখন প্রভু আবিষ্ট হইতেন, সেই অবস্থায় যখন শ্রীকৃষ্ণের নাম-পর্যন্তও শুনিতে পারিতেন না, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিলে, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয়া কোনও দূতী মনে করিয়াই প্রভু তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য তাড়া করিতেন (২।২৪।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রভুর সেই সময়ের অবস্থা-সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—প্রভু—"গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রস্তাব। নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব॥ কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে। চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥ 'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' এই মাত্র বোলে। আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥ যে বৈষ্ণব ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে। তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন—' কৃষ্ণ কোন খানে'॥ বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়। যে জানে যে-মত, সেই-মত প্রবোধয়॥ ২।২।১৯৫-৯৯॥"

তখন প্রভুর এমনই গাঢ় প্রেমাবেশ যে, যখন তিনি গৃহে আসেন, তখনও তাঁহার "ব্যাভার-প্রস্তাব" থাকিত না, অর্থাৎ ব্যবহারিক কোনও প্রসঙ্গের প্রতিই তাঁহার অনুসন্ধান থাকিত না—সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধেও যে প্রভুর কোনও অনুসন্ধান থাকিত না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তখন প্রভুর নিকটে ব্যবহারিক বিষয়ে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও, তাঁহার নিকট হইতে কোনও উত্তর পাওয়া যাইত না। কৃষ্ণপ্রেমাবেশের গাঢ় নিবিড়তাবশতঃ তিনি সেই জিজ্ঞাসা বোধ হয় শুনিতেও পাইতেন না। কৃষ্ণবিরহের ভাবে আবিষ্টা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি সর্বদা "কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বলিতেন এবং কোনও ভক্তকে দেখিলেও, "কৃষ্ণ কোন্ খানে" বলিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানই করিতেন, অন্য কোনও বিষয়েই—সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষয়েও—প্রভুর কোনও অনুসন্ধানই থাকিত না।

ব্যবহারিক বিষয়ে প্রভুর কোনও অনুসন্ধান না থাকিলেও, নিমাইও না জানি বিশ্বরূপের ন্যায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়েন—এইরূপ আশংকা করিয়া, বাৎসল্যঘন-বিগ্রহা শচীমাতা ব্যবহারিক বিষয়ে প্রভুর মনকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে এক এক সময়ে যেমন প্রভুর নিকটে বসাইতেন, তেমনি আবার ইচ্ছাও করিতেন—তাঁহার প্রাণাধিক নিমাই যেন বধূমাতার নিকটে বসেন। মাতার এই অভিপ্রায় জানিয়া কেবল মাত্র মাতার প্রীতিবিধানের নিমিত্তই প্রভু যে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে বসিয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"এক দিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর। বসি আছে লক্ষ্মীসঙ্গে পরম-সুন্দর॥ যোগায় তাম্বূল লক্ষ্মী পরম-হরিষে। প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিনে॥ যখন থাকয়ে লক্ষ্মী-সঙ্গে বিশ্বম্ভর। শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥ মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া। লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥ ২।১১।৬৬-৬৯॥" এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রদত্ত পরবর্তী বিবরণ হইতে বুঝা যায়, একদিন দিবা-ভাগেই এই ঘটনা হইয়াছিল।

প্রভুর তৎকালীন মনের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, প্রেমানন্দের আবেশজনিত বিহ্বলতায় তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞানও থাকিত না। "প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিনে"-বাক্যে বৃন্দাবনদাস তাহাই জানাইয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হয়তো প্রভুর সেই আনন্দকেই স্বপ্রদত্ত তাম্বূল-ভোজন-জনিত আনন্দ মনে করিয়া আনন্দ-বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে উপবেশন ও তৎপ্রদত্ত তাম্বূল-ভোজনের সময়ে যে প্রভুর এই আনন্দাবেশ তিরোহিত হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। শচীমাতার প্রীতিবিধানের নিমিত্ত প্রভু এইরূপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তখনও প্রভুর চিত্ত যে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না।

গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে, "সর্ব্বভক্তগণ সন্ধ্যাসময় হইলে। আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে

অল্পে মিলে। ভক্তিযোগ-সম্মত যে সব শ্লোক হয়। পঢ়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ মহাশয়॥ পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্যধ্বনি। শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥ 'হরি বোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে। চতুর্দ্দিগে পড়ে, কেহো না পারে ধরিতে॥ ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন। একবারে সর্ব্বভাব দিল দরশন॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ। ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥ সর্ব্বনিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়। প্রভাতে বা কথঞ্চিত প্রভু বাহ্য পায়॥ এইমত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন। নিরবধি নিশি দিশি করয়ে কীর্ত্তন॥ ২।২।২১৩-২০॥"

এই বিবরণ হইতে জানা গেল, প্রভু তখন রাত্রিতে শয়ন-গৃহেও যাইতেন না।

এক্ষণে শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনের কথা বলা হইতেছে। কবি কর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে লিখিয়াছেন—"গয়ায়া ইত্যেবং স্বগৃহমগমদ্ ভূরিকরুণপ্রভুঃ পৌষস্যান্তে সকল-তনুভৃত্তাপশমনঃ। ততঃ মাঘস্যাদৌ নিরবধি নিজৈঃ কীর্ত্তনরসৈঃ প্রকাশং চাবেশং বিকিরতি স্মানুদিবসম্॥ মহাকাব্য॥ ৪।৭৬॥ —পরম-করুণ এবং সর্বজীব-তাপহর প্রভু পৌষমাসের অন্তে (শেষ ভাগে) এইরূপে গয়া হইতে নিজের গৃহে আগমন করিলেন; তাহার পর মাঘমাসের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভু প্রতি দিন নিজ কীর্তনরসের দ্বারা জগতে প্রকাশ ও আবেশ বিকীরণ করিতে লাগিলেন।"

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"মধ্যখণ্ড কথা ভাই! শুন এক চিত্তে। বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেন মতে॥ ২।২।৩৪৩॥" কোন্ স্থানে প্রভু "বৎসরেক কীর্ত্তন" করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে তাহাও জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রভু বলিয়াছিলেন—"ভাই সব! শুন মন্ত্র সার। রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা-সবাকার॥ আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল। নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥ সংকীর্ত্তন করিয়া সকল গণ-সনে। ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥ জগত উদ্ধার হউক শুনি কৃষ্ণনাম। পরার্থে সে তোমরা সভার ধন-প্রাণ॥ ২।৮।১০৬-৯॥ সর্ব্ববৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস। আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-বিলাস॥ শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন। কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥ ২।৮।১০-১১॥" প্রভুর এই কীর্তনই সন্ন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত এক বৎসর চলিয়াছিল। কচিৎ কোনও দিন চন্দ্রশেখরের গৃহে কীর্তন হইত, সাধারণতঃ শ্রীবাসগৃহেই সর্বদা হইত। ১৪৩১-শকের মাঘ মাসের শেষ তারিখে প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। কর্ণপূরের পূর্বোল্লিখিত উক্তি হইতে জানা যায়, ১৪৩০ শকের পৌষের অন্তে গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাঘ মাসের আদি হইতেই প্রভু প্রতিদিন কীর্তন করিয়াছিলেন। ১৪৩০ শকের মাঘ মাসের আদি হইতে ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত সময় হয় এক বৎসর এবং কিঞ্চিন্ন্যূন একমাস। অথচ পূর্বে উল্লিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের বাক্য হইতে জানা যায়, প্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই প্রতিদিন প্রভুর নিজগৃহে কীর্তন হইত। ইহাতে মনে হয়, এই কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাস কাল প্রভুর নিজ গৃহে কীর্তনাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করিয়া লীলা বর্ণন করেন নাই, কবিরাজ-গোস্বামী তাহা করিয়াছেন (পূর্ববর্তী ১৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কবিরাজ-গোস্বামী চৈ. চ. ১।১৭ পরিচ্ছেদে, গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরবর্তীকালের লীলাসমূহের ক্রম এইরূপ লিখিয়াছেন—শচীকে প্রেমদান, অদ্বৈতমিলন, অদ্বৈতের

বিশ্বরূপ-দর্শন, শ্রীবাসকর্তৃক প্রভুর অভিষেক, খাটে বসিয়া প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ, নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন, নিত্যানন্দের ষড়্‌ভুজরূপ-দর্শন ও ব্যাসপূজা, প্রভুর নিত্যানন্দাবেশ, শচীকর্তৃক রাম-কৃষ্ণ-দর্শন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, সাতপ্রহরিয়াভাব, মুরারি-ভবনে প্রভুর বরাহ-আবেশ, শুক্লাম্বরের তণ্ডুল-ভক্ষণ, হরের্নাম-শ্লোকের অর্থ-প্রকাশ (চৈ. চ. ১।১৭।৮-২৯)। এ-সমস্ত লীলার কথা বলিয়া কবিরাজ বলিয়াছেন—"তবে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত লীলাসমূহের পরে) প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সঙ্কীর্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥ চৈ. চ. ১।১৭।৩০ ॥"

কবিরাজ-গোস্বামীর এই বিবরণ হইতে জানা গেল, প্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে, শ্রীবাস-ভবনে কীর্তনারম্ভের পূর্বপর্যন্ত সময়ের মধ্যে পূর্বকথিত যে-সকল লীলা সংঘটিত হইয়াছিল, শ্রীবাসগৃহে কীর্তনারম্ভের পূর্ববর্তী কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাসের মধ্যেই সে-সমস্ত লীলা ঘটিয়াছিল।

যাহা হউক, শ্রীবাস-ভবনে কীর্তনারম্ভ হইতে এক বৎসর প্রভু সারা রাত্রিই শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনে রত থাকিতেন, উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। এই সময় প্রভু কোনও দিনই রাত্রিতে নিজ গৃহে শয়ন করেন নাই। তাহার পূর্ববর্তী কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাস কাল রাত্রিতে নিজ গৃহে শয়ন করিতেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই সময়েও গদাধর পণ্ডিতই যে রাত্রিতে প্রভুর নিকটে শয়ন করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—"গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ। প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদসন্নিকর্ষে স্থিতিমান্। তেন সার্দ্ধং রজন্যাং স তিষ্ঠন্নপ্যে শুভাননম্। দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদকম্ ॥ কড়চা ॥ ২।৩।১০-১১ ॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল, গদাধর সর্বদা প্রভুর নিকটে থাকিতেন এবং রজনীতেও থাকিতেন।

ইহার পরে মুরারি গুপ্ত লিখিয়াছেন—"গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্। কৃত্বা মাল্যাদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা ॥ শয়নীয়ে গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখম্। স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তং শৃণু তস্যামৃতং বচঃ ॥ যথা ক্বচিদ্ ব্রজে রত্নমন্দিরে কৃষ্ণসন্নিধৌ। শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা স্বপিতি প্রেমসংপ্লুতা ॥ কড়চা ॥ ২।৩।১৫-১৭ ॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল—গদাধর প্রতি দিনই প্রভুর অঙ্গে চন্দনানুলেপন এবং মাল্যাদি দিতেন এবং প্রভুর শয়ন-গৃহে শয্যা রচনা করিয়া প্রভুর নিকটে শয়ন করিতেন—ব্রজে শ্রীরাধা যেমন কখনও কখনও রত্নমন্দিরে শয্যা রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শয়ন করিতেন, তদ্রূপ।"

কবি কর্ণপূরও তাঁহার মহাকাব্যে এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। "স তু গদাধরপণ্ডিতঃ সত্তমঃ সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ। অনুদিনং ভজতে নিজজীবিত-প্রিয়তমং তমভিস্পৃহয়া যুতঃ ॥ নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ। বিহরণামৃতস্য নিরন্তরং সদুপভুক্তমনেন নিরন্তরম্ ॥ মহাকাব্য ॥ ৫।১২৮-২৯ ॥" এই উক্তি হইতেও জানা গেল—গদাধরপণ্ডিত সর্বদা প্রভুর নিকটেই থাকিতেন এবং রাত্রিতেও প্রভুর নিকটেই শয়ন করিতেন।

কর্ণপূর অন্যত্রও লিখিয়াছেন—"শ্রীমান্ গদাধর-মহামতিরত্যুদারশীলঃ স্বভাবমধুরো বহুশান্তমূর্তিঃ। ঊচে সমীপ-শয়িতঃ প্রভুনা রজন্যাং নির্মাল্যমেতদুরসি প্রতিসার্য্যস্রেভ্যঃ ॥ মহাকাব্য ॥ ৬।১২ ॥" এই উক্তি হইতেও জানা গেল—গদাধর রাত্রিকালে প্রভুর নিকটেই শয়ন করিতেন।

শ্রীবাস-গৃহে কীর্তনারম্ভের পরে তো প্রভু সমগ্র রাত্রিই কীর্তনে থাকিতেন। সেই সময়ে রাত্রিতে স্ব-গৃহে শয়নের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। মুরারি গুপ্ত এবং কর্ণপূরের কথিত, গদাধরের সহিত প্রভুর স্বগৃহে শয়ন, কেবল কীর্তনারম্ভের পূর্ববর্তী কিঞ্চিন্ন্যুন এক মাসের মধ্যেই সম্ভব। কিন্তু গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রথম কয়েক দিন যে প্রভু কৃষ্ণ-বিরহাবেশে রাত্রি জাগরণ করিতেন, কখনও বসিয়া থাকিতেন, কখনও উঠিতেন, আবার কখনও বা ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। এতাদৃশী অবস্থার পরেই সম্ভবতঃ প্রভু নিজগৃহে শয়ন করিতেন এবং গদাধরও তাঁহার নিকটে শয়ন করিতেন। কিন্তু কোন্ সময় হইতে গদাধর প্রভুর নিকটে শয়ন করিতে আরম্ভ করেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের একটি বিবরণ হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"একদিন তাম্বূল লইয়া গদাধর। সন্তোষে হইলা আসি প্রভুর গোচর॥ গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা। 'কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা'॥ সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে। কি বোল বলিব হেন বচন না স্ফুরে॥ সম্ভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়। 'নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়'॥ 'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া। আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥ আথেব্যথে গদাধর দুই হাথে ধরি। নানামতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি॥ 'এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও খানি।' গদাধর বোলে, আই দেখিল আপনি॥ বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি। 'এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥ মুঞি ভয়ে নাহি পারোঁ সম্মুখ হইতে। শিশু হই কেন (কি প্রকারে) প্রবোধিল ভালমতে॥' আই বোলে—'বাপ! তুমি সর্ব্বথা থাকিবা। ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথাহো না যাবা॥' ২।২।২০০-২০৯॥"

শচীমাতার এই আদেশ লঙ্ঘন গদাধরের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই দিন হইতেই গদাধর দিবারাত্রি সর্ব্বদাই প্রভুর নিকটে থাকিতে এবং রাত্রিতে প্রভুর নিকটে শয়ন করিতে লাগিলেন বলিয়া মনে হয়। শচীমাতার আদেশব্যতীত প্রভুর শয়ন-গৃহে অপর কেহ থাকিতে পারেন না। "প্রভুসঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা॥ ২।২৪।৩১॥" যে-সময় হইতে গদাধর প্রভুর নিকটে শয়ন করিতে লাগিলেন, সেই সময় হইতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে রাত্রিতে প্রভুর শয়ন-গৃহে থাকিতেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহার পূর্বেও বিষ্ণুপ্রিয়া রাত্রিতে প্রভুর শয়ন-গৃহে থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য আর্তিতে প্রভু সারা-নিশি জাগিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিতেন, শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া নিকটে বসাইলেও প্রভু তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না, কখনও বা তাঁহার প্রেম-হুঙ্কারে বিষ্ণুপ্রিয়া ভয় পাইয়া পলায়ন করিতেন, কখনও বা প্রভু তাঁহাকে মারিতে যাইতেন। প্রভুর এই অবস্থার সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া যে তাঁহার নিকটে যাইতেন, তাহা মনে হয় না। বিশেষতঃ, প্রভুর এতাদৃশী পরমার্তির সময়ে স্বয়ং শচীমাতাও যখন তাঁহার সম্মুখে যাইতে ভয় পাইতেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া যে যাইতেন, তাহা মনে হয় না। কিন্তু তখনও যে বিষ্ণুপ্রিয়া শচী-গৃহে ছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহা জানা যায়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যে-দিন মধ্যাহ্নে শচীমাতা প্রভুর ঐশ্বর্য দর্শন করিয়াছিলেন, সেই দিন প্রাতঃকালে শচীমাতা প্রভুর নিকটে বলিলেন—পূর্বরাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, তাঁহার দেবমন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম, নিমাই এবং নিত্যানন্দ—এই চারিজন কাড়াকাড়ি করিয়া প্রসাদ খাইতেছিলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা। আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥ তোমার ঘরের মূর্তি পরতেখ

বড়। মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ়॥ মুঞি দেখি বারে বার নৈবেদ্যের সাজে। আধা-আধি না থাকে, না কহি কারে লাজে॥ তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল। আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥ হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে। অন্তরে (আড়ালে) থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে॥ ২।৮।৪৬-৫০॥" বোধ হয় শচীমাতার চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধে প্রভু এই রঙ্গময়ী কথা বলিয়াছিলেন। "বাহ্যচেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে। সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে॥ ২।২৪।২৮॥" যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে জানা গেল, সেই সময়েও বিষ্ণুপ্রিয়া শচীগৃহে ছিলেন। তাহার পরেও যে ছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহা জানা যায়।

জগাই-মাধাই-উদ্ধারের দিনেও যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শচীগৃহে ছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহাও জানা যায়।

জগাই-মাধাইর উদ্ধারের রাত্রিতে তাঁহাদের সহিত ভক্তবৃন্দকে লইয়া প্রভু নিজ গৃহে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন—"বধূ-সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে। বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে॥ ২।১৩।৩০৬॥" আবার, সেই রাত্রিতেই প্রভু জগাই-মাধাই এবং ভক্তবৃন্দের সহিত গঙ্গায় জলকেলি করিয়াছিলেন। সে-স্থান হইতে "গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ। তুলসীর করিলেন চরণ-বন্দন॥ ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর। নৈবেদ্যান্ন আনি মা'য়ে করিলা গোচর॥ সর্ব্বভাগবতেরে করিয়া নিবেদন। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ করয়ে ভোজন॥ পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ খাইয়া। মুখশুদ্ধি করিবারে বসিলা আসিয়া॥ বধূ-সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া। মহানন্দ-সাগরে শরীর ডুবাইয়া॥ ২।১৩।৩৬৬-৭০॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল, জগাই-মাধাইর উদ্ধারের দিনেও বিষ্ণুপ্রিয়া শচীগৃহে ছিলেন।

পূর্বকথিত কবিরাজ-গোস্বামীর লীলাক্রম হইতে জানা যায়, শচীমাতার ঐশ্বর্য-দর্শন এবং জগাই-মাধাইর উদ্ধার—এই উভয় লীলাই হইয়াছিল, শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তনারম্ভের পূর্বে এবং এই দুইটি লীলার মধ্যে, শচীমাতার ঐশ্বর্য-দর্শন-লীলা হইয়াছিল আগে।

অদ্বৈতাচার্যের সম্বন্ধে প্রভু গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন এবং সে-জন্য প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে নমস্কারাদিও করিতেন। তাহাতে অদ্বৈতের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত। প্রভুর নিকট হইতে শাস্তিরূপ অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশাতে তিনি নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে যাইয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুরে যাইয়া অদ্বৈতাচার্যকে শাস্তি দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২।১৯ অধ্যায়ে এই বিবরণ দৃষ্ট হয়। শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে কয়েক দিন থাকিয়া প্রভু যখন নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন, তখন "পুত্র দেখি আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল। বধূ-সঙ্গে গৃহে করে আনন্দ-মঙ্গল॥ ২।১৯।২৭০॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়, তখনও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শচীগৃহে ছিলেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর ক্রম অনুসারে, উল্লিখিত ঘটনা হইয়াছিল, শ্রীবাসগৃহে কীর্তনারম্ভের পরে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২।১৮ অধ্যায়ে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে প্রভুর লক্ষ্মীকাচে নৃত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কবিরাজ-গোস্বামীর ক্রম অনুসারে, এই লীলা হইয়াছিল পূর্বকথিত শ্রীঅদ্বৈতের শাস্তি-প্রাপ্তির অনেক পরে এবং সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ প্রভুর গৃহত্যাগের অনেক পূর্বে। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, প্রভুর লক্ষ্মীকাচে নৃত্য-দর্শনের নিমিত্ত, প্রভুর আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবারও শচীমাতার সঙ্গে চন্দ্রশেখর আচার্যের

গৃহে গিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও গিয়াছিলেন। "আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে। লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥ যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার। চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার॥ ২।১৮।২৯-৩০॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল—এই সময়েও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শচীগৃহে ছিলেন। ইহার পরে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

যে-রাত্রির চারি দণ্ড থাকিতে সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ প্রভু গৃহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে কীর্তনার্থ প্রভু শ্রীবাস-ভবনে যায়েন নাই, নিজ গৃহেই ছিলেন। প্রভুর গৃহে আসিয়াই ভক্তগণ এবং নগরিয়াগণও প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীধর একটি লাউ লইয়া আসিয়াছিলেন, আর এক জন দুগ্ধ লইয়া আসিলেন। প্রভু জননীকে বলিলেন—"দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥ সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন। ২।২৬।৮৭-৮৮॥" শচীমাতাই রন্ধন করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, সে-দিন বিষ্ণুপ্রিয়া শচীগৃহে ছিলেন না, থাকিলে তিনিই রন্ধন করিতেন। শচীদেবী জানিতেন, সেই রাত্রিতেই প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন। "আই জানে—আজি প্রভু করিব গমন॥ ২।২৬।৯৩॥" বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহে থাকিলে দুঃখভারাক্রান্ত চিত্ত লইয়া বৃদ্ধা শচীমাতা রন্ধন করিতেন বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক "সভারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর। ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর॥ ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি। চলিলা শয়ন-গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর। নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর॥ ২।২৬।৯০-৯২॥" প্রভু নিদ্রিত হইলেন; কিন্তু "আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥ ২।২৬।৯৩॥" তিনি "দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥ ২।২৬।৯৭॥" চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিয়া প্রভু শচীমাতাকে প্রবোধ দিয়া এবং প্রদক্ষিণ করিয়া ও তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে প্রভুর প্রবোধ-দানের কথা বৃন্দাবনদাস লিখেন নাই। গৃহত্যাগ-দিনের পূর্বেও প্রভু ভক্তবৃন্দকে এবং শচীমাতাকেও প্রবোধ দিয়াছেন; কিন্তু সেই প্রসঙ্গেও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ-দানের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর গৃহত্যাগ-দিনের পূর্ব হইতেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শচীগৃহে ছিলেন না, পিত্রালয়ে ছিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে তখন শচীগৃহে ছিলেন না, তাহা বৃন্দাবনদাসের কথিত বিবরণ হইতেও জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা। জড় হইলেন, কিছু নাহি স্ফুরে কথা॥ ভক্তগণ না জানেন এ-সব বৃত্তান্ত। উষঃকালে স্নান করি যতেক মহান্ত॥ প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে। আসিয়া দেখেন—আই বাহির দুয়ারে॥ ২।২৬।১১৩-১৫॥" প্রভু সন্ন্যাস করিবেন—একথা ভক্তগণ জানিতেন। কিন্তু সেই দিনই যে প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, একথা তাঁহারা জানিতেন না, জানিতেন শ্রীনিত্যানন্দ এবং শচীমাতা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং মুকুন্দ (২।২৬।৬০)। প্রভুর আদেশে এই পাঁচ জনকে শ্রীনিত্যানন্দ তাহা জানাইয়াছিলেন।

ভক্তগণ প্রভুর গৃহত্যাগের কথা জানিলেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহাদের হৃদয়-বিদারক আর্তনাদের কথা এবং অস্থিরতার কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ-স্থলেও বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও উল্লেখ নাই।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাদটীকায় লিখিয়াছেন—

"কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া। 'সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥ (২।২৬।১২৯ ॥)" —এই পয়ারের "পরে নিম্নলিখিত পদগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকেই পরিলক্ষিত হইল ; আমাদিগের অবলম্বিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতেও ইহার কিয়দংশও দৃষ্টিগোচর হইল না। পদগুলি এই—" ইহা বলিয়া প্রভুপাদ "মুদ্রিত পুস্তকের" অতিরিক্ত পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদগুলিতেও ভক্তবৃন্দের আর্তনাদের কথাই আছে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও উল্লেখই নাই।

এই সমস্ত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—প্রভুর গৃহত্যাগের সময়ে এবং তাহার পূর্ব হইতেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শচীগৃহে ছিলেন না। তিনি পিত্রালয়েই গিয়াছিলেন। পতিগত-প্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া যে নিজে ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কোনও কারণে শচীমাতাই তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। প্রভুর পতিব্রতা সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াও বোধ হয়, তাঁহার সান্নিধ্য তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পতির পরমার্থ-পথের অন্তরায় হইবে—মনে করিয়াই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, মায়ের আদেশে, পিতৃগৃহে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন।

লোচনদাস-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের উক্তির আলোচনা। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীলনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীললোচনদাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-নামক এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে। জগত মোহিত যার ভাগবত-গীতে॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়, বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষরূপে প্রচারিত এবং সর্বত্র সমাদৃত হওয়ার পরেই লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিয়াছেন।

যাহা হউক, শ্রীললোচনদাস তাঁহার গ্রন্থে, মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতে, প্রভুর শয়ন-গৃহে, গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্রাবস্থিতির এবং উভয়ের মধ্যে বহু রঙ্গ-রসের কথা লিখিয়াছেন।

কিন্তু লোচনদাস উল্লিখিত বিবরণের উপাদান কোথায় পাইলেন, তাহা তিনি বলেন নাই। তাঁহার গুরুদেব নরহরি সরকার ঠাকুরের মুখে যে তিনি ইহা শুনিয়াছেন, তাহাও তিনি বলেন নাই। এ-সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। ডকটর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থে (২৮৩ পৃষ্ঠায়) এই কিংবদন্তীটি লিখিয়াছেন। যথা—"এই সময়ে লোচনের গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৃন্দাবন-দাসের মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। লোচনের গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, প্রভু সন্ন্যাসের পূর্ব-রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ভুবনমোহিনীরূপে সাজাইয়া এবং তাঁহাকে শেষ আলিঙ্গন-প্রদানপূর্বক গৃহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনদাস এই ঘটনা অবগত ছিলেন না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার উল্লেখ নাই। লোচনের এই বর্ণনা দেখিয়া বৃন্দাবনদাস সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার মাতা নারায়ণী দেবীর নিকট জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে নারায়ণী বলেন যে, লোচনের একটি কথাও অত্যুক্তি নহে, কারণ ঐ রাত্রিতে তিনি প্রভুর বাটিতে ছিলেন।"

এই কিংবদন্তীসম্বন্ধে নিবেদন এই। প্রথমতঃ, নারায়ণী দেবী যে মাঝে মাঝে প্রভুর গৃহে থাকিতেন, তাহা বৃন্দাবনদাস বা মুরারি গুপ্ত কোনও স্থলেই লিখেন নাই। প্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতে যে তিনি প্রভুর গৃহে ছিলেন, একথাও মুরারি গুপ্ত বা অন্য কোনও চরিতকার লিখেন নাই। সুতরাং কিংবদন্তীতে যে বলা হইয়াছে, প্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতে নারায়ণী প্রভুর বাটিতে ছিলেন, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ?

দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, প্রভু যখন গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন নারায়ণী ছিলেন চারি বৎসরের বালিকা। তাহার একবৎসর পরে প্রভু গৃহত্যাগ করেন্। সুতরাং গৃহত্যাগের সময়ে নারায়ণীর বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। পাঁচ বৎসরের বালিকা নারায়ণী যে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শয়ন-গৃহে প্রভুর রসরঙ্গ দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য? ডক্টর মজুমদার লিখিয়াছেন—"পাঁচ বৎসরের মেয়ে আড়ি পাতিয়া লোচন-বর্ণিত বিলাস-লীলা দেখিয়াছিল, একথা বিশ্বাস করা যায় না।"

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, গৃহত্যাগের দিন প্রভু নিজগৃহে ভক্তবৃন্দ এবং নগরিয়াগণের সঙ্গে "রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর" পর্যন্ত ছিলেন (২।২৬।৮৯)। তাহার পরে প্রভু সকলকে বিদায় দিয়া ভোজন করিয়া শয়ন-গৃহে নিদ্রিত হইলেন (২।২৬।৯০-৯২)। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে প্রভু গৃহত্যাগ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, রাত্রি তৃতীয় প্রহরের শেষার্ধ এবং চতুর্থ প্রহরের প্রথমার্ধের মধ্যবর্তী সময়েই প্রভু শয়ন-গৃহে ছিলেন। পাঁচ বৎসরের বালিকা নারায়ণী যে প্রভুর শয়ন-গৃহে "আড়ি পাতিবার" নিমিত্ত, একাকিনী রাত্রি তৃতীয়-চতুর্থ প্রহরে প্রভুর গৃহে আসিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ, তিনি থাকিতেন তাঁহার খুল্লতাত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে। তাঁহার খুল্লতাতপত্নীগণ যে নিশার্ধের পরে তাঁহাকে একাকিনী ঘরের বাহির হইতে দিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, তিনি বাহির হইয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন কিরূপে? বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, প্রভু শয়ন-গৃহে গেলে শচীমাতা জাগ্রত অবস্থায় "দুয়ারে" বসিয়া ছিলেন; পরের দিন প্রাতঃকালে ভক্তগণ যখন প্রভুকে নমস্কার করিতে আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহারা শচীমাতাকে "দুয়ারে" জড়প্রায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। নারায়ণী "আড়ি পাতিতে" গিয়াছিলেন। শচীমাতাকে দুয়ারে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে সম্ভব। ফিরিয়া গেলে আর প্রভুর শয়ন-গৃহের নিকটে "আড়ি পাতা" সম্ভব হয় না।

পাঁচ বৎসরের কোনও বালিকা স্বামী-স্ত্রীর গোপন-কথাদির মর্ম কি বুঝে? যাহারা তাহার মর্ম বুঝে, তাহাদের পক্ষেই "আড়ি পাতা" সম্ভব। "আড়িপাতার" কৌতূহল নারায়ণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রায় সমবয়স্কা সখীস্থানীয়া নারীদের স্বামীর সহিত কথাবার্তাদি শুনার জন্যই নারীরা "আড়ি পাতে"। বিষ্ণুপ্রিয়া কি নারায়ণীর সমবয়স্কা এবং সখীস্থানীয়া ছিলেন?

শ্রীবাসের গৃহে নারায়ণী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—তাঁহার বয়োবৃদ্ধ খুল্লতাত শ্রীবাস-পণ্ডিতাদি প্রভুর পূজা-স্তবাদি করিয়াছেন। প্রভুর তৎকালীন বয়স এবং নারায়ণীর বয়সের পার্থক্যও অনেক। এই অবস্থায় প্রভুর শয়ন-গৃহে "আড়ি পাতিবার" প্রবৃত্তিও নারায়ণীর পক্ষে কল্পনাতীত।

তৃতীয়তঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে, নারায়ণী দেবীর অন্তর্ধানের পরেই বৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন (পূর্ববর্তী ১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীচৈতন্যভাগবত যখন বিশেষরূপে প্রচারিত এবং সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল, তখনই যে লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহাও এই অনুচ্ছেদে পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং বৃন্দাবনদাস যখন লোচনদাসের গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন, তাহার বহুপূর্বেই নারায়ণী দেবী অপ্রকট হইয়াছেন। সেই সময়ে বৃন্দাবনদাস কিরূপে তাঁহার মাতা নারায়ণীকে লোচনদাসের বর্ণিত লীলার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং নারায়ণীই বা কিরূপে তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন?

এইরূপে দেখা গেল, উল্লিখিত কিংবদন্তীর সারবত্তা কিছুই নাই। লোচনদাস যে তাঁহার শ্রীচৈতন্য-

মঙ্গলে, গৌর-নাগরীবাদ-নামক একটি নূতন মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সর্বজন-বিদিত। তাঁহার এই নূতন মতবাদের সমর্থনেই যে তিনি প্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত প্রভুর অবাস্তব রঙ্গ-রহস্যের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বিবরণ তাঁহার স্ব-কপোল-কল্পিত। উল্লিখিত কিংবদন্তীও তাঁহার মতবাদের অনুবর্তী কোনও লোকের নির্বিচার-কল্পনামাত্র। অন্য গৌর-চরিতকার-গণের, বিশেষতঃ প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্তের, উক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া লোচনদাসের প্রদত্ত বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীসম্বন্ধে এই অনুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত আর কোনও কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় না। মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চার চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—"বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে প্রভু কাশী হইতে যাত্রা করিয়া নবদ্বীপের নিকটস্থ কুলিয়া-নগরে আসিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ কুলিয়াতে প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপে গমনের নিমিত্ত প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইলেন। সম্মত হইয়া প্রভু নবদ্বীপে যাইয়া জননীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন এবং মাতৃপ্রদত্ত অন্ন ভোজন করিলেন। ইহার পরে, মুদ্রিত কড়চায় এইরূপ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

"প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্। বিধায় তস্যাং স্থিত এব কৃষ্ণঃ সা লক্ষ্মীরূপাচ নিষেবতে প্রভুম্ ॥ কড়চা॥ ৪।১৪।৮॥ —প্রভু প্রকাশরূপে নিজ-প্রিয়ার (বিষ্ণুপ্রিয়ার) নিকটে আসিয়া নিজ মূর্তি (বিগ্রহ) বিধান করিয়া (প্রস্তুত করিয়া?) সেই মূর্তিতেই কৃষ্ণ (গৌর-কৃষ্ণ) অবস্থান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীরূপা সেই বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রভুর (প্রভুর মূর্তির) সেবা করিতে লাগিলেন॥"

এই উক্তিসম্বন্ধে নিবেদন এই। পূর্বেই (২-গ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, মুদ্রিত কড়চার তৃতীয় ও চতুর্থ প্রক্রমের সকল উক্তির যাথার্থ্য স্বীকৃত হয় না। এই দুইটি প্রক্রমে পরবর্তীকালের সংযোজিত বহু শ্লোক আছে বলিয়াই সমালোচকগণ মনে করেন। চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দশ অধ্যায়ের যে-বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে, তাহা অবাস্তব। যেহেতু, বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যে কুলিয়ায় এবং নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, একথা কবিরাজ-গোস্বামী বলেন নাই। এই সময়ে প্রভুর নবদ্বীপে আগমন অবাস্তব হইলে, প্রকাশরূপে প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন-দান এবং তাঁহাকে স্বীয় বিগ্রহ-দানও অবাস্তব হইয়া পড়ে। সুতরাং উল্লিখিত বিবরণ যে মুরারি গুপ্তের লিখিত বিবরণ নহে, এবং ইহা যে মুরারি গুপ্তের কড়চাতে পরবর্তী-কালে কেহ সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাই মনে হয়।

পরবর্তীকালে, বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য বিপ্র জগন্নাথের পুত্র শ্রীলনরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যামদাস) "ভক্তিরত্নাকর"-নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী-সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

ভক্তিরত্নাকর বলেন—বৃন্দাবন-গমনের পূর্বে শ্রীলশ্রীনিবাস আচার্য নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুগত ঠাকুর বংশীবদনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি শ্রীনিবাসকে কোলে করিয়া স্বীয় নেত্রজলে তাঁহাকে সিক্ত করিলেন। পরে "শ্রীঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ে জানাইতে। চলিলেন শ্রীবংশীবদন সাবহিতে॥ এথা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয় দাসী প্রতি কয়। দেখিনু স্বপন কহি, মনে যে আছয়॥ ভুবনমোহন প্রভু মোর প্রাণপতি। আইলা আমার আগে কি মধুর গতি॥ কামের গরব নাশে সে রূপের ছটা। তাহে কি

উপমা ছার বিজুরীর ঘটা॥ কিবা চারু-চন্দনে চর্চ্চিত সব তনু। শরদের চাঁদ কোটি লেপিয়াছে যনু॥ ভূষণে ভূষিত সে বসন পরিধানে। লোভায় যুবতী লাজ ভয় নাহি মনে॥ আহা মরি চাঁচর চিকুর চারু চুলে। কিবা সে সৌরভ তার কেবা নাহি ভুলে॥ দুটি আঁখি দীঘল কমলদল জিনি। না ধরে ধৈরয কেহ দেখি সে চাহনি॥ আজানুলম্বিত বাহু ভঙ্গী মনোহর। জগৎ মাতায় কিবা বক্ষঃ পরিসর॥ সে চাঁদবদনে অতি মন্দ মন্দ হাসি। না জানি কি অমিয়া বরিষে রাশি রাশি॥ কত না আদরে মোরে বসায়ে আসনে। ধীরে ধীরে কহে মোরে মধুর বচনে॥ শ্রীনিবাস নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার। পাইল যতেক দুঃখ লেখা নাহি তার॥ অদ্য আসিবেন তিঁহো তোমার দর্শনে। আপনা জানিয়া কৃপা করিবা তাহানে॥ ঐছে কত কহি কি আনন্দ প্রকাশিয়া। হৈলা অদর্শন দুঃখে বসিনু জাগিয়া॥ বুঝিনু সে মোর প্রাণনাথ-প্রিয় অতি। মনে হেন হয় তার হবে শীঘ্রগতি॥ হেন কালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা। নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা॥ শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে। শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী-সাক্ষাতে॥ প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর। ধরণী লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর॥ শ্রীনিবাস প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী। দাঁড়াইল সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ সঙরি॥ প্রভুর বিচ্ছেদ-দাবানলে জ্বলে হিয়া। তথাপি উল্লাস শ্রীনিবাসে নিরখিয়া॥ বাৎসল্যানুগ্রহে কহি মধুর বচন। শ্রীনিবাস-মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ॥ শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইতে আজ্ঞা দিয়া। হইলেন স্তব্ধ নেত্রজলে ভাসে হিয়া॥ শ্রীনিবাসে দিল কেহ প্রসাদ বিরলে। খাইলা প্রসাদ, সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে॥ প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন। ভক্তিরত্নাকর, চতুর্থতরঙ্গ॥ বহরমপুর সংস্করণ॥ ১২২-২৪ পৃষ্ঠা॥"

এই বিবরণ হইতে জানা গেল, মহাপ্রভু ভুবন-মোহনরূপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলেন। ইহা হইতেছে মহাপ্রভুর তিরোধানের অনেক পরের ঘটনা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ১৫১৪-শকের বৈশাখ মাসে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল"-শীর্ষক প্রবন্ধ, ২০-২২ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ১৫১৩ শকে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। মহাপ্রভুর অন্তর্ধান ১৪৫৫ শকে। সুতরাং ইহা হইতেছে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের ৫৮ বৎসর পরের ঘটনা। ১৪৩১ শকে মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়স অনূন ১৫।১৬ বৎসর ছিল বলিয়া মনে করিলে ১৫১৩ শকে তাঁহার বয়স ছিল অনূন ৯৭।৯৮ বৎসর। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি দীর্ঘ কাল প্রকট ছিলেন। যাহা হউক, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর আরও বলিয়াছেন—"ঈশ্বরীর ক্রিয়া যৈছে না হয় বর্ণন॥ প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে। কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥ কনক জিনিয়া অঙ্গ, সে অতি মলিন। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥ হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥ তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেন রাখয়ে জীবন॥ শ্রীনিবাসে সন্দর্শন দিয়া দিনে দিনে। যে দশা হইল, তা' বর্ণিব কোন্ জনে॥ তখনি সে অনুভব কৈল সর্ব্বজন। শ্রীনিবাসে কৃপাহেতু দেহ ধারণ॥ ভক্তিরত্নাকর॥ চতুর্থতরঙ্গ॥ ১২৪ পৃষ্ঠা॥"

এই বিবরণে যে কঠোর-নিয়ম-নিষ্ঠা এবং কঠোর ভজনাদর্শের কথা জানা গেল, তাহা গৌর-ঘরণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পক্ষেই সম্ভব।

তিনি কোন্ সময়ে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে উল্লিখিত বিবরণ হইতে মনে হয়, শ্রীনিবাস আচার্যকে কৃপা করার পরে তিনি বেশী দিন প্রকট ছিলেন না।

৫৪। গৌরমন্ত্র

পূর্ববর্তী ৫১-অনুচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে যে-সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের আলোচনায় জানা গিয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ—উভয়ই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, উভয়ই উপাস্য এবং উভয়ের ধাম ও সেবা প্রাপ্তিই সাধকের কাম্য। ইহাও জানা গিয়াছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার যোগেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর্তব্য। বস্তুতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে উভয় স্বরূপের অর্চনাদিই প্রচলিত আছে,—আগে গৌরের পূজা, তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের পূজার রীতিই প্রচলিত।

উপাসনা করিতে হইলে উপাস্য-স্বরূপের মন্ত্রের প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনাতেও গৌর-মন্ত্রের প্রয়োজন। এ-সম্বন্ধেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু গৌর-মন্ত্র এবং তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান। একশ্রেণীর বৈষ্ণবেরা বলেন—গৌর যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেই গৌরের উপাসনা কর্তব্য। আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা বলেন—গৌর শ্রীকৃষ্ণ সত্য, কিন্তু কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে গৌরের উপাসনা করিলে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা হইতে পারে না, পৃথক্ মন্ত্রেই গৌরের উপাসনা কর্তব্য এবং গৌরের পৃথক্ মন্ত্রও কোনও কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের একস্থলে আছে—"এক দিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে। অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥ অদ্বৈত দেখিল গিয়া প্রভু দুইজন। বসিয়া করয়ে জল-তুলসী সেবন॥ দুই ভুজ আস্ফালিয়া বোলে 'হরি হরি'। ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে অর্চ্চন পাসরি॥ মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার। ক্রোধ দেখি—যেন মহারুদ্র-অবতার॥ অদ্বৈত দেখিয়া মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর। পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী-উপর॥ ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল। 'এই মোর প্রাণনাথ' —জানিলা সকল॥ 'কতি যাবে চোরা আজি'—ভাবে মনে মনে। 'এত দিন চুরি করি বুল এই খানে॥ অদ্বৈতের ঠাঞি চোর! না লাগে চোরাই। চোরের উপর চুরি করিব এথাই॥' চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে। সর্ব্ব-পূজা-সজ্জ লই নাম্বিলা তখনে॥ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঞি। চৈতন্য-চরণ পূজে আচার্য্য গোসাঞি॥ গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ, চরণ-উপরে। পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করে॥ "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥' পুনঃ পুন শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে। চিনিঞা আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥ পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে। যোড়হস্ত করি দাণ্ডাইলা পদতলে॥ ২।২।১২৬-৩৮॥ কথোক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিলা বাহ্য। দেখেন আবেশময় অদ্বৈত আচার্য্য॥ ২।২।১৪২॥"

এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত কোন্ মন্ত্রে প্রভুর পূজা করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহা লিখেন নাই। কিন্তু "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া যে অদ্বৈত প্রভুকে নমস্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতেই প্রভুর পূজা করিয়াছিলেন। তাহার হেতুও উল্লিখিত পয়ার-সমূহে পাওয়া যায়। প্রভু যে অদ্বৈতের "প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ", তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস অন্যস্থলেও লিখিয়াছেন, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর অপূর্ব শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছিলেন (২।৬।৭৩-৯১ দ্রষ্টব্য)। তাহার পরে প্রভুর আদেশে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যে পটল বিধানে" প্রভুর পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ মন্ত্রে তিনি প্রভুর পূজা করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস তাহা না লিখিলেও, শ্রীঅদ্বৈত যে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"-ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন, তাহা তিনি লিখিয়াছেন (২।৬।১০৩-১২ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈত তখন শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতেই প্রভুর পূজা করিয়াছিলেন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি তখন প্রভুর শ্রীকৃষ্ণরূপেরই দর্শন পাইয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীবাস-গৃহে ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া প্রভু যখন বিষ্ণুখট্টায় বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার আদেশে ভক্তগণ তাঁহার অভিষেক এবং "দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে। পূজা করি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে" ॥ ২।৯।৫০ ॥" এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতেই প্রভুর পূজা হইয়াছিল, ভক্ত ভাবময় রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ বুদ্ধিতে নহে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াও কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা কর্তব্য।

গৌর-মন্ত্র লইয়া বহু পূর্বেও বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। ইহার মীমাংসা কি, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। মীমাংসার যোগ্যতা আমাদের নাই, সতুরাং সেই চেষ্টাতেও আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে ভজন-রহস্যবিৎ সুধীভক্তবৃন্দের বিবেচনার জন্য তাঁহাদের চরণে এ-স্থলে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

উপাস্যস্বরূপের উপাসনা-মন্ত্র হইতেছে তাঁহার স্বরূপদ্যোতক এবং ভাবদ্যোতক। দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব এবং কান্তাভাব—এই চারিভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এক হইলেও এই চারিভাবের লীলায় তাঁহার ভাব এক নহে। এই চারিভাবের উপাপনা-মন্ত্রও এক নহে, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন। কান্তাভাবের মন্ত্রে, অর্থাৎ দশাক্ষর কি অষ্টাদশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে, যে বাৎসল্যভাবের উপাসনা হইতে পারে না, কিংবা বাৎসল্যভাবের মন্ত্রে যে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত বিহারকারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হইতে পারে না, তাহা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। প্রত্যেক ভাবের উপাসনা-মন্ত্রই হইতেছে সেই ভাব-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপদ্যোতক ও ভাবদ্যোতক।

গৌরের স্বরূপ হইতেছে এই যে—তিনি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, এবং সেজন্য তিনি ভক্তভাবময়। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের দ্যোতকও নহে, ভক্তভাব-দ্যোতকও নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে গৌরের উপাসনায় শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ এবং ভাব কিরূপে প্রকাশ পাইতে পারে, ভজনবিজ্ঞ সুধী ভক্তদের চরণে আমাদের তাহাই বিনীত জিজ্ঞাস্য।

পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, অদ্বৈতাচার্য উল্লিখিত দুই স্থলে শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতেই প্রভুর পূজা করিয়াছেন ; উল্লিখিত দুই স্থলে তিনি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ-বুদ্ধিতে গৌরের পূজা করেন নাই। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপের উপাসনায়, শ্রীঅদ্বৈতের উল্লিখিত আচরণের অনুসরণ সঙ্গত কিনা, তাহাও আমাদের বিনীত জিজ্ঞাসা।

আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, কান্তাভাবের সাধকরূপে শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়, প্রভুর স্বরূপ-দ্যোতক "গৌরাঙ্গ এবং গৌর"-শব্দদ্বয়ের উল্লেখপূর্বক যে বলিয়াছেন, "গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে

স্ফুরে” এবং “গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যে বা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ”, কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরের উপাসনায়, ঠাকুর মহাশয়ের এই উক্তিগুলির সার্থকতা মিলিবে কিনা এবং কবিরাজ-গোস্বামীও যে বলিয়াছেন—“কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার, দশ দিকে কহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গ-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥”—এই উক্তিরও সার্থকতা থাকে কিনা ?

শ্রীঅদ্বৈত যে গৌরের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহাও জানা যায়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বলিয়াছেন—“সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার ॥ ২।৬।১২৪ ॥” “সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে” শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয় না, হয়ও নাই। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপেরই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে অবতার হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈত বুঝিতে পারিয়াছেন—এই প্রভুই রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ।

আবার প্রভু যখন অদ্বৈতকে বর মাগিতে বলিলেন, তখন অদ্বৈত বলিলেন—“আর কি মাগিমু বর। যে বর চাহিলুঁ তাহা পাইলুঁ সকল ॥” ২।৬।১৫৮ ॥ তখন প্রভু বিশ্বম্ভর মাথা ঢুলাইয়া শ্রীঅদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন—“তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর ॥ ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার। মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার ॥ ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে। হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে ॥ ২।৬।১৬২-৬৪।” ঘরে ঘরে কীর্তন-প্রচার এবং ব্রহ্মা-ভবাদির আকাংক্ষিত ভক্তি (অর্থাৎ প্রেম) বিলাইয়া দেওয়া (অর্থাৎ নির্বিচারে সকলকে দেওয়া) শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের কার্য নহে, ইহা হইতেছে শ্রীরাধার সহিত একই দেহে মিলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই কার্য। তাহা উপলব্ধি করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত বলিয়াছিলেন—“যদি ভক্তি বিলাইবা। স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা ॥ ২।৬।১৬৫ ॥ চণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গায়্যা ॥ ২।৬।১৬৭ ॥” প্রভুও তাহা অঙ্গীকার করিলেন, প্রভু “অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার। প্রভু বোলে—সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥ ২।৬।১৬৮ ॥” প্রভুর কথা শুনিয়া—“সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য-গোসাঞি। অভিমত পাইয়া রহিলা সেই ঠাঞি ॥ ২।৬।১৭৬ ॥”

এই বিবরণ হইতে জানা গেল, শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বেরও উপলব্ধি পাইয়াছেন। এই সময়ে শ্রীঅদ্বৈত যে মহাপ্রভুর পূজা করিয়াছিলেন, শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাহা লিখেন নাই। যদি পূজা করিতেন, তাহা হইলে কি মন্ত্রে বা কোন্‌ভাবে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যাইত।

ইহার পরে, অর্থাৎ প্রভুর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বের উপলব্ধির পরে, নীলাচল হইতে প্রভুর বঙ্গদেশে আগমন-সময়ে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখনও প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নৃত্যকীর্তন করিয়াছিলেন। (৩।৪।৪৮১-৮৪)। এ-স্থলেও প্রভুর ভক্তভাবময়ত্ব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপত্বই, প্রকাশ পাইয়াছে, কৃষ্ণস্বরূপত্ব প্রকাশ পায় নাই। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের সহিত সংকীর্তনে নৃত্য-গীত করেন নাই। এই সময়েও শ্রীঅদ্বৈত “দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জনাদি”-যোগে প্রভুকে ভোজন করাইয়াছিলেন (৩।৪।৪৯৭-৫০০) এবং “দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা” দিয়াছিলেন (৩।৪।৫০৩)। এ-স্থলেও শ্রীঅদ্বৈত কোনও মন্ত্রে এ-সকল উপকরণ নিবেদন করেন নাই, তাহার কোনও প্রয়োজনও ছিল না। কেন না, স্বীয় অভীষ্ট লীলা-বিলাসী উপাস্য-স্বরূপের মন্ত্র চিন্তা করিয়া তাঁহার স্বরূপের স্মৃতি চিত্তে জাগ্রত করাই মন্ত্রচিন্তার উদ্দেশ্য। চিত্তে স্মৃতি জাগ্রত হইলে, উপচার অঙ্গীকার করার নিমিত্ত উপাস্যের চরণে প্রার্থনা-জ্ঞাপনই হইতেছে মন্ত্রের

সহিত উপচার-নিবেদনের উদ্দেশ্য। যে-স্থলে উপাস্য সাক্ষাদ্‌ভাবে উপস্থিত, সে-স্থলে মন্ত্র-ভাবনার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। প্রভুর অসাক্ষাতে শ্রীঅদ্বৈত যদি রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ প্রভুকে কখনও ভোগ নিবেদন করিতেন, তাহা হইলে জানা যাইত, কি মন্ত্রে তিনি তাহা নিবেদন করিতেন। কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, পাণিহাটীর শ্রীলরাঘব পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণকে যেমন ভোগ নিবেদন করিতেন, তেমনি আবার গৌরকেও পৃথক্ ভোগ নিবেদন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতেই যদি তিনি গৌরকে ভোগ নিবেদন করিতেন, তাহা হইলে পৃথক্‌ভাবে ভোগ-নিবেদনের সার্থকতা কিছু থাকিত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তিনি কোন্ মন্ত্রে প্রভুর ভোগ নিবেদন করিতেন, তাহা জানা যায় না।

বস্তুতঃ কেবল মন্ত্র-চিন্তাপূর্বক ভোগ নিবেদন করিলেই যে ভগবান্ তাহা ভোজন করেন, তাহা নয়; প্রীতির সহিত নিবেদিত হইলেই ভগবান্ তাহা ভোজন করেন। "নানোপচারকৃতপূজমমার্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ"—ইত্যাদি বচনই তাহার প্রমাণ।

যাহা হউক, ভজনরহস্যবিৎ সুধীভক্তগণের চরণে আর একটি নিবেদন এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন—শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথক্ মন্ত্র আছে এবং তাহা শাস্ত্রীয় মন্ত্র। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, সেই পৃথক্ মন্ত্র প্রামাণ্য-শাস্ত্রের মন্ত্র নহে। তাহা শাস্ত্রীয় মন্ত্র কিনা, সে-বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা আমাদের নাই। যদি কেহ সেই মন্ত্রে গৌরের পূজা না করিয়া, গৌরের স্বরূপ-বাচক কোনও নাম-মন্ত্রে গৌরের পূজাদি করেন, তাহা হইলে সেই পূজাদি সার্থক হইবে কিনা, সুধীবৃন্দের নিকটে তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

ভক্তিমার্গের সাধনে, সপরিকর উপাস্যের পূজাদিই বিহিত। যাঁহারা কান্তাভাবের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উপাসনা করেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদিরও যথাযোগ্যভাবে তাঁহারা সেবা-পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীরাধিকাদির নাম-মন্ত্রেই (অর্থাৎ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ, শ্রীশ্রীললিতা-বিশাখাদি-সখীগণেভ্যো নমঃ, শ্রীরূপাদি-মঞ্জরীগণেভ্যো নমঃ—ইত্যাদি চতুর্থ্যন্ত নাম-মন্ত্রেই) যথাযোগ্যভাবে পূজা করিয়া থাকেন, নাম-মন্ত্রে শ্রীরাধিকাদির এতাদৃশী পূজা যে অসার্থক, তাহা তাঁহারা কেহ মনে করেন না। তাঁহা মনে করিলে নাম-মন্ত্রে পূজা করিতেন না।

তদ্রূপ, শ্রীগৌরাঙ্গের পূজার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর এবং শ্রীশ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দের পূজাদিও ভক্তগণ করিয়া থাকেন। বহুস্থলে শ্রীনিত্যানন্দাদির পূজাদি চতুর্থ্যন্ত নাম-মন্ত্রেই হইয়া থাকে এবং সেই পূজাদি সার্থক বলিয়াই ভক্তগণ মনে করেন। নাম-মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দাদির পূজা যদি সার্থক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ-বাচক কোনও চতুর্থ্যন্ত নাম-মন্ত্রে (যেমন শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ—ইত্যাদি মন্ত্রে) মহাপ্রভুর পূজাদি কি অপরাধ-জনক বা অসার্থক হইবে?

উপরোক্ত আলোচনায় যে-জিজ্ঞাস্যগুলির কথা বলা হইল, ভজনরহস্যবিৎ সুধীভক্তগণ অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের উত্তর নির্ণয় করিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে বিনীত প্রার্থনা।

৫৫। জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষা

মহাপ্রভুর উক্তিতে, ভক্তগণের উক্তিতে এবং গ্রন্থকারের উক্তিতে, জীব-জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্যভাগবত

অনেক শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। পারমার্থিকী শিক্ষাই হইতেছে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মুখ্য শিক্ষা, অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা হইতেছে আনুষঙ্গিকী।

পূর্ববর্তী ৫১-অনুচ্ছেদে, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ—উভয়েই হইতেছেন সম্বন্ধ-তত্ত্ব, উভয়ের সহিতই জীবের স্বরূপানুবন্ধী প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, উভয়ের প্রীতিময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও যে বলিয়াছেন--কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সেবা লাভ করিতে হইলে একান্ত প্রয়োজন যে, তাদৃশী সেবার বাসনা, বা প্রেম, তাহাও সে-স্থলে বলা হইয়াছে। এই প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রেমলাভের নিমিত্ত জীবের কর্তব্য যে-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান—যে-সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে, কৃষ্ণসুখ-বাসনাব্যতীত, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত, সেই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান—তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সেই প্রেম বা বিষ্ণুভক্তি যে নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয়, অব্যয়, মহাপ্রভুর মুখে শ্রীচৈতন্যভাগবত তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। "বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সব সত্য বিষ্ণুভক্তি। মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণশক্তি॥ মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে। হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥ ৩।৩।৪৯৬-৯৮॥" এতাদৃশী ভক্তি বা প্রেম-প্রাপ্তির সাধন যে ভক্তিযোগ, শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। "ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন। 'ভক্তি' (অর্থাৎ ভক্তিযোগ) এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন॥ 'কৃষ্ণ' বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাথ মিলে। ধন কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥ ২।২৪।৭২-৭৩॥"

কিরূপে কৃষ্ণনাম করিলে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, মহাপ্রভুর মুখে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। "বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম। 'অনিন্দক হই সভে বোল কৃষ্ণনাম॥ অনিন্দক হই যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বোলে। সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিমু হেলে॥' ২।১৯।২১৩-১৪॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিন্দার সাংঘাতিক কুফল বহু স্থলে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণব-নিন্দার কুফলের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

"যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার। এই মত নিন্দক সন্ন্যাসী দুরাচার॥ নিন্দক-তপস্বী বাটোয়ারে নাহি ভেদ। দুইতে নিন্দক বড়—এই কহে বেদ॥ তথাহি শ্রীমন্নারদীয়ে॥ প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্। বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥ হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্। পাবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাণৈরেবং বকব্রতাঃ॥ (২।২০।১-২-শ্লোকার্থ দ্রষ্টব্য)॥ ভাল রে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে। সাধুনিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥ সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়। জন্ম জন্ম অধঃপাত—চারিবেদে কয়॥ বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে। জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে'॥ অতএব নিন্দক তপস্বী—বাটোয়ার। বাটোয়ার হৈতেও অত্যন্ত দুরাচার॥ আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব। নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট কহে শাস্ত্র সব॥ অনিন্দক হই যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে। সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥ চারি বেদ পঢ়িয়াও যদি নিন্দা করে। জন্মে জন্মে কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥ ২।২০।১৩৮-৪৬॥"

শ্রীলবৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর। ভক্তিবিনে জপতপ অকিঞ্চিৎকর। বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ। কৃষ্ণপ্রেম হইলেও তার প্রেম-বাধ॥ আমি নাহি বলি;—এই বেদের বচন। সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন॥ যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার। বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্বে আছিল তাঁহার। আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া। মা'য়েরে দিলেন প্রেম সভা' শিখাইয়া॥ ২।২২।৬-১০॥" (২।২২।৪০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রভু বলিয়াছেন—"যেই মোর দাসের সকৃত নিন্দা করে। মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহরে॥ ২।১৯।২০৯॥"

নিন্দাদোষের ক্ষালন কিরূপে হইতে পারে, প্রভু তাহাও বলিয়াছেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুর নিকটে বলিলেন—"ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া। বহু নিন্দা করিয়াছোঁ আপনা খাইয়া॥ 'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।' এই মত অনেক বলিলুঁ অনুক্ষণ। এবে প্রভু সে পাপিষ্ঠ কর্ম্ম স্মঙরিতে। অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে' সর্ব্বমতে॥ সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ। কহ মোরে কেমতে খণ্ডয়ে সেই পাপ॥ ৩।৩।৪৩৫-৩৮॥" তখন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"শুন বিপ্র! বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ। সেই মুখে করি যদি অমৃত-গ্রহণ॥ বিষো হয় জীর্ণ, দেহ হয় ত অমর। অমৃত প্রভাবে; এবে শুনহ উত্তর॥ না জানিয়া যত তুমি করিলে নিন্দন। সে কেবল বিষ তুমি করিলে ভোজন॥ পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম। নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥ যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন। সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥ সভা হৈতে ভক্তির মহিমা বাড়াইয়া। গীত কবিত্ব বিপ্র! কর তুমি গিয়া॥ কৃষ্ণ-যশ-পরমানন্দ-অমৃতে তোমার। নিন্দা-দোষ যত সব করিব সংহার॥ এই কহি সভারে, তোমারে না কেবল। না জানিঞা নিন্দা করিলেক যে-সকল॥ আর যদি নিন্দা-কর্ম্ম কভু না আচরে। নিরবধি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥ এ-সকল পাপ ঘুচে, এই সে উপায়ে। কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়ে॥ চল বিপ্র! কর গিয়া ভক্তির বর্ণন। তবে সে তোমার সর্ব্ব-পাপ-বিমোচন॥ ৩।৩।৪৪০-৫০॥"

আর, জানিয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিলে, সেই বৈষ্ণবেরচরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার তুষ্টি-বিধান-পূর্ব্বক অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই যে সেই অপরাধের ক্ষালন হইতে পারে, প্রভু তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন। প্রভু বলিয়াছেন—"যে বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয় যার। পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নারে আর॥ ২।২২।৩২॥"

এ-রকম অনেক লোক আছেন, যাঁহারা যখন যে-রকম সভায় যায়েন, তখন সে-রকম কথাই বলেন, কখনও কখনও ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান-যোগাদির উৎকর্ষও খ্যাপন করেন। এতাদৃশ লোকদিগকে প্রভু "খড়-জাঠিয়া" বলিয়াছেন এবং ভক্তির নিকটে যে তাঁহাদের অপরাধ হয়, তাহাও বলিয়াছেন। এইরূপ "খড়-জাঠিয়ামি" যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত, মুকুন্দ দত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন (২।১০।১৭২-৯০ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

অহংকার হইতেই নিন্দাদির প্রবৃত্তি জাগে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা। ১।৯।৪৩॥ ফলবন্ত বৃক্ষ, আর গুণবন্ত জন। নম্রতা সে স্বভাব অনুক্ষণ॥ ১।৯।৪৫॥"

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৈষ্ণব-সেবার অবশ্য-কর্তব্যত্ব-সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন। "'কৃষ্ণসেবা হৈতেও

বৈষ্ণব-সেবা বড়।' ভাগবত-আদি সর্ব্বশাস্ত্রে কৈল দঢ়। এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম-উপায়। ভক্তসেবা হৈতে সে সভেই কৃষ্ণ পায়॥ ৩।৩।৪৭৬-৭৭॥"

মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া। যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥ সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে। তার পূজা মোর গা'য়ে অগ্নি হেন পড়ে॥ ২।১৯।২০৭-৮॥"

হিংসা-বর্জনের উপদেশও শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়। প্রভু বলিয়াছেন—"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত—সব মোর দাস। এতেকে যে পরহিংসে, সেই যায় নাশ॥ ২।১৯।২১০॥" শচীমাতার নিকটেও প্রভু বলিয়াছেন—"ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়। সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন—পরহিংসা যা'য়॥ ২।১।২৩৩॥"

জীবমাত্রের মধ্যেই পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত। সুতরাং কুক্কুর, চাণ্ডাল, গো-খর পর্যন্ত সকলকেই দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করা যে কর্তব্য, শ্রীমদ্ভাগবত তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্-ভূমাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥" "প্রবিষ্টো জীব-কলয়া তত্রৈব ভগবানিতি। ভা. ১১।১৯।১৬; ৩।২৯।৩৪॥" এই শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর নিকট বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি। দণ্ডবত করিবেক বহু মান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম—সভারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী, যার ইথে নাহি মতি॥ ৩।৩।২৮-২৯॥" শ্রীলবৃন্দাবনদাসও বলিয়াছেন—"কাহারো না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে। অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥ 'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে। সভার সম্মান—ভাগবত-ধর্ম্ম হয়ে॥ ২।১০।৩১০-১১॥" ২।১০।৩১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির অপকারিতার কথাও বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। "যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥ ২।১০।১৫১॥" এই পয়ারের টীকায় শাস্ত্র-প্রমাণ দ্রষ্টব্য। শ্রীলবৃন্দাবনদাস আরও বলিয়াছেন—"যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম—সর্ব্ব-শাস্ত্রে কহে॥ ২।১০।৯৯॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার অনুকূল সাধন-পন্থার কথাই সর্বত্র বলা হইয়াছে। সেই সেবাপ্রাপ্তির প্রতিকূল বলিয়া ভুক্তি-মুক্তি-প্রাপ্তির অনুকূল সাধন-পন্থার কথা কোনও স্থলেই বলা হয় নাই।

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে যাইতেছিলেন, তখন ললিতপুর-গ্রামে এক সন্ন্যাসীর গৃহে তিনি গিয়াছিলেন। তখন প্রভু সন্ন্যাসীর পরিচয় জানিতেন না। গিয়া "বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণামে॥ ২।১৯।৪৬॥" তখন "সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ। 'ধন বংশ-সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ॥' প্রভু বোলে—'গোসাঞি! এ নহে আশীর্ব্বাদ। হেন বোল—'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥ বিষ্ণু-ভক্তি-আশীর্ব্বাদ—অক্ষয় অব্যয়। যে বলিলা গোসাঞি! তোমার যোগ্য নয়'॥ ২।১৯।৪৮-৫০॥" সন্ন্যাসী প্রভুকে ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের (অর্থাৎ ইহকালের ভুক্তির) অনুকূল আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন—ইহা বাস্তবিক আশীর্বাদ, অর্থাৎ বাস্তব-মঙ্গল-প্রাপক আশীর্বাদ, নহে। যে-হেতু, ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদিরূপ ভুক্তি "অক্ষয় অব্যয়" নহে, অনিত্য। যাহাতে "অক্ষয় অব্যয় বিষ্ণুভক্তি" পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে বাস্তব আশীর্বাদ।

ইহাদ্বারা প্রভু জানাইলেন—ইহকালের ভুক্তি হইতেছে নিতান্ত অসার, তাহার নিমিত্ত ইচ্ছা হইতেছে বিষ্ণুভক্তির প্রতিকূল।

এই প্রসঙ্গে প্রভু আরও বলিয়াছিলেন—"বেদেও বুঝায় স্বর্গ, শ্লোলে জনাজনা। মূর্খপ্রতি কেবল বেদের করুণা॥ বিষয়সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ। চিত্ত বুঝি কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥ ২।১৯।৬৪-৬৫॥" যাহারা দেহ-সুখ-সর্বস্ব, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত, তাহারা ইহকালের ন্যায়, পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগরূপ ভুক্তিও চাহিয়া থাকে। তাহাদিগকে বেদের আনুগত্যে রাখার জন্যই বেদ স্বর্গাদি-প্রাপক সাধনের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গাদি-লোকের সুখও অনিত্য, স্বর্গাদি লোক হইতেও পতন হয়, আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—পূণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে স্বর্গ হইতেও আবার মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।" অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—ব্রহ্মলোক হইতেও এবং স্বর্গ হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সে-সমস্ত লোক হইতেও, আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার জন্মমৃত্যুর কবলে পড়িতে হয়, শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেই আর পুনর্জন্ম হয় না। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গীতা॥ ৮।১৬॥" এইরূপে জানা গেল, ইহকালের ভুক্তির ন্যায় পরকালের স্বর্গাদি-লোকের ভুক্তিও অনিত্য। অনিত্য বস্তুর জন্য কামনার সার্থকতা কিছু নাই; সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য।

এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—"ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভারে শিখায়। 'ভক্তি বিনে কেহো যেন কিছুই না চায়॥' ২।১৯।৫৯॥" কৃষ্ণভক্তিই অক্ষয় অব্যয়; সুতরাং তাহাই একমাত্র কাম্য। ইহকালের বা পরকালের ভুক্তি অনিত্য বলিয়া বাস্তব কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং ভুক্তিবাসনা পরিত্যজ্য। "ভক্তি বিনে কেহো হেন কিছুই না চায়"—এই বাক্যের "ভক্তি বিনে কিছু"—হইতেছে ভুক্তি এবং মুক্তি—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুবর্গ। ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের লক্ষ্য হইতেছে ইহকালের এবং পরকালের ভুক্তি; তাহা অনিত্য বলিয়া পরিত্যজ্য। মোক্ষও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাপ্রাপ্তির প্রতিকূল বলিয়া মোক্ষও পরিত্যজ্য। এ-সমস্ত কারণেই শ্রীচৈতন্যভাগবতে, ভুক্তি-মুক্তির অনুকূল কোনও সাধন-পন্থার কথা বলা হয় নাই।

যাহা বেদ-বিহিত, তাহাই ধর্ম; যাহা তাহার বিপরীত, তাহাই অধর্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো-হ্যধর্ম্মস্তদ্‌বিপর্যয়ঃ॥ ভা. ৬।১।৪০॥ (১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)॥" যাঁহারা বেদ-বিহিত শুদ্ধভক্তি-মার্গের পথিক, বেদবিরুদ্ধ-পন্থাবলম্বীদের সঙ্গ যে তাঁহাদের পক্ষে বর্জনীয়, প্রত্যক্ষভাবে এবং ভঙ্গীতে, শ্রীচৈতন্যভাগবত তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু পূর্বকথিত ললিতপূরের সন্ন্যাসীর আশীর্বাদের অসারতার কথা বলিলে, সন্ন্যাসী রুষ্ট হইয়া বিশেষভাবে নিজের মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি না জানিল ভাল মন্দ হয় কা'য়॥ দুধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥ ২।১৯।৭৭॥" তখন—"হাসি বোলে নিত্যানন্দ—'শুনহ গোসাঞি। শিশুসঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি॥ আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা। আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥' আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে। ভিক্ষা করিবারে ঝাট বোলয়ে হরিষে॥ ২।১৯।৭৮-৮০॥" ইনি কি রকম সন্ন্যাসী, নিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভুও তখনও তাহা জানিতেন না। সন্ন্যাসীর

নিমন্ত্রণ তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহারা "ফলাহার করিতে বসিলা দুই জন ॥ দুগ্ধ-আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাথ। শেষ খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসী-সাক্ষাত ॥ বামপথি-সন্ন্যাসি—মদিরা পান করে। নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারেঠোরে ॥. 'শুনহ শ্রীপাদ! কিছু 'আনন্দ' আনিব? তোমাসম অতিথি বা কোথায় পাইব ॥ ২।১৯।৮৬-৮৭।" নিত্যানন্দও ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁহাকে নিজের মত সন্ন্যাসী মনে করিয়াই লালিতপুরের সন্ন্যাসী "আনন্দ" আনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নানারকম সন্ন্যাসীও দেখিয়াছেন। সন্ন্যাসীর মুখে "আনন্দ" আনার কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ বুঝিতে পরিলেন, ইনি বামাচারী মদ্যপ বেদবিরুদ্ধতন্ত্রমতাবলম্বী সন্ন্যাসী। "দেশান্তর করি নিত্যানন্দ সব জানে। 'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে ॥ 'আনন্দ আনিব?' ন্যাসী বোলে বার বার। নিত্যানন্দ বোলে—'তবে লড় সে আমার' ॥ ২।১৯।৮৮-৮৯ ॥" তখন "প্রভু বোলে—'কি আনন্দ বোলয়ে সন্ন্যাসী?' নিত্যানন্দ বোলে—'মদিরা হেন বাসি ॥' ২।১৯।৯২ ॥" বামাচারী তান্ত্রিক সান্ন্যাসীরা মদিরাকে 'আনন্দ' বলেন। প্রভু তাহা জানিতেন না, নিত্যানন্দ প্রভুকে তাহা জানাইলেন। শুনিয়া—" 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর। আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর ॥ দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া। চলিলা আচার্য্যগৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া। ২।১৯।৯৩-৯৪ ॥"

সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাইতেছিলেন, তখন জলেশ্বরের পরে বাঁশধায়-পর্থে এক তান্ত্রিক শাক্ত সন্ন্যাসী আসিয়া পথিমধ্যে প্রভুকে নমস্কার করিলেন। কৌতুকভরে প্রভু মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—"কহ কহ কোথা তুমি সব। চিরদিনে আজি দেখিলাঙ যে বান্ধব ॥' প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইল। আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিল ॥ যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে। সব কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে' ॥ শাক্ত বোলে—'চল ঝাট মঠেতে আমার। সভেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার ॥'. পাপী শাক্ত মদিরারে বোলয়ে 'অনন্দ'। বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ॥ প্রভু বোলে—'আসি আমি 'আনন্দ' করিতে। আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে ॥' শুনিঞা চলিলা শাক্ত হই হরষিত। এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ ২।১৯।২৬৩-৬৯ ॥"

প্রভু কৌশলে শাক্ত সন্ন্যাসীকে ঘরে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহার ঘরে গেলেন না। উল্লিখিত দুইটি ব্যাপারে প্রভু জগতের জীবকে জানাইলেন, বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বীদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকাই ভাল।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"শেষ খণ্ডে যখন চলিলা প্রভু কাশী। শুনিলেক যত কাশীবাসী সন্ন্যাসী ॥ শুনিঞা আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসিগণ। দেখিব চৈতন্য, বড় শুনি মহাজন ॥ সভেই বেদান্তী জ্ঞানী, সভেই তপস্বী। আজন্ম কাশীতে বাস, সভেই যশস্বী ॥ এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি। পঢ়ায়ে বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণুভক্তি ॥ অন্তর্য্যামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে। গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে ॥ ২।১৯।১০০-১০৪ ॥" ইঁহারা ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী। শঙ্করের মায়াবাদ—বেদবিরুদ্ধ, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত (গৌ. বৈ. দ., তৃতীয় পর্ব—দ্বিতীয়াংশ দ্রষ্টব্য) এবং ভক্তিবিরোধী। এই বেদবিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের সঙ্গ-ভয়ে প্রভু তাঁহাদের দর্শন পর্যন্ত দিলেন না। ইহদ্বারা প্রভু জানাইলেন—বেদবিরুদ্ধ মায়াবাদীদের সঙ্গও বর্জনীয়।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর বিবরণ-দান-প্রসঙ্গে শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"এইমত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র

সুখী। সবে ভক্তিশূন্য লোক দেখি বড় দুঃখী॥ কৃষ্ণযাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণসঙ্কীর্তন। ইহার উদ্দেশে নাহি জানে কোন জন। ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী বিষহরি'। তাও যে পূজেন, সেহো মহা দম্ভ করি। 'ধন বংশ বাঢ়ুক' করিয়া কাম্য মনে। মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥ যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥ ** ॥ লোক দেখি দুঃখ ভাবে' শ্রীমাধবপুরী। হেন নাহি, তিলার্দ্ধেক সম্ভাষা যারে করি॥ ৩।৪।৪০৭-১৬॥"

এই বিবরণে শ্রীলবৃন্দাবনদাস ভঙ্গীতে জানাইলেন—যাঁহারা ভক্তিহীন, যাঁহারা অবৈদিক দেবতার পূজক, যাঁহারা কেবল ঐহিক সুখের জন্যই মত্ত এবং বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বী যোগীদের, সংসার-ভোগরত ব্যক্তিদের এবং ভোগ-সর্বস্ব রাজা-রাজড়াদের গুণ-মহিমাদি-শ্রবণ-কীর্তনেই যাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণাদিও বর্জনীয় (৩।৪।৪১২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শুদ্ধভক্তিমার্গের সাধকদের পক্ষে হিতকর এইরূপ বহু উপদেশ শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধ-কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে অধিক উল্লিখিত হইল না।

গৃহস্থদের পক্ষে অনুসরণীয় অনেক উপদেশও শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে।

অধ্যয়নের পর্যবসান শ্রীকৃষ্ণভজনে হইলেই যে অধ্যয়নের সার্থকতা, শ্রীবাসাদি ভক্তগণের উক্তিতে শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। "পড়ে কোন লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? ১।৮।৪৯॥, ১।৮।২৫১॥ সত্য 'কৃষ্ণ'—সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥ অধ্যয়ন এই সে—সকল শাস্ত্রসার॥ ২।১।৩৬২-৬৩॥"

অধ্যাপন-কালে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের "চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে। তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে॥ ইতিমধ্যে কদাচিত কেহো কোন দিনে। কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥ ধর্ম্ম-সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব-ধর্ম্ম। লোকরক্ষা লাগি কভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম॥ হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেই ক্ষণে। সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি বিনে॥ প্রভু বোলে—'কেনে ভাই! কপালে তোমার। তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার॥ তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। তবে তারে 'শ্মশান সদৃশ' বেদে বোলে॥ বুঝিলাঙ আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা। আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥ চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার। সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পঢ়িবার॥ ১।১০।১৮৭-৯৪॥" (১।১০।১৯২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

এ-স্থলে প্রভু জানাইলেন—ব্রাহ্মণের কপালে সর্বদা তিলক থাকা আবশ্যক এবং তিলক-ধারণ না করিয়া সন্ধ্যা করিলে সেই সন্ধ্যা বন্ধ্যা (নিষ্ফল) হয়। প্রভু নিজেও ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক ধারণ করিতেন। "একদিন প্রভু আইসেন রাজপথে। সাত পাঁচ পঢ়ুয়া প্রভুর চারিভিতে॥ ১।৮।২৪২॥ ললাটে তিলক ঊর্দ্ধ, পুস্তক শ্রীকরে। ১।৮।২৪৫॥" (১।৮।২৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর বিবাহ-কালে, বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র "বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করিয়া" কন্যা-সম্প্রদান করিয়াছিলেন। "বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা। প্রভুর

শ্রীকরে সমর্পিলেন দুহিতা ॥ ১।১০।৩৬৮ ॥" ইহাতে জগতের প্রতি এই শিক্ষা দেওয়া হইল যে, বিষ্ণুপ্রীতি-কামনাতেই গৃহস্থের সমস্ত কর্ম কর্তব্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের অন্তর্ধানের পরে প্রভু গয়ায় গিয়া বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিণ্ড দান এবং গয়াস্থিত অন্যান্য তীর্থেও যথাবিহিত শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, গৃহস্থের পক্ষে পিতৃকৃত্য অবশ্যকর্তব্য।

দরিদ্রসেবা এবং অতিথি-সেবার আদর্শও প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

"নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে। ভোজ্যবস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ॥ প্রভু সে পরমব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার। দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি। অন্ন বস্ত্র কপর্দ্দক দেন গৌর-হরি ॥ নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে। যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সভাকারে ॥ কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ। সভা' নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ ॥ সেই ক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে। কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে ॥ ১।১০।১০-১৫ ॥ তবে লক্ষ্মী দেবী গিয়া পরম সন্তোষে। রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি বৈসে ॥ সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া। তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥ এই মত যতেক অতিথি আসি হয়। সভাকেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময় ॥ গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম। 'অথিতির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ॥ গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে। পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে ॥ যার না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে। সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥ সত্যবাক্য কহিবেক করি পরিহার। তথাপি অতিথিশূন্য না হয় তাহার ॥ অকৈতবে চিত্তসুখে যার যেন শক্তি। তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি ॥' অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে। জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে ॥ ১।১০।১৮-২৬ ॥"

প্রভু নিজের আচরণে গৃহস্থদিগকে দুঃখিত-সেবা এবং অতিথি-সেবা শিক্ষা দিয়াছেন এবং লক্ষ্মীদেবীও নিজের আচরণে গৃহস্থগৃহিণীদিগকে অতিথি-সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শক্তি অনুসারে সকলেরই অতিথি-সেবা কর্তব্য। প্রভু বলিয়াছেন, অতিথি-সেবা গৃহস্থের মূলধর্ম। গৃহস্থব্যতীত অন্যের পক্ষে অতিথি-সেবাদির সুযোগ বা সামর্থ্য থাকে না বলিয়াই বোধ হয় গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী বলিয়াছেন, "গৃহস্থ সে সভার প্রীতের স্থলি হয়ে ॥ ২।২৫।২৬৭ ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে গৃহস্থের অনুসরণীয় এইরূপ অনেক উপদেশ ও শিক্ষা আছে। বাহুল্য-বোধে অধিক উল্লিখিত হইল না।

সাধকের পক্ষে স্বীয় ভজনাঙ্গে অবিচলা নিষ্ঠা যে একান্ত আবশ্যক, শ্রীলহরিদাস ঠাকুরের উক্তিতে সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ। তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥ ১।১১।৯১ ॥ অশেষ দুর্গতি হই যদি যায় প্রান। তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥ ১।১১।১৩৬ ॥"

ভগবন্নির্ভরতার উপদেশও হরিদাস-ঠাকুরের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"যে করান ঈশ্বরে। তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥ অপরাধ-অনুরূপ যার যেন ফল। ঈশ্বর সে করে, ইহা জানিহ সকল ॥ ১।১১।৮৯-৯০ ॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, জগতের জীবের প্রতি এইরূপ আরও অনেক উপদেশ দৃষ্ট হয়।

৫৬। তৎকালীন নবদ্বীপ

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে এবং মহাপ্রভুর সময়েও, নবদ্বীপের অবস্থা-সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন,—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি। যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥ অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥ নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥ বিবিধ বয়সে একো জাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী দৃষ্টিতে সভে মহাদক্ষ॥ সভে 'মহা অধ্যাপক' করি গর্ব্ব ধরে। বালকেহো ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥ নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়। নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়॥ অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। লক্ষকোটি অধ্যাপক— নাহিক নির্ণয়॥ রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥ কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥ ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সভে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে। পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥ ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়ে। এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥ যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব। তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥ শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিত যম-পাশে বন্ধি মরে॥ না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥ যেবা সব বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী। তা' সভার মুখে-হ নাহিক হরিধ্বনি॥ অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়। 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥ গীতা-ভাগবত যে-যে জনে বা পঢ়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥ এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার। দেখি, ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার॥ 'কেমতে এসব জীব পাইবে উদ্ধার। বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥ বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম। নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥ স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন॥ সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ। 'শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ॥' ১।২।৫১-৭৩॥"

এই বিবরণ হইতে জানা যায়—নবদ্বীপ তখন একটি অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তাহাতে অসংখ্য লোকের এবং নানাজাতির বসতি ছিল। লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতে সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেন, অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ কাহারও ছিল না। পুত্রকন্যার বিবাহে এবং ইচ্ছানুরূপ উৎসবাদিতে লোকেরা যথেচ্ছ অর্থব্যয়ও করিতেন, তাঁহাদের সেই সামর্থ্যও ছিল। অসংখ্য অধ্যাপকও ছিলেন এবং তাঁহাদের অধ্যাপনার খ্যাতিও নানাস্থানে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। এজন্য নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। সকলেই মনে করিতেন, নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিলেই "বিদ্যারস" পাওয়া যায়, অর্থাৎ অধ্যয়নের পূর্ণতালাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণজ্ঞান-লাভের আনন্দও পাওয়া যায়। ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব-কালে অনেক মেধাবী বিদ্যার্থী এ-দেশের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ইংলণ্ডে যাইয়া অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতে পারিলে বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে সকলে তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনও করিতেন। উল্লিখিত বিবরণ হইতে মনে হয়, তৎকালীন নবদ্বীপও ছিল বাঙ্গালা দেশের অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ। নবদ্বীপের মধ্যেও সর্বত্রই বিদ্যাচর্চা হইত; তাহা শুনিয়া সাধারণ লোকও অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত। এজন্য বালকেরাও অভিজ্ঞ ভট্টাচার্যের সঙ্গেও তর্ক-বিতর্ক করিত। বিদ্যাচর্চার এতাদৃশী ব্যাপকতা এবং তাহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে

এতাদৃশ জ্ঞান-প্রচার এক অতি দুর্লভ ব্যাপার। বিদ্যাচর্চাই ছিল তৎকালীন নবদ্বীপের একটি অসাধারণ বৈভব। অবশ্য ইহা ছিল নবদ্বীপের ব্যবহারিক বৈভব। আর্য-ভারতে ব্যবহারিক বৈভবের স্থান থাকিলেও, তাহা মুখ্য বৈভব বলিয়া পরিগণিত হইত না, পারমার্থিক বৈভবেরই মুখ্যত্ব স্বীকৃত হইত।

কিন্তু শ্রীলবৃন্দাবনদাসের প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, তৎকালীন নবদ্বীপের পারমার্থিক বৈভব বিশেষ গৌরবময় ছিল না। পারমার্থিক বৈভবের মূল উৎস হইতেছে ভক্তি, যে-ভক্তির কৃপায় জীব তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, ভক্তির সমাদর করিতেন, এইরূপ ভক্তও তৎকালীন নবদ্বীপে ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম ছিল বলিয়াই মনে হয়। জনসাধারণ, এমন কি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণও, ছিলেন ভাগবদ্‌বহির্মুখ। ব্যবহারিক বিষয়েই ছিল তাঁহাদের অনুরক্তি, পারমার্থিক বিষয়ের দিকে তাঁহাদের কোনও লক্ষ্যই ছিলনা। যে-কয়জন ভক্ত তখন নবদ্বীপে ছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন তৎকালীন নবদ্বীপের পারমার্থিক বৈভবের ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু এই স্ফুলিঙ্গের আলোক বহির্মুখতার অন্ধকারকে দূর করিতে পারিত না। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, অল্পসংখ্যক ভক্তগণ—"বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম। নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥" পণ্ডিতগণও বিদ্যার এবং কুলের গৌরবই খ্যাপন করিতেন, ভক্তিসম্বন্ধে কেহ কোনও কথা বলিতেন না। এমন কি, যে-সমস্ত অধ্যাপক গীতা-ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহারাও ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ বলিতেন না। নিজেরা ভক্তিহীন ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ভক্তিগ্রন্থের গূঢ়রহস্যও অনুভব করিতে পারিতেন না। "যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্রসব। তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব॥"

তৎকালীন নবদ্বীপে যে-কয়জন ভক্ত ছিলেন, বৃন্দাবনদাস তাঁহাদের মহিমাও খ্যাপন করিয়াছেন। পরমার্থভূত-বস্তু ভক্তিকেই যাঁহারা সর্বস্ব মনে করেন, তাঁহাদের নিকটে ব্যবহারিক বৈভব অকিঞ্চিৎকর। এজন্য তৎকালীন নবদ্বীপের জনসাধারণ ব্যবহারিক বৈভবে সম্পন্ন হইলেও, তাঁহাদের পারমার্থিক দৈন্য দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইত, তাঁহাদের পারমার্থিক কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহারা—'সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।" কি আশীর্বাদ করিতেন? "শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ॥"—হে কৃষ্ণচন্দ্র! তুমি শীঘ্রই সকলের প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ কর, যাহাতে সকলের বহির্মুখতা ঘুচিয়া যাইতে পারে, সকলে কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে।

যখন প্রভু আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু আত্ম-প্রকাশ করেন নাই, নবদ্বীপের সেই সময়ের, ব্যবহারিক বৈভবের কথাও বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন। যথা,—

"যদ্যপিহ নবদ্বীপ পণ্ডিত-সমাজ। কোট্যবর্বুদ অধ্যাপক নানাশাস্ত্র-রাজ॥ ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র বা আচার্য্য। অধ্যাপনা বিনা কারো নাহি কোন কার্য্য॥ যদ্যপিহ সভেই স্বতন্ত্র, সভে জয়ী। শাস্ত্রচর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মারেও নাহি সহী॥ ১।৯।৫-৭॥ জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থানে। সভা' জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখানে॥ ১।৯।৩২॥" এজন্য দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রযুদ্ধে অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করিয়াও, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিতে পারিলেই বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে, অন্যান্য-স্থানের পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করিয়া সরস্বতীর বরপুত্র এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত যে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে, অন্যত্র শাস্ত্রযুদ্ধে জয়লাভের ফলে

প্রাপ্ত অশ্ব-গজাদি লইয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস তাহা বলিয়া গিয়াছেন।—"হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্‌বিজয়ী। আইল পরম অহঙ্কারযুক্ত হই॥ সরস্বতীমন্ত্রের একান্ত উপাসক। মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ॥ ১।৯।১৯-২০॥" সরস্বতী তাঁহাকে—"'ত্রিভুবন বিজয়ী' করি বর দিল॥ ১।৯।২২॥ পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান। সংসার জিনিঞা বিপ্র বুলে স্থানে স্থান॥ সর্ব্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর। হেন নাহি জগতে যে দিবেক উত্তর॥ যার কক্ষামাত্র নাহি বুঝে কোন জনে। দিগ্‌বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানে স্থানে॥ শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা। পণ্ডিত-সমাজ যত নাহি তার সীমা॥ পরম-সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ-যুক্ত হই। সভা' জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্‌বিজয়ী॥ প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি পণ্ডিত-সভায়। মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব নদীয়ায়॥ 'সর্ব্বরাজ্য দেশ জিনি জয়পত্র লই। নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্‌বিজয়ী॥' 'সরস্বতীর বরপুত্র' শুনি সর্ব্বজনে। পণ্ডিত সভার বড় চিন্তা হৈল মনে॥ ১।৯।২৪-৩১॥" নিমাঞি পণ্ডিত এতাদৃশ দিগ্‌বিজয়ীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া পণ্ডিত-দিগের চিন্তা দূর করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের সুনাম রক্ষা করিয়াছিলেন।

৫৭। তৎকালীন দেশের অবস্থা

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে দেশের তৎকালীন অবস্থা-সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এ-স্থলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। শাসনব্যবস্থা। ভারতের নানা স্থানে তখন মুসলমান রাজাদের প্রবল প্রতাপ ছিল। উড়িষ্যাদি কয়েক স্থলে হিন্দুরাজত্বও ছিল। বাঙ্গালায় ছিল মুসলমান রাজত্ব।

তখনকার দিনে রাজতন্ত্রই প্রচলিত ছিল, গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল না। শাসন-কার্য্যের আনুকূল্যার্থ প্রজাদের প্রতিনিধিমূলক কোনও প্রতিষ্ঠানও তখন ছিল না। আইন-প্রণয়নাদি ব্যাপারে রাজারই ছিল সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য।

মহাপ্রভুর সময়ে বাঙ্গালার নবাব ছিলেন হুসেন সাহ। তাঁহার রাজধানী ছিল গৌড়-নগর। রাজ-কার্য-পরিচালন-বিষয়ে যোগ্য হিন্দুকেও মন্ত্রীত্বাদি-পদে তিনি নিযুক্ত করিতেন। হুসেন সাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্রীসনাতন; সনাতনের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীরূপ ছিলেন হুসেন সাহের দবীরখাস (প্রাইভেট সেক্রেটরী)। কিন্তু মুলুকপতি এবং কাজি প্রভৃতি অঞ্চল-শাসকগণ ছিলেন সকলেই মুসলমান।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, হুসেন সাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া তত্রত্য দেবমূর্তি এবং দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া দিতেন। "যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে। দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেন দেউল বিশেষে॥ ৩।৪।৬৭॥" কিন্তু মহাপ্রভু-সম্বন্ধে তাঁহার আচরণে তাঁহার ধর্মান্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং উদার প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রভু যখন গৌড়-নগরের নিকটবর্তী রামকেলি-গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন হুসেন সাহের "কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজা-স্থানে॥ ৩।৪।২৪॥" কোটোয়াল প্রভুর অদ্ভুত প্রেম-বিকারের কথা হুসেন সাহের নিকটে বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন—"বাহু তুলি নিরন্তর বোলে হরিনাম। ভোজন শয়ন আর নাহি কিছু

রাম ॥ চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক আইসে দেখিতে। কাহারো না হয় চিত্ত ঘরেরে যাইতে ॥ কত দেখিয়াছি আমি-সব যোগী জ্ঞানী। এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি ॥ ৩।৪।৪২-৪৪ ॥"

কোটোয়ালের কথা শুনিয়া হুসেন সাহ বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহার গুপ্তচর কেশব খানকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কহত কেশব খান! কেমত তোমার। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি নাম বোল যার ॥ কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য। কেমত গোসাঞি তিনি কহিবা অবশ্য ॥ চতুর্দ্দিগে থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে। কি নিমিত্তে আইসে? কহিবে ভালমতে ॥ ৩।৪।৪৯-৫১ ॥" কেশব খান ছিলেন হিন্দু। তিনি প্রভুসম্বন্ধে যাহা জানিয়াছিলেন, তাহা খুলিয়া বলিলে, হিন্দুধর্মবিদ্বেষী যবনরাজা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপর অত্যাচার করিতে পারেন আশংকা করিয়া সত্য কথা গোপন করিয়া হুসেন সাহের নিকটে একটা বিবৃতি দিলেন। রাজার কথা "শুনিঞা কেশব খান—পরম সজ্জন। ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥ ৩।৪।৫২ ॥" রাজাকে তিনি বলিলেন—"কে বোলে 'গোসাঞি', এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। দেশান্তরি গরিব বৃক্ষের তলবাসী ॥ ৩।৪।৫৩ ॥"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিশেষ কোনও প্রভাব-বিশিষ্ট লোক নহেন, তিনি একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মাত্র। অন্যদেশের লোক, খুব দরিদ্র, গাছতলাতেই বাস করেন।

প্রভুর অলৌকিক প্রভাব হুসেন সাহের চিত্তে ক্রিয়া করিয়াছিল। যদিও ধর্মান্ধতাবশতঃ হুসেন সাহ হিন্দুদের বহু দেবমূর্তি এবং দেবালয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন, প্রভুসম্বন্ধে তাঁহার সেই ধর্মান্ধতা বিলুপ্ত হইয়া গেল, প্রভুর কৃপায় তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন। কেশব খানের কথা শুনিয়া যবনরাজ বলিলেন—"গরিব না বোল কভু তানে। মহাদোষ হয় ইহা শুনিলেও কানে ॥ হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে। সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥ আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে। তাঁর আজ্ঞা সর্ব্বদেশে শিরে করি বহে ॥ এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে। মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥ তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে। ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে ॥ ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে। নানাযুক্তি করিবেক সেবক-সকলে ॥ আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে। চাহে, তাহা কেহো নাহি পায় ভাল মতে ॥ অতএব তিঁহো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর'। 'গরিব' করিয়া তাঁরে না কর উত্তর ॥ ৩।৪।৫৪-৬২ ॥"

এইরূপ অনুভূতির ফলে, সর্বতোভাবে প্রভুর নিরাপত্তা-সম্বন্ধে হুসেন সাহ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন—"রাজা বোলে—'এই মুঞি বলিলুঁ সভারে। কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥ যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে। আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে ॥ সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন। কি বিরলে থাকুন, যে লয় তাঁর মন ॥ কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে। কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥' ৩।৪।৬২-৬৬ ॥"

প্রভুর নিরুপদ্রব কীর্তন-সম্বন্ধে যবন-রাজ যে-আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, হিন্দু-সাধারণের সম্বন্ধে তদ্রূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। ফলে হিন্দুদের পক্ষে স্বচ্ছন্দ-ভাবে কীর্তন হইয়া পড়িয়াছিল দুষ্কর। প্রভুর আদেশে "পরম আনন্দে সব নগরিয়াগণ। হাতে তালি দিয়া বোলে 'রাম নারায়ণ' ॥ মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে। দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে। গায়েন বা'য়েন সভে আনন্দ-হৃদয়ে ॥ 'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।' এই মত

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম ॥ ২।২৩।৮৮-৯১ ॥" নগরিয়াগণ প্রতিদিন এইভাবে কীর্তন করিতে লাগিলেন। "এক দিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায় ॥ হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র। শুনিঞা স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥ কাজি বোলে—'ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য। আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য্য ॥' আথেব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ। মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন ॥ যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ কাজি বোলে—'হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া। করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥ ক্ষমা করি যাই আজি, দৈবে হৈল রাতি। আর দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি ॥' এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া। নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া ॥ ২।২৩।১০০-১০৭ ॥"

তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থার ফলে, যবন-কাজির দৃষ্টিতে এবং যবন-রাজার দৃষ্টিতেও, "হিন্দুয়ানি" অর্থাৎ মৃদঙ্গ-মন্দিরা-সহকারে হরিনাম-কীর্তন, ছিল অপরাধ—শাস্তিযোগ্য এবং জাতি-নাশক অপরাধ। কিন্তু "হিন্দু হওয়া" বোধ হয় তখনও অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না।

নিরীহ হিন্দুদিগকে বলপূর্বক মুসলমান করার প্রয়াস তখন ছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় না। কোনও হিন্দুর পক্ষে কোনও মুসলমানকে হিন্দুধর্মাচরণে প্রবর্তিত করার প্রয়াসও তখন ছিল কল্পনাতীত। কোনও মুসলমান-সন্তান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যদি হিন্দুধর্মানুরূপ আচরণ করিতেন, তখন তাঁহার উপরেও যবন-রাজ-শক্তি অকথ্য অত্যাচার করিত। হরিদাস ঠাকুরই তাহার প্রমাণ (১।১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মুসলমান জনসাধারণ যে হরিদাসের প্রতি কোনওরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে পাওয়া যায় না। ইহাতে জানা যায়, মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্ধতা তখন বিশেষ ছিল না। কোনও কোনও যবন রাজকর্মচারীও যে স্বচ্ছন্দভাবে সকলের ধর্মাচরণ-বিষয়ে উদারতা পোষণ করিতেন, তাহার প্রমাণও শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়। যে-মুলুকপতিদ্বারা কাজি হরিদাস ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করাইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন উদার-প্রকৃতি (১।১১।৬৭-৯৭ পয়ার এবং ১।১১।১৪৬-৫২ পয়ার দ্রষ্টব্য)। সকল সময়েই, সকল জাতির মধ্যেই, ভাল লোক এবং মন্দ লোক—উভয়ই থাকেন।

তৎকালে হিন্দুদের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মকার্যে ধর্মান্ধ যবন-কাজিও কোনও রূপ বিঘ্ন জন্মাইতেন বলিয়া মনে হয় না। 'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে। দুর্গোৎসব-কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ ২।২৩।৮৯ ॥" —এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, বৎসরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুরা বৈদিকী দেবতা দুর্গাদেবীর পূজা করিতেন এবং সেই উপলক্ষ্যে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খাদিও বাজাইতেন। কাজি তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইতেন না। বোধ হয় কেবল হরিনাম-কীর্তনই কাজির গাত্রদাহ জন্মাইত। তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থা অনুসারে, উচ্চস্বরে "হরিকীর্তন-কোলাহল" না করিলে, যবন-রাজের শাসনাধীন রাজ্যে হিন্দুদের বস-বাসের কোনও অসুবিধা হইত না। তৎকালে প্রজাতন্ত্র ছিল না বলিয়া, স্বচ্ছন্দে বস-বাসের অধিকারই ছিল একমাত্র নাগরিক অধিকার। হিন্দুরা তখন এই অধিকার ভোগ করিতেন। তৎকালীন যবন-রাজগণ তাঁহাদের শাসিত দেশকে একমাত্র "মুসলমানের বাসযোগ্য দেশ" বলিয়া মনে করিতেন না।

খ। ব্যবহার্য দ্রব্য ও রীতিনীতি। বলা বাহুল্য, তৎকালে কাপড়ের কল ছিল না বলিয়া লোকের ব্যবহারের সর্ববিধ বস্ত্রই—কার্পাস-বস্ত্র এবং পট্টবস্ত্রাদি সমস্তই—তন্তুবায়দের (তাঁতীদের) গৃহে তন্ত্রে (তাঁতে)

প্রস্তুত হইত। সূতার কলও ছিল না বলিয়া তক্লি এবং চরকার সহায়তাতেই কার্পাস ও পাট-আদি হইতে সূতা প্রস্তুত হইত।

তৎকালীন লোকেরা খুব মিহি সূতাও প্রস্তুত করিতে পারিতেন (২।২৩।১৮২ পয়ারে সূক্ষ্মবসনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়)। মিহি সূতার বস্ত্রও ব্যবহৃত হইত।

"পরম-নির্ম্মল-সূক্ষ্মবাস পরিধান ॥ ২।২৩।১৮২ ॥"—এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, পট্টসূত্রাদির স্বাভাবিক বর্ণ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করার প্রণালীও তৎকালে জানা ছিল এবং ১।১০।৩১০ পয়ারে "দিব্য-সূক্ষ্ম পীত বস্ত্রের" উল্লেখে বুঝা যায়, সর্বপ্রকারের কাপড়ে এবং সূতায় পাকা রং করার প্রণালীও তৎকালে জানা ছিল। পুরুষদের এবং সধবা রমণীদের পরিধেয় বস্ত্রের পাইড়ের নিমিত্তও সূতা রং করার প্রয়োজন হইত।

২।৭।৫৯ পয়ারাদি বহু স্থলে পট্টবস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। "পট্ট" বলিতে "পাটকে" বুঝায়। তৎকালে পাট হইতে এবং তন্তুবহুল অন্য বৃক্ষাদি হইতেও সূতা প্রস্তুত করা হইত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে রেশমীবস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তৎপূর্ববর্তী কোনও প্রাচীন গ্রন্থেও রেশমী বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পট্টবস্ত্রেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যায়, তৎকালে রেশমী বস্ত্রের প্রচলন ছিল না। বস্তুতঃ, একখানা রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে সহস্র সহস্র জীবের (গুটি পোকার) প্রাণ নষ্ট করার প্রয়োজন হয়। প্রাণিহত্যাজনিত পাপের ভয়েই বোধ হয় তৎকালে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত না। এই পাপের কথা বিবেচনা করিলে, রেশমীবস্ত্রকে পবিত্র মনে করাও বোধ হয় সঙ্গত হয় না।

তৎকালে গন্ধদ্রব্যও ব্যবহৃত হইত। তৎকালীন গন্ধবণিকেরা অতি উত্তম এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী গন্ধবিশিষ্ট গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানিতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায়, নগর-ভ্রমণ-কালে প্রভু যখন গন্ধবণিকের গৃহে যাইয়া "ভাল গন্ধ" চাহিয়াছিলেন, তখন গন্ধবণিক "দিব্যগন্ধ" আনিয়া দিলেন। প্রভু তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে বণিক বলিয়াছিলেন—"আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহ ত ঠাকুর। কালি যদি গা'য়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর। ধুইলেও যদি গা'য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে। তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে ॥ ১।৮।১২৬-২৭ ॥"

ধাতুনির্মিত বড় ঝারি, ছোট ঝারি, পিতলের পানের বাটা, আলবাটি প্রভৃতি তৈজস-পত্রও তৎকালে ব্যবহৃত হইত (২।৭।৬০-৬১ পয়ার দ্রষ্টব্য) এবং ধনী লোকগণ "হিঙ্গুল পিত্তলে শোভিত দিব্য খট্টাও" ব্যবহার করিতেন (২।৭।৫৮) এবং তৎকালে গাড়ী ছিল না বলিয়া ধনীরা দোলায় বা ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করিতেন (২।৭।৬৬ এবং ১।৫।১৯)।

তৎকালে ব্রাহ্মণদের সকলের কপালেই ঊর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক থাকিত। তিলকহীন কপাল শ্মশান-সদৃশ বলিয়া পরিগণিত হইত। তিলক ধারণ না করিয়া সন্ধ্যা করিলে সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইত বলিয়া বিবেচিত হইত (১।১০।১৮৭-৯৪ পয়ার এবং ১।১০।১৯২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ২।২৩।১০৩, ২।২৩।৩১৫ প্রভৃতি পয়ার হইতে জানা যায়, তৎকালে গৃহস্থ হিন্দু পুরুষেরা সকলেই, স্ত্রীলোকদের ন্যায় মাথায় লম্বা চুল রাখিতেন। এই লম্বা চুলকে সাধারণতঃ বাঁধিয়া রাখা হইত। তৈলাদিদ্বারা এই চুলের সংস্কার করা হইত; ধনী লোকেরা "দিব্যগন্ধ আমলকী"-দ্বারাও কেশ-সংস্কার করিতেন (২।৭।৬৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

ক্বচিৎ দু-একজন মস্তকে কেশ-পোষণ করিতেন না। যেমন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। মহাপ্রভু তাঁহাকে "নাঢ়া" বলিতেন। বোধ হয় তিনি মস্তক মুণ্ডন করিতেন, অথবা ছোট করিয়া চুল ছাটাইতেন।

বিবাহের অধিবাস-দিনে উপস্থিতির জন্য "অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে (১।১০।২৫৮)"—বলিয়া আত্মীয় বান্ধবদের নিমন্ত্রণের রীতি ছিল। নিধারিত সময়ে আত্মীয়-বান্ধবগণ উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে "গন্ধ, চন্দন, তাম্বূল ও দিব্যমালা" দেওয়ার রীতি ছিল। তাঁহাদের "শিরে মালা, সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে। একো বাটা তাম্বূল একো জনে" দেওয়ার রীতি ছিল (১।১০।২৬৪-৬৫)।

"বালক-উত্থান-পর্ব্ব-কালে (অর্থাৎ নিষ্ক্রামণ-সংস্কার-কালে" প্রসূতির সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন-নারীগণ স্নানঘাটে যাইতেন। স্নানের পরে, যথাবিধি দেবতাদের পূজা করিয়া প্রসূতি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই নারীগণকে "খই, কলা, তৈল, সিন্দূর, গুয়া, পান" দিতেন। তৎকালে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল (১।৩।১৮-২১)।

গ। আর্থিক অবস্থা। নবদ্বীপের বৈভব-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, "রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে॥ ১।২।৫৮॥" ইহাতে বুঝা যায়, লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে কাহারও অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ ছিল না, সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে বস-বাস করিতেন। পুত্র-কন্যার বিবাহে এবং রুচির অনুরূপ উৎসবাদিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্যও তখন লোকের ছিল (১।২।৬১-৬২)।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে জানা যায়, নবদ্বীপের বাহিরেও বঙ্গদেশে লোকের আর্থিক-সচ্ছলতা ছিল। অধ্যাপক প্রভু নিমাই পণ্ডিত একবার পূর্ববঙ্গের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। প্রভুর গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়ে তাঁহারা যেভাবে প্রভুকে গুরু-দক্ষিণা দিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন। "তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি। যার যেন শক্তি সভে দিলা ধন আনি॥ সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন। সুরঙ্গ-কম্বল, বহু-প্রকার বসন॥ উত্তম-পদার্থ যত ছিল যার ঘরে। সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥ ১।১০।১০৯-১১॥" যথাশক্তি এবং সন্তুষ্ট-চিত্তে যাঁহারা স্বর্ণ-রজতাদি নিজেদের ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে সমর্থ, তাঁহাদের যে আর্থিক-সচ্ছলতা ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

সকল দেশেই, সকল সময়েই, কিছু না কিছু লোক দরিদ্র থাকেন। সুতরাং তৎকালে বঙ্গদেশে দরিদ্র যে কেহই ছিলেন না, তাহা মনে করাও বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। দীন-দুঃখীদিগকেও সজ্জনগণ অন্ন, বস্ত্র এবং অর্থাদি দিতেন (১।১০।১১-১২); তাহাতে তাঁহাদেরও অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট আর থাকিত না। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও দরিদ্র ছিলেন। সজ্জনগণ তাঁহাদেরও যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন, তাহাতে তাঁহাদেরও দারিদ্র্য-দুঃখ থাকিত না।

ঘ। বিদ্যাচর্চা। বিদ্যাচর্চা তৎকালীন নবদ্বীপে কিরূপ অসাধারণ-ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে (পূর্ববর্তী ৫৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে অধ্যয়নের জন্য লোক নবদ্বীপে আসিতেন। ইহাতেই জানা যায়, বঙ্গদেশের সর্বত্রই তখন বিদ্যার্জনের নিমিত্ত প্রবল আগ্রহ ছিল। অধ্যাপক প্রভু নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখনও বহু স্থানে বহু বিদ্যার্থী এবং বহু অধ্যাপকও প্রভুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং উপাধি লাভ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশে

মহাপ্রভু হইলা প্রবেশ। অদ্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥ পদ্মাবতী তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র। শুনি সর্ব্বলোক বড় হইল আনন্দ॥ 'নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি। আসিয়া আছেন'—সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি॥ ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ। উপায়ন-হস্তে আইলেন সেই ক্ষণ॥ সভে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার। বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥ 'আমা-সভাকার বহু ভাগ্যোদয় হৈতে। তোমার বিজয় আসি হৈল এ-দেশেতে॥ অর্থ-বিত্ত লই সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে। যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥ হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে। আনিঞা দিলেন আমা'সভার দুয়ারে॥ ১।১০।৬৫-৭২॥ তবে এক নিবেদন করিয়ে তোম্যারে। বিদ্যা দান কর কিছু আমাসভাকারে॥ উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী। লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥ (প্রভু যে ব্যাকরণ-সূত্রের টিপ্পনী করিয়াছিলেন, ১।৬।৭৩ পয়ার হইতে তাহা জানা যায়। "আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী॥")। সাক্ষাতেও শিষ্য কর' আমা সভাকারে। থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল সংসারে॥ ১।১০।৭৬-৭৮॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে, বিদ্যার্জনের নিমিত্ত পূর্ববঙ্গের লোকদের প্রবল আগ্রহের কথা জানা যায়।

প্রভু যে কেবল পদ্মাবতীতীরেই গিয়াছিলেন এবং কেবল পদ্মাবতীতীরবর্তী লোকদেরই এইরূপ আগ্রহ জন্মিয়াছিল, তাহা নহে। পূর্ববঙ্গের বহু স্থলেই প্রভু গিয়াছিলেন এবং সর্বত্রই বিদ্যার্থীদের উল্লিখিতরূপ আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রভু পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-কৌশলে অল্প সময়ের মধ্যেই বহু লোক কৃতবিদ্য হইয়া পদবী লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"হেন মতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র। বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥ মহাবিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বঙ্গে। পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে॥ সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই। হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কোন্ ঠাঁই॥ শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া। নিমাঞি-পণ্ডিত-স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥ হেন কৃপাদৃষ্টে প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান। দুই মাসে সভেই হইলা বিদ্যাবান্॥ কত শত শত জন পদবী লভিয়া। ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া॥ এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি। বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥ ১।১০।৯১-৯৭॥"

পূর্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু শ্রীহট্টের ভাষার অনুকরণ করিয়া নবদ্বীপবাসী শ্রীহট্টের লোকদের পরিহাস করিয়াছিলেন। ইহাতে জানা যায়, তিনি শ্রীহট্টেও গিয়াছিলেন এবং পদ্মাবতীতীর হইতে শ্রীহট্টে গমনাগমনের কালে আরও নানা স্থানে গিয়াছিলেন এবং অধ্যাপন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, নবদ্বীপের বাহিরেও, বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিদ্যার্জনের জন্য তৎকালে লোকের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে বুঝা যায়, বাঙ্গালা ভাষার চর্চাও তখন ছিল এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের সৃষ্টিও কিছু কিছু হইয়াছিল। লোকে যাহাকে ধর্ম-কর্ম বলিয়া মনে করে, কিংবা যে-ভাবধারা দেশের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সাধারণতঃ সাহিত্য গড়িয়া উঠে। তৎকালে রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া রাজনৈতিক-ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া কাহারও কাহারও পক্ষে কোনও সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনাও ছিল না। জনসাধারণ যাহাকে ধর্ম-কর্ম বলিয়া মনে করিত, তৎকালে একমাত্র তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। এতাদৃশ-সাহিত্যের সৃষ্টি যে কিছু কিছু হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি

হইতে তাহা জানা যায়। শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, তৎকালে মঙ্গলচণ্ডীর ও বিষহরির (মনসার) গীত গাহিয়া লোকেরা রাত্রি জাগরণ করিতেন। এবং "যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের" গীতেও আনন্দ অনুভব করিতেন। ইহা হইতে জানা যায়, তৎকালে মঙ্গল-চণ্ডী-বিষহরির এবং যোগিপালাদির গীত রচিত হইত। জনসাধারণের আনন্দ-জনক এ-সকল গীত যে বাঙ্গালাভাষাতেই রচিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত না হইলেও, উন্নততর সাহিত্যেরও তৎকালে সৃষ্টি হইয়াছিল—বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে রচিত—কাশীরামদাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ। এই দুই অমর কবির কল্পনা-শক্তি এবং কবিত্ব-প্রতিভা এই গ্রন্থদ্বয়কে এমনই চিত্তাকর্ষক করিয়াছে যে, এখন পর্যন্ত বাঙ্গালী-সমাজে এই গ্রন্থদ্বয় পরম আদরের বস্তু হইয়া রহিয়াছে, লোকের নীতি-জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের উৎসরূপে এবং স্থলবিশেষে শাস্ত্ররূপেও পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গালাভাষায় তখন পারমার্থিক গ্রন্থও কিছু রচিত হইয়াছিল—কুলীনগ্রামবাসী শ্রীগুণরাজ খান (মালাধর বসু) রচিত "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" (শ্রীমদ্‌ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধের পয়ারাদি ছন্দে মর্মানুবাদ) এবং কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহ-নগরের শ্রীরঘুনাথ-ভাগবতাচার্যরচিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী"। ইহাতে পয়ারাদি ছন্দে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের মর্মানুবাদ এবং শেষ তিন স্কন্ধের শ্লোকানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

ঙ। সামাজিক অবস্থা। তৎকালীন সমাজের সাধারণ লোকগণ বিষয়-রসেই মত্ত থাকিতেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥ ১।২।৫৭॥ বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম। (পণ্ডিতগণ) নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥ ১।২।৭১॥ সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥ বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে। মদ্যমাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥ ১।২।৮২-৮৩॥"

এই সময়ের লোকদের সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে কবি কর্ণপূরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো ন শান্তির্ন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া॥ ২।১॥"—(শৌচ, সত্য, শম-দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি (ক্ষমা), মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি কিছুই ছিল না), "ষষ্ঠে কর্মনি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ সংজ্ঞামাত্র-বিশেষিতা ভুজভুবো বৈশ্যাশ্চ বৌদ্ধা ইব। শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতয়া ধর্মোপদেশোৎসুকা বর্ণানাং গতিরীদৃগেব কলিনা হা হন্ত সম্পাদিতা॥ ২।২॥"—(দ্বিজগণ দ্বিজচিহ্ন-যজ্ঞসূত্রমাত্র ধারণ করিয়া কেবল ষষ্ঠ কর্মে অর্থাৎ প্রতিগ্রহে—দানগ্রহণে, তাঁহাদের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ, প্রজাপালনে অসামর্থ্যবশতঃ, নাম-মাত্রে রাজা ছিলেন, বৈশ্যগণ বৌদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, শূদ্রগণ পণ্ডিতম্মন্য হইয়া ধর্মোপদেশ-দানে উৎসুক হইয়াছিলেন—কলির প্রভাবে চারিবর্ণের এতাদৃশী অবস্থাই হইয়াছিল)।

চারিটি আশ্রমের অবস্থাও চারিটি বর্ণের ন্যায় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ণপূর তাঁহার নাটকে লিখিয়াছেন—

"বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাদ্যাশ্রমযুজো গৃহস্থাঃ স্ত্রী-পুত্রোদর-ভরণমাত্র-ব্যসনিনঃ। অহো বানপ্রস্থাঃ শ্রবণপথমাত্র-প্রণয়িনঃ পরিব্রাজা বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্॥ ২।৩॥"—(বিবাহে অযোগ্যতাবশতঃ

কেহ কেহ নিজেদিগকে ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচিত করিতেন, গৃহস্থগণ কেবল স্ত্রীপুত্রের উদর-ভরণেই আনন্দ অনুভব করিতেন, "বানপ্রস্থ"-কথাটি কেবল শ্রবণ-পথগতই ছিল, অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কেহই বনে যাইতেন না ; আর চতুর্থ সন্ন্যাসাশ্রম—কেহ কেহ সন্ন্যাসের পোষাকমাত্র ধারণ করিয়াই নিজেদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত করিতেন এবং পোষাকের বলেই অপরের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিতেন)।

তৎকালীন বিদ্বান্‌দিগের সম্বন্ধে কর্ণপূর তাঁহার নাটকে বলিয়াছেন—"অভ্যাসাদ্‌ য উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদিশব্দাবলের্জন্মারভ্য সুদূর-দূর-ভগবদ্‌বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী। যে যত্রাধিক-কল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥ ২।৪ ॥"—(উপাধি, জাতি, অনুমিতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের শব্দসমূহের অভ্যাস—অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন,-বশতঃ এই পণ্ডিতগণ ভগবদ্‌বার্তা-প্রসঙ্গ হইতে জন্মাবধি সুদূর-দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। যে-সকল তার্কিক যে-স্থলে যত অধিক কল্পনা-কুশল, সে-স্থলে তাঁহারা বিদ্বত্তম বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহাদের কল্পনাকেই তাঁহারা শাস্ত্র বলিয়া জানিতেন)।

এতাদৃশীই ছিল তৎকালীন সামাজিক অবস্থা। লোকের ধর্ম-কর্মাদির অবস্থাও সামাজিক অবস্থার অঙ্গীভূত। এক্ষণে তৎকালীন ধর্ম-কর্ম-বিষয়ক অবস্থা-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

চ। তৎকালীন ধর্ম-কর্মের অবস্থা। ধর্মের নামে লোক যাহা কিছু করিয়া থাকে, তাহার সমস্তই ধর্ম নহে, পারমার্থিক ধর্মও নহে। যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম ; যাহা বেদবিহিত নহে, এবং যাহা বেদবিরুদ্ধ, বেদানুগত শাস্ত্র তাহাকে অধর্মই বলেন (১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যায় শাস্ত্র-প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। বেদে অধিকার-ভেদ স্বীকৃত। সুতরাং যাহা বেদবিহিত, তাহা ধর্ম হইলেও, বেদবিহিত সকল ধর্ম পারমার্থিক ধর্ম নহে। শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখপূর্বক পূর্বেই (৫১ অনুচ্ছেদে এবং অন্যত্র) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য এবং তাদৃশী সেবার বাসনা—যাহার অপর নাম হইতেছে প্রেম, বা প্রেমভক্তি, বা শুদ্ধাভক্তি, তাহা—হইতেছে অপরিহার্য প্রয়োজন এবং সেই প্রেমলাভের উপায় হইতেছে শুদ্ধা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান—যাহার স্বরূপ-লক্ষণ হইতেছে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণ-নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্তনাদি। সেই ভক্তি বা প্রেম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ, পরন্তু প্রাকৃত চিত্তের বৃত্তি নহে। ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখবাসনা, এমন কি মোক্ষ-বাসনাও, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যের অনুকূল নহে, বরং প্রতিকূল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে সর্বত্রই এই সকল কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এ-সকল বিষয় স্মরণ-পথে রাখিয়াই তৎকালীন ধর্ম-কর্মের অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

তৎকালীন জনসাধারণের ধর্ম-কর্ম-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন—"রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥ কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার। প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥ ধর্ম-কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে। পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে॥ ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়ে। এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে॥ ১।২।৫৮-৬২ ॥ হরিভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার। অসৎসঙ্গ অসৎপথ বহি নাহি আর॥ নানা রূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে। দেহ-গেহ-ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥ ১।৬।১৯৫-৯৬ ॥ সর্ব্বদিগে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্ব্বজন। উদ্দেশ না জানে কেহো কেমন কীর্ত্তন॥ কোথাও

নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ। ১।১১।২৪৯-৫০ ॥ কৃষ্ণযাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোন জন॥ 'ধর্ম কর্ম' লোক সব এইমাত্র জানে। মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী বিষহরি'। তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি॥ 'ধন-বংশ বাঢ়ুক' করিয়া কাম্য মনে। মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥ যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥ অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়। গোবিন্দপুণ্ডরীকাক্ষ-নাম উচ্চারয়॥ কারে বা 'বৈষ্ণব' বলি, কি বা সঙ্কীর্ত্তন। কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন॥ বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে। সকল জগত বদ্ধ মহাতমোগুণে॥ ৩।৪।৪০৮-১৫॥" ইত্যাদি।

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—তৎকালীন জনসাধারণ ছিলেন দেহ-সুখ-সর্বস্ব, বিষয়-মদে মত্ত, ধনবৃদ্ধির এবং পুত্রাদি-লাভের নিমিত্ত এবং ইহকালের স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি লাভের উদ্দেশ্যেই, তাঁহারা অবৈদিক দেবতাদির পূজা করিতেন। পরমার্থভূত বস্তু-সম্বন্ধে এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়-সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোনও ধারণা ছিল না। বেদবহির্ভূত-তন্ত্রমতাবলম্বী যোগীদিগের অলৌকিকী শক্তি দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইতেন এবং তাঁহাদের অলৌকিকী শক্তির প্রভাবে নিজেদের সুখ-সম্পদ-বৃদ্ধির আশাতেই তাঁহাদের মহিমা-কীর্তন করিতেন। তাঁহাদের এই আলৌকিকী শক্তি যে পারমার্থিকী শক্তি নহে, জনসাধারণ তাহা জানিতেন না। যাঁহারা কেবল স্নানের সময়ে, অন্য সময়ে নহে, "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ" প্রভৃতি ভগবন্নাথের "উচ্চারণ" মাত্র করিতেন, বোধ হয় তাঁহারা তাহা করিতেন কেবল গতানুগতিকভাবে, "গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষের" প্রতি, কিংবা এ-সমস্ত নামের প্রতি, তাঁহাদের মন বা প্রীতি থাকিত না। সুতরাং এ-সমস্ত আচরণ ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না।

সুকৃতি, বা ভাগ্যবান্ লোকসম্বন্ধে তৎকালীন লোকের কিরূপ ধারণা ছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। "তারে বলি সুকৃতি, যে দোলা ঘোঁড়া চড়ে। দশ বিশজন যার আগে পাছে রড়ে॥ ১।৫।১৯॥"

তৎকালীন পণ্ডিতদের কথাও শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন। যথা "যে বা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব। তাহারা-হো না জানয়ে গ্রন্থের অনুভব। শাস্ত্র পঢ়াইয়া সভে এই কর্ম্ম করে। শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্ধি মরে॥ না বাখানে যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণের কীর্ত্তন। দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥ ১।২।৬৩-৬৫॥ গীতা-ভাগবত যে-যে জনে বা পঢ়ায়। ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥ ১।২।৬৮॥ বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম। নিরবধি বিদ্যা-কুল করেন ব্যাখ্যান॥ ১।২।৭১॥"

যাঁহারা "বিরক্ত-সন্ন্যাসীর" বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যেবা সব বিরক্ত সন্ন্যাসী অভিমানী। তা' সভার মুখে-হ নাহিক হরিধ্বনি॥ অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়। 'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥ ১।২।৬৬-৬৭॥" বৃন্দাবনদাস ইহাদিগকে "বিরক্তসন্ন্যাসী" না বলিয়া "বিরক্ত সন্ন্যাসী অভিমানী" বলিয়াছেন।—বিরক্ত-সন্ন্যাসিম্মন্য। ইহারা বাস্তবিক ধর্মধ্বজী।

তৎকালে নবদ্বীপে, তথা বঙ্গদেশে, ভক্ত বা বৈষ্ণব যে একেবারেই ছিলেন না, তাহা নহে; তবে তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প। চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি, নবদ্বীপে শ্রীবাসপণ্ডিতের পরিবার, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, খোলাবেচা শ্রীধর, চন্দ্রশেখর আচার্য, জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর প্রভৃতি ছিলেন। তাঁহারা স্বকার্য-সাধন করিতেন। "স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান,

কৃষ্ণের কথন ॥ ১।২।৭২ ॥ হাথে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগণ। আপনা-আপনি মেলি করয়ে কীর্ত্তন ॥ ১।১১।৯ ॥ আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি। গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥ ১।১১।২৫১ ॥"

কিন্তু এ-সমস্ত ভাগবতগণ ছিলেন পূর্বোল্লিখিত বহির্মুখ লোকগণের ঠাট্টাবিদ্রূপের পাত্র। "জগত প্রমত্ত—ধনপুত্র-মিথ্যা-রসে। দেখিলেই বৈষ্ণবমাত্র সভে উপহাসে' ॥ আর্য্যাতর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া। 'যতী, সতী, তপস্বীও যাইব মরিয়া ॥ তারে বলি সুকৃতি, যে দোলা ঘোঁড়া চড়ে। দশ বিশ জন যার আগে পাছে রড়ে ॥ এতে যে গোসাঞি-ভাবে করহ ক্রন্দন। তভু ত দারিদ্র্য-দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥ ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি ছাড় ডাক। ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥' ১।৫।১৭-২১ ॥"

বহির্মুখ লোকগণ—"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহো বোলে—'সব পেট পুষিবার আশ ॥' কেহো বোলে—'জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার। উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যভার ॥' কেহো বোলে—'কত বা পড়িলুঁ ভাগবত। নাচিব কান্দিব হেন না দেখিলুঁ পথ ॥ শ্রীবাসপণ্ডিত—চারি-ভাইর লাগিয়া। নিদ্রা নাহি যাই ভাই! ভোজন করিয়া ॥ ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে কাঁদিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে ॥' ১।৭।১৮২-৮৬ ॥"

আবার "হাথে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগণ। আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন ॥ তাহাতেও উপহাস করয়ে অন্তরে। 'ইহারা কি কার্যে ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে ॥ আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন। দাস-প্রভু-ভেদ বা করেন কি কারণ ॥' সংসারি-সকল বোলে—'মাগিয়া খাইতে। ডাকিয়া বোলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে ॥' 'এগুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।' এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া ॥ ১।১১।৯-১৩ ॥" বহির্মুখ লোকগণ ভক্তদের ঘর-দ্বার নষ্ট করার কথাও চিন্তা করিতেন। "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাদি উক্তি বোধ হয় কোনও পণ্ডিতের মুখে বেদ-বিরুদ্ধ-মায়াবাদ-মতের, বা বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতেরই প্রতিধ্বনি।

তৎকালীন বহির্মুখ লোকগণ উচ্চ সংকীর্তনের বিরোধী ছিলেন। হরিদাস ঠাকুর উচ্চ সংকীর্তন করিতেন। এক দিন এক ব্রাহ্মণ তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন—"অয়ে হরিদাস! একি ব্যাভার তোমার। ডাকিয়া যে নাম লহ, কিহেতু ইহার ॥ মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়। ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয় ॥ কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে। এইত পণ্ডিতসভা, বোলহ ইহাতে ॥ ১।১১।২৬৫-৬৭ ॥" তখন হরিদাস শাস্ত্র-প্রমাণ-প্রদর্শন-পূর্বক উচ্চ সংকীর্তনের মহিমা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু "সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন। বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন ॥ 'দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস। কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ ॥' 'যুগশেষে শূদ্র বেদ করিব বাখানে।' এখনেই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে ॥' ১।১১।২৮৫-৮৭ ॥" এইরূপ বহির্মুখ লোকগণের শাস্ত্রবাক্যের উপরেও আস্থা ছিল না।

উচ্চকীর্তনকারীদিগকে তখনকার লোকগণ জগতের শত্রু মনে করিতেন এবং উচ্চকীর্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষেরও আশংকা করিতেন। যে-কয়জন ব্রাহ্মণ তখন উচ্চ সংকীর্তন করিতেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বহির্মুখ লোকগণ বলিতেন—"এ-বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ। ইহা সভা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ ॥ এ-বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে। ভাবুক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে ॥ গোসাঞির (বিষ্ণুর) শয়ন হয় বর্ষা চারি মাস। ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ॥ নিদ্রা-ভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইব গোসাঞি। দুর্ভিক্ষ

করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥ কেহো বোলে—'যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে। তবে এগুলাকে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥ ১।১১।২৫৩-৫৭ ॥"

এমন লোকও তখন কিছু কিছু ছিলেন, যাঁহারা উচ্চকীর্তনের বিরোধী না হইলেও সর্বদা উচ্চকীর্তনের বিরোধী। তাঁহারা মনে করিতেন, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে উচ্চকীর্তন করা যাইতে পারে। "কেহো বোলে—'একাদশী-নিশি-জাগরণ। করিব গোবিন্দ-নাম করি উচ্চারণ॥ প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ।' এই মত বোলে যত মধ্যস্থ সমাজ ॥ ১।১১।২৫৮-৫৯ ॥"

তৎকালীন লোকগণ, বিশেষতঃ বহির্মুখ পণ্ডিতগণ, সমাজের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত অতত্ত্বজ্ঞ লোকগণকর্তৃক কৃষ্ণকীর্তনকে পাপজনক এবং দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর বলিয়া মনে করিতেন। "কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড়বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥ চৈ. চ. ১।১৭।২০৪ ॥"

বাঙ্গালা দেশে তখন দুর্গোৎসবের প্রচলন ছিল বলিয়াও জানা যায়। বৎসরের মধ্যে কোনও এক নির্দিষ্ট সময়েই দুর্গাপূজা হইত বলিয়া মনে হয়। দুর্গাদেবী হইতেছেন বৈদিকী দেবতা। নদীয়াবাসীদের ঘরে দুর্গোৎসব কালে বাজাইবার জন্য যে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ ছিল, প্রভুর আদেশে লোকগণ যখন কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সে-সমস্ত মৃদঙ্গাদি বাহির করিয়া সংকীর্তন-কালে বাজাইতেন। "মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্ব্ব-ঘরে। দুর্গোৎসব কালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন-সময়ে। গায়েন বা'য়েন সভে আনন্দ-হৃদয়ে ॥ ২।২৩।৮৯-৯০ ॥" মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহেও চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। প্রভু সেই চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপন করিতেন। নবদ্বীপের বাহিরে, সপ্তগ্রামের হিরণ্যদাস-গোবর্ধনদাসের গৃহেও দুর্গামণ্ডপ ছিল (চৈ. চ. ৩।৬।১৫৩), বেণাপোলের রামচন্দ্র খানের গৃহেও দুর্গামণ্ডপ ছিল (চৈ. চ. ৩।৩।১৪২)।

ললিতপুরের মদ্যপ বামাচারী সন্ন্যাসীর বিবরণ (২।১৯।৪২-৯৪) হইতে জানা যায়, তৎকালে বঙ্গদেশে বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতও প্রচলিত ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত একটি বিবরণ হইতেও তাহা জানা যায়। মহাপ্রভু স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তদের লইয়াই শ্রীবাসগৃহে প্রতিরাত্রিতে নৃত্য-কীর্তন করিতেন, বাহিরের লোকদের প্রবেশ-নিবারণার্থ শ্রীবাস-গৃহের বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। গোপাল-চাপাল-নামক এক ব্রাহ্মণ কীর্তন-দর্শনের জন্য আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, সর্বতোভাবে বেদানুগত শ্রীবাস পণ্ডিতকে তান্ত্রিকরূপে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে—"একদিন বিপ্র—নাম গোপাল-চাপাল। পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্মুখ বাচাল ॥ ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ কলার পাত উপর থুইল ওড়-ফুল। হরিদ্রা সিন্দুর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ মদ্যভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘর গেলা। চৈ. চ. ১।১৭।৩৩-৩৬ ॥" প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত এ-সমস্ত দেখিয়া ভব্যসভ্য লোকদের ডাকিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"নিত্যরাত্রে করি আমি ভবানীপূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন ॥ চৈ. চ. ১।১৭।৩৮ ॥" শুনিয়া শিষ্ট লোকগণ হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার।" পরে "হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল। জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ চৈ. চ. ১।১৭।৪১-৪৩ ॥" গোপাল-চাপাল যে ভাবানী-পূজার সজ্জ করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তান্ত্রিকী ভবানী। বৈদিকী ভবানীর বৈদিকী পূজায় মদ্য নিষিদ্ধ।

তৎকালে বাঙ্গালা দেশের বাহিরেও বহুস্থলে এই তন্ত্রমত প্রচলিত ছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে

শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমনের সময়ে, উড়িষ্যাদেশে বাঁশধায়-পথে এক মদ্যপ-শাক্ত সন্ন্যাসী আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলে "প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইল। আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিল ॥ যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে। সব কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে ॥ ৩।২।২৬৪-৬৫ ।।" এ-স্থলে "যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে"—এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, তৎকালে ভারতের বহু দেশেই তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন। এই শাক্ত প্রভুকে বলিয়াছিলেন—"চল ঝাট মঠেতে আমার। সভেই 'আনন্দ' আজি করিব অপার ॥ পাপী শাক্ত মদিরারে বোলয়ে 'আনন্দ'। বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ ॥ ৩।২।২৬৬-৬৭ ।।" এ-সমস্ত উক্তি হইতেই বুঝা যায়, এই শাক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন মদ্যপ তান্ত্রিক। প্রভু তাঁহাকে কৌশলে তাঁহার মঠে পাঠাইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

তৎকালের দেহ-সুখ-সর্বস্ব কৃষ্ণভক্তিশূন্য লোকদের সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাস এক স্থলে লিখিয়াছেন— "যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥ ৩।৪।৪১২ ।।" এ-স্থলে যে যোগীদের কথা বলা হইয়াছে, প্রকরণ হইতেই জানা যায়, তাঁহারা ছিলেন বেদবিরুদ্ধাচারী। এক শ্রেণীর যোগী আছেন, যাঁহারা দেহস্থ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে প্রয়াসী। ষট্‌চক্র-সাধন এবং কুণ্ডলিনী শক্তির কথা কোনও বেদানুগত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদের এতাদৃশ সাধনের ফলে তাঁহারা কতকগুলি অলৌকিকী শক্তি লাভ করেন এবং সে-জন্য বহির্মুখ লোকগণও তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহাদের এই অলৌকিকী শক্তি পারমার্থিকী শক্তি নহে, বস্তুতঃ বিশেষ বিকাশপ্রাপ্ত স্নায়বিকী শক্তি। শ্রীলবৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে বুঝা যায়, এতাদৃশ বেদবিরুদ্ধ যোগমার্গাবলম্বী যোগীরাও তৎকালে জনসমাজে আদৃত হইতেন।

তৎকালে কোনও কোনও স্বার্থান্বেষী লোক যে নিজেদিগকে ভগবদবতার বলিয়া প্রচার করিতেন, এবং বাস্তব-ধর্ম-পিপাসু অথচ শাস্ত্রমর্ম-জ্ঞানহীন লোকদের পারমার্থিক সর্বনাশ-সাধন করিতেন, শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাহাও জানাইয়া গিয়াছেন (১।১০।৮১-৮৬ এবং ২।২৩।৪৭৯-৮১ পয়ার দ্রষ্টব্য)। নকল অবতারদের যে ভগবৎ-স্বরূপের দৈহিক লক্ষণ পর্যন্তও নাই, শাস্ত্রমর্ম-জ্ঞানহীন পণ্ডিত লোকগণও তাহা বুঝিতে না পারিয়া, ইহাদের এবং ইহাদের সহচরদের প্ররোচনায় পরমার্থ-বিষয়ে কেবল প্রতারিতই হইয়া থাকেন (২।২৬।৪৯-পয়ারের টীকা এবং মশ্রী ॥ ৫।৫-৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কবি কর্ণপূরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে তৎকালের ধর্ম-কর্ম-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে।

নদীতটে বিকট-শিলাপট্টঘটিত সুখাসনে উপবিষ্ট এবং ধ্যান-পরায়ণ কোনও লোকসম্বন্ধে কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রজসুধাস্যন্দাধবরোধে মহদ্ দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ। অস্যোপান্ত-নদীতটস্য কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূৎ পাণীয়াহরণ-প্রবৃত্ত-তরুণী-শঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ ॥ অহো জ্ঞাতম্, তদিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য ॥ চৈ. চ. না. ২।৬ ।।" তাৎপর্য—"ইনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছেন। ললাটচন্দ্র হইতে ক্ষরিত সুধার ধারাকে জিহ্বাগ্রদ্বারা রুদ্ধ করার জন্য মহাদক্ষতা দেখাইতেছেন। এ কি? হঠাৎ নদী হইতে জল নেওয়ার জন্য আগত কোনও তরুণীর শঙ্খবলয়ের ঝনৎকারে ইহার কি সমাধিভঙ্গ হইল? হাঁ বুঝিয়াছি—এই ব্যক্তির এইরূপ যোগধ্যানের

ভঙ্গী কেবল উদরভরণের নিমিত্ত অভিনয় মাত্র।” কর্ণপুর এ-স্থলে কপট-ধর্মাচরণের কথাই বলিয়াছেন এবং এতাদৃশ লোকও যে তখন ছিলেন, তাহাই জানাইলেন। এই শ্লোকে কর্ণপূর যাঁহার কথা বলিয়াছেন, তিনি যে পূর্বকথিত যোগমার্গের সাধনেরই অভিনয় করিয়াছিলেন, ললাট-চন্দ্রের সুধার উল্লেখেই তাহা জানা যায়।

ভগবৎকৃপায় তীর্থের মহিমার এবং তীর্থাধিরাজের করুণার উপলব্ধিই হইতেছে তীর্থ-ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র দেশ-ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া নিজেদের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের দেশ-ভ্রমণ হয় বটে, কিন্তু বাস্তব তীর্থ-ভ্রমণ হয় না। সেই সময়ে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকও যে অনেক ছিলেন, কর্ণপূর তাহাও বলিয়াছেন। “গঙ্গা-দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর-শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্। অব্দেনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈ স্তীর্থাবলীং পর্য্যটন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশান্ বেত্ত কঃ॥ চৈ. চ. না. ২।৭॥” তাৎপর্য—“(কোনও তীর্থভ্রমণকারী বলিতেছেন) গঙ্গাদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, উত্তরকোশলা (অযোধ্যা), বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি তীর্থসমূহ এক বৎসরেই তিনবার চারিবার পর্যটন করিতে করিতে এ-পর্যন্ত আমার কত শত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমাদের ন্যায় লোকদিগকে কে চিনিতে পারে?”

তৎকালীন তপস্বীদের সম্বন্ধে কর্ণপূর বলিয়াছেন—“হুং হুং হুমিতি তীব্রনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্ট্যাপ্যতিক্রূরয়া দূরোৎসারিত-লোক এষ চরণাবুৎক্ষিপ্য দূরং ক্ষিপন্। মৃৎস্নালিপ্ত-ললাট-দোস্তট-গল-গ্রীবোদরোরাঃ কুশৈর্দীব্যৎ-পাণিতলঃ সমেতি তনুমান্ দম্ভঃ কিমহো স্বয়ঃ॥ চৈ. চ. না. ২।৮॥” তাৎপর্য—“তীব্র নিষ্ঠুর বাক্যে এবং অতিক্রূর-দৃষ্টিতে ‘হুং হুং হুং’ ইত্যাদি শব্দ ইনি উচ্চারণ করিতেছেন, পদদ্বয়কে উর্ধ্বে ক্ষেপণ করিতেছেন বলিয়া লোকগণ দূরে সরিয়া যাইতেছেন। ইনি উত্তম মৃত্তিকাদ্বারা ললাট, বাহুমূল, গলদেশ, গ্রীবা, উদর এবং বক্ষঃস্থলকে লিপ্ত করিয়াছেন। কুশসমূহদ্বারা ইঁহার করতল শোভা পাইতেছে। যেন মূর্ত্তিমান দম্ভ।” এ-স্থলেও কপট ধর্মাচরণের কথাই বলা হইয়াছে।

তৎকালে আচরিত ধর্ম-কর্ম-সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ কয়েকটি বিবরণ দিয়া কর্ণপূর শেষে বলিয়াছেন —নিরুপাধি বিষ্ণুভক্তিব্যতীত কেবল ধ্যান, ধারণা, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাসের শ্রম, জপ, তপঃ, কর্ম প্রভৃতির কৌশল শিক্ষাদিতে নিপুণতার আধিক্য হইতেছে কেবল জঠর-পিঠরাবর্ত্ত-পূর্ত্তির নানাবিধ উপায় মাত্র। চৈ. চ. না. ২।৯॥

কর্ণপূরের এবং বৃন্দাবনদাসের উক্তির মর্ম একই।

কতিপয় ভক্তব্যতীত, জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য লোকদের ধর্ম-কর্ম-সম্বন্ধে এ-স্থলে যে-বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে জানা যায়—এ-সমস্ত ধর্ম-কর্ম পূর্বকথিত পারমার্থিক ধর্ম ছিল না। সর্পভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে বিষহরির (মনসার) পূজাদি, সাংসারিক আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য মঙ্গলচণ্ডী-বাশুলির পূজাদি, ধন-পুত্রাদি লাভের জন্য মদ্যমাংস-সহযোগে দক্ষ-পূজাদির—পারমার্থিক কোনও মূল্যই নাই। বেদবিরুদ্ধ তান্ত্রিক মতের বা বেদবিরুদ্ধ যোগ-মতের অনুসরণে ইহকালের সুখ-সম্পদ, কতকগুলি বিভূতি, লোক-সমাজে প্রসার-প্রতিপত্তি প্রভৃতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু পরমার্থভূত বস্তু পাওয়া যায় না। অনেকের ধর্মাচরণ যে কপটতাময় এবং উদরভরণের উপায় মাত্র ছিল, কর্ণপূরের উক্তিসমূহ হইতে তাহাও জানা যায়।

মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি অবৈদিকী দেবতা। তৎকালে বঙ্গদেশে অনেক স্থলে যে দুর্গা-পূজা হইত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্গা হইতেছেন বৈদিকী দেবতা। তাঁহার কৃপা হইলে মোক্ষ লাভ হইতে পারে। জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্যরূপে কাম্য না হইলেও, সুতরাং জীবের স্বরূপানুবন্ধী পরমার্থভূত বস্তু না হইলেও, মোক্ষ হইতেছে নিত্য বস্তু, ভুক্তির ন্যায় অনিত্য বস্তু নহে। বৈদিকী দেবী শ্রীদুর্গার শাস্ত্রবিহিত উপাসনায় তাহা পাওয়া যাইতে পারে। তৎকালের লোকগণের মধ্যে অনেকে যে বৎসরের মধ্যে কোনও কোনও নির্দিষ্ট সময়ে দুর্গোৎসব করিতেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহাই জানা যায় ; কিন্তু মোক্ষকাম হইয়া কেহ যে দুর্গার উপাসনা করিতেন, তাহা জানা যায় না। বৎসরের মধ্যে একবার কি দুইবার সাময়িক দুর্গোৎসব এবং শ্রীদুর্গার উপাসনা এক জিনিস নহে। উপাসনা নিত্যকর্তব্য।

৫৮। প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা (৫৮-৭৪ অনুচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কতকগুলি উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে তন্ত্রসম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু জানা আবশ্যক মনে করিয়া এ-স্থলে কতিপয় অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্রসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

ক। **তন্ত্র।** তন্ত্র হইতেছে সাধারণতঃ সাধন-সহায়ক গ্রন্থ-বিশেষ। এই তন্ত্রগ্রন্থগুলির নামের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে 'তন্ত্র'-শব্দটি থাকে, আবার কখনও তাহা থাকেও না। এই তন্ত্র দুই রকমের —বেদানুগত এবং বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ।

খ। **বেদানুগত তন্ত্র।** বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের সহিত যে-সকল তন্ত্র-গ্রন্থের সঙ্গতি আছে, কোনওরূপ বিরোধ নাই, সে-সকল তন্ত্রগ্রন্থ হইতেছে বেদানুগত। এজন্য তন্ত্রকে শ্রুতির শাখা বিশেষও বলা হয়। "তন্ত্র—শ্রুতিশাখা-বিশেষঃ। শব্দকল্পদ্রুম ॥" বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র, ক্রমদীপিকা, মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ও শান্তিপর্বে উল্লিখিত নারদ-পঞ্চরাত্র[১] প্রভৃতি হইতেছে বেদানুগত তন্ত্র। অপৌরুষেয় বৈদিক-গ্রন্থেও তন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ; সে-স্থলে বেদানুগত তন্ত্রই অভিপ্রেত।

গ। **বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধতন্ত্র।** মূল দার্শনিক তত্ত্বাদিসম্বন্ধে বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের সহিত যে-তন্ত্রের সঙ্গতি নাই, বরং বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহাই বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র। এই জাতীয় তন্ত্রের একটি মুখ্য লক্ষণ হইতেছে—বেদকথিত পরব্রহ্ম হইতে অপরের জগৎ-কারণত্ব-মনন। জীবতত্ত্বাদি বিষয়েও বেদের সহিত এই জাতীয় তন্ত্রের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। পরবর্তী বিবরণে এই বিষয়গুলি কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইরূপ বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র সাধারণতঃ দুই রকমের—শৈবতন্ত্র এবং শাক্ততন্ত্র।

---

(১) এই নারদপঞ্চরাত্র পুস্তকাকারে আজকাল পাওয়া যায় না। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে এই নারদ-পঞ্চরাত্রের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরবর্তীকালে 'নারদপঞ্চরাত্র'-নামে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ; এ-সকল গ্রন্থ সর্বতোভাবে প্রামাণ্য নহে। এ-সকল গ্রন্থে প্রাচীন পঞ্চরাত্রের কোনও কোনও শ্লোক আছে বটে ; কিন্তু অনেক বেদবিরুদ্ধ কথাও আছে।

৫৭। শৈবতন্ত্র

শৈবতন্ত্রকে শিবাগমও বলা হয়।[১]

বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র হইতে জানা যায়, বেদকথিত পরব্রহ্মই হইতেছেন জগতের কারণ—নিমিত্ত কারণও তিনি এবং উপাদান-কারণও তিনি। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায়, জগৎ-কারণ এই পরব্রহ্ম হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ গো. পূ. তা. শ্রুতিঃ॥ ১॥" একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতেই অন্য সমস্তের জ্ঞান জন্মে, ইহাই হইতেছে সমস্ত শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মের একটি লক্ষণ। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেই যে এই লক্ষণটি বিরাজিত, তাহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। "ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ কঃ পরমো দেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য বিজ্ঞানেন অখিলং ভাতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তদু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দাৎ মৃত্যুর্বিভেতি, গোপীজনবল্লভ-জ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি, স্বাহেদং সংসরতীতি॥ গো. পূ. তা. শ্রুতিঃ॥ ১॥" সর্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত গীতাশ্লোকগুলিই তাহার প্রমাণ। "পরংব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ —শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনোক্তি॥ ১০।১২॥" অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি, যথা—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্র-মোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ৯।১৭-১৮॥, বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫।১৫॥" ইত্যাদি।

উল্লিখিত উক্তিগুলির বীজ ঋগ্বেদেই বিদ্যমান। ঋগ্বেদের ৭।৯৯।১-মন্ত্রে বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব বলা হইয়াছে। ১।১৫৬।২-মন্ত্রে এই বিষ্ণুর জন্ম-কথা-কীর্তনের কথাও বলা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণকেও "বিষ্ণু" বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণকেও "বিষ্ণু" বলা হয়; কিন্তু বৈকুণ্ঠেশ্বর বিষ্ণুর জন্ম-কথা জানা যায় না; বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলার ব্যপদেশে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন। ১।১৬৪।৪৭-মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কথা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ঋগ্বেদে যে-বিষ্ণুর কথা বলা হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণই। ঋগ্বেদ পরিষ্কার-ভাবেও তাহা বলিয়াছেন। "যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥ কৃষ্ণায় গোপীনাথায় চক্রিণে মুরবৈরিণে। অমৃতেশায় গোপায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ —ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলান্তে খিলসূক্ত[২]।" এ-স্থলে গোপ এবং গোপীনাথ কৃষ্ণকেই "বিষ্ণু" বলা হইয়াছে। বাহুল্যবোধে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অন্যান্য ঋঙ্মন্ত্র উল্লিখিত হইল না।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব-সম্বন্ধে পূর্বে যে-শ্রুতি-স্মৃতি-বচনসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে, ঋগ্বেদেই তাহাদের বীজ বিদ্যমান।

---

(১) বেদানুগত আগম এবং নিগমও আছে, বেদবহির্ভূত আগম এবং নিগমও আছে। বেদানুগত আগমের নামবিশিষ্ট তান্ত্রিক আগমও আছে।

(২) খিললক্ষণম্—পরশাখীয়ং স্বশাখায়ামাপেক্ষাবশাৎ পঠ্যতে তৎ খিলমুচ্যতে [ম. ভা. শা. ৩২৩।১০ (কুং) নীলকণ্ঠ-টীকা]। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ঔন্ধরাজধানী হইতে স্বাধ্যায়মণ্ডলদ্বারা প্রকাশিত ঋগ্বেদের ৭৬২ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনায় জানা গেল, বেদমতে শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জগৎ-কারণ পরব্রহ্ম।

কিন্তু শৈবতন্ত্র বা শিবাগমের মতে শিব হইতেছেন জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণমাত্র। ইহা হইতেছে বেদ-বিরোধী অভিমত। একথা বলার হেতু কথিত হইতেছে।

বৈদিক শাস্ত্রানুসারে শিব হইতেছেন গুণাবতার, তমোগুণের সহায়তায় সৃষ্টি-সংহারকারী। বৈদিক শাস্ত্রানুসারে গুণাবতার শিবের পরিচয় নিম্নলিখিত রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইতেছেন মূলসঙ্কর্ষণ বলরাম, তাঁহার অংশ—দ্বারকা-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ—পরব্যোম-চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ—কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ, তাঁহার অংশ—গর্ভোদকশায়ী নারায়ণ, তাঁহার অংশ হইতেছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) এবং শিব। এইরূপে জানা গেল,—ব্রহ্মা, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু এবং শিব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশমাত্র। কারণার্ণবশায়ী হইতেছেন অব্যবহিতরূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সৃষ্টিকর্তা, আর ব্রহ্মা হইতেছেন ব্যষ্টিজীবের দেহাদির এবং ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিকর্তা। শিব সংহারকর্তা এবং ক্ষীরোদশায়ী পালনকর্তা। ব্রহ্মার উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্‌বশঃ। স্বয়ং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্‌॥ ভা. ২।৬।৩২॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা ও শিবের আবির্ভাবই হয় না। শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ॥ মহোপনিষৎ॥ ১।১॥" এইরূপ শ্রুতিবাক্য আরও আছে। যথা,—"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ॥", "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥" —ভা. ২।২৯।৩২-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামিধৃত শ্রুতিবাক্য। "আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি, পুরুষো হ বৈ নারায়ণ ইতি। * * একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥"—উক্ত ভাগবত-শ্লোক-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ধৃত শ্রুতিপ্রমাণ॥ এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মাও ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না। সৃষ্টির পূর্বে যাঁহার অস্তিত্বই ছিল না, তিনি বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেন না।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"—এই ১।৩-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"দেবস্য পরমেশ্বরস্য আত্মভূতাং তু জগদুদয়স্থিতিলয়হেতুভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং শক্তিমিতি। তথাচোক্তং 'শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।' ইতি। স্বগুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ। সত্ত্বেন বিষ্ণুঃ, রজসা ব্রহ্মা, তমসা মহেশ্বরঃ॥ * *॥ তথাচোক্তং—'সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মিকাম্। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥' ইত্যাদি॥" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এ-সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ-মূলক বাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব হইতেছেন পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের শক্তি। একই ভগবান্ জনার্দনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতেছেন জনার্দনেরই অংশ। এই তিনের দ্বারাই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি (পালন) এবং সংহার করাইয়া থাকেন। ব্রহ্মা রজোগুণের দ্বারা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু) সত্ত্বগুণের দ্বারা জগতের পালন করেন এবং শিব তমোগুণের দ্বারা জগতের সংহার করেন।

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়—বেদ-শাস্ত্র-কথিত শিব পরব্রহ্ম নহেন, জগতের সৃষ্টিকর্তাও নহেন। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের আদেশে এবং শক্তিতে তিনি জগতের সংহারকর্তামাত্র।

পূর্বোল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা যায়, বৈদিক শিব হইতেছেন আদিনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের একরূপ অংশ। অংশীর প্রীতিময়ী সেবাই হইতেছে অংশের স্বরূপগত ধর্ম। বৃক্ষের অংশ মূল এবং পত্রাদির স্বরূপগত ধর্ম যেমন বৃক্ষের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা, তদ্রূপ। আবার শ্রুতি হইতে জানা যায়, নারায়ণ হইতেই ত্রিলোচন শূলপাণি শিবের উদ্ভব। "তথাহি অর্থর্বসু পঠ্যতে। তদাহুরেকো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো * *। তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে। * * নারায়ণাৎ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে * * নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে * *॥ (পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ—এই ২।২।৩৭-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতি-বাক্য)।" যাঁহা হইতে শিবের উদ্ভব, তাঁহার প্রীতিময়ী সেবাও শিবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। এইরূপে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময়ী সেবাই হইতেছে শিবের স্বরূপগত ধর্ম, শিব হইতেছেন ভক্তভাবাপন্ন। শিব যে শ্রীকৃষ্ণের একস্বরূপ-রাম-নাম-জপে আনন্দ অনুভব করেন, ভগবতীর নিকটে তিনি নিজেই তাহা বলিয়াছেন। "রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ পদ্মপুরাণ। উত্তরখণ্ড। সহস্রনাম-স্তোত্র॥ ৭২।৩৩৫॥" বাণযুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—"অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চামলাশয়াঃ। সর্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্॥ ভা. ১০।৬৩।৪৩॥—আমি, ব্রহ্মা, দেবগণ এবং বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সর্বপ্রযত্নে, পরমাত্মা এবং প্রিয়তম তোমার শরণাপন্ন।" শ্রীশিব যে শ্রীকৃষ্ণেরই এক স্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণের পূজা করেন, শ্রীভাগবত হইতে তাহাও জানা যায়। ইলাবৃতবর্ষে শ্রীশিব পার্বতী প্রভৃতি অর্বুদসহস্র নারীগণের সহিত সঙ্কর্ষণের পূজা করেন। "ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্থমূর্ত্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি॥ ভা. ৫।১৭।১৬॥" শ্রীভাগবতের উক্তশ্লোকের পরবর্তী কতিপয় শ্লোকে শ্রীশিবকর্তৃক সঙ্কর্ষণের স্তবোক্তিও দৃষ্ট হয়। শ্রীশিব যে বাসুদেবের ধ্যান করেন, তাহাও তিনি ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ ভা. ৪।৩।২৩॥—বিশুদ্ধসত্ত্বকে বসুদেব বলা হয়। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বেই পরমপুরুষ অনাবৃতভাবে প্রকাশ পায়েন। আমি সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেবকে মনের দ্বারা ধ্যান করি।" ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে জানা যায়, শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"ত্বদ্‌ভক্তিবিষয়ে দাস্যে লালসা বর্ধতেঽনিশম্। তৃপ্তির্ন জায়তে নামজপনে পাদসেবনে॥ ত্বন্নাম পঞ্চবক্ত্রেণ গুণঞ্চ মঙ্গলালয়ম্। স্বপ্নে জাগরণে শশ্বদ্ গায়ন্ গায়ন্ ভ্রমাম্যহম্॥ আকল্পং কোটি-কোটিঞ্চ ত্বদ্‌রূপধ্যানতৎপরম্। ভোগেচ্ছা বিষয়ে নৈব যোগে তপসি মন্মনঃ॥ ত্বৎসেবনে পূজনে চ বন্দনে নামকীর্ত্তনে। সদোল্লসিতমেষাঞ্চ বিরতৌ বিরতিং লভেৎ॥ স্মরণং কীর্ত্তনং নামগুণয়োঃ শ্রবণং জপঃ। ত্বচ্চারুরূপধ্যানং ত্বৎপাদমেবাভিবন্দনম্॥ সমর্পণমাত্মনশ্চ নিত্যং নৈবেদ্যভোজনম্। বরং বরেশ দেহীদং নবধা ভক্তিলক্ষণম্॥"

এ-সমস্ত কারণেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের মহিমা-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীশিবকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥ ভা. ১২।১৩।১৬॥"

এ-সমস্ত বেদানুগত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়, বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে যে-শিবের কথা বলা হইয়াছে, সেই শিব এবং তান্ত্রিক শৈবদের কথিত শিব এক তত্ত্ব নহেন। আকৃতিতে এবং পোষাক-পরিচ্ছদাদিতে এক রকম হইলেও তত্ত্ব-মহিমাদিতে তাঁহারা ভিন্ন। আকারসাম্যে বস্তুসাম্য বুঝায় না। বৃক্ষজাত আম্র এবং মৃণ্ময় আম্রের আকার এক রকমই। কিন্তু বৃক্ষজাত আম্র এবং মৃণ্ময় আম্র এক নহে। মৃণ্ময় আম্রে বৃক্ষজাত আম্রের গুণ থাকে না। তদ্রূপ বৈদিক শিব এবং তান্ত্রিক শিবও এক এবং অভিন্ন হইতে পারেন না। বৈদিক শিবে শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত যে-সমস্ত লক্ষণ আছে, তান্ত্রিক শিবে সে-সমস্ত নাই। আকার-সাম্যহেতু, বৈদিক শিবের উদ্দীপনবশতঃ বেদানুগত লোকও তান্ত্রিক শিবের অর্চনাদি করিতে পারেন। তাহা হইবে বাস্তবিক বৈদিক শিবেরই পূজা।

যাহা হউক, এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—বৈদিক শিব জগতের কারণ নহেন। তান্ত্রিকেরা যে-শিবকে জগৎ-কারণ (নিমিত্ত-কারণ) বলেন, তিনি বৈদিক শিব নহেন; সুতরাং তাঁহাদের অভিমতও বেদসম্মত নহে।

তান্ত্রিক শৈবদের অনেক সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ের মতেই তাঁহাদের কথিত শিব হইতেছেন জগৎ-কারণ। একটি সম্প্রদায়ের নাম পাশুপত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মতে "পশু" বলিতে জীবমাত্রকেই বুঝায়। তাঁহাদের মতে শিবই পরব্রহ্ম বলিয়া শিব হইতেছেন "পশুপতি"। এই মতের সহিত বেদের যে সামঞ্জস্য নাই, "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ॥—এই ২।২।৩৭ ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ রামানুজাদি ভাষ্যকারগণও বেদের সহিত এই মতের অসামঞ্জস্য দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন —"সা চেয়ং বেদবাহ্যেশ্বরকল্পনানেকপ্রকারা—অবৈদিক ঈশ্বর-কল্পনা অনেক প্রকার।" একটি প্রকারের কথা তিনি বলিয়াছেন—"মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে কার্য-কারণ-যোগ-বিধি-দুঃখান্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পশুপতিনেশ্বরেণ পশুপাশবিমোক্ষায়োপদিষ্টাঃ। পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণমিতি বর্ণয়ন্তি॥—শৈবগণ বলেন, কার্য, কারণ, যোগ, বিধি, দুঃখান্ত এই পাঁচ পদার্থ পশুপতিকর্তৃক পশুগণের বন্ধনচ্ছেদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। পশুপতি শিব এতজ্জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ও নিমিত্ত-কারণ।"—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-মহোদয়ের সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।[১] শৈবমতে যে বেদবাহ্য ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছে, শ্রীপাদ শঙ্কর তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-সম্পাদিত, ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের সংস্করণে পাদটীকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, এ-স্থলে আমরাও পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা হইতে জানা যায়, শৈবদের

---

(১) এ-স্থলে পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—"শৈব-সম্প্রদায়ের চতুর্বিধ অবান্তর প্রভেদ আছে। যথা—শৈব, পাশুপত, কারুণিক-সিদ্ধান্ত ও কাপালিক। ইহারা সকলেই মহেশ্বর-প্রোক্ত আগম-শাস্ত্রের অনুগামী। মহত্তত্ত্বাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব কার্য অর্থাৎ জন্মবান্ এবং সে-সকলের কারণ প্রধান (প্রকৃতি) ও ঈশ্বর। প্রধান প্রকৃতি-কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ। যোগ-শব্দের মুখ্য অর্থ সমাধি। ত্রৈকালিক স্নানাদি অনুষ্ঠেয় কর্মফল বিধি-শব্দের বোধ্য। দুঃখান্ত-শব্দের অর্থ মোক্ষ। পশু-শব্দের অর্থ জীব। পাশ-শব্দের অর্থ বন্ধন (সংসার-রজ্জুতে বাঁধা)।"

(অর্থাৎ তান্ত্রিক শৈবদের) সকল সম্প্রদায়ই মহেশ্বর-প্রোক্ত আগমশাস্ত্রের অনুগামী। মহেশ্বর হইতেছেন শিব। শিব-কথিত আগমই হইতেছে শিবাগম। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে—শিব হইতেছেন বৈদিক দেবতা। তাঁহার কথিত আগম কেন বেদবিরুদ্ধ হইল এবং সেই আগম-কথিত ঈশ্বরই বা কেন বেদবাহ্য হইতে পারেন ?

বৈদিক শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। বেদানুগত পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কোনও কারণে এক সময় শিবকে বলিয়াছেন—হে শিব ! "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তুঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড ॥ ৬২।৩১ ॥ —তুমি স্বকল্পিত আগম-শাস্ত্রদ্বারা লোকসকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও গোপন কর ; যেন এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।" শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশের অনুসরণেই শ্রীশিব স্বকল্পিত শিবাগম প্রচার করিয়াছেন।[১] এই শিবাগমে জীবকে কৃষ্ণবহির্মুখ করার প্রয়াস আছে বলিয়া এবং জীবের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে গোপন করা হইয়াছে বলিয়া, ইহা যে বেদবিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, বেদানুসারে শিবাগমের অনুসরণকারীদের মোক্ষও সম্ভবপর নহে। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন— "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥" বলাবাহুল্য, বেদবিহিত পন্থায় যাঁহারা বৈদিক শিবের উপাসনা করেন, বেদমতে তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষ অসম্ভব নহে।

শিবাগমের অনুসরণকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ হঠযোগের সাহায্যও গ্রহণ করেন। এজন্যই বোধ হয় তাঁহাদিগকে "যোগী" এবং তাঁহাদের সাধন-পন্থাকে "যোগমার্গ" বলে। ইহা অবশ্যই বেদকথিত যোগমার্গ নহে।

৬০। শাক্ততন্ত্র (৬০-৭২ অনুচ্ছেদ)

শাক্ততন্ত্রমতে শক্তিই হইতেছেন পরব্রহ্ম, জগৎ-কারণ। তান্ত্রিক শাক্তদের মতে এই শক্তি হইতেছেন শিবের কান্তাশক্তি। বহু শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থ আছে। যেমন—দেবীভাগবত, মহানির্বাণতন্ত্র এবং বাংলাদেশে রচিত অন্যান্য বহু তন্ত্রগ্রন্থ। ('দেবীভাগবত' যে একখানি শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থ, এই প্রবন্ধেরই পরবর্তী অংশে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'মহানির্বাণতন্ত্র'-সম্বন্ধে গোবরডাঙ্গা হিন্দুকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য-মহোদয় তাঁহার 'শাক্ত পদাবলী'-গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বাংলাদেশে বিশেষভাবে আদৃত মহানির্বাণ-তন্ত্র মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।")

পরবর্তী কয়েকটি (৬১-৭২) অনুচ্ছেদে, তন্ত্রসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কয়েকজন পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাদের উক্তির আলোচনা করা হইতেছে।

৬১। শাক্ততন্ত্র-সম্বন্ধে কতিপয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি ও তাহার আলোচনা (৬১-৭২ অনুচ্ছেদ)

কলিকাতার নিকটবর্তী বেলুড় রামকৃষ্ণমঠের স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজকর্তৃক সম্পাদিত

---

(১) বর্তমানে যে-সমস্ত শিবাগম দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই যে শ্রীশিবের কথিত, তাহা নহে। পরবর্তীকালে কোনও কোনও তান্ত্রিক শৈবাচার্যও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীচণ্ডী"-নামক গ্রন্থের নবম সংস্করণের (ভাদ্র, ১৩৬৯) ভূমিকায়, শাক্ততন্ত্র-সম্বন্ধে স্বামীজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে শাক্ততন্ত্রসম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য এ-স্থলে সেই ভূমিকার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইতেছে এবং স্থলবিশেষে, বন্ধনীর মধ্যে, আমাদের বক্তব্যও ব্যক্ত করা হইতেছে।

"হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল-কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামক দুইখানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত হয়। * * বাংলা দেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়। (ভূমিকা, ১৭ পৃষ্ঠা)।"

[বিশ্বকবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং সর্বপ্রথম ভারতীয় আই. সি. এস্. শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় তাঁহার "বৌদ্ধধর্ম"-নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখিয়াছেন—বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি- উপার্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। হিন্দুমতানুযায়ী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করেন লিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস এই যে, ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধ ব্যক্তিরা অশেষরূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্যসমূহ সম্পাদন করিতে সমর্থ হন (৭০ পৃষ্ঠা)।" বারাণসীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীলগোপীনাথ কবিরাজ, এম্ এ, ডি. লিট্-মহোদয় তাঁহার "তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন" নামক গ্রন্থেও (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তান্ত্রিকদের অদ্ভুত আলৌকিকী শক্তির কথা লিখিয়াছেন। "মহামায়াতন্ত্র ও শম্বরতন্ত্র"-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ইহাতে মায়াপ্রপঞ্চ নির্মাণের কথা আছে। মায়াপ্রপঞ্চ নির্মাণের ফলে দ্রষ্টার ইন্দ্রিয় তদনুরূপ বিষয়কে গ্রহণ না করিয়া অন্যথা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যেমন বাস্তব জগতে যাহা ঘট, দ্রষ্টার নিকটে তাহা প্রতিভাত হয় পটরূপে। ইহা কতকটা বর্তমান hypnotism প্রভৃতি মোহিনী বিদ্যার অনুরূপ (৫৮ পৃষ্ঠা)।" "যোগিনীজালশম্বর"-নামক গ্রন্থসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"মায়াপ্রধান তন্ত্রকে শম্বর বলে। ইহাতে যোগিনীদের জল দৃষ্ট হয়। (৫৮ পৃঃ)।" "তত্ত্বশম্বর"-গ্রন্থসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ইহা এক প্রকার মহেন্দ্রজালবিদ্যা। এই বিদ্যাদ্বারা এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্ব ভাসমান হয়। যেমন পৃথিবীতত্ত্বে জলতত্ত্বের ভান বা জলতত্ত্বে পৃথিবীতত্ত্বের ভান ইত্যাদি (৫৮ পৃষ্ঠা)।" "মহাসম্মোহন"-গ্রন্থসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"জাগ্রৎ মনুষ্যকে সুপ্ত বা অচেতন করিবার বিদ্যা। ইহা বাল-জিহ্বাচ্ছেদাদি কু-উপায়ে সিদ্ধ হয়। (৫৯ পৃঃ)।" কলাসার-নামক গ্রন্থে "বর্ণের উৎকর্ষসাধন কিরূপে করিতে হয়, তাহার বর্ণনা", কুণ্ডিকামত-নামক গ্রন্থে "গুটিকাসিদ্ধির বর্ণনা", ত্রোতলতন্ত্রে "ঘুটিকা (পানপাত্র), অঞ্জন ও পাদুকাসিদ্ধির বিবরণ", ত্রোতলোত্তরতন্ত্রে "৬৪০০০ যক্ষিণীর দর্শনের উপায়"-বর্ণন আছে। (৫৯ পৃষ্ঠা)।" এতাদৃশী অলৌকিকী শক্তির অর্জন তান্ত্রিকদের মুখ্য লক্ষ্য হয়তো নহে ; কিন্তু ইহাদ্বারা তাঁহারা সাধারণ লোকদিগকে বিস্মিত এবং আকৃষ্ট করিতে পারেন।]

উল্লিখিত উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী লিখিয়াছেন—"ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'Introduction to Buddhist Esotericism'-গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুতন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধ-তন্ত্রের নিকট ঋণী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্রে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা,

ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাবিদ্যার যে-বর্ণনা আছে, তৎসমুদয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধতন্ত্র 'সাধনমালা' পরিদৃষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা—দেবীর এই অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত। ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা।"

"হিন্দুতন্ত্রের অনেক মন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্র-সৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ। ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা।"

[স্বামীজী ডক্টর ভট্টাচার্যের উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। ইহাদ্বারা তাঁহার স্বীকৃতিই বুঝা যায়। স্বীকৃতির হেতুও আছে—তন্ত্রশাস্ত্রের উক্তিই ডক্টর ভট্টাচার্যের উক্তির অনুকূল ; তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ-মহোদয় তাঁহার "তন্ত্রপরিচয়"-নামক গ্রন্থে (বীরভূম, শান্তিনিকেতন হইতে চৈত্র ১৩৫৯ সালে প্রকাশিত) মেরুতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—কৌলিক, বাম, চীনক্রম, সিদ্ধান্তীয় ও শাবর—এই পাঁচ রকমের বামমার্গ আছে (৫২ পৃষ্ঠা)। মেরুতন্ত্র বলিয়াছেন—এই পাঁচটি বামমার্গ হইতেছে হাতের পাঁচটি অঙ্গুলির তুল্য। "কৌলিকোঽঙ্গুষ্ঠতাং প্রাপ্তো বামঃ স্যাত্তর্জনীসমঃ। চীনক্রমো মধ্যমঃ স্যাৎ সিদ্ধান্তীয়োঽবরো ভবেৎ। কনিষ্ঠঃ শাবরো মার্গ ইতি বামস্ত পঞ্চধা॥" ৫২ পৃষ্ঠা।

সপ্ততীর্থ-মহোদয় আরও লিখিয়াছেন—"ভৈরবতন্ত্র বলিতেছেন, 'মহাচীনক্রমেণৈব তারা শীঘ্র ফলপ্রদা। * *। মহাচীনক্রমেণৈব ছিন্নমস্তাবিধির্মতঃ॥'—তারাদেবী ও ছিন্নমস্তাদেবীর পূজায় চীনাচার (মহাচীনাচার) শীঘ্র ফল প্রদানে সমর্থ। মহর্ষি বশিষ্ঠের চীনদেশে গমন ও চীনাচারে তারা-বিদ্যার উপাসনায় সিদ্ধি-লাভের কথা তারা-তন্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে[১]। স্বচ্ছন্দভৈরব-তন্ত্রে বলা হইয়াছে, চীনাচারের সাধনায় কোন প্রকার বিধি-নিষেধ মানিতে হয় না। সাধক যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবেন। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত শৌচাচারাদিরও তাহাতে প্রয়োজন নাই। ৫২ পৃষ্ঠা॥"

সপ্ততীর্থ-মহোদয়ের উক্তি এবং উদ্ধৃতি হইতে জানা গেল, চীনমহাদেশেও শাক্ততন্ত্রের প্রচলন ছিল ; মেরুতন্ত্র, ভৈরব-তন্ত্র, স্বচ্ছন্দভৈরব-তন্ত্র এবং তারা-তন্ত্রাদিতেও চীনদেশীয় তন্ত্রমার্গের উল্লেখ আছে। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত তারদেবী ও ছিন্নমস্তাদেবীর পূজায় চীনাচারই শীঘ্র ফলপ্রদ। চীনদেশে যে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এখনও যে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত, তাহা সর্বজন-বিদিত। চীনদেশীয় বৌদ্ধেরা যে তান্ত্রিক শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার পূজাদিও করিতেন, সপ্ততীর্থ-মহোদয়ের গ্রন্থ হইতে তাহাও জানা যায়। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-কথিত বৌদ্ধতন্ত্র "সাধনমালা" যে চীনদেশে প্রচলিত ছিল, তাহাও বুঝা যায়। সুতরাং ডক্টর ভট্টাচার্যের উক্তি ভিত্তিহীন নহে। এ-জন্যই বোধ হয় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ তাহার প্রতিবাদ করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তি-মহোদয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য। হিন্দুতন্ত্র যে অনেক বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকটে ঋণী, অধ্যাপক চক্রবর্তী তাহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহার রচিত "শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা"-নামক গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৭) ১৫৩ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—

---

(১) তারাতন্ত্রাদিতে যে "মহর্ষি বশিষ্ঠের চীনদেশে গমন ও চীনাচারে তারা-বিদ্যার উপাসনায় সিদ্ধিলাভের কথা" বলা হইয়াছে, তিনি নিশ্চয়ই ত্রেতাযুগের শ্রীরামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠ নহেন। কেননা, তিনি ছিলেন বেদমার্গানুগামী, তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন না। তাঁহার চীনদেশে গমনের কথা কোনও প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

"তান্ত্রিকতার এক অনাদি[১] উৎস হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের দেবদেবীর পরিকল্পনা, পূজাপদ্ধতি নিজ নিজ ধর্মের পরিবেষ্টনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তান্ত্রিকতার কল্পনা আদৌ করিয়াছিলেন এ-দেশের মাতৃতান্ত্রিক অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়-জাতি; বিশেষ করিয়া এই তন্ত্রপ্রচারের প্রধান ধারক ছিলেন মোঙ্গলীয় বা তিব্বতীয় চীন জাতি। এই জাতি বহুকাল পূর্ব হইতেই চীন ও তিব্বতের সংস্কার লইয়া ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ধরিয়া উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত পথে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও আসাম ছিল ইঁহাদের প্রধান বসতি-কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতে হিমালয়ের অধিত্যকা-দেশ ধরিয়া ইঁহারা কাশ্মীর, ভূটান, সিকিম্, নেপাল, বঙ্গ, আসাম, এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এক বিরাট বন্ধনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তান্ত্রিক আচার এই বন্ধনীর মধ্যেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কামাখ্যা, সিরিহট্ট, পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান ছিল ইঁহাদের প্রধান লীলাভূমি। তাই বলা হয়—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা'; বৌদ্ধতন্ত্রেও ইহার স্বীকৃতি আছে (দ্রষ্টব্য সাধনমালা)। এই জাতির প্রভাবে হিন্দু আর্যগণ নিজধর্মে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীর কল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণও ইঁহাদের নিকট হইতেই তন্ত্রাচার আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উপরন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রাচার তিব্বত, চীন, মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ চীন হইতে 'মহাচীনতারা', ভোটদেশ হইতে 'একজটা' (তারার রূপভেদ) প্রভৃতির মূর্তি ও পূজা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব যে-উৎস হইতে হিন্দুতন্ত্রের মূর্তি, পূজাপদ্ধতি পরিগৃহীত, সেই একই উৎস হইতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মূর্তি ও পূজাপদ্ধতি গৃহীত। সেই জন্যই মহাচীন তারার সহিত হিন্দু 'ছিন্নমস্তার' এত মিল, বৌদ্ধ 'বসুধারা' দেবীর সহিত হিন্দুর 'কমলা'-মূর্তির এত সামঞ্জস্য। উৎস এক এবং সাধারণ, অতএব উভয়ের মধ্যে যে নানা দিক্ হইতেই সৌসাদৃশ্য থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক।"

বক্তব্য। অধ্যাপক চক্রবর্তি-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় 'সাধনমালার' ভূমিকায় বলিয়াছেন, Hindu goddesses like Mahachintara, Chhinnamasta, Kali etc. were originally Buddhists': তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন 'তারার ধ্যান ও সাধনা হিন্দুতন্ত্রে প্রচলিত আছে এবং দুইটি ধ্যান মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয় হিন্দু তান্ত্রিকেরা মহাচীন তারার উপাসনা ও মূর্তিকল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।' ইত্যাদি।" ডঃ ভট্টাচার্যের এই উক্তির খণ্ডনার্থই অধ্যাপক চক্রবর্তী কতকগুলি কথা বলিয়া অবশেষে পূর্বোল্লিখিত বিবরণ দিয়াছেন। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে হিন্দুতন্ত্রের মহাবিদ্যাদি যে বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত, স্বামী জগদীশ্বরানন্দের চণ্ডী-ভূমিকা হইতে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং তর্কের বিষয় হইতেছেন মহাবিদ্যা।

অধ্যাপক চক্রবর্তি-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ১৭-১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মাতৃপূজার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন আর্যেতর নিগ্রোবটু, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গল বা তিব্বতীয় চীনজাতি। তাঁহাদের ধর্মের পুরোভাগে

(১) অধ্যাপক চক্রবর্তী কোন্ অর্থে এ-স্থলে "অনাদি"-শব্দ লিখিয়াছেন, বুঝা যায় না। তাঁহার মতে তান্ত্রিকতার আদৌ কল্পনা করিয়াছিলেন অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি এবং তাহার প্রধান ধারক ছিলেন চীনজাতি। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত এই পৃথিবীও সৃষ্ট বস্তু,—সুতরাং "অনাদি" নহে। পৃথিবীর সৃষ্টির পরেই অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও চীনজাতির উৎপত্তি; সুতরাং তাঁহারাও "অনাদি" নহেন। তাঁহাদের কল্পিত তান্ত্রিকতা কিরূপে "অনাদি" হইতে পারে?

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন মাতৃকাদেবী—সৃষ্টির মূল পালনী-শক্তিরূপা, ভীতির অধিকর্ত্রীরূপা, সমাজের নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপা মাতৃদেবী। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা যে মহাবিদ্যাদির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, অধ্যাপক চক্রবর্তী তাহা বলেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের ১৫৩ পৃষ্ঠায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, মহাচীন-তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যা হইতেছেন চীনজাতির পরিকল্পিত। চীনজাতিও বৌদ্ধ ছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"উপরন্তু বৌদ্ধ তন্ত্রাচার তিব্বত, চীন, মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।" এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই কি চীনজাতি মহাবিদ্যাদির কল্পনা করিয়াছিলেন? না কি পরে? অধ্যাপক চক্রবর্তীর বিবরণ হইতে তাহা জানা যায় না। বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই যদি চীনারা মহাবিদ্যাদির কল্পনা করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ হইত অধ্যাপক চক্রবর্তীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রবলতম প্রমাণ। তিনি যখন তাহা বলেন নাই, তখন বুঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম আশ্রয়ের পরেই চীনারা মহাবিদ্যাদির কল্পনা করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাবিদ্যাদিও বৌদ্ধ-পরিকল্পিত। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকায়, (১০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ তন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূলকল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামক দুই খানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত হয়। চীনদেশীয় ত্রিপিটকে (বৌদ্ধশাস্ত্রে) চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নালন্দা ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীখানি এক সময়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের প্রিয় হইয়াছিল। জনৈক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর স্বহস্ত-লিখিত একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত। বাংলা দেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়।" ইহার পরেই স্বামীজী ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের পূর্বোদ্ধৃত বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চীনদেশীয় বৌদ্ধদের অনেকেই নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারাই বোধ হয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিত বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ নিজেদের দেশে নিয়া, চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হইতে পারে,—ভারতীয় বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থই তিব্বতে ও চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং সাধনমালায় কল্পিত মহাবিদ্যাদিও ভারত হইতেই চীনারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের উক্তি ভিত্তিহীন নহে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর বিবরণে ইহার খণ্ডন হয় নাই।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, বাংলাদেশে প্রচলিত তন্ত্রগ্রন্থগুলি বৌদ্ধতন্ত্র (ভারতীয় বা চীনদেশীয় বৌদ্ধতন্ত্র) অবলম্বনেই রচিত; সুতরাং এই তন্ত্রগ্রন্থগুলি লৌকিক, অপৌরুষেয় নহে এবং এইরূপ মাতৃসাধনার আদি প্রবর্তক ছিলেন আর্যেতর জাতি। এই আর্যেতর জাতি-সম্বন্ধে অধ্যাপক চক্রবর্তি-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"এই প্রকৃতির প্রথম উপাসক কাহারা? ভারতীয় সংস্কৃতিতে দুইটি স্বতন্ত্রধারার পরিচয় পাওয়া যায়। 'দৈব আসুর এব চ'; 'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব'। একটি দৈব বা বৈদিক, অপরটি আসুর বা তান্ত্রিক। একটি পুরুষ-প্রধান, অপরটি মাতৃ-প্রধান। আর্যসমাজ পুরুষ-কেন্দ্রিক, তাঁহাদের প্রধান দেবতা পুরুষ। অতএব অপর ধারাটি আর্যভিন্ন অন্য জাতির। এই জাতি আর্যদের প্রবল প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। আর্যসমাজের নিকট ইঁহারা চিরকাল নিন্দিত হইয়া আসিয়াছেন। বেদে ইঁহাদিগকে বলা হইয়াছে

অসুর, দস্যু ; ইঁহারা অনাসা-(noseless), 'শিশ্নদেবা' (worshipper of phallic emblems), 'অযজ্ঞা' (never perfomed sacrifices) এবং 'অন্যব্রতা' (follower of strange laws) ; ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইঁহাদিগকে বলা হইয়াছে বয়াংসি, অন্ত্যজ। ইঁহারাই মহাকাব্যপুরাণের রাক্ষস, দৈত্য, দানব, নিষাদ, কিরাত। ইতিহাসে ইঁহারা শবর, পুলিন্দ, বা আদিবাসী নামে অভিহিত হইয়াছেন।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, মাতৃতান্ত্রিকতার আদি প্রবর্তক ছিলেন আর্যেতর জাতি। যাঁহারা বেদানুগত, তাঁহাদিগকেই "আর্য" বলা হয়। তাঁহাদের "প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী" আর্যেতর জাতি যে বেদবিরোধী ছিলেন, তাঁহা সহজেই বুঝা যায়। বেদবিরোধী ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা আর্যসমাজে চিরকাল নিন্দিত হইতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রবর্তিত মাতৃতান্ত্রিকতা যে বেদবিরুদ্ধ, তাহাই জানা গেল। আবার, বৌদ্ধেরা যে বেদবিরোধী, তাহা সর্বজন-বিদিত, তাঁহাদের কল্পিত দশমহাবিদ্যাদিও বেদসম্মত হইতে পারেন না। হিন্দু শাক্ততান্ত্রিকেরাও বৌদ্ধদের কল্পিত এবং বেদবিরুদ্ধ মহাবিদ্যাসমূহকে নিজেদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূজার মন্ত্রাবলীও, কোনও কোনও স্থলে সম্পূর্ণরূপে এবং কোনও কোনও স্থলে অপভ্রংশরূপে, বৌদ্ধদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শাক্ততন্ত্র যে বেদবিরুদ্ধ এবং লোকবিশেষের দ্বারা রচিত, তাঁহাই জানা গেল। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ এবং অধ্যাপক চক্রবর্তীর উক্তি হইতেও তাহাই জানা যায়।

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার "শাক্তপদাবলী"-গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ঋগ্‌বেদ আর্যদের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। ঋগ্‌বেদে পুরুষ-দেবতারই একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ভারতীয় সাধনায় স্ত্রী-দেবতা অর্থাৎ 'শক্তি' একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন। অনেকের অনুমান এই যে, মাতৃতান্ত্রিক অনার্য সম্প্রদায় হইতে আর্য-সমাজে 'শক্তির' প্রবেশ ঘটিয়াছে।" অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর প্রদত্ত বিবরণ পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে শাক্ততান্ত্রিকদের উপাস্যা শক্তিদেবীগণের স্বরূপাদি-সম্বন্ধেও কয়েকটি তথ্য জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—মোঙ্গলীয় বা তিব্বতীয় চীনজাতি "চীন ও তিব্বতের সংস্কার লইয়া" এ-দেশে আসিয়াছিলেন এবং "এই জাতির প্রভাবে হিন্দু আর্য্যগণ নিজ ধর্ম্মে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান, দেব-দেবীর কল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।" তিব্বতীয় চীনজাতি 'চীন ও তিব্বতের সংস্কার' অনুসারেই তান্ত্রিক দেবদেবীর 'কল্পনা' করিয়াছিলেন। সুতুরাং এইরূপ দেবদেবীগণের মূর্তি হইতেছে তাঁহাদের সংস্কারেরই মূর্তরূপ, তাঁহাদের সামাজিক রীতি-নীতি হইতে জাত সংস্কারের কল্পিত রূপ। সুতরাং তাঁহাদের 'কল্পিত' দেবদেবীগণের বাস্তব-সত্তা কিছু নাই।

এই প্রসঙ্গে গোবরডাঙ্গা হিন্দুকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্যাচার্য-মহোদয়ের রচিত "শাক্তপদাবলী"-নামক গ্রন্থের উক্তিও উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রলয়ের, পরিদৃশ্যমান জগতের নানা বৈচিত্র্যের, জীবের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া মানুষ প্রথম তাহার সহজ বুদ্ধির প্রেরণায় সমস্ত কিছুর পশ্চাতে এক এক জন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে। ১/পৃষ্ঠা।" ; "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পূর্বের অবস্থাটা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সেই অনন্ত অসীম মহাশূন্য মহাব্যোম আমাদের কল্পনা-শক্তির গোচরে আসে না। ঐ মহাশূন্য অনন্ত ও অসীমই ব্রহ্মরূপে কল্পিত হইয়াছে, এই অসীম নির্বিকার, নির্বিশেষ ও নির্বিকল্প। ১-২ পৃষ্ঠা" ; "প্রকৃতির

মধ্য দিয়া সর্বশক্তিমানের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া মানুষ যেরূপে তাঁহার আরাধনা আরম্ভ করে, তাহাই নানা দেবতার পরিকল্পনার মূল কারণ। —২ পৃষ্ঠা।" ; "তান্ত্রিকগণই জগন্মাতা দেবী কালিকার রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। —১০ পৃষ্ঠা।" ; "কালী হইতেছেন প্রকৃতিরই প্রতীক। সৃষ্টির পূর্বে অসীম মহাব্যোম অর্থাৎ মহাশূন্য গাঢ় অন্ধকারে আবৃত ছিল। তারপর একদিন সৃষ্টির উন্মেষ হয়—অন্ধকারের উদর হইতে সৃষ্টি রূপ পরিগ্রহ করিল। সৃষ্টি-পূর্বের ঐ অন্ধকারেরই প্রতীক কালী। —১১ পৃষ্ঠা।" ; "এই ভয়াবহ পটভূমিকার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মায়ের ভয়াবহ মূর্তি পরিকল্পিত হইয়াছে।—১৬ পৃষ্ঠা।" ; তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাগণ-প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"এই দেবীদের রূপবর্ণনাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কোন্ ভাবের প্রতীক রূপে কোন্ দেবী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যাও তন্ত্রশাস্ত্রে রহিয়াছে। —১০৮ পৃঃ।" "যে-ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতে মঙ্গলকাব্য—তথা ঐ কাব্যে বর্ণিত দেবদেবীগণের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বিদ্যমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীতি ও স্বার্থবুদ্ধি হইতে সঞ্জাত ভক্তিরস তাহার প্রকাশের মাধ্যম পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। —২৩৯ পৃষ্ঠা।" ; "তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ তাঁহাদের দ্রুত ক্ষীয়মাণ ধর্মের প্রভাব রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুধর্মের অনুসরণে কিছু কিছু দেবীর সৃষ্টি করিল। অপর দিকে মুসলমান-শক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত আত্মপ্রত্যয়হীন হিন্দু-সমাজ নানা দেবীর সৃষ্টি করিয়া কোন মতে আত্ম-বিকাশের পথটি খুঁজিয়া পাইল। এই সকল নবসৃষ্ট দেবীদের অধিকাংশই ছিলেন উগ্র-প্রকৃতিবিশিষ্ট। পরে অবশ্য তাঁহারা এই উগ্রতা হারাইয়া শান্ত হইয়া পড়িলেন—যেমন চণ্ডীদেবী। দেবী কালিকা এই ঘোরা দেবীদের অন্যতমা। ইনি বিশুদ্ধ তান্ত্রিক দেবী। —২৪৪ পৃষ্ঠা।" ; "মঙ্গলকাব্যের নিষ্ঠুরা দেবীসঙ্ঘ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচারের পটভূমিকায় এবং অনার্য ও বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রভাব হইতে জাত নিষ্ঠুর-প্রকৃতির দেবীকুল পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে ক্রমশঃ মঙ্গলদায়িনী দেবীরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন। —২৪৬ পৃষ্ঠা।" ; "পার্বতী, উমা, দুর্গা এবং চণ্ডীর ধারা মিলিয়া যে এক মহাদেবীর বিবর্তন পুরাণাদিতে দেখা যায়, তাহার সঙ্গেই দেবী কালিকা বা কালীর ধারাটি মিশ্রিত হইয়াছে এবং দেবী বঙ্গের শক্তি-সাধনায় শেষ পর্যন্ত সর্বেশ্বরী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মহাশক্তির বিবর্তন-ধারায় সর্বশেষে দেবী কালিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। —১০ পৃষ্ঠা।"

অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীও তাঁহার "শাক্ত-পদাবলী ও শক্তিসাধনা"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"প্রত্যেকটি মূর্ত্তিই এক একটি ভাবের প্রতীক। হিন্দুজাতি ভাবপ্রবণ, তাঁহাদের কল্পিত মূর্ত্তিগুলিও ভাবার্থপূর্ণ। —১৩৯ পৃষ্ঠা।"

উপরি-উক্ত বিবরণসমূহ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায় যে, তান্ত্রিক দেবদেবীগণ তান্ত্রিকদেরই কল্পিত, তান্ত্রিকদের ভাবধারার প্রতীক, দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দেবদেবীর মূর্তির পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের বা বিবর্তনের সর্বশেষ রূপটি হইতেছেন কালীদেবী। সুতরাং এ-সমস্ত কল্পিত দেবদেবীর কোনও বাস্তব অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বা 'বিসর্জন' নাটকে শক্তি-সাধক রঘুপতির মুখে অতি সত্য কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন—"মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন দাঁড়াইয়া, তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি, বিশ্বের

চৌদিক বেয়ে চির রক্ত ধারা ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তার— (বিসর্জন, ২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)। * * * * সত্য কোথা আছে, কেহ নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে। সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারিদিকে ফাটিয়া পড়িছে ; সত্য তাই নাম ধরে মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা। (বিসর্জন, ২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।"

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে উল্লেখ করা যায় যে, তান্ত্রিকগণ নিজেদের সংস্কার অনুসারে এবং কোনও কোনও আধুনিক গবেষক পণ্ডিতও, পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিতদের অনুসরণে এবং সম্ভবতঃ তান্ত্রিকদের ভাবধারা-দর্শনে, বেদকথিত ব্রহ্মকে এবং বেদকথিত ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই যে-সমস্ত মায়াতীত ভগবৎস্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহাদিগকেও লোক-কল্পিত বলিয়া মনে করেন। বেদকেও তাঁহারা তান্ত্রিকদের তন্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের রচিত গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য, বেদকথিত ব্রহ্ম এবং উল্লিখিত ভগবৎস্বরূপগণও অনাদি, অজ, নিত্য, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, নানাবিধ ভাব-বিভাবিত। বেদানুগত সাধক ভগবৎকৃপায় সে-সমস্ত ভাবের কোনও কোনও ভাবের অংশে বিভাবিত হইতে পারেন। তাঁহারা সাধকের কল্পিত ভাবের প্রতীক নহেন, সাধকের ভাবেও বিভাবিত নহেন।

তান্ত্রিকদের কল্পিত দেবীগণের রূপাদিও অদ্ভুত। কেহ দিগম্বরা, কেহ বা চর্মাম্বরা। কেহ "মৈথুনপ্রিয়া" এবং সাধকের সহিত "রমণ-ক্রিয়া-রতা" (মধুমতী), কেহ বা "বিপরীত সম্ভোগাতুরা"। দেবী স্বয়ং কালীও মহাকালের সহিত বিপরীত সম্ভোগাতুরা। তান্ত্রিক-দেবীগণের এতাদৃশ রূপের ও ভাবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে সত্য। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক অর্থ একদিকে যেমন এই সকল দেবীর অবাস্তবত্ব-প্রতি-পাদক, অন্যদিকে তেমনি আর্য হিন্দুদিগের বিবেচনায় যাহা কুরুচি ও অশ্লীলতা, তাহার আচ্ছাদনের ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র।

সকল ধর্মসম্প্রদায়েই অতত্ত্বজ্ঞ এবং বিচারবুদ্ধিহীন লোকের সংখ্যাই অনেক বেশী। তান্ত্রিক সম্প্রদায়েও ইহার ব্যতিক্রম নাই। তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে যাঁহারা এইরূপ অতত্ত্বজ্ঞ এবং বিচারবুদ্ধিহীন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক অর্থের ধার ধারেন না, তাহা উপলব্ধিও করিতে পারেন না। দেবীদিগের প্রতিমায় দৃষ্ট রূপ এবং তন্ত্রগ্রন্থে কথিত ধ্যানাদিই তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায়। সকলেই যে জিতেন্দ্রিয় হইবেন, তাহাও নয়। সুতরাং তান্ত্রিক দেবীগণের রূপ এবং ধ্যানদি যে অজিতেন্দ্রিয় লোকদিগের অধিকাংশ লোকের চিত্তেই যৌনলালসা জাগাইবে এবং সেই লালসাচরিতার্থ করার অনুকূল পন্থায় তাঁহাদিগকে ধাবিত করিবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ "মহানির্বাণতন্ত্রে" উপদিষ্ট পঞ্চ-ম-কারের সাধনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা "বিজয়তন্ত্রে" কথিত হইলেও তাঁহারা মহানির্বাণতন্ত্রের অনুসরণেই প্রবৃত্ত হইবেন ; বিশেষতঃ পঞ্চ-ম-কারের সাধন শীঘ্র সিদ্ধি-প্রদায়ক। "মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেব চ। ম-কারং পঞ্চ দেবেশি শীঘ্রং সিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ মহানির্বাণতন্ত্র॥" এ-সমস্ত কারণে অজিতেন্দ্রিয় তান্ত্রিকদের মধ্যে যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার ফলে স্থলবিশেষে যে সমাজও কলুষিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বেদানুগত কোনও কোনও সাধক-সম্প্রদায়ে যে এতাদৃশ ব্যভিচার একেবারেই নাই, তাহা নয় ; কিন্তু তাঁহাদের এতাদৃশ ব্যভিচারের সমর্থক কোনও শাস্ত্রবাক্য নাই, তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ে যে তদনুকূল শাস্ত্রবাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।]

স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী তাঁহার "শ্রীশ্রীচণ্ডীর" ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন—

"শাক্তভাবের স্রোত সমগ্র ভারত প্লাবিত করিলেও বাংলাদেশে ইহা বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলাভাষায় প্রাচীনকাল হইতে বিশাল শাক্তসাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। ভূমিকা, ১৮ পৃষ্ঠা।"

"পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাভাষায় বিশাল শাক্তসাহিত্য রচিত হইয়াছে। ভূমিকা, ১৮ পৃষ্ঠা।"

"দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, সুবঙ্গের রাজা রাজসিংহের ভারতীমঙ্গল, * * নারায়ণদেবের কালিকাপুরাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাব্য। ভূমিকা, ১৯ পৃষ্ঠা।"

"বাংলায় শাক্তসাধনস্রোত একদা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ভূমিকা, ২০ পৃষ্ঠা।"

"বাংলার শাক্ত সাধকগণের মধ্যে হালিসহরের রামপ্রসাদ, বর্ধমানের কমলাকান্ত, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, তারাপীঠের বামাক্ষেপা, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, মেহারের সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকা, ২০ পৃষ্ঠা।"

"পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন অভূতপূর্ব ও সুদূরপ্রসারী। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে তিনি বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। * * বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টলভূমি পর্যন্ত প্রদেশ বিষ্ণুক্রান্তা। ভূমিকা, ২১ পৃষ্ঠা।"

[স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী পূর্বে বলিয়াছেন—"বাংলাদেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা।" এস্থলে বলিয়াছেন, শাক্তভাবের স্রোত বাংলাদেশে বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছে (ভূমিকা, ১৮ পৃষ্ঠা)। ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, বৌদ্ধতন্ত্রের শাক্তভাবই বাংলাদেশে বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে? পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে-বিশাল শাক্তসাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিও বৌদ্ধতন্ত্রই নয় কি? অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর যে-বিবরণ পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও জানা যায়, মোঙ্গলীয় বা তিব্বতীয় ও চীনজাতির প্রভাবেই "হিন্দু আর্য্যগণ নিজধর্ম্মে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান, দেবদেবীর কল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।" এই চীনারা যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁহার গ্রন্থের ২৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, অষ্টাবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্তী যুগে শাক্তকবিদের রচনায় "শাক্তপদাবলীর ভাবের অঙ্কুর থাকিলেও, শাক্তগীতির বিশিষ্ট ঢং অনুপস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীই শাক্তপদালীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও সমৃদ্ধির যুগ।"

স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী লিখিয়াছেন, বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধনায় পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টলভূমি পর্যন্ত প্রদেশ বিষ্ণুক্রান্তা। চট্টলভূমি হইতেছে চট্টগ্রাম—বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে বুঝা যায়, বাংলাদেশে প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্র অনুসারেই পরমহংসদেব সাধন করিয়াছিলেন। পূর্বোল্লিখিত কারণে এই চৌষট্টিখানা তন্ত্রের ভিত্তিও কি বাংলায় সমৃদ্ধ বৌদ্ধতন্ত্র নয়? যেহেতুতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের উক্তির প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই, সেই হেতুতেই এ-সমস্ত প্রশ্নেরও তিনি নেতিমূলক উত্তর দিতে পারিবেন না।]

স্বামীজী তাঁহার ভূমিকায় আরও লিখিয়াছেন—

"নাগোজী ভট্ট পাণিনি-ব্যাকরণ-দর্শন-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান আচার্য। * * নাগোজীর অন্যতম

শিষ্য উমানন্দ নাথ ১৭৭৫ খ্রীঃ 'পরশুরামকল্পসূত্রে'র 'টীকা 'নিত্যোৎসব' রচনা করিয়াছেন। * * নাগোজী ভট্ট একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। * * ইহার পৌত্র মণিরাম ১৮০৪ খ্রীঃ বিদ্যমান ছিলেন। নাগোজী ভট্টের রচিত প্রায় পঞ্চাশখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কাত্যায়নীতন্ত্র ইঁহারই রচনা। উক্ত তন্ত্রে চণ্ডীর বিস্তৃত মন্ত্রবিভাগ-কারিকা আছে। ভূমিকা, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা।"

[নাগোজী ভট্টের শিষ্য উমানন্দ নাথ যখন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে "নিত্যোৎসব" লিখিয়াছেন এবং নাগোজীর পৌত্র মণিরাম যখন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তখন মনে হয়, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই, অথবা তৃতীয়াংশের পরেই (বর্তমান সময়ের অনধিক দুই শত বৎসর পূর্বে) নাগোজী ভট্ট কাত্যায়নীতন্ত্রসহ প্রায় পঞ্চাশখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সুতরাং কাত্যায়নীতন্ত্র বেশী প্রাচীন নহে এবং ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই লিখিত—অপৌরুষেয় নহে।]

"ভারতবর্ষে প্রচলিত গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মিরী ও বিলাসী—এই চারি প্রকার তন্ত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক। পালরাজাদের সময় বাংলা তন্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। একটি তন্ত্রে আছে—'গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা', অর্থাৎ গৌড়ে (বঙ্গদেশে) তন্ত্রবিদ্যার উদ্ভব হয়। বরদাতন্ত্রের ১০ম পটলে বাংলা অক্ষরের বর্ণনা আছে। আবার অধিক সংখ্যক প্রাচীন পীঠস্থানগুলি বঙ্গভূমিতেই অবস্থিত। ভূমিকা, ২৫ পৃষ্ঠা।"

[যুক্তিদ্বারা এবং একটি তন্ত্রের উল্লেখপূর্বকও স্বামীজী দেখাইয়াছেন—বাংলাদেশেই তন্ত্রের উদ্ভব। ইহাতে বুঝা যায়, বাংলার তন্ত্রগ্রন্থগুলি ব্যক্তিবিশেষেরই লিখিত এবং স্বামীজীর পূর্বোক্তি অনুসারে বুঝা যায়, এ-সকল তন্ত্রগ্রন্থের ভিত্তিও বাংলায় সমৃদ্ধ বৌদ্ধতন্ত্রই। অধ্যাপক চক্রবর্তীর উক্তিও ইহার অনুকূল।]

"নৃসিংহানন্দ নাথের নিকটে ভাস্কর শ্রীবিদ্যাপঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষাগ্রহণের পরে তিনি ভাসুরানন্দ নাথ-নামে পরিচিত হন। * * ভাস্করের চণ্ডীর টীকা 'গুপ্তবতী' বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'গুপ্তবতী' ১৭৪১ খ্রীঃ রচিত হয়। * * চণ্ডীর টীকাকারগণের মধ্যে একমাত্র ভাস্করই রহস্যত্রয়ের টীকা লিখিয়াছেন। উহাতে শাক্তদর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের আভাস আছে। ভূমিকা, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা।"

[চণ্ডী বস্তুতঃ তন্ত্রগ্রন্থ না হইলেও ভাস্কর তাঁহার গুপ্তবতী টীকাতে তান্ত্রিক-ব্যাখ্যা দিয়া ইহাকে তন্ত্রগ্রন্থরূপেই পরিণত করিয়াছেন। এই গুপ্তবতী টীকাতে তিনি যে-তন্ত্রমতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বেশী প্রাচীন নহে—এই টীকা ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ বর্তমান সময়ের প্রায় সোয়াদুইশত বৎসর পূর্বে) রচিত।]

৬২। তন্ত্রমত বেদবিরুদ্ধ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজের সম্পাদিত "শ্রীশ্রীচণ্ডী"-গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামীজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যও আমরা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। স্বামীজীর নিজের উক্তি, তাঁহার স্বীকৃত ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের উক্তি, সেই উক্তির অনুকূল মেরুতন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র, স্বচ্ছন্দভৈরব-তন্ত্র এবং তারাতন্ত্রাদি বহু তন্ত্রগ্রন্থের উক্তির আলোচনায় দেখা গিয়াছে—শাক্ততন্ত্রের মহাবিদ্যাদি বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই গৃহীত, তাঁহাদের পূজামন্ত্রাদি ও বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই, কোনও স্থলে অবিকৃত ভাবে,

কোনও স্থলে বা অপভ্রংশরূপে, গৃহীত হইয়াছে। স্বামীজীর উক্তি অনুসারে জানা যায়, বাংলাদেশেই শাক্ততন্ত্রের উদ্ভব এবং বাংলাদেশে বহু শাক্ততন্ত্র রচিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত তন্ত্রের ভিত্তিও বাংলাদেশে সমৃদ্ধ বৌদ্ধতন্ত্র। বৌদ্ধেরা বেদবিরোধী; সুতরাং তাঁহাদের কল্পিত মহাবিদ্যাদি-এবং মন্ত্রাবলীও বেদবহির্ভূত। বৌদ্ধদের রচিত তন্ত্রগ্রন্থগুলি এবং তাঁহাদের অনুসরণে বাংলাদেশে রচিত তন্ত্রগ্রন্থগুলি কোনও কোনও বিশিষ্ট লোককর্তৃকই লিখিত, ব্রহ্মদর্শী কোনও বৈদান্তিক ঋষিকর্তৃক লিখিত নহে। বেদকথিত ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি যিনি লাভ করেন, তাঁহাকেই পারমার্থিক ঋষি বলা হয়। তাঁহার উক্তিতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়ের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অপরের মধ্যে সেই দোষ-চতুষ্টয় থাকার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং তাদৃশ অপরের লিখিত গ্রন্থ পারমার্থিক সাধকের পক্ষে অনুসরণীয় হইতে পারে কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

যিনি শাক্ততান্ত্রিকগণের উপাস্যা এবং যাঁহাকে তাঁহারা জগৎকারণ পরব্রহ্ম বলেন, তাঁহারা বলেন—তিনি হইতেছেন শিব-শক্তি। ইহাও বেদবিরোধী অভিমত। যে-হেতু, বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র অনুসারে বেদকথিত পরব্রহ্মই হইতেছেন জগৎ-কারণ, ব্যাসদেবও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈদিক শাস্ত্রানুসারে শিবশক্তি হইতেছেন বৈদিক শিবের কান্তাশক্তি দুর্গা—যাঁহার নামান্তর হইতেছে চণ্ডী, চণ্ডিকা, গৌরী, কাত্যায়নী, কালী, কালিকা, চামুণ্ডা, পার্বতী, ভগবতী, ভদ্রকালী-প্রভৃতি। শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে তিনি হইতেছেন পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি শ্রীরাধার অংশ। শ্রীরাধা-প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ॥ —মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত 'সিদ্ধান্তরত্ন'-নামক গ্রন্থের ২।২২-অনুচ্ছেদে ধৃত অথর্ববেদান্তর্গত পুরুষবোধিনী-শ্রুতি॥" পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়, নারদের নিকটে শ্রীশিব বলিয়াছেন "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥ ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ। তৎকলাকোটি-কোট্যাংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ॥ সা তু সাক্ষান্ মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম॥ প. পু. পা.॥ ৫০।৫৩-৫৫॥"

"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।"-এই ২।২।৩৭-ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (তান্ত্রিক) শৈবমত খণ্ডন করিয়া ২।২।৪২-ব্রহ্মসূত্রের উপক্রমে গোবিন্দভাষ্যকার বলিয়াছেন—"অথ শক্তিবাদং দূষয়তি। সার্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পাদিগুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ সম্ভবেন্ন বেতি বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তিঃ সম্ভবেদিতি প্রাপ্তে প্রতিচষ্টে 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ২।২।৪২ ব্র. সূ.।" তাৎপর্য—অতঃপর শক্তিবাদের দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। শাক্তদিগের মতে শক্তি সর্বজ্ঞতা-সত্যসঙ্কল্পতাদি গুণবিশিষ্টা, তাঁহা হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। ইহা সম্ভব, বা অসম্ভব, তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত, 'তাদৃশী শক্তিদ্বারাই বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব'-পূর্বপক্ষীয়দের (অর্থাৎ শাক্তদের) এই সিদ্ধান্তের নিরসনের নিমিত্ত ব্যাসদেব 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ'—এই ২।২।৪২-ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।" এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—"ইহাপি বেদবিরোধাদনুমানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া—শক্তিবাদও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া কেবলমাত্র অনুমানের দ্বারাই শক্তির জগৎ-কারণত্ব কল্পনা করিতে হয়।" তাহার পরে ঐ ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—কেবলমাত্র শক্তি হইতে বিশ্বের উদ্ভব সম্ভব নহে, শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পুরুষকর্তৃক অনুগৃহীতা শক্তিই কর্ত্রী, এইরূপ মনে করিলেও শক্তিবাদের দোষের নিরসন হয় না। তাহা

দেখাইবার নিমিত্তই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"ন চ কর্তুঃ করণম্ ॥ ২।২।৪৩ ॥" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে—শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ স্বীকৃত হইলেও, তাঁহারও বিশ্বোৎপত্তির উপযোগী করণ বা ইন্দ্রিয় নাই, (শাক্তমতে মূল পরতত্ত্ব হইতেছেন নিরাকার, নির্বিশেষ), সুতরাং তাঁহার অনুগ্রহও উপপন্ন হয় না। যদি বলা যায়, সেই পুরুষ হইতেছেন—নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণসম্পন্ন, তাহা হইলে শাক্তবাদই টিকিতে পারে না। "বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ২।২।৪৪-ব্রহ্মসূত্র ॥" এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—"তস্য পুরুষস্য নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি চেৎ তর্হি তদপ্রতিষেধঃ ব্রহ্মবাদান্তর্ভাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাৎ বিশ্বসৃষ্ট্যঙ্গীকারাৎ ॥" অর্থাৎ সেই পুরুষের নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকরণাদি যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা তো বেদান্তের ব্রহ্মকারণবাদের অন্তর্ভুক্তই হইয়া পড়ে। তাদৃশ পুরুষ হইতে বিশ্বসৃষ্টি স্বীকৃত হওয়ায় শক্তি-কারণবাদ আর টিকিতে পারে না।

এই ২।২।৪৪-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের পরে, পরবর্তীসূত্রের উপক্রমে গোবিন্দভাষ্য বলিয়াছেন—"শক্তি-মাত্রকারণতাবাদস্তু নিঃশ্রেয়সকামৈরণাদরণীয় এবেত্যুপসংহরতি ॥ —যাঁহারা নিঃশ্রেয়সকামী (মুক্তিকামী), তাঁহাদের নিকটে শক্তিমাত্র-কারণতাবাদ যে অনাদরণীয়ই, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই দ্বিতীয় পাদের উপসংহার-সূত্রে ব্যাসদেব তাহা বলিয়াছেন। এই উপসংহার-সূত্রটি হইতেছে—"বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ২।২।৪৫ ॥" এই ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে বলা হইয়াছে—"সর্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাৎতুচ্ছঃ শক্তিবাদঃ। 'শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্। বদন্তি তদ্‌বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্ন চাধম' ইতি হি স্মৃতিঃ। চ-শব্দে-নোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি হেতুঃ সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবর্ত্মনাং দোষকণ্টকবৈশিষ্ট্যাৎ তদ্‌রহিতং বেদান্তবর্ত্মৈব শ্রেয়োঽর্থিভিরা স্থেয়মিতি ॥" তাৎপর্য—সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া শক্তিবাদ তুচ্ছ। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—শ্রুতি, স্মৃতি এবং যুক্তি ঈশ্বরকেই পরতত্ত্ব বলেন। যে ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধ কথা বলেন, তাঁহা অপেক্ষা অধম কেহ নাই। এই স্মৃতিবাক্যে চ-শব্দদ্বারা 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ'—এই ব্রহ্মসূত্র-কথিত হেতু সমুচ্চিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা শ্রেয়ঃকামী, দোষরূপ-কণ্টকবিশিষ্ট সাংখ্যাদি পন্থা পরিত্যাগপূর্বক দোষরহিত বেদান্তমার্গই তাঁহাদের অবলম্বনীয়।

এই প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক উল্লেখযোগ্য। পাষণ্ড-শব্দ-প্রসঙ্গে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডের ৪২ অধ্যায় হইতে দেবীর নিকটে সদাশিবের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম উক্তিটি হইতেছে—"যেঽন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞান-মোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগদ্‌বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ —অজ্ঞানমোহিত যে-সকল লোক জগদ্‌বন্দ্য নারায়ণব্যতীত অন্য দেবতাকে পরতত্ত্ব বলেন, তাঁহারা পাষণ্ডী।"

যাহা হউক, উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্র-সমূহের ভাষ্যে শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্যও শক্তি-কারণবাদের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

ক। তান্ত্রিকী কালী বৈদিকী দেবতা নহেন

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় বিবেচ্য। তান্ত্রিকগণ যে-শক্তিকে জগৎ-কারণ বলেন এবং তাঁহারা যে-শক্তির উপাসনা করেন, সেই শক্তি হইতেছেন—"কালী"। তিনি শিবের শক্তি বা কান্তা। এই কালী-

সম্বন্ধে "কালীতন্ত্র" বলিয়াছেন—"শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্ ॥ শিবাভির্ঘোরারাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্। —তন্ত্রসারধৃত কালীতন্ত্রম্ ॥ —শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥" —এই কালী শবরূপ মহাদেবের হৃদয়ের উপরে সংস্থিতা, তাঁহার চতুর্দিকে ঘোর-শব্দকারিণী বহু শিবা (শৃগাল) বিরাজিতা এবং তিনি মহাকালের সহিত বিপরীত-সম্ভোগাতুরা।

পূর্বে বলা হইয়াছে, বৈদিকী দুর্গাদেবীরও একটি নাম কালী। বেদানুগত মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যেও দেবীকে বহুস্থলে "কালী" বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই বৈদিকী কালী যে কখনও স্বীয় পতি শিবের বক্ষের উপরে দণ্ডায়মানা হয়েন, তাহা বেদানুগত কোনও গ্রন্থেই বলা হয় নাই। তান্ত্রিকেরাও ইহার সমর্থনে বেদানুগত কোনও শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করেন নাই। ইহা কেবল শাক্ততন্ত্রেরই অভিমত—যে শাক্ততন্ত্রের উদ্ভব বাংলা দেশেই হইয়াছে বলিয়া স্বামী জগদীশ্বরানন্দ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তান্ত্রিকদের কালী যে বৈদিকী দেবতা নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তান্ত্রিকদের একটি পদ্ধতি হইতেও তাহা জানা যায়। সেই পদ্ধতিটির কথা বলা হইতেছে। শ্রীদুর্গা হইতেছেন বৈদিকী দেবতা। বেদানুগত পুরাণে দুর্গার রূপ এবং পূজাপদ্ধতির কথা বলা হইয়াছে। জনৈক তান্ত্রিক "তন্ত্রসম্রাট্" জানাইলেন—তান্ত্রিকেরাও পুরাণের অনুসরণেই দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কালীর পূজা করেন তন্ত্রমতে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, বেদানুগত কোনও পুরাণেই তান্ত্রিকদের কালীর রূপ এবং পূজাপদ্ধতি কথিত হয় নাই ; কথিত হইলে দুর্গাপূজার ন্যায়, কালীপূজাও তান্ত্রিকেরা পুরাণমতেই করিতেন। তান্ত্রিকী কালী যে বৈদিকী দেবতা নহেন, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুনা যায়, অধুনা কোনও কোনও তান্ত্রিক দুর্গাপূজাতে তান্ত্রিক আচার অনুপ্রবিষ্ট করিয়া থাকেন।

তান্ত্রিকদের কালী হইতেছেন দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা—সর্বপ্রথমোক্তা মহাবিদ্যা। স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর চণ্ডীভূমিকা হইতে পূর্বে যাহা উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে, তদনুসারে জানা যায়, এই দশ মহাবিদ্যা এবং তদন্তর্গত কালীও হইতেছেন বেদবিরোধী বৌদ্ধদের কল্পিত এবং কালীর মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত। বৌদ্ধেরা বেদবিরোধী বলিয়া তাঁহাদের কল্পিত "কালী"—যিনি হিন্দু তান্ত্রিকদের উপাস্যা, সেই "কালী"—যে বৈদিকী দেবতা নহেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধতন্ত্রের আনুগত্যে বাংলাদেশে যে-সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে-সমস্তে কালীর প্রসঙ্গেরই প্রাধান্য। সুতরাং সে-সমস্তত্ন্ত্রও যে অবৈদিক এবং বেদবিরুদ্ধ, তাহাও জানা যায়। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার "শাক্তপদাবলীর" ২৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কালী" হইতেছেন "বিশুদ্ধ তান্ত্রিক দেবী।", অর্থাৎ ইনি একমাত্র তান্ত্রিকদেরই কল্পিত, বৈদিক গ্রন্থে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ-রচিত পূর্বকথিত "তন্ত্রপরিচয়"-নামক গ্রন্থের নিবেদনে সপ্ততীর্থ-মহাশয় লিখিয়াছেন—"তন্ত্রশাস্ত্রও ভারতভূমিতে শ্রুতির পাশাপাশিই চলিতেছে (ক-পৃষ্ঠা।", "ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদি শ্রুতির ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক কিছু পাওয়া যাইবে (খ-পৃষ্ঠা)।" তন্ত্রশাস্ত্র যে শ্রুতির অঙ্গ বা শ্রুতির বা বেদের অনুগত, সপ্ততীর্থ-মহাশয় তাহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্র শ্রুতির পাশাপাশি চলিতেছে এবং শ্রুতির ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রেও অনেক কিছু পাওয়া যাইবে। শ্রুতিতে যেমন ক্রিয়াকাণ্ড ও মোক্ষসম্বন্ধে অনেক কথা আছে, তন্ত্রগ্রন্থেও তেমনি অনেক কথা থাকিলেও শ্রুতি ও

তন্ত্র এক এবং অভিন্ন হইয়া যায় না। মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় শ্রুতিতে যেরূপ কথিত হইয়াছে, তন্ত্রগ্রন্থে সে-রূপ কথিত হয় নাই। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে স্থলবিশেষে শ্রুতির সহিত তন্ত্রের ভেদ না থাকিলেও উপায় এবং উপেয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভেদ বর্তমান। ইহা হইতেও জানা যায়, তন্ত্র বেদানুগত নহে, বরং বেদবিরোধী।

অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তি-মহোদয় তাঁহার পূর্বকথিত "শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা"-গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"ভারতীয় সংস্কৃতিতে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। 'দৈব আসুর এব চ', 'বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব'। একটি দৈব বা বৈদিক, অপরটি আসুর বা তান্ত্রিক। একটি পুরুষ-প্রধান, অপরটি মাতৃ-প্রধান। আর্যসমাজ পুরুষ-কেন্দ্রিক, তাঁহাদের প্রধান দেবতা পুরুষ। অতএব অপর ধারাটি আর্য ভিন্ন অন্য জাতির।" শাক্ততন্ত্র যে অবৈদিক, অধ্যাপক চক্রবর্তী তাহা পরিষ্কারভাবেই বলিয়া গিয়াছেন।

গোবরডাঙ্গা হিন্দুকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য-মহোদয় তাঁহার "শাক্ত পদাবলী"-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"পরমার্থলাভের যে কোন পন্থাই তন্ত্রের পন্থা নহে। শিব ও শক্তিসম্বন্ধীয় উপাসনা-বিধিকেই তন্ত্র বলা হইয়া থাকে॥ ২২ পৃষ্ঠা॥", "তান্ত্রিক উপাসনা-পদ্ধতি কোন্ যুগ হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। প্রাচীন শ্রুতি-সংহিতায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাতে তন্ত্রের উল্লেখ নাই। পুরাণাদিতেও তন্ত্র সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। তন্ত্রোক্ত মারণ-উচাটন-বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তন্ত্রের অন্যান্য প্রধান লক্ষণগুলি তাহাতে পাওয়া যায় না। কাজেই তন্ত্রশাস্ত্রকে[১] প্রাচীন আর্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড় ইত্যাদি জাতিদের মধ্যে তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচার প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। অনেকের ধারণা, আর্যগণ তাহা গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। তান্ত্রিকেরা অবশ্য মনে করেন যে, সমস্ত তন্ত্রানুষ্ঠানই বৈদিক এবং বেদ হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা বেদমূলক, তাহাই অভ্রান্ত, এইরূপ ধারণার বশেই তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। বৈদিক সংস্কৃতি সর্বোত্তম সভ্যতার নিদর্শন, এই মনোভাবও তাঁহাদের উপরি-উক্ত ধারণার মূলে রহিয়াছে। এজন্যই তাঁহারা ইহাকে আগমশাস্ত্র—বেদের শাখা বলিয়া থাকেন (২৩-পৃষ্ঠা)।", "তন্ত্র বেদমূলক কিনা, এই সম্পর্কে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, তন্ত্রের মধ্যে যে আর্য ও অনার্য ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তান্ত্রিকগণই জগন্মাতা দেবী কালিকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন (১০ পৃষ্ঠা)।" তাঁহার গ্রন্থের ৩-৫ পৃষ্ঠায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, শক্তি-উপাসনা মাতৃ-তান্ত্রিক অনার্যদের পরিকল্পিত। বৈদিক যুগে ভারতবাসীর আর্য ও অনার্য—এই দুইটি বিভাগ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল এবং অনার্যেরা আর্যদের বিদ্বেষ ও কুৎসার পাত্র ছিলেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁহার 'শাক্তপদাবলী'-গ্রন্থের ২৪-পৃষ্ঠায় আরও লিখিয়াছেন—"মহানির্বাণতন্ত্র বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে তন্ত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, কালক্রমে মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য-সাধনে অসমর্থ, কলিতে

---

(১) 'তন্ত্র'-শব্দে অধ্যাপক ভট্টাচার্য শিব ও শক্তি-সম্বন্ধীয় সাধন-পন্থাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

বৈদিক মন্ত্রসমূহও প্রায় সেইরূপ। বন্ধ্যা স্ত্রীর যেমন সন্তান হয় না, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রদ্বারা কার্য করিলে তাহা পণ্ডশ্রম হয়, কোন ফলসিদ্ধি হয় না। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে-ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্বোধের মত তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ। ইহা জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কার্যেই প্রশস্ত। এই উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তন্ত্র বেদমূলক নহে।"

যাহা হউক, উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, তন্ত্রশাস্ত্রকে আর্যশাস্ত্র (অর্থাৎ বেদানুগত শাস্ত্র) বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তান্ত্রিকগণ তাহাকে বেদানুগত বলিয়া মনে করেন মাত্র; কিন্তু তাহা যে বেদানুগত নহে, শ্রুতি-সংহিতার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাহা দেখাইয়াছেন। তন্ত্র যে বেদমূলক নহে, তাহাও বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, তান্ত্রিকদের দশমহাবিদ্যার উল্লেখ এবং বিবরণ কোনও বেদানুগত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তান্ত্রিকদের 'মুণ্ডমালাতন্ত্রেই' দশমহাবিদ্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয় (তন্ত্রসার। ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বোধ হয় বৌদ্ধতন্ত্রের দশ মহাবিদ্যাই 'মুণ্ডমালাতন্ত্রে' স্থান পাইয়াছেন।

তন্ত্রসার গ্রন্থ (১৪ পৃষ্ঠা) হইতে জানা যায়, 'মালিনীবিজয় তন্ত্র'মতে মহাবিদ্যা হইতেছেন দ্বাদশাধিক; যথা—কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, ও শৈলবাসিনী ইত্যাদি। তান্ত্রিকদের 'সিদ্ধযামল'-মতে মহাবিদ্যা শতলক্ষ। "শতলক্ষ মহাবিদ্যা তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে।" ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন দশমহাবিদ্যা (অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা' গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৬৩। তান্ত্রিক পীঠস্থান

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে আর একটি বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকায় (২৫-পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—"অধিকসংখ্যক পীঠস্থানগুলি বঙ্গভূমিতেই অবস্থিত।"

তান্ত্রিক শাক্তদের মতে ৫১টি পীঠস্থান আছে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা যায়, 'তন্ত্রচূড়ামণি'-নামক তন্ত্রগ্রন্থে এই একান্নটী পীঠস্থানের বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শব্দকল্পদ্রুম আরও লিখিয়াছেন—"অন্যানি পীঠাদীনি কালীপুরাণে ১০।৫০।৬১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্যানি।"

বেদানুগত পুরাণ-উপপুরাণের তালিকায় কালীপুরাণের নাম দৃষ্ট হয় না। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের চণ্ডীভূমিকা (১৯ পৃষ্ঠা) হইতে জানা যায়, নারায়ণদেব বাংলা-ভাষায় এক "কালিকাপুরাণ" রচনা করিয়াছিলেন। শব্দকল্পদ্রুম-কথিত "কালীপুরাণ"-ও বোধ হয় কোনও তান্ত্রিকেরই রচিত।

যাহা হউক, বেদানুগত কোনও গ্রন্থে একান্ন পীঠের কথা দৃষ্ট হয় না। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার চণ্ডীভূমিকায় (২২ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—"মহাভারতের একান্নটি দেবীপীঠস্থানে বা শক্তি সাধনার কেন্দ্রে চণ্ডী নিয়মিতভাবে পঠিত হয়।" এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোনও কোনও বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়াছেন, দেবীসম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ কেবল বাংলাদেশে প্রচলিত মহাভারতেই দৃষ্ট হয়। অন্য দেশে প্রচলিত মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। এমন ও হইতে পারে, বাংলাদেশের কোনও লোকই মহাভারতে এ-সমস্ত বিবরণ প্রবেশ করাইয়াছেন।

যাহা হউক, তান্ত্রিকদের মতে একান্ন পীঠের উৎপত্তির হেতু এইরূপ। শিবপত্নী ভগবতীর পিতা প্রজাপতি দক্ষ এক যজ্ঞ করিতেছিলেন ; সেই যজ্ঞে উপস্থিতির জন্য শিবের নিমন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু সেই যজ্ঞ দর্শনের নিমিত্ত ভগবতীর অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল, তিনি মহাদেবের অনুমতি চাহিলেন ; কিন্তু পাইলেন না। তখম ভয় দেখাইয়া পতির নিকট হইতে অনুমতি আদায়ের নিমিত্ত তিনি শিবের নিকটে, তান্ত্রিকদের কথিত দশমহাবিদ্যারূপে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি দক্ষের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন। কিন্তু দক্ষের আচরণাদিতে ক্ষুব্ধা হইয়া তিনি সে-স্থলে দেহত্যাগ করেন। মহাদেব তাহা জানিতে পারিয়া দেবীর শবদেহ মস্তকে বহনপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ! তখন বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া দেবীর দেহাংশ যে-যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সে-সে-স্থলই পীঠরূপে পরিণত হইয়াছে।

কোনও বেদানুগত গ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধের দ্বিতীয় হইতে সপ্তম অধ্যায়ে দক্ষের যজ্ঞসম্বন্ধীয় বিবরণ কথিত হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞে উপস্থিতির নিমিত্ত শিবের যে নিমন্ত্রণ ছিল না, পিতৃগৃহে গমনের জন্য ভগবতীর যে অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি যে শিবের অনুমতি পায়েন নাই, তাহাতে তিনি যে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতে এ-সমস্ত কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু দশমহাবিদ্যা প্রকাশের কথা বলা হয় নাই। দক্ষযজ্ঞ-স্থলে দেবী যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তিনি যে পরে হিমালয়-অঞ্চলে মেনকার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় মহাদেবকে পাইয়াছিলেন, তাহাও শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হইয়াছে। কিন্তু দেবীর শবদেহ বহনপূর্বক শিবের ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া নানাস্থানে দেবীর দেহাংশ-পতনাদির কথা ভাগবতে কিছুই নাই। শ্রীমদভাগবতের টীকাকারগণও অন্য কোনও পুরাণের বা অন্য কোনও গ্রন্থের অন্যরূপ বিবরণ তাঁহাদের টীকায় উদ্ধৃত করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, পুরাণাদি অন্য কোনও বেদানুগত গ্রন্থেই, ভাগবত-কথিত বিবরণ হইতে ভিন্ন কোনও বিবরণ নাই। একথা বলার হেতু এই যে, ভাগবতের টীকায় অনেক স্থলেই দেখা যায়, অন্য পুরাণাদির বিবরণও টীকাকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কোনও স্থলে ভাগবতের বিবরণের সহিত পার্থক্য থাকিলে তাহার সমাধানের চেষ্টাও করিয়াছেন। মহাভারতে যদি একান্ন পীঠের কথা থাকিত, তাহা হইলে টীকাকারগণ যে তাহার উল্লেখ করিতেন, তাহা স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যায়।

পূর্বকথিত সপ্ততীর্থ-মহোদয় তাঁহার "তন্ত্রপরিচয়"-নামক গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"মহাভাগবতান্তর্গত ভগবতী-গীতায় শ্রীপার্বতী-হিমালয়-সংবাদে এইরূপ অনেকগুলি বচন আছে। আরও আছে যে, মহাশক্তিই দক্ষযজ্ঞে যাত্রার কালে দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া শিবকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।" সপ্ততীর্থ-মহোদয় এই প্রসঙ্গে মহাভাগবতোক্ত ভগবতী-গীতার কথাই বলিয়াছেন, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, বা অন্য কোনও গ্রন্থের কথা বলেন নাই। তাঁহার কথিত "মহাভাগবত"-গ্রন্থের পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। বেদানুগত পুরাণ-উপপুরাণাদির তালিকায় "মহাভাগবত"-নামক কোনও গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা বোধ হয়, কালীপুরাণের ন্যায়, তান্ত্রিকদের রচিত কোনও গ্রন্থই হইবে। এইরূপ অনুমানের হেতু এই যে, উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে সপ্ততীর্থ-মহোদয় লিখিয়াছেন—"মহাভাগবতান্তর্গত ভগবতী-গীতায় * * এইরূপ অনেকগুলি বচন আছে।" এই উক্তির পূর্বে তিনি "পিচ্ছিলা তন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, নবরত্নেশ্বর, সুপ্রভেদতন্ত্র" প্রভৃতি হইতে কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই বচনগুলির অনুরূপ বচনই যে মহাভাগবতের অন্তর্গত ভগবতী-গীতাতে

আছে, তাহাই তিনি বলিয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত তন্ত্রবচনগুলির সহিত বৈদিক শাস্ত্রের সঙ্গতি নাই ; সুতরাং সে সকল তন্ত্রগ্রন্থ তান্ত্রিকদের রচিত হওয়ারই সম্ভাবনা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। দশমহাবিদ্যা যে বেদবিরোধী বৌদ্ধদের কল্পিত, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং দশমহাবিদ্যার প্রসঙ্গ কোনও বেদানুগত গ্রন্থে থাকার সম্ভাবনাই নাই। বেদানুগত কোনও সাধকসম্প্রদায়ে দশমহাবিদ্যার পূজাদির প্রথাও দৃষ্ট হয় না।

দশমহাবিদ্যার সহিত একান্ন পীঠের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। যেহেতু, তান্ত্রিকদের মতে দশমহাবিদ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াই ভগবতী দক্ষালয়ে গমন করিয়া দেহত্যাগ করেন এবং দেবীর শবদেহ-বহনপূর্বক শিব যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত শবদেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানগুলিকে পীঠস্থানে পরিণত করে। এইরূপ বিবরণ কোনও বৌদ্ধতন্ত্রে আছে কিনা জানিনা। সম্ভবতঃ হিন্দুতান্ত্রিকেরাই পৌরাণিক বিবরণকে উপলক্ষ্য করিয়া, সেই বিবরণের সহিত নিজেদের কল্পিত কতকগুলি বিবরণ সংযোজিত করিয়া, দশমহাবিদ্যার উৎপত্তির হেতু এবং সেই প্রসঙ্গে একান্ন পীঠের বিবরণও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের চেষ্টাতেই নানাস্থানে পীঠস্থানও স্থাপিত অথবা কল্পিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিবরণটি এইরূপ অনুমানের অনুকূল বলিয়া মনে হয়।

ক। শ্রীক্ষেত্রকে পীঠস্থানরূপে কল্পনা

তন্ত্রচূড়ামণি-নামক গ্রন্থে একান্ন পীঠের বিবরণ কথিত হইয়াছে। তাহাতে একটি পীঠস্থান-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"উৎকলে নাভিদেশশ্চবিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে। বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥"—অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে দেবীর নাভিদেশ পতিত হইয়াছে, সেজন্য তাহা একটি পীঠস্থান। এই পীঠস্থানে জগন্নাথ হইতেছেন ভৈরব (অর্থাৎ মহাদেব) এবং বিমলাদেবী হইতেছেন মহাদেবী বা ভৈরবী। তান্ত্রিকদের মতে, প্রতি পীঠস্থানেই ভৈরবরূপে মহাদেব এবং ভৈরবীরূপে মহাদেবী বিরাজিত।

এই প্রসঙ্গে নিবেদন এই। ঋগ্‌বেদে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের উল্লেখ আছে। যথা –"অদো যদ্‌দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১০।১৫৫।৩॥" এই মন্ত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ সায়নাচার্য লিখিয়াছেন—"অদো বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানমপুরুষং নির্মাত্রা পুরুষেণ রহিতং যদ্‌দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং সিন্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরে প্লবতি জলস্যোপরি বর্ততে, তদ্‌দারু হে দুর্হণো দুঃখেন হননীয় কেনাপি হন্তুমশক্য হে স্তোত্রারা রভস্ব অবলম্বস্ব উপাস্স্বেত্যর্থঃ। তেন দারুময়েন দেবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছ।" এ-স্থলে দারুব্রহ্মের (শ্রীজগন্নাথের) উপাসনায় উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-লোক প্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে, শিবলোক প্রাপ্তির কথা বলা হয় নাই। "বৈষ্ণব-লোক" হইতেছে "বিষ্ণু-সম্বন্ধী লোক বা বিষ্ণুলোক।" সুতরাং পুরুষোত্তমাখ্য দারুব্রহ্ম (শ্রীজগন্নাথ) যে বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১৩-৯২ পয়ারসমূহে বেদানুগত স্কন্দপুরাণের একটি বিবরণ কথিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, শ্রীশিব পার্বতীর সহিত বহুকাল কাশীতে বাস করিয়া এক সময়ে কৈলাসে গিয়াছিলেন। কাশীরাজ-নামে কাশীর এক রাজার দুর্বুদ্ধি জন্মিল ; তিনি কৃষ্ণকে পরাজিত

করার নিমিত্ত শিব-পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীশিব রাজাকে দর্শন দিয়া বলিলেন "বর মাগ"। তখন রাজা বলিলেন—"এক বর মাগোঁ প্রভু তোমার চরণে। যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারেঁা রণে।" ভোলানাথের চরিত্র বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। তিনি রাজাকে বলিলেন—"তুমি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমার গণের সহিত আমি আমার পাশুপত অস্ত্র লইয়া তোমার পশ্চাতে থাকিব।" রাজা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন, শিবও চলিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রের প্রভাবে কাশীরাজ নিহত হইলেন, তাঁহার পুরী কাশীও ভস্মীভূত হইল। তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ শিব তাঁহার পাশুপত-অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ; কিন্তু সুদর্শনের তেজ দেখিয়া পাশুপত অস্ত্র পলায়ন করিল। সুদর্শন তখন শিবের দিকে অগ্রসর হইলে শিব ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। শেষকালে শিব বুঝিতে পারিলেন, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত সুদর্শন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চক্রতেজ সম্বরণ করিয়া শিবকে দর্শন দিলেন এবং শিবের আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া কিছু তিরস্কারও করিলেন। ভীত হইয়া শিব নিজের দৈন্য প্রকাশ করিলেন এবং অবশেষে বলিলেন—"এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিমু কোথায়। তোমা বই আর বা বলিব কার পায়।" শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীশিবকে বলিলেন—"সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল-নাম। ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতিরম্য স্থান॥" এবং "সেই স্থানে আমার আছয়ে গোপ্যপুরী।" শ্রীকৃষ্ণ শিবকে বলিলেন—আমার সেই গোপ্যপুরী শ্রীক্ষেত্রের উত্তর দিকে একাম্রবন-নামে এক দিব্যস্থান আছে। তুমি "সর্বগোষ্ঠীসহ তথা করহ প্রয়াণ॥ একাম্রবন-নাম—স্থান মনোহর। তথাই হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর॥ সেহো বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী।" তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীক্ষেত্রের মহিমা বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া শ্রীশিব শ্রীক্ষেত্রে বাসের অনুমতি চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"শুন শিব! তুমি মোর নিজদেহ সম। যে তোমার প্রিয়, সে আমার প্রিয়তম॥ যথা তুমি তথা আমি, ইথে নাহি আন। সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান॥ ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্বথা আমার। সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ অধিকার॥ একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি। তাহাতেই পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি॥ সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয়তম। মোর প্রীতে তথাই থাকিবে সর্বক্ষণ॥" এইরূপে শ্রীশিব একাম্রবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ভুবনেশ্বরেরই অপর বা প্রাচীন নাম একাম্রবন।

স্কন্দপুরাণের উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—শ্রীক্ষেত্রের দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণই, শিব নহেন। সুদর্শন চক্র হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য শ্রীশিব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া স্তব-স্তুতি করিয়া সর্বশেষে বলিয়াছিলেন—"দোষ ক্ষমা কর প্রভু লইলুঁ শরণ॥" তখন "শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীবনাথ। চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাত॥ চতুর্দ্দিগে শোভা করে গোপগোপীগণ। কিছু ক্রোধহাস্য-মুখে বোলেন বচন॥" এই গোপগোপীবেষ্টিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীজগন্নাথরূপে শ্রীক্ষেত্রে বিরাজিত এবং সে-স্থানে তিনি সেই গোপগোপীদের সহিতই গোপ্য-লীলা করিয়া থাকেন। এজন্যই তিনি শ্রীশিবের নিকট বলিয়াছেন—সেই "স্থানে আমার আছয়ে গোপ্যপুরী।" বেদানুগত শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"মথুরা-দ্বারকালীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে। নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ॥ —মথুরা, দ্বারকা এবং গোকুলে যে-সমস্ত লীলা করেন, নীলাচলস্থিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণও সে-সমস্ত লীলা করেন।" এইরূপে দেখা গেল,

নীলাচলস্থিত শ্রীজগন্নাথের স্বরূপ-তত্ত্বসম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত ঋগ্‌বাক্যের সহিত স্কন্দ পুরাণে কথিত বিবরণের কিঞ্চিন্মাত্রও বিরোধ নাই। বিরোধের সম্ভাবনাও নাই; যেহেতু, স্কন্দ পুরাণ হইতেছে বেদানুগত একটি মহাপুরাণ। এখন পর্যন্তও শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রেই শ্রীজগন্নাথের সেবা-পূজাদি হইয়া থাকে, কখনও শিবমন্ত্রে বা তান্ত্রিক ভৈরব-মন্ত্রে হয় না। এতাদৃশ জগন্নাথরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই তান্ত্রিকেরা ভৈরব (তান্ত্রিক শিব) আখ্যা দিয়াছেন এবং শ্রীজগন্নাথের অধিষ্ঠানক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রকে একটি তান্ত্রিক পীঠস্থান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন!

শ্রীকৃষ্ণকেই যাঁহারা তান্ত্রিক ভৈরব এবং তাঁহার অধিষ্ঠানক্ষেত্রকে একটি তান্ত্রিক পীঠস্থান বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, কোনও কোনও স্থলে হয়তো পূর্ব হইতেই অধিষ্ঠিত বৈদিক শিবকে এবং বৈদিকী দেবীকে, তান্ত্রিকী ভৈরব এবং তান্ত্রিক ভৈরবী এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্রকে তান্ত্রিক পীঠস্থান বলিয়া ঘোষণা করা, তাঁহাদের পক্ষে আরও সহজ। সুযোগমত সে-সকল স্থানের সেবাপূজাদির ভার আয়ত্ত করিতে পারিলে তো কথাই নাই। কোনও কোনও স্থলে নূতনভাবে তান্ত্রিক ভৈরব ও ভৈরবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্তৎস্থানকে তান্ত্রিক পীঠস্থানরূপে ঘোষণা করাও অসম্ভব নয়। উল্লিখিতরূপ ব্যাপারসমূহের ন্যায় ব্যাপার যে কোনও স্থলে হয় নাই, তাহা কেহ সন্দেহাতীতভাবে বলিতে পারিবেন কিনা, জানি না।

খ। দেবীভাগবত-সম্বন্ধে আলোচনা

'দেবীভাগবত'-নামক একখানি গ্রন্থে, দেবীর শবদেহ স্কন্ধে বহনপূর্বক শিবের ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া দেবীদেহের অংশ-সমূহের নানাস্থানে পতনের বিবরণ এবং সেই সকল স্থান পীঠস্থানরূপে পরিণত হওয়ার বিবরণ দৃষ্ট হয় (দেবীভাগবত॥ ৭।৩০।৪২-৪৭॥" এই গ্রন্থে পীঠের বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে (৭।৩০।৫৩-৮৪)। কিন্তু এ-স্থলে একশত আটটি পীঠস্থানের কথাই বলা হইয়াছে। ভগবতীর দশমহাবিদ্যারূপ ধারণের কথা এই দেবীভাগবতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই 'দেবীভাগবত' হইতেছে একখানি শাক্ততন্ত্র-গ্রন্থ, বৈদিক গ্রন্থ নহে। বেদানুগত পুরাণ উপপুরাণের তালিকায় ইহার নামও দৃষ্ট হয় না। ইহা যে একখানি শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থ, এই গ্রন্থের মধ্যেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। বিস্তৃত আলোচনা এ-স্থলে সম্ভবপর নহে, সংক্ষেপে কিছু বলা হইতেছে।

তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের উক্তির উল্লেখপূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বেদানুগত আর্য-জাতির প্রধান দেবতা পুরুষ, বেদ এবং বেদানুগত গ্রন্থসমূহেও পুরুষ-দেবতারই প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। কিন্তু আর্যেতর জাতির প্রধান দেবতা হইতেছেন স্ত্রী-দেবতা, তাঁহারাই মাতৃ-উপাসনার আদি প্রবর্তক। এই আর্যেতর বা অনার্য জাতির পরিকল্পিত মাতৃ-তন্ত্রই হিন্দুতান্ত্রিকগণ গ্রহণ এবং পরিপুষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দু-তন্ত্রগ্রন্থেও মাতৃ-দেবতারই সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য, পুরুষ-দেবতার স্থান হীন। ইহাই হইতেছে শাক্ত-তন্ত্রের মূল লক্ষণ। 'দেবীভাগবতে' এই লক্ষণটি সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থে দেবীরই সর্বাতিশায়ী মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, দেবীই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, দেবীই পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদিও দেবীর কৃপায় তাঁহাদের কার্য করিয়া থাকেন। 'দেবীভাগবতে' দেবীর মুখে ব্যক্ত করা হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র এই

দেবীই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না, এবং তাঁহারই নাম পরব্রহ্ম। "অহমেবাস পূর্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিন্নগাধিপ। তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥ ৭৷৩২৷২ ॥" সমস্তশাস্ত্রে তাঁহাকেই সর্বকারণ-কারণ বলা হইয়াছে, তিনিই তত্ত্বসমূহের আদিভূত এবং তিনি হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। "প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণ-কারণম্। তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৭৷৩২৷২৫ ॥"

এ-সমস্ত হইতেছে বেদবিরুদ্ধ-কথা এবং শাক্ত-তন্ত্রের কথা। সুতরাং 'দেবীভাগবত' যে বৈদিক গ্রন্থ নহে, পরন্তু শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থ তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

'দেবীভাগবতের' প্রথম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায় হইতে জানা যায়, দেবী বিষ্ণুকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, বিষ্ণু তাহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মা তাহা নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন। তদনুসারেই ব্যাসদেব দ্বাদশস্কন্ধে সমন্বিত এই 'দেবীভাগবত' প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়, ব্যাসদেব তাঁহার পুত্র শুকদেবকে এই দেবীভাগবতই অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন (১৷৩৷৩৬)। শুকদেবের অধ্যয়ন-কালে সূতগোস্বামীও সে-স্থানে ছিলেন, তিনিও দেবীভাগবতের তত্ত্ব অবগত হইয়া নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে তাহা বর্ণন করিয়াছেন (১৷২৷৩-৪)।

এই সমস্তই হইতেছে ব্যাসদেব-কথিত পুরাণেতিহাসের বিরুদ্ধ উক্তি। দেবীভাগবতের লেখক এ-উক্তিদ্বারা লোককে জানাইতে চাহিয়াছেন—দেবীভাগবত ব্যাসদেবেরই লিখিত। কিন্তু ব্যাসদেব যে কোনও শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণই নাই। তিনি তাঁহার কথিত পুরাণেতিহাসে দেবীর মাহাত্ম্যাতিশয্যের কথাও বলেন নাই, দেবীই যে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, দেবীই যে পরব্রহ্ম, ব্যাসদেব কোনও স্থলেই তাহা বলেন নাই। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বরং তিনি উক্তরূপ মতের খণ্ডনই করিয়াছেন।

প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, কোনও শাক্ত-তান্ত্রিকই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের গুরুত্ব-খ্যাপনের জন্য ব্যাসদেবের লিখিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এতাদৃশ কোন তান্ত্রিক পণ্ডিতই যে মহাভারতাদি গ্রন্থে দেবীসম্বন্ধে অনেক আখ্যান অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে।

রাবণবধের নিমিত্ত নারদের উপদেশে এবং পৌরোহিত্যে রামচন্দ্র যে আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, দেবীভাগবতের ৩৷৩০ অধ্যায়ে তাহাও কথিত হইয়াছে। অথচ বাল্মিকীর রামায়ণে এ-সকল কথা নাই।

কলির যুগধর্মসম্বন্ধে দেবীভাগবত বলিয়াছেন—দেবীর পদ-কমলের ধ্যান (৬৷১১৷৫৭)। ইহাও বেদানুগত-শাস্ত্রবিরোধী বাক্য।

দেবীভাগবতে বলা হইয়াছে, দেবী রমাকান্ত বিষ্ণুকে পরমার্থদ মন্ত্র দিয়াছেন (৪৷৬৷৫৯) এবং বলিয়াছেন, এই মন্ত্র জপ করিলে বিষ্ণুর মৃত্যুভয় থাকিবে না, কালপ্রভাবের ভয়ও থাকিবে না (৩৷৬৷৬০) এবং দেবী যখন সমস্ত সংহার করিবেন, তখন বিষ্ণু দেবীতে লীন হইবেন (৩৷৬৷৬১)। বিষ্ণুর মৃত্যুভয় এবং কাল-প্রভাবেব ভয়! প্রলয়কালে বিষ্ণুর দেবীতে লয়-প্রাপ্তি!! —অদ্ভুত বেদবিরুদ্ধ কথা।

আগামবাগীশ কৃষ্ণ-নন্দের 'তন্ত্রসার'-গ্রন্থে কৈলাস, সহস্রার ও বিন্দুস্থানাদি সহ ষট্‌চক্রের, কুণ্ডলিনী

শক্তির এবং ষট্‌চক্রের অবলম্বনে সাধনের এবং সেই সাধনের ফলের যে-বিবরণ দৃষ্ট হয়, দেবীভাগবতেও তাহা আছে (৭।৩৫।২৭-৬২)। এই দেবীভাগবত যে বেদবিরুদ্ধ শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থ, ইহাও তাহার একটি প্রমাণ। বেদানুগত কোনও গ্রন্থেই ষট্‌চক্রাদির অবলম্বনে তান্ত্রিকদের ন্যায় সাধনের উপদেশ দৃষ্ট হয় না এবং বেদানুগত কোনও সাধক-সম্প্রদায়েও তদ্রূপ সাধনের প্রথা দৃষ্ট হয় না।

এতাদৃশী বেদবিরুদ্ধ-উক্তি দেবীভাগবতের বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। এইরূপ বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থখানি ব্যাসদেবের রচিত বলিয়া দেবীভাগবত বলেন। দেবীভাগবতব্যতীত, ব্যাসদেবের লিখিত কোনও গ্রন্থে যদি এইরূপ উক্তির সমর্থক ইঙ্গিতও থাকিত, তাহা হইলেও দেবীভাগবতের এই উক্তিটি বিবেচনার বিষয় হইতে পারিত। কিন্তু এইরূপ ইঙ্গিত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বেদ যাঁহার স্ব-মুখোক্তি, সেই ভগবান্‌ই ব্যাসরূপে পুরাণাদি প্রকটিত করিয়াছেন বলিয়া মৎস্যপুরাণাদি হইতে জানা যায়। যাহা বেদবিরোধী, তাহা যে অধর্ম, তাহাও বেদানুগত শাস্ত্র হইতে জানা যায়, ব্যাসদেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায়, ব্যাসদেব যে বেদবিরুদ্ধ এবং বস্তুতঃ অধর্মোপদেশক তন্ত্রগ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সুধীগণের তাহা বিবেচ্য।

অথচ তান্ত্রিকেরা বলেন— দেবীভাগবতই হইতেছে বেদানুগত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'। দেবীভাগবতের একাধিক স্থলে ইহাকে 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' বলাও হইয়াছে। তান্ত্রিকদের মতে ব্যাসদেব-কথিত 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' হইতেছে উপপুরাণ, মহাপুরাণ নহে! দেবীভাগবতই হইতেছে মহাপুরাণ!! অথচ অপৌরুষের মৎস্য-বামন-পদ্ম-স্কন্দ-প্রভৃতি পুরাণে শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে-সমস্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুখ্য লক্ষণগুলিরই এই দেবীভাগবতে একান্ত অভাব।

যাহা হউক, উপরি-লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, দেবীভাগবত হইতেছে একখানি শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থ—মহাপুরাণও নহে ; পুরাণও নহে, উপপুরাণও নহে। সমস্ত শাক্ত-তন্ত্রই যখন বাংলা দেশে বিশিষ্ট তান্ত্রিক পণ্ডিতগণকর্তৃক লিখিত হইয়াছে, তখন দেবীভাগ্‌বতও বাংলাদেশেই যে কোনও তান্ত্রিক শাক্তপণ্ডিতকর্তৃক লিখিত হইয়াছে, তাহাই অনুমিত হইতে পারে।

৬৪। বৈদিক-গ্রন্থোল্লিখিত দুর্গা-কালী প্রভৃতি তান্ত্রিকী দুর্গাকালী নহেন

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বেদানুগত-শাস্ত্রে বৈদিকী দেবতা শ্রীদুর্গারও কালী, চণ্ডী, মহামায়া প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। এ-সমস্ত নামের উল্লেখ-পূর্বক তান্ত্রিকেরা বলেন—তাঁহাদের তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত দুর্গা, চণ্ডী, কালী প্রভৃতির উল্লেখ বৈদিক শাস্ত্রেও আছে। কিন্তু নামসাম্যে বস্তুসাম্য বুঝায় না। স্বর্গাধিপতি দেবরাজের নাম ইন্দ্র। লৌকিক জগতেও অনেক লোকের নাম "ইন্দ্র" আছে। কিন্তু লৌকিক জগতের ইন্দ্রনামক কোনও লোক দেবরাজ ইন্দ্র নহেন, দেবরাজ ইন্দ্রও লৌকিক জগতের ব্যক্তিবিশেষ ইন্দ্র নহেন। বৈদিক দেবতাগণের এবং তৎ-সমনামীয় তান্ত্রিক দেবতাগণের স্বরূপলক্ষণ একরূপ নহে।

৬৫। তান্ত্রিকদের কথিত মহামায়া-তত্ত্ব

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার চণ্ডীভূমিকায় (৩৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীরামপ্রসাদ একটি ব্যক্যেই মাহামায়াতত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই কালী এবং

কালীই ব্রহ্ম। যাঁহাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগণ তাঁহাকেই জগজ্জননী মহামায়ারূপে আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ।"

এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্বামী জগদীশ্বরানন্দের উক্তি অনুসারেই, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাংলাদেশে প্রচলিত চৌষট্টিটি তন্ত্র অনুসারে সাধন করিয়াছিলেন এবং শাক্ততন্ত্রের উদ্ভবও বাংলা দেশেই; সুতরাং এই তন্ত্রগুলি হইতেছে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের লিখিত। তন্ত্রগ্রন্থগুলি যে বেদবিরুদ্ধ, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন এ-সমস্ত বেদবিরুদ্ধ লৌকিক-তন্ত্রমতের তান্ত্রিক সাধক। শ্রীরামপ্রসাদও তদ্রূপই ছিলেন। কালী ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তিগুলিও বেদবিরুদ্ধ তন্ত্র-শাস্ত্রেরই কথা। তান্ত্রিকদের উপাস্যা কালী যে বৈদিকী দেবতা নহেন, পরন্তু বেদবিরোধী বৌদ্ধদের কল্পিতা দেবতা এবং তাঁহার উপাসনায় মন্ত্রাবলীও যে বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই গৃহীত হইয়াছে, স্বামীজীর উক্তির অনুসরণে তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি কিরূপে বেদকথিত ব্রহ্ম হইতে পারেন?

যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, বৈদান্তিকগণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলেন। "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—এই ব্রহ্মসূত্রের পরেই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ১।১।২ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥" এই ব্রহ্ম হইতেছেন—"বৃংহতি বৃংহয়তীতি ব্রহ্ম।"—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি এবং "আনন্দাৎ হ্যেব এতানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি এই ব্রহ্মেরই পরিচয় দিয়াছেন। এই ব্রহ্মব্যতীত সাংখ্য-পাতঞ্জল-শৈবাদি-দর্শনে কথিত জগৎকারণ যে বাস্তবিক জগৎ-কারণ নহেন, তাহাও ব্যাসদেব বিভিন্ন ব্রহ্মসূত্রে এবং ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাদি আচার্যগণ বলিয়া গিয়াছেন। "এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥"-এই ১।৪।২৮-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—উল্লিখিত ব্রহ্মব্যতীত অপরকে যাঁহারা জগৎ-কারণ বলেন, তাঁহাদের অভিমতও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া খণ্ডিত হইল। বৈদিক গ্রন্থকথিত দুর্গা বা কালীও যে জগৎ-কারণ ব্রহ্ম, কোনও বেদান্তাচার্যই একথা বলেন নাই। গোবিন্দভাষ্যকার এবং নিম্বার্কাচার্যও যে শক্তির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে, বেদবিরোধী বৌদ্ধতান্ত্রিকদের কল্পিতা এবং হিন্দু তান্ত্রিক-শাক্তদের উপাস্যা অবৈদিকী দেবতা কালী কিরূপে জগৎ-কারণ হইতে পারেন এবং এই কালী এবং বৈদান্তিকদের ব্রহ্মই বা কিরূপে এক এবং অভিন্ন হইতে পারেন? "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী" এতাদৃশী উক্তির উপরে বৈদান্তিকগণ কোনও গুরুত্বই আরোপ করিবেন না।

৬৬। মহাবিদ্যাগণের অবতার

যাহা হউক, তান্ত্রিকেরা যে তাঁহাদের মহাবিদ্যাগণের অবতারও কল্পনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৌদ্ধতান্ত্রিকদের কল্পিত কালী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা হিন্দুতান্ত্রিকদের "মুণ্ডমালা"-তন্ত্রে স্থান পাইয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতে জানা যায়, "চামুণ্ডাতন্ত্রে"ও সেই দশ মহাবিদ্যা স্থান পাইয়াছেন। মহাবিদ্যা-প্রসঙ্গে শব্দকল্পদ্রুম সর্বপ্রথমেই চামুণ্ডাতন্ত্র-কথিত দশমহাবিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার পরেই "মালিনীবিজয়তন্ত্র"-মতে কতিপয় মহাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা হইতেছেন—কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তকা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যা,

বাসলী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী ইত্যাদি (ইত্যাদ্যাঃ)। "ইত্যাদ্যাঃ"-শব্দ হইতে বুঝা যায়, উল্লিখিত ত্রয়োদশ জন মহাবিদ্যাব্যতীত আরও কয়েকজন মহাবিদ্যা আছেন।

যাহা হউক, মালিনীবিজয়তন্ত্র-কথিত মহাবিদ্যাগণের উল্লেখ করিয়াই শব্দকল্পদ্রুম বলিয়াছেন—"তাসাং দশাবতারত্বং যথা। প্রকৃতির্বিষ্ণুরূপা চ পুংরূপশ্চ মহেশ্বরঃ। এবং প্রকৃতিভেদেন ভেদাস্তু প্রকৃতের্দশ॥ কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ রামরূপা চ তারিণী। বগলা কূর্মমূর্তিঃ স্যান্ মীনো ধূমাবতী ভবেৎ॥ ছিন্নমস্তা নৃসিংহঃ স্যাদ্ বরাহশ্চৈব ভৈরবী। সুন্দরী জামদগ্ন্যঃ স্যাদ্ বামনো ভুবনেশ্বরী॥ কমলা বৌদ্ধরূপা স্যাদ্ দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী॥ স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌স্বয়ং। স্বয়ঞ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালীরূপো ভবেদ্ ব্রজে॥ ইতি মুণ্ডমালাতন্ত্রম্ (শব্দকল্পদ্রুম)॥" তাৎপর্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়—"প্রকৃতি হইতেছেন বিষ্ণুরূপা (অর্থাৎ প্রকৃতিই বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতি-শব্দের একটি অর্থ—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া; অপর এক অর্থ—নারী), মহেশ্বর হইতেছেন পুরুষ (ইহাতে বুঝা যায়—বিষ্ণুরূপধারিণী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেছেন নারী এবং মহেশ্বর বা শিব হইতেছেন পুরুষ)। এইরূপ প্রকৃতিভেদে প্রকৃতির দশটি ভেদ আছে (সেই দশটি ভেদ হইতেছে এইরূপ)—কালিকা কৃষ্ণরূপ হইয়াছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতেছেন কালিকার অবতার, তদ্রূপ রাম—তারিণীর অবতার, কূর্ম—বগলার অবতার, মীন (মৎস্য) ধূমাবতীর অবতার; নৃসিংহ—ছিন্নমস্তার অবতার, বরাহ—ভৈরবীর অবতার, জামদগ্ন্য (পরশুরাম)—সুন্দরীর অবতার, বামন—ভুবনেশ্বরীর অবতার, বুদ্ধ—কমলার অবতার, কল্কি—দুর্গার অবতার। কালী স্বয়ংভগবতী, কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ংভগবান্। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজে কালীরূপ হইয়া থাকেন।"

উল্লিখিত স্থলে "কালিকা"-কে যদি "কালী" এবং "তারিণী"-কে যদি "তারা" মনে করা যায়, তাহা হইলে কালিকা (কালী), বগলা, তারিণী (তারা), ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, কমলা ও ধূমাবতী—এই অষ্ট মহাবিদ্যার নাম পাওয়া যায়। এই অষ্টমহাবিদ্যা হইতেছেন বৌদ্ধদের কল্পিত এবং হিন্দু তান্ত্রিকদের মুণ্ডমালাতন্ত্রে ও চামুণ্ডাতন্ত্রে স্থানপ্রাপ্ত দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত অষ্টমহাবিদ্যা। এই আট জন মহাবিদ্যা হইতেছেন অবতারিণী। উপরে উদ্ধৃত প্রমাণে আরও দুই জন অবতারিণী মহাবিদ্যার নাম আছে—দুর্গা (যিনি কল্কিরূপ ধারণ করেন) এবং সুন্দরী (যিনি পরশুরামের রূপ ধারণ করেন)। ইহাদের নাম চামুণ্ডাতন্ত্রেও দৃষ্ট হয় না, মালিনীবিজয়-তন্ত্রেও দৃষ্ট হয় না। মালিনীবিজয়-তন্ত্রে "ইত্যাদ্যাঃ-"শব্দে যে আরও কতিপয় মহাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, দুর্গা এবং সুন্দরী তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে, পূর্বকথিত সপ্ততীর্থ মহোদয়ের রচিত "তন্ত্রপরিচয়"-নামক গ্রন্থের উক্তি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের ১৪-পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—"শ্রী-শব্দ দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ষোড়শীদেবীর নামান্তর। শ্রী, কামেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি ষোড়শীদেবীরই নাম।" পূর্বোল্লিখিত অবতারিণীগণের অন্তর্গত "সুন্দরী"-কে যদি "ত্রিপুরাসুন্দরী" মনে করা যায়, তাহা হইলে, ত্রিপুরাসুন্দরী ষোড়শীদেবীর নামান্তর বলিয়া, "সুন্দরী"ও হইবেন দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "ষোড়শী"। আবার, "তন্ত্রপরিচয়" হইতে "দুর্গা"-দেবীরও পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের ১৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—"নিরুত্তরতন্ত্রে শ্রী-কুল ও কালী-কুলের কয়েক জন দেবীর নাম উল্লিখিত আছে। যথা—"কালী তারা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহিষমর্দিনী। ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা॥" এই নিরুত্তরতন্ত্রে উল্লিখিত "দুর্গা"-ই বোধ হয় কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়েন।

যাহা হউক, প্রকৃতির দশটি ভেদের, অর্থাৎ দশাবতারের, কথা বলিতে যাইয়া মুণ্ডমালাতন্ত্র যে-দশটি অবতারের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন---(১) কৃষ্ণ (কালিকা বা কালী), (২) রাম (তারিণী বা তারা), (৩) কূর্ম (বগলা), (৪) মীন (ধূমাবতী), (৫) নৃসিংহ (ছিন্নমস্তা), (৬) বরাহ (ভৈরবী), (৭) পরশুরাম (সুন্দরী-যোড়শী), (৮) বামন (ভুবনেশ্বরী), (৯) বুদ্ধ (কমলা) এবং (১০) কল্কি (দুর্গা)। ইঁহারা সকলেই মহাবিদ্যার অবতার। বেদমতে অবতার হইতেছেন অবতারীর অংশ। উল্লিখিত দশ জন অবতারিণী মহাবিদ্যার মধ্যে নয় জনই যে বেদবিরোধী বৌদ্ধদের কল্পিত মহাবিদ্যা, তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। অথচ মুণ্ডমালাতন্ত্রে ইঁহাদিগকেই বেদকথিত কৃষ্ণ-রাম-মীন-নৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপগণের অবতারিণী বা অংশিনী বলা হইয়াছে এবং কৃষ্ণ-রামাদিকে তাঁহাদের অবতার—সুতরাং বেদমতে অংশ—বলা হইয়াছে। আবার এ-সমস্ত কৃষ্ণরামাদিকে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ভেদও বলা হইয়াছে। ইহাতে বেদকথিত কৃষ্ণ-রামাদির সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণ হইতেছেন কালিকার বা কালীর অবতার—সুতরাং অংশ। আবার ইহাও বলা হইয়াছে—"স্বয়ংভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" যিনি সকলের অংশী, তিনিই—যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণের ভগবত্তা, বেদমতে তিনিই স্বয়ংভগবান্। কৃষ্ণ যদি কালিকার বা কালীর অবতার বা অংশ হয়েন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে স্বয়ংভগবান্ হইতে পারেন ? আবার, কৃষ্ণ যদি স্বয়ংভগবান্ হয়েন এবং কালী যদি স্বয়ংভগবতী হয়েন, তাহা হইলে কালী হইবেন স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের কান্তা—কান্তাশক্তি। যিনি কৃষ্ণের কান্তা বা কান্তাশক্তি, তিনি কখনও কৃষ্ণনিরপেক্ষা হইতে পারেন না, এবং কৃষ্ণও তাঁহার অবতার বা অংশ হইতে পারেন না। যাহা হউক, উল্লিখিত উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই মুণ্ডমালা বলিয়াছেন—"স্বয়ঞ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালীরূপো ভবেদ্ ব্রজে—স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজে কালীরূপ হয়েন।" আবার এই প্রসঙ্গেই পূর্বে বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাৎ—কালী কৃষ্ণরূপা হয়েন।" একবার বলা হইল—কালীই কৃষ্ণ হয়েন, সুতরাং কৃষ্ণ হইলেন কালীর অংশ। আবার বলা হইল—কৃষ্ণ কালী হয়েন। এক বাক্যে কৃষ্ণ—কালীর অংশ, আর এক বাক্যে কালী—কৃষ্ণের অংশ। এই বাক্যগুলি কি পরস্পরবিরোধী নহে ? এবং মুণ্ডমালা-তন্ত্র-লেখকের ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের পরিচায়ক নহে ? বেদমতে শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ংভগবান্, তখন সমস্ত বৈদিক ভগবৎস্বরূপ এবং বৈদিকী কান্তাশক্তি—বেদকথিতা কালীও—তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং লীলানুরোধে তিনি যে-কোনও সময়েই নিজেকে যে-কোনও ভগবৎস্বরূপরূপে বা যে-কোনও কান্তাশক্তিরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। কখনও যদি তিনি কালীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন, তবে সেই কালী হইবেন বৈদিকী কালী, পতিবক্ষে দণ্ডায়মানা এবং বিপরীত-সম্ভোগাতুরা তান্ত্রিকী কালী হইবেন না।

কবি জয়দেব তাঁহার "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ"-নামক গ্রন্থে দশ অবতারের স্তব করিয়াছেন। সেই দশ অবতার হইতেছেন—মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, হলধর (বলরাম), বুদ্ধ এবং কল্কি। জয়দেব বলিয়াছেন, কেশবই এ-সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াছেন। এই কেশব যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাও তিনি বলিয়াছেন "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥ ১।১৬॥" শ্রীকৃষ্ণ যে অপর কোনও ভগবৎস্বরূপের অবতার বা অংশ, তাহা জয়দেব বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, উল্লিখিত দশ অবতার শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার—অংশ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাই কথিত হইয়াছে এবং ইহাই বেদসম্মত। মুণ্ডমালাতন্ত্রে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কালিকার বা

কালীর অবতার বা অংশ বলা হইয়াছে। ইহা বেদবিরুদ্ধ উক্তি। মুণ্ডমালাতন্ত্রে হলধরের উল্লেখ নাই। তৎস্থলে কৃষ্ণকে বসাইয়া মহাবিদ্যাদের দশ অবতার পূর্ণ করা হইয়াছে।

এ-স্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অবতার ও অবতারীর গুণ-মহিমাদিসম্বন্ধে বেদমত এবং তন্ত্রমত এক রকম নহে। বেদমতে গুণমহিমাদিতে অবতার ও অবতারীর পার্থক্য আছে, কিন্তু তন্ত্রমতে তাহা নাই। তন্ত্রমতে অবতার ও অবতারী সম্যক্‌রূপে অভিন্ন। কিন্তু সম্যক্‌রূপে অভিন্ন হইলে রূপ-ভেদ কেন এবং লীলাভেদই বা কেন? কালী কৃষ্ণরূপে রাসলীলা করেন, কালীরূপে করেন না কেন?

পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্বামী জগদীশ্বরানন্দের মতে বাংলাদেশেই শাক্ত-তন্ত্রের উদ্ভব। তাঁহার চণ্ডীভূমিকার উক্তির আলোচনায় ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বাংলাদেশে রচিত তন্ত্রগ্রন্থগুলির ভিত্তিও বাংলাদেশে সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৌদ্ধতন্ত্রই। স্বামীজী নিজেই, চণ্ডীভূমিকার ১০ম পৃষ্ঠায়, লিখিয়াছেন, বৌদ্ধদের প্রাচীনতম তন্ত্রগ্রন্থ হইতেছে দুইখানি—মূলকল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র, যথাক্রমে খৃষ্টীয় ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত। বৌদ্ধদের সাধনমালা-নামক যে তন্ত্রগ্রন্থে দশমহাবিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে প্রাচীনতম তন্ত্রগ্রন্থদ্বয়ের পরবর্তী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ-সমস্ত বৌদ্ধতন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া অন্য যে-সকল তন্ত্র রচিত হইয়াছে, সে-সমস্ত যে অনেক পরবর্তী, তাহাও অনুমিত হইতে পারে। স্বামীজীর উক্তি হইতে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নাগোজীভট্টের কাত্যায়নীতন্ত্র বর্তমান সময় হইতে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা আধুনিক। বাংলাদেশে রচিত শাক্ত-তন্ত্রগ্রন্থগুলিও এইরূপ আধুনিক হওয়ারই সম্ভাবনা। এ-সমস্ত পৌরুষেয় এবং অর্বাচীন তন্ত্রগ্রন্থে বৌদ্ধতন্ত্রের দশমহাবিদ্যার বিবরণ বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং এতাদৃশ তন্ত্রগ্রন্থেই বেদকথিত ভগবৎ-স্বরূপগণকে মহাবিদ্যাদিগের অবতার বলা হইয়াছে। মনে হইতেছে, এই জাতীয় তন্ত্রগ্রন্থের উদ্দেশ্য হইতেছে বেদবিরোধী বৌদ্ধদের কল্পিত মহাবিদ্যাগণ হইতে বেদকথিত ভগবৎ-স্বরূপগণের, এমনকি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও, অপকর্ষ প্রতিপাদন। এখনও কোনও কোনও তান্ত্রিকের মধ্যে এতাদৃশ আচরণ দৃষ্ট হয়।

৬৭। শাক্ততন্ত্রমতে কলির যুগধর্ম

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তৎসম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম নিবেদনে লিখিয়াছেন—"বর্তমান যুগ শক্তিসাধনার প্রশস্ত সময়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া দেখাইলেন যে, জগৎ-কারণকে জননীভাবে আরাধনা করাই যুগধর্ম।" স্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। স্বামীজীর মতে শাক্ততান্ত্রিক সাধনই হইতেছে বর্তমান কলিযুগের যুগধর্ম। কিন্তু বেদানুগত কোনও শাস্ত্রই একথা বলেন নাই; বরং বলিয়াছেন, নামসংকীর্তনই হইতেছে কলির যুগধর্ম। কালসন্তরণোপনিষৎ ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের কীর্তনকেই কলির ধর্ম বলিয়াছেন। বেদানুগত পুরাণাদিও বলিয়াছেন "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥", "কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ হরিকীর্তনাৎ॥" ইত্যাদি।

ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই সাধন বিহিত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই, বা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেই, জন্ম-মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্রুতি॥",

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ॥" সেই ব্রহ্মের স্বরূপাদি একমাত্র বেদ হইতেই জানা যায়। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১।১।৩ ॥"-ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"যথোক্তং ঋগ্‌বেদাদিশাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদি কারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইতি অভিপ্রায়ঃ ॥" সুতরাং যাহা বেদমূলক, তাহাই ধর্ম ; যাহা বেদমূলক নহে, তাহা ধর্ম নহে, পরন্তু অধর্ম। "বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদবিপর্যয়ঃ। বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ॥ ভা. ৬।১।৪০ ॥" টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বেদেন প্রণিহিতো বিহিতো ধর্মঃ, স চ বেদপ্রমাণক ইত্যর্থঃ। অনেন যো বেদপ্রমাণকঃ স ধর্মঃ, যো ধর্মঃ, স বেদপ্রমাণক ইতি স্বরূপং প্রমাণঞ্চোক্তম্‌। * * তদ্‌বিপর্যয়ো যো বেদনিষিদ্ধঃ সোঽধর্মঃ, নিষেধস্তস্মিন্‌ প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥" এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রধর্ম বেদবিহিত নহে বলিয়া ধর্মরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, বেদমতে তাহা হইতেছে অধর্ম। সুতুরাং তাহা কলির—কলির কেন, কোনও যুগেরই—যুগধর্ম হইতে পারে না।

৬৮। তন্ত্র ও মোক্ষ

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে আর একটি কথা বলা হইতেছে। শৈব এবং শাক্ত তান্ত্রিকদের লক্ষ্যও হইতেছে মোক্ষ—জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ। বেদমতানুসারে, তন্ত্রমতের সাধনে মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। বৈদিক শাস্ত্রানুসারে তাহার হেতু কথিত হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বেদকথিত ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই, সেই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হইলেই, সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায়, ইহার আর অন্য পন্থা নাই। "তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ শ্রুতিঃ ॥ মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ॥" কিন্তু ব্রহ্মকে জানিবার এবং পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে—ভক্তি, বেদকথিতা ভক্তি। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ গীতা ॥ ১৮।৫৫ ॥" গীতার "দৈবী হ্যেষাগুণময়ী মম মায়াদুরত্যয়া"—ইত্যাদি ৭।১৪-শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্‌" ইত্যাদি ৭।১৬-পর্যন্ত তিনটি শ্লোকে অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণও সে-কথাই বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—শ্রেয়োলাভের একমাত্র পন্থা হইতেছে ভক্তি। সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল-জ্ঞান-লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায়, শেষকালে তাঁহাদের কেবল ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছু না। "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥ ভা. ১০।১৪।৪ ॥" শ্রুতিতে ভক্তিকেই পরাবিদ্যা বলা হইয়াছে। এই পরাবিদ্যাদ্বারাই অক্ষর-ব্রহ্মকে পাওয়া যাইতে পারে। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা প্রসঙ্গে মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন—অপরাবিদ্যার অন্তর্গত বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ॥ ১।২।৭ ॥" পরাবিদ্যাদ্বারাই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় ; যেহেতু পরাবিদ্যা (ভক্তি)-দ্বারাই অক্ষর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ১।১।৫ ॥ (অধিগম্যতে প্রাপ্যতে—শ্রীপাদ শঙ্কর)।" অন্যশ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং

দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ —শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভ ॥ ১ অনুচ্ছেদ-ধৃত মাঠরশ্রুতি-বচন ॥"—একমাত্র ভক্তিই সাধককে পরব্রহ্মের নিকটে নিতে (সান্নিধ্য উপলব্ধি করাইতে) পারেন, একমাত্র ভক্তিই সাধককে পরব্রহ্মের দর্শন করাইতে (আন্তর ও বহিরনুভব জন্মাইতে) পারেন। সেই পরমপুরুষ ভক্তির বশীভূত, ভক্তিই ভূয়সী—সর্বসমর্থা।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল,ভক্তির সহিত সম্বন্ধহীন জ্ঞান-যোগাদিদ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভবপর নহে। পূর্বকথিত গীতা ॥ ৭।১৪-১৬-শ্লোকত্রয়ের তাৎপর্যও তাহাই।

ক। বৈদিকী ভক্তির স্বরূপ

উল্লিখিত মাঠরশ্রুতি-বাক্য হইতে বৈদিকী ভক্তির স্বরূপতত্ত্বও অবগত হওয়া যায়। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। পরব্রহ্মের তিনটি প্রধানা শক্তি আছে—চিচ্ছক্তি বা পরাশক্তি, জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি এবং অবিদ্যা বা মায়াশক্তি। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ বি. পু. ॥ ৬।৭।৬১ ॥" এই তিনটি শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি সর্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া তাহাকে পরাশক্তিও বলা হয়। এই চিচ্ছক্তি বা পরাশক্তি হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি, অর্থাৎ অগ্নির পক্ষে দাহিকা শক্তির ন্যায়, পরব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্যা শক্তি, স্বরূপভূতা শক্তি। এই শক্তির জ্ঞানক্রিয়া (সর্ববিষয়ে জ্ঞানপ্রবৃত্তি) এবং বলক্রিয়াও (সান্নিধ্যমাত্র সকলকে বশীভূত করিয়া নিয়ন্ত্রণ-শক্তিও) আছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥ ৬।৮ ॥" পরব্রহ্ম যাহা কিছু করেন, তৎসমস্তই তাঁহার এই চিচ্ছক্তিদ্বারাই করেন, তিনি এই চিচ্ছক্তিরই অপেক্ষা রাখেন, অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখেন না। কেননা, তিনি হইতেছেন পরম-স্বতন্ত্র, স্বরাট্—স্বস্বরূপশক্ত্যেকসহায় (চিচ্ছক্তি তাঁহার স্বরূপ-ভূতা বলিয়া ইহাকে স্বরূপশক্তিও বলা হয়)। তিনি এই চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই অপেক্ষা রাখেন বলিয়া, একথাও বলা যায় যে, তিনি স্বরূপশক্তির বশীভূত। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পরমস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয় না; কেননা, এই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি হইতেছে তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্না। তিনি একমাত্র এই স্বরূপশক্তিরই বশীভূত, অন্য কোনও শক্তির—জীবশক্তিব বা মায়াশক্তির—বশীভূত নহেন; যেহেতু, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি তাঁহার স্বরূপভূতা নহে। পূর্বোক্ত মাঠর-শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, তিনি ভক্তির বশীভূত—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"। সুতরাং এই ভক্তিও তত্ত্বতঃ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিই হইবে, অর্থাৎ এই ভক্তি হইতেছে ভগবানের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, ইহা কোনওরূপ প্রাকৃত-শক্তি নহে।

এই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি আছে—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। হ্লাদিনী-সংবিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিই হইতেছে ভক্তি। জীবের (জীবাত্মার) মধ্যে স্বরূপশক্তি—সুতরাং স্বরূপশক্তির কোনও বৃত্তিও—নাই। বিষ্ণুপুরাণ হইতেই তাহা জানা যায়। ধ্রুব ভগবান্‌কে বলিয়াছেন—"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ বি. পু. ॥ ১।১২।৬৯ ॥ —হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—এই ত্রিবিধা শক্তি, সর্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নাই)। আর হ্লাদকরী (অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা-বিধায়িনী সাত্ত্বিকী), তাপকরী (অর্থাৎ বিষয়-বিয়োগাদিতে মানসিক তাপদায়িনী তামসী) এবং (সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখ-

জনিত তাপ এই উভয়) মিশ্রা (বিষয়জন্যা রাজসী), এই তিনটি শক্তি—তুমি প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণবর্জিত বলিয়া—তোমাতে নাই (কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবে আছে। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখয়াছেন—"হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা সংবিৎ বিদ্যাশক্তিঃ একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী॥ স্বরূপভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয়্যেব ন তু জীবেষু। জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা যা ত্বয়ি নাস্তি। তামেবাহ হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি। ইত্যাদি॥" এইরূপে দেখা গেল জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তির কোনও বৃত্তিই নাই; শাস্ত্রবিহিত সাধনভজনের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবান্ হইতেই সাধকজীব তাহা পাইয়া থাকেন, এবং তখনই সাধকের চিত্তে তাহা ভক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

এইরূপে জানা গেল—বেদক্থিতা ভক্তি হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির বৃত্তি, জীবের মধ্যে তাহা নাই, ভগবৎকৃপাতেই সাধকজীব তাহা পাইয়া থাকেন এবং তখনই জীব ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন।

জীবের মধ্যে যদি স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীবের ভগবদ্‌বহির্মুখতাও সম্ভব হইত না, মায়াকবলিতত্বও সম্ভব হইত না। তাহার হেতু বলা হইতেছে।

চিচ্ছক্তির একমাত্র গতি তাহার শক্তিমান্ ভগবানের দিকে, অন্য দিকে নহে। জীবের মধ্যে যদি চিচ্ছক্তি থাকিত, সেই চিচ্ছক্তি জীবকে বা জীবের চিত্তকে ভগবানের দিকেই চালিত করিত, অন্য কোনও দিকেই, ভগবান্ হইতে বাহিরের দিকে, কখনও চালাইত না, সুতরাং জীবের ভগবদ্‌বহির্মুখতাও সম্ভব হইত না।

আর জীবের মধ্যে চিচ্ছক্তি থাকিলে জীবের মায়া-কবলিতত্ব কেন সম্ভবপর হইত না, তাহা বলা হইতেছে। মায়া হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা, জড়রূপা, চিদ্‌বিরোধিনী—অন্ধকার যেমন আলোকের বিরোধী, তদ্রূপ। মায়া এবং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি হইতেছে অন্ধকার এবং আলোকের তুল্য। যেখানে আলোক, সেখানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যেখানে চিচ্ছক্তি, সেখানে মায়া থাকিতে পারে না। আবার, একমাত্র চিচ্ছক্তিব্যতীতও অন্য কিছু মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। ভগবানের মধ্যে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি আছে বলিয়াই মায়া ভগবান্‌কে স্পর্শও করিতে পারে না, এই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির প্রভাবেই ভগবান্ সর্বকালের জন্য মায়াকে দূরে রাখিয়াছেন। গায়ত্রীর অর্থবাচক ভা. ১।১।১-শ্লোকেই তাহা বলা হইয়াছে—"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥" এ-স্থলে "ধাম্না"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্ত্যা"। তদনুসারে উক্তবাক্যের অর্থ হইবে—"যিনি স্বীয় স্বরূপশক্তিদ্বারা কুহককে (মায়াকে) সদা (অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বকালের জন্য) নিরস্ত (দূরে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন), সেই পরমসত্যের (পরব্রহ্মের) ধ্যান করি।" শ্রীনারদও শ্রীকৃষ্ণকে "স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-গুণপ্রবাহম্॥ ভা. ১০।৩৭।২২॥" বলিয়াছেন। এ-স্থলে "স্বতেজসা"-শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"চিচ্ছক্ত্যা" এবং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বরূপশক্তিপ্রভাবেন"। তদনুসারে নারদোক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে—"শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়ার গুণপ্রবাহ তাঁহা হইতে নিত্যই নিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে।" আবার "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ ভা. ১।৭।২৩॥"—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের এই বাক্য হইতেও তাহাই

জানা যায়। ভগবানে চিচ্ছক্তি আছে বলিয়াই মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, চিচ্ছক্তির অস্তিত্বই মায়াকে দূরে থাকিতে বাধ্য করে।

বৈদিকী গায়ত্রীর অর্থ হইতেও তাহাই জানা যায়। মূল জপ্য গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থ শ্রীপাদ সায়নাচার্য এইরূপ করিয়াছেন ঃ—

"যঃ সবিতাদেবঃ নঃ অস্মাকং ধিয়ঃ কর্মাণি ধর্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ, তস্য দেবস্য সবিতুঃ সর্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য আত্মভূতস্য বরেণ্যং সর্বৈরুপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া চ সম্ভজনীয়ং ভর্গঃ অবিদ্যাতৎকার্যয়োঃ ভর্জনাৎ ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ ধীমহি ধ্যায়েম।"

শ্রীপাদ সায়নের এই অর্থ অনুসারে গায়ত্রীমন্ত্রের স্থূল অর্থ হইতেছে—আমাদের কর্মসমূহের বা ধর্মাদি-বিষয়া বুদ্ধির প্রেরক যিনি, সেই জগৎস্রষ্টা আত্মভূত পরমেশ্বরের বরেণ্য বা সম্ভজনীয় ভর্গের ধ্যান করি। "ভর্গঃ"-শব্দের অর্থে সায়ন লিখিয়াছেন—অবিদ্যাতৎকার্যয়োঃ ভর্জনাৎ ভর্গঃ (অবিদ্যা বা মায়াকে এবং মায়ার কার্যকে যাহা ভাজিয়া দিতে পারে, তাহাই ভর্গঃ)। সেই ভর্গঃ হইতেছে—স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ (স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং পরব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ পরব্রহ্মের আত্মভূত বা স্বরূপভূত তেজঃ বা শক্তি)।

ভ্রস্জ-ধাতু হইতে ভর্গঃ-শব্দ নিষ্পন্ন। ভ্রস্জ-ধাতুর অর্থ—ভাজিয়া দেওয়া; যেমন খোলাতে ধান বা ডাইল ভাজা। যে ধান বা ডাইল খোলাতে ভাজা হয়, তাহার আর অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না। সায়নের অর্থ অনুসারে "ভর্গঃ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের আত্মভূত বা স্বরূপভূত যে তেজঃ (শক্তি) মায়া এবং মায়ার কার্যকে ভাজিয়া দিতে পারে (ভাজিয়া দিলে মায়া এবং মায়ার কার্যের আর অঙ্কুরোদ্‌গম হইবে না, মায়া এবং মায়ার কার্য আর আমাদের বন্ধন জন্মাইতে পারিবে না), আমরা সেই তেজের বা শক্তির ধ্যান করি।

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে, ভগবানের তাদৃশ তেজ বা শক্তি কি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, পরব্রহ্ম ভগবানের প্রধানা শক্তি তিনটি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। এই তিনটি শক্তির মধ্যে কোন্ শক্তির ধ্যান করিব? কোন্ শক্তি মায়াকে ভাজিয়া দিতে পারে? মায়াশক্তির ধ্যানে কোনও লাভ নাই; কেন না, মায়া নিজেকে নিজে ভাজিয়া নষ্ট করিবে না। অগ্নি স্বীয় শক্তিতে অন্য সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু নিজেকে নষ্ট করিতে পারে না। জীবশক্তির ধ্যানও নিরর্থক; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া॥ গীতা॥ ৭।১৪॥"—জীবের (অর্থাৎ জীবশক্তির) পক্ষে দৈবী গুণময়ী মায়া দুরপনেয়া। তাহা হইলে পারিশেষ্য ন্যায়ে বাকী রহিল চিচ্ছক্তি—এই চিচ্ছক্তিই মায়াকে এবং মায়ার কর্মকে ভাজিয়া দিতে পারে, মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে সম্যক্‌রূপে অপসারিত করিতে পারে। শ্রীপাদ সায়নের অভিপ্রায়ও এই চিচ্ছক্তিই। এজন্য তিনি ধ্যেয় শক্তিকে পরব্রহ্মের আত্মভূতা বা স্বরূপভূতা (পরব্রহ্মাত্মক) বলিয়াছেন।

এই আলোচনায়, শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণ বলে জানা গেল, যেখানে চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, সেখানে মায়া যাইতে পারে না, থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবের মধ্যে যদি চিচ্ছক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীবের মায়া-কবলিতত্বও সম্ভবপর হইত না।

উল্লিখিত আলোচনায় ইহাও জানা গেল—চিচ্ছক্তিব্যতীত অপর কিছুই যখন মায়াকে অপসারিত করিতে

পারে না, তখন মায়া হইতে অব্যাহতি বা মোক্ষ লাভের নিমিত্ত সাধকের চিত্তে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব অপরিহার্যরূপে আবশ্যক। বেদবিহিত পন্থায় শ্রীকৃষ্ণের (অথবা অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল মায়াতীত ভগবৎস্বরূপরূপে আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত, সে-সকল ভগবৎস্বরূপের মধ্যে কোনও এক স্বরূপের) ভজন করিলেই ভগবৎকৃপায় সাধকের চিত্তে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব এবং ভক্তিরূপে অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে, মায়া হইতে অব্যাহতি লাভও সম্ভব হইতে পারে। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা॥ ৭।১৪॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥" এইরূপে দেখা গেল, বেদকথিত ভগবদ্ভজনব্যতীত এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির কৃপাব্যতীত মোক্ষ অসম্ভব। ভক্তির সংস্রবশূন্য জ্ঞান-কর্মাদি মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে নিরর্থক। ইহাই হইতেছে মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে বেদের অভিমত।

তন্ত্রমতের সাধনে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

তান্ত্রিক শৈবমত শিবাগমের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রমাণের উল্লেখপূর্বক পূর্বেই বলা হইয়াছে, লোকদিগকে কৃষ্ণবহির্মুখ করার নিমিত্ত এবং লোকদিগের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে গোপন করার নিমিত্তই শ্রীশিব শিবাগম প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং তান্ত্রিক শৈবেরা যে কৃষ্ণবহির্মুখ, তাহাই জানা যায়। বেদানুসারে তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না। তান্ত্রিকদের শিবও বেদকথিত শিব নহেন বলিয়া সেই শিবের উপাসনাতেও, বেদানুসারে, মোক্ষলাভ হইতে পারে না।

আর, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তান্ত্রিক শাক্তদের উপাস্যা কালী হইতেছেন বেদবিরোধী বৌদ্ধদের কল্পিত মহাবিদ্যা, তাঁহার মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধদেরই কল্পিত। তিনি, বা তিনি যে-সকলরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারা বৈদিকী দেবতা নহেন বলিয়া তাঁহার, বা তাঁহাদের, উপাসনাতেও বেদমতে মোক্ষলাভ অসম্ভব।

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের উক্তির উল্লেখপূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তান্ত্রিকী দেবতাদের বাস্তব অস্তিত্বই নাই; সুতরাং তাঁহাদের উপাসনার সার্থকতাই বা কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের উপাসনায় মোক্ষলাভই বা কিরূপে হইতে পারে?

৬৯। তন্ত্রমতে পরতত্ত্ব

তান্ত্রিকদের কথিত পরতত্ত্বও বেদকথিত পরতত্ত্ব নহেন। তান্ত্রিকদের মতে পরতত্ত্ব হইতেছেন স্বরূপতঃ নিরাকার এবং সর্বতোভাবে নির্বিশেষ; সাধকদিগের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি মায়াময়রূপ পরিগ্রহ করেন। পূর্বকথিত সপ্ততীর্থ-মহাশয়ের "তন্ত্রপরিচয়" (৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা) হইতে কয়েকটি তন্ত্রবচন এবং তাহাদের অনুবাদ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"কুলার্ণবতন্ত্রের ষষ্ঠোল্লাসেও একটি বচন আছে—'চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥—চিন্ময় অপ্রমেয় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্ম সাধকগণের হিতের নিমিত্ত রূপকল্পনা করিয়াছেন।'

"উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি। দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানা বিধাস্তনূঃ॥ * * সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী (মহানির্বাণতন্ত্র)॥ —উপাসকগণের কার্যসিদ্ধি, জগতের কল্যাণ

এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত তুমি নানাবিধ শরীর গ্রহণ করিয়া থাক। তিনি সাকারা হইয়াও নিরাকারা অর্থাৎ শরীরধারী জীবের ন্যায় কোনও আকৃতিতে আবদ্ধ নহেন। আপন মায়া অবলম্বনে স্বেচ্ছায় বহুবিধ রূপ ধারণ করেন।'

"সা হি নানাবিধা ভূত্বা সাধকাভীষ্টদা ভবেৎ (পিচ্ছিলা-তন্ত্র)—অরূপা হইয়াও তিনি সাধকগণের হিতের নিমিত্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।'

'চিতিরূপা মহামায়া পরংব্রহ্মস্বরূপিণী। সেবকানুগ্রহার্থায় নানারূপং দধার সা॥ (নবরত্নেশ্বর) —চিৎস্বরূপা পরব্রহ্ম-রূপিণী সেই মহামায়া সেবকগণকে অনুগ্রহ করিতে নানারূপ ধারণ করিয়াছেন।'

"যতীনাং মন্ত্রিণাঞ্চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনাং তথা। ধ্যান-পূজানিমিত্তং হি তনূর্গৃহ্ণাতি মায়য়া॥ (সুপ্রভেদ-তন্ত্র)—সন্ন্যাসী, মন্ত্রসাধক, জ্ঞানযোগী ও যোগী, ইঁহাদের ধ্যান এবং পূজার নিমিত্ত ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া শরীর (রূপ) গ্রহণ করিয়া থাকেন।' ইত্যাদি।"

মায়াবাদাচার্যরূপে শ্রীপাদ শঙ্করেরও পরতত্ত্ব বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ অভিমত। কিন্তু তাঁহার নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম তান্ত্রিকদের কথিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম—তান্ত্রিকদের নিরাকার নির্বিশেষ শিব, বা নিরাকারা মহামায়াও—নহেন। মায়াবাদমতেও নির্বিশেষ ব্রহ্মই মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগৎকর্তা হইয়া থাকেন।

পরতত্ত্বসম্বন্ধে উল্লিখিত অভিমত হইতেছে বেদবিরোধী। সর্বব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব বিষ্ণুকে ঋগ্‌বেদ "বৃহচ্ছরীরঃ", এবং "যুবাকুমারঃ" বলিয়াছেন (ঋগ্‌বেদ॥ ১।১৫৫।৬॥" এ-স্থলে বিষ্ণুর "বৃহৎশরীরের" কথা বলা হইয়াছে, নিরাকার বলা হয় নাই; নিরাকার বিষ্ণু যে মায়াকে আশ্রয় করিয়া "বৃহচ্ছরীরঃ" হইয়াছেন, তাহাও বলা হয় নাই। মানুষের শরীর হয় দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত; কিন্তু পুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের শরীর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের হাতের সাড়ে চারি হাত। এজন্যই বোধ হয় "বৃহচ্ছরীর" বলা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদ এই বিষ্ণুর শরীরকে আবার "যুবাকুমারঃ"—অর্থাৎ যুবা (নিত্য তরুণ) এবং অকুমারও বলিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের ১।১৫৬।২ মন্ত্রে বিষ্ণুকে "নবীয়সে—নিত্যনূতনও"বলা হইয়াছে।

পরব্রহ্ম পরমাত্মার শরীরের (তনুর) স্পষ্ট উল্লেখ শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডক॥ ৩।২।৩॥, কঠ॥ ১।২।২৩॥" তাঁহার এই শরীর যে মায়িক—সুতরাং অনিত্য—তাহা নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন। "নিত্যোনিত্যানাং (অথবা নিত্যোঽনিত্যানাং) চেতনশ্চেতনানমেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥ কঠ॥ ২।২।১৩॥" তাঁহার মায়িক বিগ্রহ অসম্ভব; কেননা মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না, মায়া কেবল মায়িক বহির্বিশ্বকেই বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। "মায়য়া বা এতৎসর্বং বেষ্টিতং ভবতি, নাত্মানং মায়া স্পৃশতি। তস্মান্মায়য়া বহির্বেষ্টিতং ভবতি॥ নৃ. পূ. তা.॥ ৫।১॥" পরব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দরূপ, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। "ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে॥ গো. পূ. তা.॥ ১॥" ব্রহ্মসংহিতা হইতে জানা যায়, ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥" এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, পরব্রহ্ম নিরাকার নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মায়ার আশ্রয়ে যে তিনি মায়িক বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, ঋগ্‌বেদাদি তাহা বলেন নাই।

তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই তাঁহার সবিশেষত্বের প্রমাণ। তাঁহার ঐশ্বর্য-বীর্যাদি সবিশেষত্ব-লক্ষণও বেদাদি বলিয়া গিয়াছেন। "বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১।২২।১৯॥", "বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১।১৫৪।১॥", "এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১০।৯০।৩॥", "মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান। যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান॥ ঋগ্‌বেদ॥ ১০।১২১।৯॥", "ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ॥ ঋগ্‌বেদ॥ ৭।৯৯।২॥"—ইত্যাদি। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। "জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।২।২॥ ব্রহ্মসূত্র॥" ইত্যাদি। এ-সমস্ত অপৌরুষেয় বাক্য হইতে জানা গেল—বেদকথিত পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, তিনি সবিশেষ। তাঁহার এই বিশেষত্ব মায়ার প্রভাবজাত নহে, পরন্তু তাঁহার স্বরূপভূত। তাঁহার লীলাতে নানা রকম বিশেষত্ব স্ফুরিত হয়। তাঁহার লীলাও তাঁহারই ন্যায় নিত্য এবং মায়াতীত। তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির সহায়তাতেই তাঁহার লীলা। এই চিচ্ছক্তি যখন লীলাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহাকে যোগমায়া বলা হয়। এই লীলাশক্তিরূপিণী যোগমায়াও চিচ্ছক্তি। শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে এই যোগমায়াকে শুধু "মায়া"ও বলা হইয়াছে। পূর্বাপর এবং বেদবাক্যের সহিত সঙ্গতি-রক্ষণপূর্বক অর্থ করিতে গেলেই তাহা বুঝা যাইবে।

পরব্রহ্ম যে তাঁহার একই রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেন, শ্রুতি হইতে তাহাও জানা যায়। "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি॥ কঠ॥ ২।২।১২॥", "একো বশী কৃষ্ণ ইড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি॥ গো. পু. তা.॥ ১৫॥" বহিরঙ্গা মায়ার সহায়তাতে যে তিনি এতাদৃশ বহুরূপ ধারণ করেন, কিংবা-সাধকদের কল্যাণের জন্যই যে তাঁহার মায়িকরূপ-ধারণ, একথা শ্রুতি বলেন নাই; শ্রুতি বরং বলিয়াছেন, মায়ার সহিত তাঁহার স্পর্শও অসম্ভব। অনাদিকাল হইতেই তিনি মায়াতীত অনন্ত ভগবৎস্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত।

এইরূপে দেখা গেল, পরতত্ত্বের স্বরূপসম্বন্ধে তান্ত্রিকেরা যাহা বলেন, তাহা বেদবিরুদ্ধ এবং তাঁহাদের কথামতে, পরতত্ত্ব যে সাধকের হিতের জন্য মায়িক বিগ্রহ ধারণ করেন, একথাও বেদবিরুদ্ধ।

৭০। তন্ত্রমতে জীবতত্ত্ব

তান্ত্রিকদের কথিত জীবতত্ত্বও বেদবিরুদ্ধ। পূর্বকথিত সপ্ততীর্থ-মহোদয়ের "তন্ত্রপরিচয়"-গ্রন্থে (৯২-৯৪ পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে—"পরশুরামকল্পসূত্রে (১।৫) বলা হইয়াছে—'শরীরকঞ্চুকিতঃ শিবো জীবঃ নিষ্কঞ্চুকঃ পরমশিবঃ।' ** শিব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। শিব স্বয়ং তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে আচ্ছাদিত করিলে সেই অপ্রকাশ-স্বাতন্ত্র্য বা অস্বতন্ত্র শিবই জীবত্ব প্রাপ্ত হন। শিব ও জীবের মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই। এই ভেদ ঔপাধিকমাত্র। শরীরাত্মক উপাধির দ্বারা উপহিত শিবই জীব, আর শরীরোপাধি-বিরহিত জীবই শিব। ** পরমার্থসারে উক্ত হইয়াছে—'পরমং যৎ স্বাতন্ত্র্যং দুর্ঘটসম্পাদনং মহেশস্য। দেবী মায়াশক্তিঃ স্বাত্মাবরণং শিবস্যৈতৎ॥ —মহেশের যে পরম স্বাতন্ত্র্য, দুর্ঘট-সম্পাদিকা মায়াশক্তির দ্বারা তাহা আবৃত হইয়া পড়ে।' সুভগোদয় বলিতেছেন—'স তয়া পরিমিতমূর্তিঃ সঙ্কুচিতসমস্তশক্তিরেষ পুমান্। রবিরিব সন্ধ্যারক্তঃ সংহৃতরশ্মিঃ স্বভাসনেঽপ্যপটুঃ॥—

সন্ধ্যাকালে আরক্ত সূর্য যেরূপ নিজের রশ্মিকে সংহৃত করেন, তখন নিজকে প্রকাশ করিবার শক্তিও তাঁহার থাকে না, সেইরূপ মায়াকর্তৃক শিবের সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত হইলে সেই শিবই পরিমিতমূর্তি জীবরূপ প্রাপ্ত হন।' ”

এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—তন্ত্রমতে জীবও স্বরূপতঃ শিবই। তত্ত্বতঃ জীবের সহিত শিবের কোনও ভেদই নাই।

মুক্তি সম্বন্ধেও “তন্ত্রপরিচয়” (৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—“শিবের প্রত্যক্ষ অনুভবরূপ জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয়। শিবই পরমাত্মা। যথার্থ দৃষ্টিতে শিব ও জীব অভিন্ন। বিশ্বপ্রপঞ্চের কোন বস্তুর সহিতই শিবের আসলে কোন ভেদ নাই। শিব ও বিশ্বের ভেদজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত। সাধক সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞানকে বিনাশ করিলেই মুক্ত হইয়া থাকেন। 'মোক্ষঃ সর্বাত্মতাসিদ্ধিঃ। (কৌলোপনিষৎ—৪)।' ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গুরূপদিষ্ট সাধনমার্গে চলিতে চলিতে সাধক চরম অবস্থায় অদ্বৈত বুদ্ধি লাভ করেন। 'সর্বৈক্যতা-বুদ্দিমন্তে।' (কৌলোপনিষৎ—২৪)॥”

এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—অন্তিমে শিব হইয়া যাওয়াই হইতেছে তন্ত্রমতে মোক্ষ। (কৌলোপনিষৎ হইতেছে তান্ত্রিকদের রচিত একটি উপনিষৎ, বৈদিকী শ্রুতি নহে)।

জীবের স্বরূপসম্বন্ধে এবং মোক্ষসম্বন্ধে তান্ত্রিকগণ যাহা বলেন, তাহা যে বেদসম্মত নহে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনি হইতেছেন বিভু—সর্বব্যাপক। তান্ত্রিকদেরও এইরূপ অভিমত। তন্ত্রমতে জীব যখন তত্ত্বতঃ শিবই, তখন জীবও বিভু। কিন্তু বেদমতে জীব বিভু নহে, পরন্তু অণু। “এষঃ অণুঃ আত্মা॥ মুণ্ডক॥ ৩।১।৯॥”, কাঠকোপনিষৎ বলেন, আত্মা “অনুপ্রমাণাৎ॥ ১।২।৮॥ —আত্মা অণুপ্রমাণ।” শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৫।৯॥ —কেশের অগ্রভাগকে যদি শতভাগ করা যায়, তাহারও প্রত্যেক ভাগকে যদি আবার শতভাগ করা যায়, তাহার সমান হইতেছে জীব।” অর্থাৎ কেশাগ্রের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য ক্ষুদ্র হইতেছে জীব।

ব্যাসদেবও নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলিতে জীবের বিভুত্ব-খণ্ডনপূর্বক অণুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। “উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্॥ ২।৩।১৯॥”, “এবঞ্চ আত্মা অকার্ৎস্ন্যম্॥ ২।২।৩৪॥”, “অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ॥ ২।২।৩৬॥”, “স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ॥ ২।৩।২০॥”, “ন অণুঃ অতচ্ছ্রুতেঃ, ইতি চেৎ, ন ইতরাধিকারাৎ॥ ২।৩।২১॥”, “স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥ ২।৩।২২॥”, “অবিরোধঃ চন্দনবৎ॥ ২।৩।২৩॥”, “অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ, ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি॥ ২।৩।২৪॥”, “গুণাৎ বা আলোকবৎ॥ ২।৩।২৫॥”, “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ॥ ২।৩।২৬॥”, “তথা চ দর্শয়তি॥ ২।৩।২৭॥”, “পৃথক্ উপদেশাৎ॥ ২।৩।২৮॥”, “তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥ ২।৩।২৯॥”, “যাবদাত্মভাবিত্বাৎ চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ॥ ২।৩।৩০॥”, “পুংস্ত্বাদিবৎ তু অস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥ ২।৩।৩১॥”, “নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা॥ ২।৩।৩২॥” বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, দ্বিতীয় পর্ব প্রথমাংশে, তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। জীবের অণুত্ব যে পরিমাণগত, তাহাও সেই অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীব-ব্রহ্মের ভেদ-বাচক ব্রহ্মসূত্রগুলিও এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে ঃ—“ভেদব্যপদেশাচ্চ॥ ১।১।১৭॥” “অনুপপত্তেশ্চ ন শরীরঃ॥ ১।২।৩॥”, “কর্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ॥ ১।২।৪॥”, “শব্দবিশেষাৎ॥ ১।২।৫॥”,

"স্মৃতেশ্চ ॥ ১।২।৬ ॥", "ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ১।৩।৫ ॥", "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ১।৩।৭ ॥", সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো-র্ভেদেন ॥ ১।৩।৪২ ॥", "অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥ ২।১।২২ ॥", "অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩।৪।৮ ॥" —বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয়াংশ, তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মোক্ষাবস্থাতেও জীব যে ব্রহ্ম হইয়া যায় না, জীবের যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, নিম্নলিখিত ব্রহ্ম-সূত্রগুলিতে ব্যাসদেব তাহাও বলিয়া গিয়াছেন ঃ—"মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ১।৩।২ ॥", "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥ ৪।৪।১ ॥," "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ৪।৪।২ ॥", "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৪।৪।৫ ॥," "এবমুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৪।৪।৭ ॥', "সঙ্কল্পাৎ এব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪।৪।৮ ॥", "অতএব চ অনন্যাধিপতিঃ ॥ ৪।৪।৯ ॥", "অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ ৪।৪।১০ ॥', "ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ৪।৪।১১ ॥", "দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ৪।৪।১২ ॥", "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপদ্যতে ॥ ৪।৪।১৩ ॥", "ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ৪।৪।১৪ ॥", "প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়াত ॥ ৪।৪।১৫ ॥", "জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিত্বাচ্চ ॥ ৪।৪।১৭ ॥", "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ৪।৪।২১ ॥" —বিস্তৃত আলোচনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, দ্বিতীয়পর্ব, দ্বিতীয়াংশ, চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মুক্ত-অবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকায়, মুক্তজীব যে ব্রহ্ম হইয়া যায় না, সুতরাং জীব যে স্বরূপতঃ বিভু নহে, পরন্তু অণু, তাহাই প্রতিপাদিত হইল। এইরূপে দেখা গেল, জীবের বিভুত্ব-বাচক তন্ত্রমত বেদসম্মত নহে, পরন্তু বেদবিরুদ্ধ।

ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে—সুতরাং জীবের মোক্ষসম্বন্ধেও—মায়াবাদাচার্য শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতের সহিত তান্ত্রিকদের অভিমতের সাদৃশ্য আছে। শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত ব্রহ্মের স্বরূপ যে শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রসম্মত নহে, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, প্রথম পর্ব দ্বিতীয়াংশের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদকথিত ব্রহ্ম যে সবিশেষ, মায়িক গুণহীন, কিন্তু অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট, ঋগ্‌বেদের মন্ত্রোল্লেখপূর্বক তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রথম পর্বের দ্বিতীয়াংশে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়েও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

জীবের স্বরূপসম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি যে বেদসম্মত নহে, তাহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয়াংশে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তজীব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও যে বেদসম্মত নহে, তাহাও দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয়াংশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীপাদ শঙ্কর বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিলেন কেন? বেদানুগত পুরাণেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীশিব বেদবিরুদ্ধ শিবাগম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর স্বয়ং শিবই, অপর কেহ নহেন। উক্ত আদেশের বশবর্তী হইয়া শ্রীশিবই যে ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্যরূপে মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তিনি নিজেই পার্বতীর নিকটে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্তিনা ॥ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ॥ ২৫।৭ ॥" শঙ্করের মায়াবাদ যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত, এ-স্থলে তাহাই বলা হইল। একথা যে মিথ্যা নহে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের ভিত্তি হইতেছে—তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকা। এই কারিকায় গৌড়পাদ বৌদ্ধমতই প্রচার করিয়াছেন। এই কারিকার ছয়টিস্থলে তিনি বুদ্ধদেবের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর এই কারিকার ভাষ্যও করিয়াছেন এবং তাঁহার অন্যান্য ভাষ্যে এই কারিকাই ছিল তাঁহার উপজীব্য। এজন্য তাঁহার ভাষ্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত এবং তাঁহাকেও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণও তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধই বলিয়াছেন এবং একথাও বলিয়াছেন যে, শঙ্করের "নির্গুণ ব্রহ্ম" এবং বৌদ্ধ নাগার্জুনের "শূন্য"—এই দুইয়ের মধ্যে অনেকটা সাম্য আছে (গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, তৃতীয় পর্বের দ্বিতীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে)।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ-ভাষ্যে বৌদ্ধমত প্রচার করিলেও, তাহাকে বেদের আবরণে প্রচ্ছন্ন করিয়াই প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্ম যখন একমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য, তখন বেদবাক্যের সহায়তাব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। আবার ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রও বেদবাক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বেদবাক্যের সহায়তাব্যতীত ব্রহ্মসূত্রেরও অর্থ করা যায় না। শঙ্করের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বৌদ্ধদের শূন্যতুল্য নির্গুণ বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিপাদন। কিন্তু বেদ এবং বেদানুগত স্মৃতিতে ব্রহ্ম হইতেছেন সবিশেষ (অবশ্য প্রাকৃত বিশেষত্বহীন)। সুতরাং শ্রুতির মুখ্য অর্থে ব্রহ্মসূত্রের (এবং শ্রুতিরও) অর্থ করিতে গেলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এজন্য তিনি বেদকথিত ব্রহ্মের সবিশেষত্বকে মায়িকরূপে কল্পনা করিয়া মায়িক বিশেষত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে তিনি ব্রহ্মসূত্রের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি ব্যবহারিক অর্থ বলিয়াছেন। তিনি ইহাকে ব্যবহারিক বলিলেও, অধিকাংশ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা ব্যাসদেবের এবং অন্যভাষ্যকারদের সম্মত। কিন্তু যে-স্থলে সুযোগ পাইয়াছেন, সে-স্থলে তিনি নিজের অভীষ্ট অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থলে "ব্যবহারিক অর্থ" লিখিয়া, সূত্রের সহিত সঙ্গতিহীন ভাবেও নিজের অভীষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, বেদবাক্যের দ্বারা তাঁহার, অভীষ্ট বৌদ্ধমতকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার মায়াবাদকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত" বলা হয়।

৭১। তন্ত্রমতে সাধন

এক্ষণে তান্ত্রিকদের সাধনসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে। তাঁহাদের সাধনও বেদবিরুদ্ধ। একথা বলার হেতু কথিত হইতেছে।

পূর্বকথিত সপ্ততীর্থ মহোদয়ের "তন্ত্রপরিচয়"-গ্রন্থে (৪৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে—"ষট্‌চক্রভেদ তান্ত্রিক সাধনার মূল তত্ত্ব।"

জীবদেহে ছয়টি চক্র অছে। যথা—"মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা—এই ছয়টি চক্র।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের নিম্নসীমা পর্যন্ত ছয়টি সূক্ষ্ম নাড়ীচক্র আছে। সাধারণতঃ তিনটি নাড়ীর ভিতর দিয়া প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মেরুদণ্ডে মালার ন্যায় গ্রথিত অস্থিখণ্ডগুলির নিম্নদেশ হইতে উপর পর্যন্ত সুষুম্নার অবস্থিতি। ইড়াতে শ্বাস প্রবাহিত হইবার সময় বাম নাসাপুট দিয়া এবং পিঙ্গলাতে প্রবাহিত হইবার সময় দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু প্রবেশ করে ও নির্গত হয়।

এক নাসাপুট হইতে অপর নাসাপুটে নিশ্বাসের স্রোত পরিবর্তনের সময় সুষুম্নার ভিতরে অল্পকালের নিমিত্ত বায়ু প্রবেশ করে। সাধনার ফলে সুষুম্নার পথ পরিষ্কৃত হইয়া খুলিয়া যায়। তখন তদ্দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হইয়া অন্তঃস্থিত শক্তিকে জাগ্রত করে।" তন্ত্রপরিচয়। ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা॥

"তন্ত্রপরিচয়" অনুসারে ছয়টি-চক্রের পরিচয় কথিত হইতেছে। এই ছয়টি চক্র হইতেছে বাস্তবিক "সূক্ষ্মনাড়ীচক্র"—(নাড়ীগ্রন্থি বা স্নায়ুগ্রন্থি)। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সকল চক্রই পদ্মাকৃতি।

গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি উপরে মেরুদণ্ডের নিম্নসীমায় মূলাধার চক্র অবস্থিত। ইহা চতুর্দল। কর্ণিকায় স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিরাজিত।

মূলাধারের উপরিস্থিত চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান। উপস্থমূলের বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে ইহার অবস্থান। ষড়্‌দল।

মণিপূরক বা মণিপদ্মচক্র নাভিদেশের বিপরীত দিকে মেরুমধ্যে অবস্থিত। দশ-দল।

হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে মেরুমধ্যে অনাহত চক্র। দ্বাদশ-দল।

কণ্ঠের বিপরীত দিকে মেরু মধ্যে বিশুদ্ধচক্র। ষোড়শ-দল।

আজ্ঞাচক্র ভ্রূমধ্যে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের শেষ সীমায়। দ্বি-দল।

মূলাধারচক্রে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া জ্ঞানরূপা আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী অধোমুখে বিরাজমানা। এই কুণ্ডলিনী শক্তির স্বরূপসম্বন্ধে শাক্ত ক্রমাদিতে বলা হইয়াছে—"তড়িৎকোটিপ্রভাং সূক্ষ্মাং বিসতন্তু-তনীয়সীম্। প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্॥ —কোটি কোটি তড়িতের প্রভার ন্যায় তাঁহার কান্তি, তিনি মৃণালতন্তুর ন্যায় অতিসূক্ষ্ম এবং সাড়ে তিন বেষ্টনে কুণ্ডলীভাবে অবস্থিত নিদ্রিত সাপের মত।" সহস্রারস্থিত পরম-শিবের সহিত এই শক্তির মিলন ঘটাইতে পারিলেই সাধক আনন্দময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—"ভেদয়িত্বা সহস্রারে পরশম্ভৌ সমর্পয়েৎ। ইত্যাদি। (শাক্তক্রম)।"—তন্ত্রপরিচয়॥ ৪৭ পৃষ্ঠা॥

তন্ত্রসার-মতে—মূলাধারচক্রে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, স্বাধিষ্ঠানচক্রে পরলিঙ্গ, মণিপূরকচক্রে শিব, অনাহতচক্রে শব্দব্রহ্মময় বাণলিঙ্গ, বিশুদ্ধচক্রে হংস, এবং আজ্ঞাচক্রে আত্মা অধিষ্ঠিত। আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বে কৈলাস ও বোধনীচক্র। তাহার ঊর্ধ্বে সহস্রার ও বিন্দুস্থান। বিন্দুচক্রে পরশিব অবস্থিত।

তান্ত্রিক সাধন-সম্বন্ধে তন্ত্রসার গ্রন্থের ৯৮১ পৃষ্ঠায় অনুবাদসহ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এইরূপ ঃ—

"অগ্রে পূরকদ্বারা মূলাধারে মনঃসংযোগ করিবে। গুহ্যদেশ ও মেঢ্রদেশের মধ্যস্থলে মূলাধারে যে কুণ্ডলিনীশক্তি রহিয়াছেন, ঐ শক্তিকে আকুঞ্চিত করিয়া জাগরিত করিবে। পরে ব্রহ্মগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদপূর্বক স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ ভেদ করিয়া ঐ কুণ্ডলিনী দেবীকে বিন্দুচক্রে লইয়া যাইবে। অনন্তর ঐ কুণ্ডলিনীকে পরশিবের সহিত একীভূতা চিন্তা করিবে। উভয়ের সংযোগে তথায় গলিত-লাক্ষা-রসতুল্য যে-অমৃতরস উৎপন্ন হইবে, সেই অমৃতরস কৃষ্ণাখ্যা (আরাধ্যদেবতাস্বরূপিণী) যোগসিদ্ধিদায়িনী সেই কুণ্ডলিনীকে পান করাইয়া, অর্থাৎ তদ্দ্বারা সেই দেবীর তর্পণ করিয়া, বিগলিত সেই অমৃতদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবনেশ্বরী, ডাকিনী, রাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি ষট্‌চক্র-দেবতার তর্পণ করিবে। তাহার পরে যোগী সেই সুষুম্নাপথদ্বারা কুণ্ডলিনীকে পুনরায় মূলাধারে

আনয়ন করিবেন। এইরূপে প্রত্যহ বায়ুধারণ অভ্যাস করিলে জরা প্রভৃতি দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।”

উল্লিখিতরূপই হইতেছে তান্ত্রিকদের সংসার-বন্ধন মুক্ত হওয়ার, অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তির সাধন। কুণ্ডলিনীকে বিন্দুচক্রস্থিত পরশিবের সহিত মিলিত করাইতে পারিলেই তন্ত্রমতে মোক্ষ সিদ্ধি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাক্তক্রমাদি তন্ত্রগ্রন্থ অনুসারে, কুণ্ডলিনী হইতেছেন মৃণালতন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম একটি বস্তুবিশেষ—সম্ভবতঃ অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুবিশেষ। ষট্‌চক্রভেদের এবং কুণ্ডলিনীশক্তির জাগৃতির রহস্য বোধ হয় কতকগুলি স্নায়বিকী শক্তিরই বিকাশ—যাহার ফলে তান্ত্রিক সাধক কতকগুলি অলৌকিকী শক্তি অর্জন করিতে পারেন। এইরূপ অলৌকিকী শক্তি কোনও পারমার্থিকী শক্তি হইতে পারে না।

বেদমতে মুক্তিলাভের উপায়ের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তির সহায়তা-ব্যতীত মোক্ষলাভ কিছুতেই হইতে পারে না। তান্ত্রিকদের সাধনে সেই ভক্তির কোনও স্থান নাই। যেহেতু, পূর্বেই বলা হইয়াছে, বেদকথিত পরব্রহ্মের উপাসনাব্যতীত চিত্তে সেই ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও ১।২।১-৭ ব্রহ্মসূত্রসমূহের ভাষ্যে বেদকথিত ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তান্ত্রিকদের সাধনে তাহা নাই; সুতরাং মোক্ষসাধিকা ভক্তির আবির্ভাবও এই সাধনে সম্ভব নয়। কোনও কোনও তান্ত্রিক সাধক বলেন—জাগ্রতা কুণ্ডলিনী শক্তিই ভক্তি; সুতরাং তাঁহার প্রভাবেই মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিকী ভক্তি হইতেছে চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং এই চিচ্ছক্তি জীবের মধ্যে নাই এবং থাকিতেও পারে না। তন্ত্রমতে নিদ্রিত এবং জাগ্রত—উভয়রূপেই কুণ্ডলিনী জীবের দেহে অবস্থিত; সুতরাং এই কুণ্ডলিনী, বেদানুসারে, কখনও চিচ্ছক্তি হইতে পারেন না, মোক্ষদায়িকা বৈদিকী ভক্তিরূপেও পরিণত হইতে পারেন না। সুতরাং বেদমতে তান্ত্রিকদের সাধন ষট্‌চক্রভেদ মোক্ষলাভের অনুকূল নহে, অর্থাৎ সাধনের কথা বিবেচনা করিলেও দেখা যায়, তন্ত্রমতের সাধনে মোক্ষ-প্রাপ্তি অসম্ভব। বেদানুগত কোনও সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ষট্‌চক্র-ভেদের চেষ্টা দৃষ্ট হয় না।

৭২। তন্ত্রমত ও শ্রীপাদ শঙ্কর

পরব্রহ্ম, জীব এবং মোক্ষ—এই তিনের স্বরূপসম্বন্ধে মায়াবাদাচার্য শ্রীপাদ শঙ্করের সহিত তান্ত্রিকদের কিছু সামঞ্জস্য বিদ্যমান বলিয়া শাক্ততান্ত্রিকদের কেহ কেহ বলেন—তাঁহাদের দার্শনিক তত্ত্ব শ্রীপাদ শঙ্করের অনুমোদিত এবং তাঁহারাও শ্রীপাদ শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতবাদী—জ্ঞানমার্গের উপাসক। এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই।

শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের স্বরূপ পূর্বেই কথিত হইয়াছে। “পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ॥”-ইত্যাদি কয়েকটি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি শৈবতন্ত্রবাদের খণ্ডনও করিয়াছেন এবং “এতেন সর্ব্বে ব্যাখাতা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১।৪।২৮॥”-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ভঙ্গীতে তিনি শাক্ত-তন্ত্রমতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর তান্ত্রিক ছিলেন না, তাঁহার অনুগত মায়াবাদীরাও তান্ত্রিক ছিলেন না, আধুনিক কালের মায়াবাদীরাও তান্ত্রিক নহেন। তাঁহাদের সাধনও তান্ত্রিকদের সাধনের মতন নহে। তান্ত্রিকদের ন্যায়, ষট্‌চক্রের সাধন, কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ-প্রয়াস, তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। মায়াবাদী

সন্ন্যাসীদের আহারাদিও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের আহারাদির অনুরূপ নহে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করেন না, তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের পক্ষে মৎস্য-মাংসাদি নিষিদ্ধ নহে।

তথাপি কিন্তু কোনও কোনও তান্ত্রিক স্বয়ং শঙ্করাচার্যকেও এবং অন্যান্য বহু লোককেও তান্ত্রিক বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। পূর্বকথিত সপ্ততীর্থ-মহোদয় তাঁহার "তন্ত্রপরিচয়"-নামক গ্রন্থের ১৬-১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"ভারতীয় হিন্দু সাধকসম্প্রদায়ের ভিতর তন্ত্রমার্গের সাধকই বেশী। শোনা যায়, আচার্য শঙ্কর তান্ত্রিক-পদ্ধতিতেই শ্রীবিদ্যার (ত্রিপুরাসুন্দরীর) উপাসনা করিতেন।[১] সকল শঙ্করমঠেই শ্রী-যন্ত্র স্থাপিত আছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও তান্ত্রিকমন্ত্রেই দীক্ষিত। আচার্য অদ্বৈত, প্রভুপাদ নিত্যানন্দ-প্রমুখ চৈতন্যপরিকর আচার্যগণ তান্ত্রিক-উপাসনায়ই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ তন্ত্রমতেই দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষা দিয়া থাকেন। রাঢ়দেশের সাধক ব্রহ্মানন্দ, ময়মনসিংহের ঠাকুর পূর্ণানন্দগিরি, ত্রিপুরার মেহারকালীবাড়ীর দশমহাবিদ্যা-সাধক সর্বানন্দঠাকুর, ঢাকা মিতরার রাঘবানন্দ—ইঁহারা সকলেই তান্ত্রিক-সাধনায় সিদ্ধ। নবদ্বীপবাসী তন্ত্রসারকৃৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হালিসহরের রামপ্রসাদ ও বর্ধমানের কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত এখনও বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তিরসের বন্যা ছুটায়। ইঁহারা তান্ত্রিক-সাধকই ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, তদীয় গুরু সাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরী, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, বীরভূম তারাপীঠের বীর সাধক বামাক্ষেপা, ঢাকা রমনার ব্রহ্মাণ্ডগিরি—ইঁহারা সকলেই এক পথের পথিক। * * * ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামদাস কাঠিয়া প্রমুখ মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিলেও বোঝা যায়, ইঁহারা তন্ত্রমার্গেই সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। জানা যায়, রাজা রামমোহন রায়ও তান্ত্রিক-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই সাধনা করিয়াছিলেন।"

তন্ত্রপরিচয়ের উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি চৈতন্য পরিকরগণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামদাস কাঠিয়া প্রভৃতি—হালিসহরের রামপ্রসাদ এবং দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতনই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন!! অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দপ্রভুর বাংশধরগণ যে এখনও তন্ত্রমতেই দীক্ষাগ্রহণ এবং দীক্ষাপ্রদান করিয়া থাকেন, তন্ত্রপরিচয় হইতে এই অদ্ভুত এবং অভিনব তথ্যও জানা গেল!! এ-সম্বন্ধে কোনওরূপ মন্তব্য অনাবশ্যক। এইটুকুমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এক রকমের পিত্তরোগী শঙ্খকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখেন।

---

(১) সপ্ততীর্থ মহোদয় তাঁহার তন্ত্রপরিচয়ের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"শ্রী-শব্দ দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত ষোড়শী দেবীর নামান্তর। শ্রী, কামেশ্বরী, ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি ষোড়শদেবীরই নাম।" তন্ত্র-শাস্ত্রের দশমহাবিদ্যা—ষোড়শীদেবী বা ত্রিপুরাসুন্দরীও—বেদবিরোধী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদেরই যে কল্পিত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর কি তবে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের ষোড়শীদেবীরই উপাসনা করিতেন? ঔন্ধ-রাজধানী হইতে মুদ্রিত হইয়া ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ঋগ্‌বেদের খিলসূক্তে [খ. অ. ৪-৪-৩৪] [ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তে] এক শ্রীসূক্ত কথিত হইয়াছে। এই সূক্তোক্তা শ্রীদেবী বৈদিকী দেবতা, বৌদ্ধকল্পিতা ষোড়শী দেবী নহেন।

৭৩। শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ-প্রসঙ্গ

এক্ষণে "শ্রীশ্রীচণ্ডী"-গ্রন্থসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে। অপৌরুষেয় অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। শাক্ত তান্ত্রিকেরা এই ত্রয়োদশ অধ্যায়কে পৃথক্ এক গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়া তাঁহার নাম দিয়াছেন—শ্রীশ্রীচণ্ডী। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঐ অধ্যায়গুলির নাম হইতেছে—দেবীমাহাত্ম্য। অবশ্য ইহার "শ্রীশ্রীচণ্ডী"-নাম অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কেননা, ইহাতে চণ্ডীমাহাত্ম্যই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা বৈদিক গ্রন্থ।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী-ভূমিকায় একস্থলে লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমূলা (৯ পৃষ্ঠা)।" কিন্তু তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন—"পুরাণের অংশ হইলেও চণ্ডী তন্ত্রশাস্ত্ররূপে গৃহীত (২৬ পৃষ্ঠা)।" তান্ত্রিকেরা বাস্তবিক তন্ত্রমতের অনুসরণেই শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টাও তাঁহারা করেন নাই। অধিকন্তু প্রতি অধ্যায়ের উপক্রমেই তান্ত্রিকী দেবতা-বিশেষের ধ্যানাদিও অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন; অর্থাৎ চণ্ডীতে এমন বিষয়ও প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণে দৃষ্ট হয় না। এইরূপে তান্ত্রিকেরা বৈদিকগ্রন্থ চণ্ডীকে বাস্তবিক বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থরূপেই পরিণত করিয়াছেন।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার চণ্ডী-ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রক্ষিপ্ত নহে, উক্ত পুরাণের প্রকৃত অংশ, অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নানা যুক্তিদ্বারা তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন (২৫ পৃষ্ঠা)।" মার্কণ্ডেয় পুরাণ অপৌরুষেয় বলিয়া এবং চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রকৃত অংশ বলিয়া, চণ্ডীও হইবে—অপৌরুষেয়। কিন্তু স্বামীজী তাঁহার চণ্ডীভূমিকায় (২৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী নর্মদা অঞ্চলে বা উজ্জয়িনীতে উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ঐতিহাসিক যুক্তিদ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বাংলাদেশেই চণ্ডীর জন্মস্থান।"

নর্মদা অঞ্চলে বা বাংলাদেশে চণ্ডীর উদ্ভব—একথা স্বীকার করিলে, চণ্ডী হইয়া পড়ে—একখানি পৌরুষেয় গ্রন্থ এবং চণ্ডীর মূল গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণও হইয়া পড়ে পৌরুষেয় গ্রন্থ। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতেছে অপৌরুষের অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ছান্দোগ্যশ্রুতি পুরাণ এবং ইতিহাসকে (মহাভারতকে) পঞ্চমবেদ বলিয়াছেন। আধুনিককালের কোনও কোনও গবেষকও বেদপুরাণাদি বৈদিক গ্রন্থের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু জৈমিনি হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বলদেববিদ্যাভূষণও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতিও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥ বৃহদারণ্যক-শ্রুতি॥ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৭।১।২॥" মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায়, অপৌরুষেয় পুরাণ একখানিই, তাহাতে শ্লোকসংখ্যা শতকোটি (মৎস্য পু.॥ ৫৩।৪)—দেবলোকে বিদ্যমান। প্রতি দ্বাপরে ব্যাসরূপে ভগবান্ সেই পুরাণ হইতে চারি লক্ষ শ্লোক লইয়া অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভূর্লোকে প্রচার করেন (মৎস্য॥ ৫৩।৮-১১)। সুতরাং এই অষ্টাদশ মহাপুরাণও অপৌরুষেয় এবং ছান্দোগ্যবাক্যানুসারে পঞ্চমবেদ এবং এতাদৃশ অষ্টাদশ

মহাপুরাণের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং তদন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীও অপৌরুষেয় এবং পঞ্চমবেদতুল্য এবং নিত্য। "অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥" এই ১।৩।২৯-ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও বেদের নিত্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের সহায়তায় বেদের নিত্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বেদ এবং পঞ্চমবেদ যদি পৌরুষেয়, অর্থাৎ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির লিখিতই হয়—ভগবানের কথিত না হয়, তাহা হইলে সাধক কোন্ ভরসায় সাধন-পথে অগ্রসর হইবেন? এই সংসারের লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা এবং তাঁহাদের চিন্তাপ্রসূত তথ্যই লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁহারা যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের অতীত, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহাদের অভিজ্ঞতা তো দিক্‌সম্বন্ধে দিগ্‌ভ্রান্ত লোকের অভিজ্ঞতার তুল্যও হইতে পারে এবং তাঁহাদের চিন্তা-প্রসূত তথ্যও ভ্রমাত্মক হইতে পারে। কিন্তু বেদাদি অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতেছে ভগবানেরই উক্তি—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ববিৎ এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়ের অতীত। তাঁহাকে পাওয়ার উপায় তিনিই বলিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। এ-সমস্ত যাঁহারা বিশ্বাস করেন, অপৌরুষেয় বেদাদি-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারাই অকুতোভয়ে সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারেন। পৌরুষেয় কোনও শাস্ত্রই এইরূপ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। সাধকের পক্ষে কোন্ শাস্ত্র অনুসরণীয়, গণভোটের দ্বারাও তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। পরমার্থভূত বস্তু গণভোটের গণ্ডীর অতীত।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার না করাই হইতেছে বেদের সর্বাতিশায়ী প্রামাণ্য স্বীকার না করা। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ যে বেদের এতাদৃশ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহার উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁহার পূর্বকথিত গ্রন্থে ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তের আলোচনা করিয়া, ২১ পৃষ্ঠায়, লিখিয়াছেন—"বস্তুতঃ আর্য্যেতর জাতির মাতৃকাদেবী এই সূক্তেই সর্ব্বপ্রথম লিখিতভাবে আর্য্য-দর্শনসুলভ ব্যক্তাব্যক্ত সূক্ষ্মতায় অভিষিক্ত হইয়া পরমাত্মা ব্রহ্মের মত দিব্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে তিনি একই আধারে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মকঃ তান্ত্রিক শক্তিসিদ্ধান্তের ইহাই প্রথম লিখিত প্রকাশ।" অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তাঁহার মতে আর্যেতর জাতির তান্ত্রিক শক্তি-সিদ্ধান্তের রহস্যই ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে গ্রথিত হইয়াছে; সুতরাং আর্যেতর জাতিকর্তৃক শক্তিসাধনার পরেই ঋগ্‌বেদ লিখিত হইয়াছে। অতএব বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য নহে। বস্তুতঃ তান্ত্রিকেরা বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং প্রমাণ-শিরোমণিত্বই স্বীকার করেন না। তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁহারা যদি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বেদকথিত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবৎ-স্বরূপেরই উপাসনা করিতেন, বৌদ্ধকল্পিত তান্ত্রিকী দেবীর উপাসনা করিতেন না এবং বেদকথিত ভগবৎ-স্বরূপসমূহের অপকর্ষও খ্যাপন করিতেন না, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তান্ত্রিকী অর্গলাদেবীর স্তুতিও করাইতেন না। "কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্‌ভক্ত্যা সদাম্বিকে। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ অর্গলাস্তোত্র ॥ ২১ ॥"

বেদবিহিত পন্থায় বেদকথিত দুর্গা বা চণ্ডীর উপাসনায় সাধক মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। কিন্তু পৌরুষেয় তন্ত্রের সহায়তায় তান্ত্রিকেরা শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থকে তন্ত্রগ্রন্থে পরিণত করিয়াছেন। এজন্যই

তাঁহারা বলেন—পুরাণের অংশ হইলেও শ্রীশ্রীচণ্ডী তন্ত্রগ্রন্থরূপে গৃহীত। বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থরূপে পরিণত শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুসরণ পরমার্থ-কামী সাধকের পক্ষে কর্তব্য কিনা, তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

৭৪। আলোচনার সারমর্ম

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের কয়েকটি উক্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধে কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন। সেজন্যই তন্ত্রসম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা হইল। আমাদের প্রবন্ধটি একটু দীর্ঘই হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সকল কথা বলা হয় নাই। তথাপি, আর অধিক আলোচনা হইতে আমরা বিরত হইলাম। এই আলোচনা হইতে যাহা জানা যায়, তাহার সারমর্ম এ-স্থলে কথিত হইতেছে।

(১) চারিবেদ এবং পঞ্চম-বেদস্বরূপ পুরাণ ও ইতিহাস (মহাভারত) অপৌরুষেয়, ভগবৎকথিত—সুতরাং সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য।

(২) বেদমতে—যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম ; যাহা বেদবহির্ভূত, বা বেদবিরুদ্ধ, তাহা অধর্ম।

(৩) বেদমতে—বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ পন্থা মোক্ষলাভের প্রতিকূল।

(৪) তন্ত্র দুই রকমের—বেদানুগত এবং বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ। বৈদিক গ্রন্থে উল্লিখিত তন্ত্র হইতেছে বেদানুগত তন্ত্র।

(৫) আদি শৈবতন্ত্র বা শিবাগম শ্রীশিবের প্রচারিত হইলেও ভগবদ্‌বহির্মুখতা-সাধক—সুতরাং বেদবিরুদ্ধ।

(৬) শাক্তত‌ন্ত্র হইতেছে বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত—সুতরাং বেদবিরুদ্ধ ; অপৌরুষেয় নহে, বিভিন্ন লোকের লিখিত।

(৭) শাক্ততন্ত্রের দশমহাবিদ্যা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত—সুতরাং অবৈদিকী দেবতা।

(৮) হিন্দুতন্ত্রের অনেক মন্ত্র হইতেছে বৌদ্ধতন্ত্রে দৃষ্ট মন্ত্রের অপভ্রংশ। দেবীর কালী, উগ্রা, বজ্রা প্রভৃতি অষ্টরূপের মন্ত্রাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত।

(৯) বৈদিক শাস্ত্রকথিত চণ্ডী, কালী, কাত্যায়নী, চামুণ্ডা প্রভৃতি শক্তিদেবীগণ, শাক্ততন্ত্রকথিত তত্তৎ নামীয় দেবীগণ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন।

(১০) বৈদিক শাস্ত্রকথিত কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাম, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ভগবৎস্বরূপগণও তন্ত্রশাস্ত্রকথিত তত্তৎ নামীয় ভগবৎস্বরূপগণ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন—আকার-সাদৃশ্যসত্ত্বেও ভিন্ন। বৈদিক ভগবৎস্বরূপগণ—মায়াস্পর্শহীন, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তন্ত্রশাস্ত্রকথিত ভগবৎস্বরূপগণ কিন্তু মায়িক।

(১১) শাক্ত তান্ত্রিকদের উপাস্যা, পতি-শিবের বুকের উপরে দণ্ডায়মানা এবং বেদবিরোধী বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের কল্পিতা কালী বেদিকী দেবতা নহেন।

(১২) শৈব-তান্ত্রিকদের কথিত শিব এবং শাক্ত-তান্ত্রিকদের উপাস্যা কালীও বেদকথিত জগৎ-কারণ ব্রহ্ম নহেন।

(১৩) শাক্ততন্ত্রে যে-কতিপয় বৈদিক ভগবৎ-স্বরূপকে, এমন কি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও, বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধতন্ত্র-কথিত মহাবিদ্যাদের অবতার বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে বেদবিরুদ্ধ।

(১৪) তান্ত্রিকদের কথিত দেবীর দশমহাবিদ্যারূপের প্রকটন-বিবরণ এবং একান্ন পীঠের উৎপত্তি-বিবরণ কোনও বেদানুগত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। ঋগ্‌বেদ এবং অপৌরুষেয় স্কন্দপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তান্ত্রিকেরা কিন্তু শ্রীক্ষেত্রকে একটি পীঠস্থান এবং শ্রীজগন্নাথকে ভৈরব (শিব) বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

(১৫) তান্ত্রিকদের ষট্‌চক্র-ভেদমূলক সাধন বেদসম্মত নহে, পরন্তু বেদবহির্ভূত ; সুতরাং এইরূপ সাধন হইতেছে বেদমতে মোক্ষলাভের প্রতিকূল।

(১৬) তান্ত্রিকসাধনে কতকগুলি অলৌকিকী শক্তি লাভ করা যায় ; কিন্তু এ-সকল অলৌকিকী শক্তি পারমার্থিকী শক্তি নহে, পরমার্থ-লাভের অনুকূলও নহে।

(১৭) সাধারণতঃ, শৈবতান্ত্রিকদের সাধনকে "যোগ" এবং শাক্ততান্ত্রিকদের সাধনকে "জ্ঞান বা জ্ঞানমার্গ' বলা হয়। এই "জ্ঞান" এবং "যোগ" কিন্তু বেদানুগত শাস্ত্রকথিত "জ্ঞান" এবং "যোগ" নহে।

(১৮) যাঁহারা চারিবেদ এবং পঞ্চম বেদস্বরূপ পুরাণেতিহাসের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের এতাদৃশ অভিমত ব্যাসদেবের এবং কোনও বেদান্তাচার্যেরই সম্মত নহে। বেদ অপৌরুষেয় না হইলে, পরমার্থকামী সাধকের পক্ষে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য কোনও অবলম্বনই থাকিতে পারে না।

(১৯) শাক্ত তান্ত্রিকেরা বেদমূলক শ্রীশ্রীচণ্ডী-গ্রন্থকে লৌকিক তন্ত্রগ্রন্থে রূপায়িত করিয়াছেন।

(২০) তান্ত্রিক দেবদেবীগণ তান্ত্রিকদেরই কল্পিত, তাঁহাদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

৭৫। তৎকালে তন্ত্রের প্রভাব (৭৫-৭৬-অনুচ্ছেদ)

এক্ষণে তৎকালে তন্ত্রের প্রভাবসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু স্থানে লিখিয়াছেন, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে এবং পরেও তৎকালীন লোকদিগের ধর্ম-কর্মের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল বাশুলীর (বা বাসুলীর) পূজা।

বাশুলী বা বাসুলী শব্দটি হইতেছে বচ্ছলী বা বাসলী শব্দের অপভ্রংশ। বচ্ছলী হইতেছেন এক বৌদ্ধদেবতা। নেপালে তাঁহার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। মহাবিদ্যা-প্রসঙ্গে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত তন্ত্রসারের উক্তি হইতে জানা যায়, কোনও তন্ত্র অনুসারে বাসলী হইতেছেন এক মহাবিদ্যা। বৌদ্ধদেবতা বচ্ছলীই বোধ হয় হিন্দুতন্ত্রে আসিয়া বাসলী (বা বাসুলী) হইয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, বাশুলী হইতেছে বিশালাক্ষী শব্দের অপভ্রংশ। তদনুসারে বাশুলীর পূজা হইতেছে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা। তন্ত্রসার-গ্রন্থ (৬১১, ৬১২ পৃষ্ঠা) হইতে জানা যায়, বিশালাক্ষী হইতেছেন এক তান্ত্রিকী দেবতা—মুণ্ডমালিনী এবং শবরূপ শিবোপরি উপবিষ্টা। তাঁহার "শিবের উপরে উপবেশন" হইতেই জানা যায়, তিনি বৈদিকী দেবতা নহেন। ইনি শাক্ত-তন্ত্রকথিতা দেবতা।

তান্ত্রিকী দেবতা বাসুলীর পূজা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা হইতেই তৎকালে নবদ্বীপে এবং বঙ্গদেশেও তন্ত্রের প্রভাবের কথা জানা যায়।

ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রভু যখন শ্রীবাসগৃহে কীর্তন করিতেন, তখন তাঁহার প্রেম-হুঙ্কার শুনিয়া পাষণ্ডিগণ বলিতেন—"নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া॥ এ-গুলা সকল মধুমতী-সিদ্ধি জানে। রাত্রি

করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে ॥ ২।৮।১১৯-২০ ॥” মহাপ্রভু বহির্দ্বার বন্ধ করাইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবাসগৃহে কীর্তন করিতেন। তাহাতে পাষণ্ডীরা বলিতেন—“আরে ভাই সব হেতু পাইল। দ্বার দিয়া কীর্তনের সন্দর্ভ পাইল ॥ রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে। নানাবিধ দ্রব্য আইসে তাসভার সনে ॥ ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন। খাইয়া তা-সভাসঙ্গে বিবিধ রমণ ॥ ভিন্ন লোক দেখিলে—না হয় তার সঙ্গ। এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা-রঙ্গ ॥ ২।৮।২৪২-৪৫ ॥” এই দুইটি উদ্ধৃতিতেই মধুমতী সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। মধুমতী হইতেছেন এক তান্ত্রিকী দেবী। তন্ত্রসার-গ্রন্থের ৩৭৪, ৬৪৮ পৃষ্ঠায় তাঁহার মন্ত্রাদি দৃষ্ট হয়। তন্ত্রসার গ্রন্থ হইতে (৬৪৮-৪৯পৃঃ) জানা যায়, “মধুমতী দেবীর পূজা ও মন্ত্র জপ করিলে দেবী সাধককে দর্শন দেন এবং রতি ও ভোজনদ্রব্য দ্বারা সাধককে পরিতোষিত করেন এবং দেবকন্যা, দানবকন্যা, গন্ধর্বকন্যা, বিদ্যাধরকন্যা, যক্ষকন্যা, রাক্ষসকন্যা, বিবিধ রত্নভূষণ এবং চর্ব্যচূষ্যাদি বিবিধ দিব্য ভক্ষ্যদ্রব্য প্রতিদিন প্রদান করিয়া থাকেন। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে যে-সকল বস্তু বিদ্যমান আছে, দেবী সাধকের আজ্ঞানুসারে তৎসমুদয় আনিয়া সাধককে প্রদান করেন। তিনি প্রতি দিন সাধকের সহিত ক্রীড়াকৌতুকাদি করিয়া থাকেন। ইহার মন্ত্র—‘প্রণব, মায়াবীজ, ‘আগচ্ছ অনুরাগিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা’—এই মন্ত্র সকল কার্যে সিদ্ধি প্রদান করে। এই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী মধুমতী দেবী অতি গোপনীয়া।”

মধুমতী দেবী অত্যন্ত গোপনীয়া বলিয়া, যাঁহারা মধুমতীসিদ্ধির জন্য সাধন করেন, তাঁহারাই এই সাধনের এবং তাহার ফলের রহস্য জানিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। সুতরাং উল্লিখিত উদ্ধৃতিদ্বয় যাঁহাদের উক্তি, তাঁহারা যে শাক্ত-তন্ত্রসাধক ছিলেন, তাহাই বুঝা যায়। ইহাদ্বারা তৎকালে তন্ত্রের প্রভাবের কথাই জানা যায়।

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন, শচীদেবীর একটি পুত্র জন্মিয়াছেন শুনিয়া অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী বহু উপঢৌকন লইয়া নবদ্বীপে মিশ্রগৃহে উপনীত হইলেন এবং “দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কাণ, বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ সর্ব অঙ্গ সুনির্মাণ, সুবর্ণপ্রতিমা ভাণ, সর্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়। বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখি পাইল বহু প্রীতি, বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ দুর্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে, ‘দীর্ঘজীবী হও দুই ভাই।’ ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল ‘নিমাই’ ॥ চৈ. চ. ১।১৩।১১৪-১৬ ॥” সীতাঠাকুরাণী ডাকিনী-শাকিনীকে অপদেবতা মনে করিয়াই তাহাদের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া ভয় পাইয়াছিলেন; সেজন্য তিনি বালকের নাম রাখিয়াছিলেন “নিমাই”। শ্রীলবৃন্দাবনদাসও লিখিয়াছেন, শচীনন্দনের নামকরণ-সময়ে পতিব্রতা রমণীগণ বলিয়াছিলেন—“ইহান্ অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যাপুত্র নাঞি। শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি ॥ ১।৩।৪৫ ॥” প্রভুর পূর্বে শচীমাতার আটটি কন্যা জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছিলেন। পতিব্রতা রমণীগণ বোধ হয়, সীতাঠাকুরাণীর কথা মনে করিয়াই, মনে করিয়াছিলেন—ডাকিনী শাকিনী প্রভৃতির দৃষ্টিতেই কন্যাগণ বাঁচিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পরে বিশ্বরূপের জন্ম। ডাকিনী শাকিনী প্রভৃতি অপদেবতার দৃষ্টি শচীদেবীর অষ্টকন্যার উপরে পতিত হইয়াছিল; কিন্তু এই নবজাত শিশুর উপর যেন পতিত না হয়, সে জন্যই তাঁহারা বালকের “নিমাঞি” নাম রাখার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। (নিমাঞি—নিমের মতন তিক্ত; সুতরাং তাঁহার প্রতি অপদেবতাদের লোভ জন্মিবে না। ইহাই বোধ হয় ছিল পতিব্রতাদের

মনোভাব। যাহা হউক) বিদ্বান্‌গণ তাঁহাদের প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—"এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে। দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥ জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে। পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥ অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম। কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥ 'নিমাঞি' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ। সেহো নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্বজন॥ ১।৩।৪৭-৫০॥" বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণও পতিব্রতাগণের প্রস্তাবিত নামের অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন এই "নিমাঞি" নামেই সকলে বালককে ডাকিবেন। ইহাতে বুঝা যায়, পতিব্রতাগণের চিত্তে অপদেবতা হইতে যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের চিত্তেও সেই আশঙ্কা জাগিয়াছিল। অথচ এই ব্রাহ্মণগণ ছিলেন বেদানুগত এবং পতিব্রতাগণও ছিলেন বেদানুগত ব্রাহ্মণদের গৃহিণী।

কিন্তু তন্ত্রসার গ্রন্থের ৯৮১ পৃষ্ঠা হইতে জানা যায়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, পরশিব, সাবিত্রী, মহালক্ষ্মী, ভদ্রকালী, ভুবানেশ্বরী, ডাকিনী, রাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি হইতেছেন শাক্ত-তান্ত্রিকদের কল্পিত ষট্‌চক্রদেবতা। সুতরাং ডাকিনী, শাকিনীও তান্ত্রিকী দেবতা। বেদানুগত ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণীগণ তাঁহাদিগকে অনিষ্টকারিণী অপদেবতা মনে করিলেও, স্পষ্টই বুঝা যায়, তৎকালে শাক্ত তন্ত্রের প্রভাব রূপান্তরিত ভাবে বেদানুগত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল।

পূর্ববর্তী ৫৭-চ-অনুচ্ছেদে কথিত ললিতপুরের মদ্যপ বামাচারী সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ হইতেও বাংলাদেশে শাক্ত তন্ত্রের প্রভাবের কথা এবং সেই অনুচ্ছেদেই কথিত বাঁশধায়-পথে শাক্ত-সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ হইতে উড়িষ্যায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও শাক্ত-তন্ত্রের প্রভাবের কথা জানা যায়।

তৎকালে দেশের ধর্মসম্বন্ধীয় অবস্থার কথা বলিতে গিয়া বৃন্দাবনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের একস্থলে লিখিয়াছেন—"যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। ইহা শুনিতেই সর্বলোক আনন্দিত॥ ৩।৪।৪১২॥" এ-স্থলে যে যোগীদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা ছিলেন তান্ত্রিক শৈবযোগী (৩।৪।৪১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সমস্ত লোকই এই তান্ত্রিক শৈবযোগীদের গীত শুনিতে আনন্দ পাইতেন। ইহাদ্বারা, শৈবতন্ত্রের প্রভাব যে খুব ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল, তাহাই বুঝা যায়।

পূর্ববর্তী ৫৭-চ-অনুচ্ছেদে কবিকর্ণপূরের নাটক হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতেও তৎকালীন তান্ত্রিকদের কথাই যে বলা হইয়াছে, শ্লোকগুলি হইতেই তাহা জানা যায়।

তৎকালে বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে, বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাব যে অত্যন্ত ব্যাপক ছিল, এই আলোচনা হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা গেল। পরবর্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতেও তাহা জানা যাইবে।

৭৬। কীর্তনাদি সম্বন্ধে তৎকালীন তান্ত্রিকদের মনোভাব ও আচরণ।

তৎকালীন নবদ্বীপের তান্ত্রিকেরাই যে কীর্তনের বিরোধিতা করিতেন এবং কীর্তনকারীদের সম্বন্ধে নানা-বিধ-দুর্বচন বলিতেন, এই অনুচ্ছেদে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

কীর্তন ও কীর্তনকারী ভক্তদের প্রতি যাঁহারা দুর্ব্যবহার করিতেন, শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের প্রায় সর্বত্রই তাঁহাদিগকে "পাষণ্ড" বা "পাষণ্ডী" বলিয়াছেন। ইহার হেতু জানিতে হইলে

"পাষণ্ড"-শব্দের অর্থ জানা দরকার। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে "পাষণ্ড"-শব্দের অর্থ যাহা লিখিত হইয়াছে, এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

"পাষণ্ডঃ—বেদবিরুদ্ধাচারবান্। সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারী। বৌদ্ধক্ষপণকাদিঃ। ইতি ভরতঃ॥ তৎপর্য্যায়ঃ—সর্ব্বলিঙ্গী ২। ইত্যমরঃ॥ কৌলিকঃ ৩ পাষণ্ডিকঃ ৪ ইতি শব্দরত্নাবলী॥" ইহার পরে বিষ্ণুপুরাণের ৩।১৮ অধ্যায়ের কয়েকটি প্রমাণ এবং স্বামিপাদের টীকা উদ্ধৃত করিয়া পাষণ্ডদের দর্শন-স্পর্শনাদি এবং তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপাদিও যে নিষিদ্ধ, তাহা কথিত হইয়াছে। তাহার পরে পাদ্মোত্তরখণ্ডের ৪২ অধ্যায় হইতে, ভগবতীর প্রতি সদাশিবের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও পাষণ্ডদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে পাষণ্ড হইতেছেন— (১) অজ্ঞানমোহিত যে-সকল লোক, জগদ্‌বন্দ্য নারায়ণকে পরতত্ত্ব না বলিয়া অন্য দেবকে পরতত্ত্ব বলেন, তাঁহারা পাষণ্ডী। "যেঽন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্য জ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাৎ জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥", (২) যাঁহারা কপালভস্মাস্থিধারী, অবৈদিকলিঙ্গ (চিহ্ন)-ধারী, বানপ্রস্থব্যতীত জটাবল্কলধারী, অবৈদিক ক্রিয়ারত, তাঁহারা পাষণ্ডী। "কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ। ঋতে বনস্থাশ্রমাশ্চ জটাবল্কলধারিণঃ। অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥", (৩) যে-সকল দ্বিজ শ্রীহরির প্রিয়তম-শঙ্খ-চক্র-উর্ধ্বপুণ্ড্রাদি চিহ্ন-বর্জিত, তাঁহারাও পাষণ্ডী। "শঙ্খচক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥", (৪) যে-দ্বিজ শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত আচারের পালন করেন না, তিনি পাষণ্ডী এবং সর্বলোক-গর্হিত। "শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেষু গর্হিতঃ॥", (৫) সর্বযজ্ঞভোক্তা ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া যিনি দেবতার হোম করেন, বা দান করেন, অথবা যিনি (বৈদিক) কর্মসমূহে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, তিনি পাষণ্ডী। "সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতম্। উদস্য দেবতাশ্চৈব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্মসু॥", (৬) ভগবৎপ্রীতির সহিত না করিয়া যাঁহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া বেদকথিত মহৎ কার্য করেন, তাঁহারাও পাষণ্ডী। "স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে যৈস্তু কর্ম বেদোদিতং মহৎ। বিনা বৈ ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥", (৭) ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-দেবগণের সহিত যিনি নারায়ণদেবকে সমান দেখেন, তিনি সর্বদাই পাষণ্ডী হয়েন। "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বিক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥", (৮) যে-দ্বিজ মনোবাক্য-কায়কর্মদ্বারা অনাস্থা (পোষণ) করেন, বাসুদেবকে জানেন না, তিনি পাষণ্ডী। "অনাস্থা ক্রিয়তে যৈস্তু মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ। বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ দ্বিজঃ॥", (৯) শ্রীহরির নাম-মন্ত্রবর্জিত এবং সজ্জনকর্তৃক বর্জিত লোকগণ পাষণ্ডী। "হরের্নামকমন্ত্রাভ্যাং লোকাঃ সদ্ভির্বিবর্জ্জিতাঃ। যদি বর্ণাশ্রমাস্থা যে তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥" ইহার পরে বলা হইয়াছে—বর্ণসমূহের গুরুগণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ) যদি অবৈষ্ণব হয়েন, ভগবদ্‌ধর্ম রহিত হয়েন, বৈষ্ণব-নিন্দক হয়েন, জীবহিংসক এবং জীব-ভক্ষক হয়েন, এবং যাঁহারা নারায়ণ বহির্মুখ, তাঁহারাও পাষণ্ডী। ইত্যাদি।

শ্রীসদাশিবের উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বীরাও পাষণ্ড। বিশেষতঃ, শব্দকল্পদ্রুম হইতেই জানা যায়, পাষণ্ড-শব্দের একটি অর্থ—বেদবিরুদ্ধাচারবান্ এবং আর একটি অর্থ—কৌলিক। কৌলিক এবং কৌল একই। পূর্বোক্ত সপ্ততীর্থ-মহোদয়ের "তন্ত্রপরিচয়" হইতে (৫২ পৃষ্ঠা) জানা যায়—বামাচারের সাধনা পঞ্চ-ম-কারের যোগে করণীয়। মেরুতন্ত্রে পাঁচ প্রকার

বামমার্গের উল্লেখ রহিয়াছে, তন্মধ্যে "কৌলিক" হইতেছে একটি বামমার্গ। কৌল-শব্দপ্রসঙ্গে শব্দকল্পদ্রুমের উক্তি হইতে জানা যায়, কুলার্ণবতন্ত্র এবং মহানীলতন্ত্রেও কৌলদের উল্লেখ আছে। সুতরাং কৌলিক বা কৌল যে বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বী, তাহাই জানা গেল। পাষণ্ড-শব্দের সাধারণ অর্থ—"বেদবিরুদ্ধাচারবান্"-হইতেও তাহাই জানা যায়। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বীরাও পাষণ্ড।

এক্ষণে কীর্তনাদির বিরুদ্ধাচরণকারী লোকদের সম্বন্ধে, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে।

প্রভু যখন অধ্যাপক, তখনও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নাই, প্রেমভক্তিও প্রচার করেন নাই। জগতের বহির্মুখতা দেখিয়া ভক্তগণের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ। "হাথে তালি দিয়া বা সকল ভক্তগণ। আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন ॥ ১।১১।৯.॥" ভক্তদের এই কীর্তন শুনিয়াও বহির্মুখ লোকগণ উপহাস করিয়া বলিতেন—"ইহারা কি কার্য্যে ডাক্ ছাড়ে উচ্চ স্বরে ॥ আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন। দাস প্রভু ভেদ বা করেন কি কারণ ॥ ১।১১।১০-১১ ॥" এই উক্তিগুলি যাঁহাদের, তাঁহারা কোন্ মতাবলম্বী ছিলেন, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে মায়াবাদাচার্য শ্রীপাদ শঙ্করের সহিত তান্ত্রিকদের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। শঙ্করের কল্পিত ব্রহ্মও সর্বতোভাবে নির্বিশেষ, তান্ত্রিকদের কল্পিত ব্রহ্মও তদ্রূপ। শঙ্করের মতেও জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদই নাই, তান্ত্রিকদের মতেও জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। উভয় মতেই ভগবৎস্বরূপগণ মায়িক বিগ্রহ। মায়াবাদীও বলেন "আমি ব্রহ্ম", তান্ত্রিকও বলেন "আমি ব্রহ্ম"। জীব-ব্রহ্মে অভেদ মনে করিয়া মায়াবাদীরাও ব্রহ্ম ও জীবে সেব্য-সেবক-ভাব স্বীকার করেন না, তান্ত্রিকেরাও স্বীকার করেন না। উপরে উদ্ধৃত উক্তিতে বলা হইয়াছে, "আমি ব্রহ্ম" এবং "দাস প্রভু ভেদ বা করেন কি কারণ"। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই সমস্ত কি কোনও মায়াবাদীর উক্তি? না কি কোনও তান্ত্রিকের উক্তি?

সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতে কেবলমাত্র দুইটিস্থলে একজন মায়াবাদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—২।৩।৩৭-৩৮ পয়ারে এবং ২।২০।৩৩-৩৪ পয়ারে। সেই মায়াবাদী হইতেছেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী, থাকিতেন কাশীতে, বাংলা দেশের বাহিরে। নবদ্বীপে, বা বাংলাদেশের মধ্যে, অবস্থিত কোনও মায়াবাদীর কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় না। ইহাতে বুঝা যায়, তৎকালে নবদ্বীপে বা বাংলাদেশে মায়াবাদের বিশেষ প্রভাব ছিল না। সুতরাং উল্লিখিত উক্তিগুলিও মায়াবাদীদের উক্তি বলিয়া মনে হয় না। উল্লিখিত উক্তিগুলির মধ্যে একটি উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, এ-সমস্ত মায়াবাদীদের উক্তি নহে। সেই উক্তিটি হইতেছে—"আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।" —অর্থাৎ "আমার (অর্থাৎ আমার দেহের) মধ্যেই নিরঞ্জন ব্রহ্ম বাস করেন।" মায়াবাদীরা "আমি ব্রহ্ম" বলেন, কিন্তু "আমার দেহের মধ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম বাস করেন"—এ-কথা বলেন না। তাঁহারা দেহের বাস্তব অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়, কিংবা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, দেহের বাস্তব অস্তিত্বের বুদ্ধিকে ভ্রমমাত্র মনে করেন। তান্ত্রিকেরা কিন্তু দেহের মধ্যে কোনও এক স্থলে যে তাঁহাদের কল্পিত "নিরঞ্জন বন্ধ" বিরাজিত, তাহা স্বীকার করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তান্ত্রিকদের মতে, সহস্রারের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থিত বিন্দুচক্রে পরশিব বিরাজিত। এই পরশিব হইতেছেন মায়াতীত অর্থাৎ নিরঞ্জন ব্রহ্ম। বিন্দুচক্রও জীবের দেহের মধ্যেই অবস্থিত; সুতরাং

বিন্দুচক্রস্থিত পরশিব বা নিরঞ্জন ব্রহ্মও জীবের দেহের মধ্যেই অবস্থিত। এইরূপে দেখা গেল—উপরে উদ্ধৃত চৈ. ভা. ১।১১।১১-১২ পয়ারের উক্তিগুলি হইতেছে তান্ত্রিকদের উক্তি।

"আমি ব্রহ্ম"—এইরূপ মনে করিয়া, তান্ত্রিক সাধনে কিছু শক্তি অর্জন করিলে, কোনও কোনও তান্ত্রিক নিজেকে ভগবান্ বলিয়াও প্রকাশ করেন এবং তাঁহার অনুগত লোকেরাও তাঁহার ভগবত্তা প্রচার করিতে থাকেন এবং তাঁহার ভগবত্তার উৎকর্ষ খ্যাপনের উদ্দেশ্যে বেদকথিত পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেরও তাহা অপেক্ষা অপকর্ষ কীর্তনেও মুখর হইয়া পড়েন। এতাদৃশ ভগবান্ অবশ্য "তান্ত্রিক ভগবান্", বৈদিক ভগবান্ নহেন। বৈদিক ভগবানের লক্ষণ এই তান্ত্রিক ভগবানে দৃষ্ট হয় না। বেদকথিত স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তান্ত্রিক ভগবান্ মায়িক বিগ্রহবিশিষ্ট। বেদকথিত স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন—বিজর (জরা বা বার্ধক্যহীন), বিমৃত্যু (মৃত্যুহীন), অপহতপাপ্‌মা (পাপহীন) (ছান্দোগ্য শ্রুতি), এবং অনাময় (নীরোগ) (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি)। কিন্তু তান্ত্রিক ভগবানের জরা আছে, মৃত্যু আছে, রোগ আছে, রোগ পাপের ফল বলিয়া রোগের অস্তিত্বে পাপের অস্তিত্বও সূচিত হইতেছে। জরাব্যাধিগ্রস্ত এমন তান্ত্রিকও আছেন, যিনি নিজমুখে নিজেকে ভগবান্ বলিয়া প্রকাশ করেন না; কিন্তু তাঁহার অনুগত লোকগণ তাঁহার সাক্ষাতেই তাঁহাকে ভগবান্ বলিলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন না, বরং সুখই অনুভব করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্র বেদবহির্ভূত, তন্ত্রকল্পিত ব্রহ্মও বেদবিরুদ্ধ এবং তন্ত্রকথিত সাধনও বেদবিরুদ্ধ। সুতরাং তান্ত্রিকেরাও বেদবিরুদ্ধাচরণকারী—সুতরাং পাষণ্ড। এ-সমস্ত কারণেই শ্রীলবৃন্দাবন-দাস কীর্তনাদির বিরোধীদিগকে "পাষণ্ড" বলিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে জানা যায়, তান্ত্রিকগণ কীর্তনকারী বৈষ্ণবদিগকে উপহাস বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণনামই কীর্তন করিতেন এবং হাতে তালি দিয়া উচ্চস্বরেই কীর্তন করিতেন। তাহাতে তান্ত্রিকেরা বলিতেন—"ইহারা কি কার্য্যে ডাক্ ছাড়ে উচ্চ স্বরে।"

মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশের পূর্ববর্তীকালের আর একটি বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইতেছে।

"এই মত ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে। সকল নদীয়া মত্ত ধনপুত্ররসে॥ শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস। কেহো বোলে 'সব পেট পুরিবার আশ॥' কেহো বোলে—'জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার। উদ্ধতের প্রায় নৃত্য, এ কোন্ ব্যভার॥' কেহো বোলে—"কত বা পঢ়িলুঁ ভাগবত। নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলুঁ পথ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত চারি-ভাইর লাগিয়া। নিদ্রা নাহি যাই ভাই! ভোজন করিয়া॥ ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে। নাচিলে কাঁদিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥' এই মত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ। দেখিলেই বৈষ্ণব—করেন সংকথন॥ ১।৭।১৮১-৮৭॥"

"সব পেট পুরিবার আশ"—এই বাক্যে কীর্তনকারী ভক্তদিগকে ভণ্ডই বলা হইয়াছে। "জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার"—এই উক্তিটি তান্ত্রিকদেরই উক্তি—শৈব তান্ত্রিকদের সাধন-পন্থাকে যোগ এবং শাক্ত তান্ত্রিকদের সাধনপন্থাকে যে জ্ঞান বলা হয়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১।৭।১৮৩-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য)। ভক্তগণ কীর্তনকালে প্রেমাবেশে নৃত্যও করেন। তান্ত্রিকেরা ইহাকে উদ্ধতের নৃত্য বলিয়াই পরিহাস করিতেন। "কত বা পঢ়িলুঁ ভাগবত"-ইত্যাদি বাক্যও অদ্ভুত। যিনি ভাগবত পড়িয়াছেন, তিনি কি জানেন না যে, ভাগবত বলিয়াছেন—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি

গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ভা. ১১।২।৪০ ॥"? "ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে"—ইত্যাদি বাক্যসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বেদানুগত শাস্ত্রমতে উচ্চকীর্তনের মহিমাই সর্বাধিক (২।২৩।৭৬ পয়ারের টীকা এবং ১।১।১১,২,৩ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃ ব্যাপারটি হইতেছে এই যে, তান্ত্রিকেরা কৃষ্ণনাম সহ্য করিতে পারেন না; উচ্চস্বরে কীর্তিত কৃষ্ণনাম কানে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের গাত্রজ্বালা এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, সেজন্য তাঁহারা সোয়াস্তির সহিত ঘুমাইতেও পারেন না। আধুনিক কালেও অন্ততঃ একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিকের কথা জানা যায়, যিনি তাঁহার দৃষ্টিগোচরভাবে হরিনামের জপও সহ্য করিতে পারিতেন না, যাঁহারা হরিনাম করিতেন, তাঁহাদিগকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতেন এবং তাঁহাদের চুরিকরার মতলব আছে বলিয়াও উপহাস করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও কীর্তনে নৃত্যাদির প্রতি এবং নৃত্যকীর্তনকারীদের প্রতিও তান্ত্রিকদের কিরূপ বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা ছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই উক্তিগুলি হইতেই তাহা জানা যায়—"কেহো বোলে—'ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য কর্ম্ম। পঢ়িয়াও এ-গুলা করয়ে হেন কর্ম্ম।' কেহো বোলে—'এগুলা দেখিতে না জুয়ায়। এ-গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥ ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে। সেহো এই মত হয়—দেখ পরতেখে॥ পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাঞি পণ্ডিত। এ-গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥' কেহো বোলে—'আত্মা বিনা সাক্ষাত করিয়া। ডাকিয়া কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥ আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন। ঘরে হারাইয়া ধন, চায় গিয়া বন॥' ২।৮।২৫২-৫৭॥"

শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চারি ভাই মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই নিজগৃহে কীর্তন করিতেন; প্রভুর আত্মপ্রকাশের পরেও শ্রীবাসের গৃহেই ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর কীর্তন চলিতেছিল। এই শ্রীবাসের প্রতি পাষণ্ডদের কিরূপ তীব্র বিদ্বেষ ছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তাহা জানা যায়। কয়েকটি উক্তি এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বের কথা। "কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা কীর্ত্তন। কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥ কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্ররসে। সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥ চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে। নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চস্বরে॥ শুনিঞা পাষণ্ডী বোলে—'হইল প্রমাদ। এ-ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥ মহাতীব্র নরপতি গ্রামের ইহার। এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার॥' কেহো বোলে—'এ বামনে এই গ্রাম হৈতে। ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে॥ এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল। অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥' এই মত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ। শুনি 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ভাগবতগণ॥ ১।২।১০৫-১২॥"

গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন কীর্তন প্রকাশ করিলেন, তখনকার কথা। "কেহো বোলে 'কিসের কীর্ত্তন কে বা জানে। এত পাক করে এই শ্রীবাস বামনে॥ মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই। 'হরি' বলি ডাক ছাড়ে যেন মহাবাই॥ মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়। রাত্রি করি ডাকিলে কি পুণ্য জনময়॥' কেহো বোলে—'আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ। শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ॥ আজি মুঞি দেয়ানে শুনিনুঁ সব কথা। রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥ শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ। ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥ যে-তে দিগে পলাইব শ্রীবাস পণ্ডিত।

আমাসভা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥ তখনে বলিলুঁ মুঞি হইয়া মুখর। শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥ তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে। সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥' কেহো বোলে—'আমাসভের কোন দায়। শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে বা আসি চায়॥' ২।২।২২৭-৩৬॥" শ্রীবাসাদিকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই পাষণ্ডীরা রাজনৌকার গুজব রটাইয়াছিলেন।

পাষণ্ডীরা প্রভুকেও রাজভয় দেখাইয়াছিলেন। "পাষণ্ডী সকল বোলে—'নিমাঞি পণ্ডিত। তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥ লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন। দেখিতে না পায় লোক শাঁপে অনুক্ষণ॥ মিথ্যা নহে লোকবাক্য সম্প্রতি ফলিল। সুহৃদ্‌জ্ঞানে সে কথা তোমারে কহিল॥' ২।১৭।৭-৯॥"

আবার, "কেহো বোলে—'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব। যত দেখ হের পেটপোষাগুলা সব॥' কেহো বোলে—'এগুলার বান্ধি হাথ-পায়। জলে ফেলি, জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়॥' কেহো বোলে—'আরে ভাই! জানিহ নিশ্চিত। গ্রামখানি লুটাইব নিমাঞি পণ্ডিত॥' ২।২৩।৯-১১॥"

খোলাবেচা শ্রীধরের উচ্চকীর্ত্তন শুনিয়া "যতেক পাষণ্ডী বোলে—'শ্রীধরের ডাকে। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে॥ মহাচাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে॥ ২।৯।১৪৭-৪৮॥"

পাষণ্ডীরা শ্রীধরকে ভণ্ডই মনে করিতেন। তাঁহারা গৌর-নিত্যানন্দকেও ভণ্ড মনে করিতেন। পাষণ্ডীদের উক্তি—"নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে। সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥ নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ। দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ॥ উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড'। ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥ ২।২৩।১১১-১৩॥"

তৎকালে পাষণ্ডীদের আচরণের এবং মনোভাবের সম্বন্ধে শ্রীলবৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন—"আর্য্যাতর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া। 'যতি, সতী, তপস্বীও যাইব মরিয়া॥ তারে বলি সুকৃতি, যে দোলা ঘোড়া চড়ে। দশ বিশ জন যার আগে পাছে রড়ে॥ এতে যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন। তভু ত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন॥ ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি ছাড় ডাক। ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥' ১।৫।১৮-২১॥"

"কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ। বৈষ্ণবেরে সভেই করয়ে পরিহাস॥ আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি। গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥ তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে। পাষণ্ডে পাষণ্ডে মেলি বল্‌গিয়াই মরে॥ 'এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ। ইহা সভা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥ এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে। ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥ গোসাঞির শয়ন হয় বর্ষা চারি মাস। ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥ নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইব গোসাঞি। দুর্ভিক্ষ করিব দেশে, ইথে দ্বিধা নাঞি॥' কেহো বোলে—'যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে। তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥' ১।১১।২৫০-৫৭॥"

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাস যখন ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম প্রচার করিতেছিলেন, তখন "অপরূপ শুনি লোক দুই জন-মুখে। নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে॥ 'করিব করিব' কেহো বোলয়ে সন্তোষে। কেহো বোলে—'দুইজন ক্ষিপ্ত মন্ত্রদোষে॥ তোমরাও পাগল হইয়া মন্ত্রদোষে। আমাসভা পাগল করিতে

আইস কিসে?' যেগুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার। তার বাড়ী গেলে মাত্র বোলে—'মার মার ॥ ভব্য ভব্য লোক-সব হইল পাগল। নিমাঞি পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥' কেহো বোলে—'দুই জন কিবা চোর-চর। ছলা করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর ॥ এমত প্রকট কেনে করিব সুজনে। আর বার আইলে ধরি লইব দেয়ানে ॥' শুনি শুনি নিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে। চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে ॥ ২।১৩।২০-২৭ ॥"

এইরূপ বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আরও অনেক আছে। অনাবশ্যক-বোধে আর উল্লিখিত হইল না। যে কয়টি বিবরণ উল্লিখিত হইল, তাহাতেই পরিষ্কারভাবে জানা যায়—তৎকালীন বেদবিরোধী পাষণ্ড তান্ত্রিকগণ কৃষ্ণনামের এবং কৃষ্ণকীর্তকারীদের প্রতি কিরূপ আচরণ ও উপদ্রব করিতেন। তাঁহারা কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভজন এবং কৃষ্ণনাম সহ্য করিতে পারিতেন না, উচ্চ কৃষ্ণনাম শুনিলে তাঁহাদের গাত্রজ্বালা ও অন্তর্দাহ জন্মিত, কৃষ্ণকীর্তনকারীদিগকে তাঁহারা দেশের সর্বনাশকারী বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদের ঘর ভাঙ্গিয়া গঙ্গার স্রোতে ফেলিয়া দেওয়ার কথাও বলিতেন, রাজদরবারে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সঙ্কল্পও করিতেন, তাঁহাদিগকে পেট-পোষা, চোর, চোরের চর, ভাবুক, ভণ্ড ইত্যাদি বলিতেন, এমন কি গৌর-নিত্যানন্দকেও ভণ্ড এবং দেশের অনিষ্টকারী বলিয়া মনে করিতেন, ভক্তদিগকে এবং মহাপ্রভুকে রাজভয় দেখাইতেন। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণপূজা এবং কৃষ্ণভক্তদের প্রতি এই তান্ত্রিকদের ছিল এক অসাধারণ বিদ্বেষ। তাঁহাদের মনোভাবে এবং আচরণে ভক্তগণ অত্যন্ত মনোদুঃখ পাইতেন; কিন্তু তাঁহারা সমস্তই সহ্য করিয়া যাইতেন, কখনও তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতেন না, বরং তাঁহাদের যাহাতে কৃষ্ণভক্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই প্রার্থনাই করিতেন। এজন্য ভক্তগণ ও তান্ত্রিকগণের মধ্যে দৃশ্যমান্ কোন সংঘর্ষ জন্মিত না।

৭৭। মহাপ্রভুর প্রভাবে তৎকালীন দেশের অবস্থা (১)

শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শান্তিপুরে আগমনের পথে প্রভু ফুলিয়ায় গিয়াছিলেন। সেই সংবাদ শুনিয়া প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত নবদ্বীপবাসী সমস্ত লোক ফুলিয়ার দিকে ধাবিত হইলেন। "ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিঞা। দেখিতে চলিলা সর্ব্বলোক হর্ষ হঞা ॥ কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী। আনন্দে চলিলা সভে বলি 'হরি হরি' ॥ পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিল নিন্দন। তারাও সপরিবারে করিল গমন ॥ (এই পাষণ্ডগণ বলিয়াছিলেন) 'গূঢ়রূপে নবদ্বীপে লইলেন জন্ম। না জানিঞা নিন্দা করিলাঙ তান ধর্ম্ম ॥ এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ। তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥' এই মত বলি লোক মহানন্দে যায়। হেন নাহি জানি লোক কত পথে ধায় ॥ ৩।১।১৭৬-৮১ ॥"

তারপর—"আইলা সকল লোক ফুলিয়া-নগরে। ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া 'হরি' বোলে উচ্চস্বরে ॥ শুনিঞা অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরিধ্বনি। বাহির হইলা সর্ব্বন্যাসি-শিরোমণি ॥ কি অপূর্ব্ব শোভা, সে কথন কিছু নয়। কোটিচন্দ্র যেন আসি করিল উদয় ॥ সর্ব্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে'। বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে ॥ চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোক দণ্ডবত হয়। কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥ * * ॥ দেখি গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর। সর্ব্বলোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥ তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সভারে। চলিলেন শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘরে ॥ ৩।১।১৯১-২০২ ॥"

এই বিবরণ হইতে জানা গেল—যে সকল পাষণ্ডী পূর্বে প্রভুর এবং প্রভুর প্রবর্তিত সংকীর্তন-ধর্মের নিন্দা করিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপায় তাঁহাদের চিত্তেও তীব্র অনুতাপ জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের কৃত অপরাধের খণ্ডনের নিমিত্ত তাঁহারাও ফুলিয়ায় গিয়া, পূর্বে তাঁহারা যে উচ্চ হরিসংকীর্তনের নিন্দা করিয়াছিলেন, নিজেরাও উচ্চস্বরে সেই হরিসংকীর্তন করিয়াছিলেন এবং প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রভুর মুখে "হরে কৃষ্ণ হরে হরে" নাম শ্রবণ করিয়া এবং প্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রভুর ইচ্ছা হইলে, যে প্রভুর দর্শনেই মহাপাষণ্ডও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা সেই প্রভুরই কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীলবৃন্দাবনদাস আরও লিখিয়াছেন, নীলাচল হইতে প্রভু যখন একবার গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তখন কিছু সময়ের জন্য বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শুনিয়া, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত অসংখ্য লোক সে-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে, যাঁহারা পূর্বে প্রভুর ও প্রভুর প্রচারিত সংকীর্তন-ধর্মের নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"মুঞি তান না জানেঁা মহিমা। যত নিন্দা করিয়াছোঁ, তার নাহি সীমা॥ এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে। মাগিমু—কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে।। ৩।২।৯০-৯১॥" বিদ্যাবাচস্পতির অনুগ্রহে সকলে তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন, এবং সকলেই—সেই নিন্দক পাষণ্ডগণও—মহা হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। "হরিধ্বনি শুনি পরম সন্তোষে। হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে॥ কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর। সে রূপের উপমা—সে-ই সে কলেবর।। * * দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে। 'হরি' বলি নৃত্য সভে করেন কৌতুকে॥ দণ্ডবত হই সভে পড়ে ভূমিতলে। আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বোলে॥ দুই বাহু তুলি সর্ব্বলোক স্তুতি করে। 'উদ্ধারহ প্রভু আমি সব পাপিষ্ঠেরে॥' ঈষত হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি। আশীর্ব্বাদ করেন—'কৃষ্ণেতে হউ মতি॥ বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥' সর্ব্বলোক 'হরি' বোলে শুনি আশীর্ব্বাদ। পুনঃপুন সভেই করেন স্তুতিবাদ॥ 'জগত-উদ্ধার লাগি তুমি গূঢ়রূপে। অবতীর্ণ হৈলা শচীগৃহে নবদ্বীপে॥ আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া। অন্ধকূপে পড়িলাঙ আপনা খাইয়া॥ করুণাসাগর তুমি পরহিতকারী। কৃপা কর, আর যেন তোমা না পাসরি॥' ৩।৩।৩১৪-২৭॥" নিন্দক পাষণ্ডীরাও প্রভুর কৃপায় এইভাবে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে আরও জানা যায়, মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ যখন নির্বিচারে সকল লোককে নাম-প্রেম দেওয়ার নিমিত্ত নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তখন কিছুকাল নবদ্বীপেও ছিলেন এবং ভক্তবৃন্দকে লইয়া সর্বত্র কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। নবদ্বীপে তখন নানাবিধ লোকের বাস। "তার মধ্যে দুর্জ্জনো যে কথোকথো বৈসে। সর্ব্বধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে॥ তাহারাও নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়। কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায়॥ আপনে চৈতন্য কথো করিলা মোচন। নিত্যানন্দদ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥ ৩।৫।৫২২-২৪॥"

কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সংক্ষেপে উল্লিখিতরূপ বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীলবৃন্দাবনদাসের অনুসরণেই তিনি লিখিয়াছেন, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে মহাপ্রভু ফুলিয়ায় গিয়াছিলেন। "ফুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন। কোটি কোটি লোক আসি কৈলা দরশন॥ ফুলিয়াগ্রামে কৈল

দেবানন্দেরে প্রসাদ। গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস-অপরাধ ॥ পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে। অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ চৈ. চ. ॥ ২।১।১৪২-৪৪ ॥" শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"পাষণ্ডদলন বানা নিত্যানন্দ রায় ॥ চৈ. চ. ॥ ১।৩।৬১ ॥"

ক। **তান্ত্রিকগণের বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণ ও তন্ত্রধর্মের ক্ষীণতা।** উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, নবদ্বীপের যে-সমস্ত পাষণ্ড (বা তান্ত্রিকগণ) কীর্তনের, ভক্তগণের, এবং প্রভুর নিন্দা করিতেন, মহাপ্রভুর এবং নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় তাঁহারাও তাঁহাদের তন্ত্রমত পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্বকথিত অধ্যাপক চক্রবর্তীও তাঁহার গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মই কিছুদিনের জন্য দেশের মধ্যে বিপুল প্রেরণা ও উন্মাদনার সৃষ্টি করে। সর্ব্বমত খণ্ড খণ্ড করিয়া 'সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত (চৈ. চ.)।' তাহার ফলে অনেক শাক্ত সাধক এই সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন।"

মহাপ্রভুর এতাদৃশ প্রভাবের কথা যে সমগ্র বাংলা দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং বাংলাদেশের বহুস্থানের তান্ত্রিকেরা যে তন্ত্রমতের অসারতা উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিত-প্রবর পঞ্চাননতর্করত্ন-মহোদয়ের একটি উক্তি এইরূপ অনুমানের অনুকূল বলিয়া মনে হয়। সেই উক্তিটির কথা বলা হইতেছে। পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-মহোদয়ের "তন্ত্রসার"-নামক গ্রন্থ তান্ত্রিক সমাজে বিশেষ আদরণীয়। তান্ত্রিকদের অবশ্যজ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই জাতীয় অপর কোনও তন্ত্রগ্রন্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। তর্করত্নমহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩৩৪ সালে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থের দুই খানিমাত্র প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে। "তন্মধ্যে একখানির লিপিকাল ১৫৮০ শকাব্দ। আর একখানির লিপিকাল লিখিত না থাকিলেও লিপির অবস্থায় অনুমান হয়, ২০০ বৎসর পূর্বে উহা লিখিত। এই দুইখানি পুস্তক নবদ্বীপের।"

মহাপ্রভুর তিরোভাব হয় ১৪৫৫ শকাব্দায়। উল্লিখিত প্রথম প্রতিলিপিটি ১৫৮০ শকাব্দায় লিখিত, অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোভাবের ১২৫ বৎসর পরে। দ্বিতীয় প্রতিলিপিটি তাহারও কয়েক বৎসর পরে লিখিত। বাংলা দেশের অন্যত্র কোনও প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তর্করত্ন মহাশয় লিখেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের প্রায় সোয়াশত বৎসর পরে নবদ্বীপের অল্প কতিপয় লোক তন্ত্রধর্মের অনুসরণ করিতেন। বাহিরে বাংলাদেশে এই ধর্মের অনুসরণ বিশেষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। থাকিলে সে-সকল স্থানেও তন্ত্রসারের প্রতিলিপি পাওয়া যাইত। ইহাতে বুঝা যায়, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের প্রায় সোয়াশত বৎসর পরে নবদ্বীপে তন্ত্রধর্মের একটি ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছিল। অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্তও শাক্তধর্ম প্রবলতা লাভ করে নাই।

৭৮। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতেই শাক্তধর্মের পুনরুজ্জীবন

কোনও ধর্ম যখন বহুলোকের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তখনই সেই ধর্ম সম্বন্ধে গীতি-কবিতাদি

পদাবলী রচিত হয়। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তিমহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় পৃষ্ঠায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে শাক্ত-পদাবলী রচিত হয় নাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শাক্তগীতি সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে বৈষ্ণব পদাবলীই বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর এই অভিমত সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কথিত আছে, এক সময়ে অসংখ্য বৌদ্ধ সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁহার গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এই বৌদ্ধ সহজিয়ারা, "যৌন সম্পর্কমূলক 'যৌগিক' প্রক্রিয়ার করুণা ও শূন্যতার যোগে 'মহাসুখ' লাভ করাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে করিতেন। * * ইহাতেও শাক্তের দেহতত্ত্ব, নাড়ী ও চক্রের (কমল) পরিকল্পনা, মূল শক্তিরূপে চণ্ডালী বা ডোমনীর (কুলকুণ্ডলিনীর অনুরূপ) স্বীকৃতি রহিয়াছে।" এতাদৃশ বৌদ্ধ সহজিয়ারা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলেও তাঁহাদের মজ্জাগত তন্ত্রাচার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; কিছুকাল পরে তাঁহারা বৈষ্ণবতার আবরণে তন্ত্রাচারের অনুশীলন করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে তাঁহারাই বৈষ্ণব-সহজিয়া হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা গুরুবাদ-সর্বস্ব হইয়া পড়িলেন এবং "গুরুপ্রসাদীর" ব্যভিচারে এবং নারীসম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যভিচারেও লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বিশুদ্ধ নির্মল শ্রৌতধর্ম যে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। বৈষ্ণবধর্ম তখন দুর্বল; সংখ্যাধিক্যবশতঃ বৈষ্ণব-সহজিয়ারা বা তান্ত্রিক বৈষ্ণবেরা তখন প্রবল। যাঁহারা পূর্বকথিত তন্ত্রধর্মের ক্ষীণধারার অনুসরণ করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ এই সুযোগে তাঁহারাও তখন প্রবল হইয়া উঠিলেন। এই ভাবেই শাক্ত-তন্ত্রধর্ম প্রসার লাভ করিতে লাগিল। অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন, ইহা হইয়াছিল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে (তাঁহার গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ক। **শাক্তধর্মের পুনরুজ্জীবন-ব্যাপারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব।** অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁহার গ্রন্থের ২৬৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পোষকতাতেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তাচার ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"'কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়'—বলিয়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন। প্রশস্তি স্তাবকতামাত্র নয়, সত্য। J. B. Long সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকে ইউরোপের রাজা অগাস্টাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহারাজের শিল্পানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত সহযোগিতা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ রঘুনাথের পুত্র। নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় হইতে নবাব মীরজাফরের আমল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ধর্ম, কাব্য, সঙ্গীত ও শিল্পের পোষকতা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার কলঙ্ক আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার গুণাবলীতে সে কলঙ্ক ঢাকিয়া গিয়াছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শক্তির উপাসক। তাঁহারই প্রত্যক্ষ পোষকতায় অষ্টাদশ শতকে শাক্তাচার ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাঙলাদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার তিনিই প্রথম প্রবর্তক। শাক্তকাব্যরচনার পশ্চাতে মহারাজের উৎসাহ প্রশংসনীয়। ভারতচন্দ্র তাঁহারই সভাকবি, সাধক-কবি রামপ্রসাদ তাঁহার অনুগ্রহ-পুষ্ট; তাঁহার রাজসভা ছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মতই 'নবরত্ন'-শোভিত।"

অধ্যাপক চক্রবর্তীর উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরই প্রত্যক্ষ পোষকতায় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তাচার ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই সময়ে এবং তাঁহারই উদ্যমে তান্ত্রিক শাক্তধর্ম পুনরুজ্জীবন লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত তাঁহার সহযোগিতা ছিল বলিয়া এবং তিনি শিল্পানুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রজাসমূহ যে তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। শাক্তধর্ম-প্রচারে তাঁহার উদ্যম যে প্রকৃতিপুঞ্জের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিল, এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ তৎকালীন অন্যান্য দেশমান্য ব্যক্তিগণও যে তাঁহার উদ্যমের আনুকূল্য করিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তান্ত্রিক শাক্তধর্ম-প্রচার-বিষয়ে, অন্য একটি গ্রন্থে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটু বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস-মহোদয় তাঁহার "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবজীবন"-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "তোতা রামদাস বাবাজি (সিদ্ধ)"-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"নবদ্বীপের বৈষ্ণব-চূড়ামণি। ইনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়, নাম ছিল—রামদাস মিশ্র। ন্যায় পড়িবার জন্য তিনি নবদ্বীপে আসেন, কিন্তু পাঠ শেষ করিবার পূর্বেই প্রবল বৈরাগ্যভরে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর মন্দিরের দক্ষিণে যে 'ঠৌরে' আছে, উহা ইঁহারই ভজনস্থান। বহু দিন ভজন করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে নবদ্বীপে অসিয়া স্বীয় সেবা পর্যবেক্ষণ করিতে আদেশ দেন। সে-সময়ে মহাপ্রভুর সেবার মহা বিশৃঙ্খল ছিল। গোস্বামিগণের দারিদ্র্যবশতঃ কোনও নির্দিষ্ট মন্দির ছিল না। শ্রীবিগ্রহ পালানুসারে সেবকদের গৃহে নীত হইয়া সেবিত হইতেন। এমন কি, সময়ে সময়ে নবদ্বীপের পাষণ্ডী ও রাজপুরুষগণের ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে লুক্কায়িত রাখা হইত। এরূপ অবস্থায় রামদাস নবদ্বীপে আসিয়া গঙ্গার নিকটবর্তী দশ-অশ্বত্থতলায় আসন গ্রহণ করেন। ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, উদাসীন বেশ ও সাত্ত্বিক বিকারাদি দেখিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া নবদ্বীপবাসীরা আমোদার্থে পীড়ন করিতে থাকেন ; কিন্তু তিনি অম্লান চিত্তে সকল পীড়ন সহ্য করিতেন। একদিন কৌতুহল-পরবশ হইয়া তিনি জনৈক পীড়নকারীকে ন্যায়শাস্ত্র-সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্ন করেন। সে-ব্যক্তি তাহার উত্তর দিতে না পারায় স্বীয় অধ্যাপকের নিকট জানাইলে অধ্যাপক তাঁহার অসাধরণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্যইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করেন। কথিত আছে—একদিন প্রত্যুষে গঙ্গাজলে বসিয়া দুই জন নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করেন। রামদাস সে-স্থলে তখন উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা চক্ষু নিমীলনপূর্বক পক্ষ-প্রতিপক্ষ করিতে করিতে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন—বাবাজিমহাশয় সন্ধ্যা সময়ে আসিয়া তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া মীমাংসা করিয়া দিলে উভয়েরই পরম আনন্দ হয় এবং চক্ষু উন্মীলনপূর্বক দেখিলেন যে, জনৈক কন্থা-করঙ্গধারী বাবাজি মীমাংসা করিয়াছেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষের কথা চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।

শ্রীরামদাস একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন—তখন কোন দুষ্টলোক তাঁহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া দেয়। ঘটনাক্রমে তৎকালে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সেই স্থান দিয়া নৌকাযোগে যাইতেছিলেন—তিনি বৈষ্ণবের অপমান দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া, তাঁহাকে কে অপমান করিয়াছে জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু ধ্যানমগ্ন নির্বিকার রামদাস কোনই উত্তর দিলেন না—গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঘাটে নৌকা রাখিয়া

নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ও বৃত্তান্ত শুনিয়া মর্মাহত হইলেন এবং এই অপরাধের জন্য তিনিই দোষী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই সময়ে রামদাসের সহিত শাস্ত্রালাপে তাঁহার ষড়্‌দর্শনে অপূর্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া মহারাজ তাঁহাকে 'তোতা' উপাধি দেন। এখন হইতে তিনি 'তোতা রামদাস' নামে অভিহিত হইলেন। তিনি শ্রীগিরিধারীর সেবা করিতেন—ঐ বিগ্রহ তাঁহার সহিত বৃক্ষতলেই থাকিতেন। মহারাজ তাঁহার সহিত কয়েক বার শাস্ত্রালাপ করিয়া ঠাকুরের আশ্রমের জন্য ঐ বৃক্ষের পার্শ্ববর্তী ছয় বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। ঐ জমির উপর যে-বাড়ী নির্মিত হয়, তাহাই 'বড় আখড়া' নামে প্রসিদ্ধ। উহা এখনও তোতা রামদাসের শিষ্য-পরম্পরা ভোগদখল করিতেছেন।

বলা বাহুল্য—ইঁহারই প্রযত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বর্তমান অঙ্গনের জমি ও পুরাতন মন্দির নির্মিত হয় এবং শ্রীবিগ্রহও মালঞ্চপাড়া হইতে বর্তমান স্থানে বিজয় করেন—নিত্যসেবার ব্যবস্থাদিও হইতে থাকে।"—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবজীবন, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা।

আলোচনা। উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, "সময়ে সময়ে নবদ্বীপের পাষণ্ডী ও রাজপুরুষগণের ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে লুক্কায়িত রাখা হইত।" ইহা হইতেছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের তান্ত্রিক শাক্তধর্ম-প্রচারের উদ্যমেরই একটি নিদর্শন। তাঁহার এবং তাঁহার কর্মচারীদের এবং তাঁহার অনুগত পাষণ্ডী তান্ত্রিকদের অত্যাচারের ভয়েই মহাপ্রভুর সেবায়েত গোস্বামিগণ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে লুকাইয়া রাখিতেন।

আবার পূর্বোল্লিখিত রামদাস বাবাজী মহারাজের গলায় জুতার মালা-প্রসঙ্গে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকটে নিজেই বলিয়াছেন—"এই অপরাধের জন্য তিনিই দোষী।" যাঁহারা বাবাজী মহারাজের গলায় জুতার মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা যে বৈষ্ণব ছিলেন, একথা কেহই মনে করিবেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ আদেশ না থাকিলেও, এইরূপ আচরণে মহারাজ রুষ্ট হইবেন না মনে করিয়া তাঁহার অনুগত তান্ত্রিকেরাই এই কার্য করিয়াছিলেন। এজন্যই মহারাজ বলিয়াছেন, "এই কার্যের জন্য তিনিই দোষী।"

মহাত্মা রামদাস যখন বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণববেশ এবং বৈষ্ণব-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করিয়া যাঁহারা তাঁহার পীড়ন করিতেন, তাঁহারাও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশ্রয়-পুষ্ট তান্ত্রিকই ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বৈষ্ণবধর্মের, বৈষ্ণবদের এবং মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সম্বন্ধে—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের, তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের, তাঁহার অনুগত এবং প্রশ্রয়-পুষ্ট তান্ত্রিকদের কিরূপ মনোভাব ছিল, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত না থাকিলে, অন্ততঃ তিনি রুষ্ট হইবেন না,—এইরূপ মনে না করিলে, রাজপুরুষগণ এবং তান্ত্রিকগণ উল্লিখিতরূপ আচরণ করিতে সাহস পাইতেন না এবং তাঁহাদের ভয়ে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকেও লুকাইয়া রাখার কোনও হেতু থাকিত না।

'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবজীবনের' পূর্বোদ্ধৃত বিবরণ হইতে জানা যায়, তোতা রামদাস বাবাজীর প্রযত্নে এবং আগ্রহাতিশয্যেই মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ মালঞ্চপাড়া হইতে বর্তমান স্থানে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রীবিগ্রহের মালঞ্চপাড়ায় অবস্থানের বিবরণ উক্ত গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। তোতা রামদাস বাবাজীর

সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরম্পরাপ্রাপ্ত কাহিনী হইতে সেই বিবরণ জানা যায়। সেই কাহিনীর কথা বলা হইতেছে।

কথিত হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে সেই সময়ের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিজস্ব ভাব পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের সেবিত বিগ্রহাদিকে লুকাইয়া রাখিয়া, বাহিরে কোনও তান্ত্রিক যন্ত্রাদি রাখিতেন এবং তাঁহারা এই তান্ত্রিক যন্ত্রাদির পূজাই করেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন। মহাপ্রভুর সেবায়েত গোস্বামিগণও মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে নবদ্বীপস্থ মালঞ্চপাড়ায় এক গর্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। যে-দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মহাত্মা রামদাস বাবাজীকে 'তোতা' উপাধি দিলেন, সেই দিন এবং সেই সময়েই বাবাজীমহারাজ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে একটি 'দান' প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থিত 'দান' দিতে মহারাজ সম্মত হইলে, বাবাজী-মহারাজ তাঁহাকে মালঞ্চপাড়ায় নিয়া মহাপ্রভুর লুক্কায়িত শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনার ভয়েই শ্রীবিগ্রহের এই ভাবে অবস্থিতি। আপনার সমর্থনে এবং আনুকূল্যে এই শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হউন—এই 'দান'-ই আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করি।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহও বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তান্ত্রিক শাক্তধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রয়াসের একটি নিদর্শন এখন পর্যন্ত নবদ্বীপে বিদ্যমান। এখনও শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে নবদ্বীপে বহু তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি সমারোহের সহিত রাস্তায় বাহির করা হয়। এই উৎসবটি বৈষ্ণবদেরই, তান্ত্রিকদের নহে। তথাপি তান্ত্রিকেরা এইরূপ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, বহু অর্থব্যয়ে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার সময়ে এই প্রথাটির প্রচলন করিয়াছিলেন; নবদ্বীপের তান্ত্রিকেরা এখনও সে-প্রথাটির অনুসরণ করিতেছেন। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বোধ হয় বৈষ্ণবদের চিত্তে বৈষ্ণবোৎসবের আনন্দকে মন্দীভূত করার অভিপ্রায়।

তৎকালে কোনও কোনও স্থানের বৈষ্ণব গোস্বামিগণও যে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বাহিরে তান্ত্রিক যন্ত্রাদির পূজাদি করিতেন, তাহাও মনে হয়। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাট খড়দহের কথাই বিবেচনা করা যাউক। এ-স্থানে নিত্যানন্দপ্রভু নিজে কোনও শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন নাই। তাঁহার পুত্র প্রভুপাদ শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহার বংশধরগণ এখনও সেই শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছেন। এ-স্থলে ত্রিপুরাসুন্দরীর যন্ত্র বিদ্যমান। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিপুরাসুন্দরী হইতেছেন, তান্ত্রিকদের দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক মহাবিদ্যা—ষোড়শী। শুনা যায়, শ্যামসুন্দরের সেবক বর্তমান গোস্বামিগণ নাকি প্রথমে ত্রিপুরাসুন্দরী-যন্ত্রের পূজা করেন এবং তাহার পরে শ্রীশ্যামসুন্দরের পূজা করেন এবং বলেন, এই ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্র শ্রীনিত্যানন্দের জটার মধ্যে ছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দও এই যন্ত্রের পূজা করিতেন। কিন্তু এই কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ এই। প্রথমতঃ, তান্ত্রিকেরাই ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্রের পূজাদি করেন, বেদানুগত কোনও সাধক তাহা করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-তান্ত্রিক ছিলেন না। নবদ্বীপের তান্ত্রিকেরাও তাঁহার প্রতি অসদাচরণ করিতেন, তাঁহাকে ভণ্ড, চোরের চর ইত্যাদি বলিতেন। বিশেষতঃ তিনি ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ এবং একজন প্রিয়তম পার্ষদ। সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু তাঁহাকেই নাম-প্রেম বিতরণের নিমিত্ত বঙ্গদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা কৃষ্ণনাম-গৌরনামই প্রচার করিয়াছেন, কখনও তন্ত্র-ধর্ম প্রচার করেন নাই। এ-সমস্ত কোনও তান্ত্রিকের কাজ

হইতে পারে না। অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য-মহোদয় তাঁহার 'শাক্তপদাবলী'-গ্রন্থের ২৬-২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"চৈতন্যদেব তান্ত্রিকদের বীভৎস সাধনপদ্ধতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে 'পাষণ্ডী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। * * চৈতন্যদেবের উদার ধর্মের স্রোতে সমগ্র বঙ্গদেশসহ ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অঞ্চল ভাসিয়া গিয়াছিল। ফলে তান্ত্রিকতার প্রভাব বঙ্গদেশে অনেক হ্রাস পাইয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের ভাব-প্লাবন মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন বাংলা দেশে আবার শক্তি-উপাসনার প্রভাব দেখা দিতে লাগিল।" তাঁহার গ্রন্থের ২২৯ পৃষ্ঠায়ও তিনি লিখিয়াছেন—"দ্রাবিড়-মঙ্গোল-অষ্ট্রীক গোষ্ঠীর মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত এই দেশ এক দিন আর্যসভ্যতা গ্রহণ করিল। তার পরে আসিল বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, আসিল তান্ত্রিক, বাউল, নাথপন্থী, মুসলিম ইত্যাদির প্রভাব; তার পর অকস্মাৎ সব কিছুই একদিন মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বন্যায় ভাসিয়া গেল।" এতাদৃশ মহাপ্রভু যে তান্ত্রিক নিত্যানন্দকে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক ধর্মপ্রচারের ভার দিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, ইহা সুধীগণের বিবেচ্য।

দ্বিতীয়তঃ, বাল্যকাল হইতেই শ্রীনিত্যানন্দ যে কৃষ্ণপ্রেম-মাতোয়ারা ছিলেন, গৃহত্যাগের পরেও যে তিনি তদ্রূপ ছিলেন, নবদ্বীপে আগমনের পরেও যে তাঁহার সেই অবস্থার কোনওরূপ পরিবর্তন হয় নাই এবং শেষকালে তিনি যে গৌরনাম এবং গৌরভজনই প্রচার করিতেন, শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহা বিশেষরূপে বলিয়া গিয়াছেন। এ-সমস্ত কি কোনও তান্ত্রিকের আচরণ?

তৃতীয়তঃ, প্রাচীন চরিতগ্রন্থে বলা হইয়াছে, "পাষণ্ডীদলন বাণা নিত্যানন্দ রায়।" তান্ত্রিকদিগকেই 'পাষণ্ডী' বলা হইত। নিত্যানন্দ নিজে যদি তান্ত্রিক হইতেন, তবে তিনি কি পাষণ্ডীদলন করিতেন?

চতুর্থতঃ, শ্রীনিত্যানন্দের যে জটা ছিল, কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায় না। এখনও যে-যে স্থলে গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ আছেন, তাহাদের কোনও স্থলেই শ্রীনিত্যানন্দের বিগ্রহে জটা দৃষ্ট হয় না। মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পূর্বে গৌর-নিত্যানন্দকে দেখিয়া দেখিয়া, কালনার শ্রীলগৌরীদাস পণ্ডিত যে শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রস্তুত করিয়া নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীবিগ্রহদ্বয় এখনও বিদ্যমান। এ-স্থানেও নিত্যানন্দের মস্তকে জটা দৃষ্ট হয় না।

উল্লিখিত কারণসমূহবশতঃ খড়দহের বর্তমান গোস্বামিগণের উপরি-উক্ত কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ বলেন, শ্রীনিত্যানন্দের ঝুলিতে এই ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্রটি ছিল। ইহাও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শ্রীনিত্যানন্দ নিজে যদি তান্ত্রিক হইতেন, তাহা হইলেই তাঁহার সঙ্গে, অথবা তাঁহার গৃহে, এই তান্ত্রিকযন্ত্রটি থাকার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু তিনি যে তান্ত্রিক ছিলেন না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, এই যন্ত্রটি তাঁহার ঝুলিতে ছিল, তাহা হইলে ইহাই জানা যায় যে, ইহার পূজাদি তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। অভিপ্রেত হইলে তিনি তাহা বীরভদ্র প্রভুকেই দিয়া যাইতেন, ঝুলির মধ্যে রাখিয়া যাইতেন না। আমাদের মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে খড়দহের তৎকালীন গোস্বামিগণ এই ত্রিপুরাসুন্দরীযন্ত্র স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন এবং মহারাজের তুষ্টি বিধানের জন্য বলিতেন, এই যন্ত্র নিত্যানন্দের জটার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল এবং স্বয়ং নিত্যানন্দও এই যন্ত্রের পূজা করিতেন। পরবর্তী গোস্বামিগণ তাহা শুনিয়া আসিয়াছেন এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, নিত্যানন্দের পক্ষে এই যন্ত্রের পূজাদি সম্ভবপর কিনা, সেই বিষয়ে কোনওরূপ বিচার করেন নাই।

খড়দহের ন্যায় অন্য স্থানেও যে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তদ্রূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের বন্যা মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কিভাবে তান্ত্রিক শাক্তধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছেন, উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে তাহা জানা গেল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে তান্ত্রিকতার স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা সমস্ত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছে। বর্তমান সময়েও বাংলাদেশে শাক্ত-তান্ত্রিকতার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কেবল উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি কতিপয় ব্যাপারেই বেদবিধির অনুসরণ করেন, গৃহে শালগ্রামের পূজাও করেন। কিন্তু শালগ্রামে অধিষ্ঠিত নারায়ণ তাঁহাদের উপাস্য নহেন। তন্ত্রমতেই তাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ এবং সাধন করিয়া থাকেন, তান্ত্রিকী দেবতাই তাঁহাদের উপাস্যা। তাহার ফলে অধিকাংশ কায়স্থ-বৈদ্যাদিরও তদ্রূপ অবস্থা। সমাজের অন্য স্তরের অধিকাংশ লোকও এক রকম প্রচ্ছন্ন তন্ত্রমতের অনুগামী। আউল-বাউল-সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকগণ বৈষ্ণব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের বা রাধাকৃষ্ণের কিংবা গৌর-নিত্যানন্দের উপাসক বলিয়াও নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের সাধন বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতানুযায়ী। দেহতত্ত্ব এবং ষট্‌চক্রের অনুশীলনাদিই তাঁহাদের সাধনের বিশিষ্ট অঙ্গ। তাঁহাদের লক্ষ্যও মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষ্যের অনুরূপ নহে। বঙ্গ ও আসামের বহুলোকই এইরূপ মতাবলম্বী। বস্তুতঃ তাঁহাদের মত হইতেছে বৈষ্ণবতার আবরণে প্রচ্ছন্ন তন্ত্রমত। তাঁহারাও তাঁহাদের তন্ত্রমত প্রচার করিতেছেন; আবার কোনও কোনও তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও তন্ত্রমত প্রচার করিতেছেন। দীক্ষার্থীর অভিপ্রায় অনুসারে কোনও কোনও তান্ত্রিক আবার কৃষ্ণমন্ত্র, রামমন্ত্র, নৃসিংহমন্ত্রাদিতেও দীক্ষা দিয়া থাকেন। অথচ, তিনি নিজে হয়তো এই সকল মন্ত্রের উপাসক নহেন। ইহাও বেদবিরুদ্ধ প্রথা। যিনি যে-স্বরূপের উপাসক, সেই স্বরূপের উপলব্ধি-লাভই তাঁহার পক্ষে সম্ভব, সুতরাং সেই স্বরূপের মন্ত্রে দীক্ষাদানই তাঁহার পক্ষে সমীচীন। বৈদিকী রীতিও তাহাই। তান্ত্রিকদের মতে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—তান্ত্রিকদেরই কল্পিতা, সুতরাং বাস্তব-অস্তিত্বহীনা, স্বীয় পতি শিবের বুকের উপর দণ্ডায়মানা, বিশাল-লোলরসনা এবং মহাকালের সহিত বিপরীত-সম্ভোগাতুরা দেবী কালীর অবতার। রাম-নৃসিংহাদিও তদ্রূপ অন্যান্য কল্পিতা মহাবিদ্যাদের অবতার। বেদমতে বেদকথিত অবতার ও অবতারীর মধ্যে গুণ-মহিমাদির পার্থক্য আছে; কিন্তু তন্ত্রমতে অবতার ও অবতারী সম্যক্‌রূপে অভিন্ন। সুতরাং তান্ত্রিকদের কৃষ্ণ-রামাদি হইতেছেন তান্ত্রিক কৃষ্ণ-রামাদি, বৈদিক কৃষ্ণ-রামাদি নহেন। তান্ত্রিকদের উপদিষ্ট কৃষ্ণমন্ত্রাদিও তান্ত্রিক কৃষ্ণাদিরই মন্ত্র। বেদবিহিত ধর্মের এবং তন্ত্রধর্মের রহস্য অবগত নহেন বলিয়া, বিশেষতঃ তন্ত্রমতে বেদমতের ন্যায় খাদ্যাদিবিষয়ে বিচারের এবং ব্রতোপবাসাদির বাধ্যবাধকতা নাই বলিয়া, আবার মহানির্বাণ-তন্ত্রমতে বেদমন্ত্র কলিকালে ফলপ্রদ নহে জানিয়া এবং কলিতে তন্ত্রমতই আশু ফলপ্রদ জানিয়া, সাধারণ লোকগণও অনেক স্থলে তান্ত্রিকদেরই আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন। এ-সমস্ত তান্ত্রিকদের মধ্যে কেহ কেহ আবার বেদমূলক বৈষ্ণব ধর্মাদির কল্পিত কুৎসাও প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে তন্ত্রধর্মই হইতেছে কলির যুগধর্ম। ফলে, অন্ততঃ বাংলাদেশে, বেদানুগত ধর্মের, অর্থাৎ বেদবিহিত পন্থায়, বেদকথিত ভগবৎ-স্বরূপগণের উপাসনার, অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। বেদবিহিত ধর্মের প্রচারও বিশেষ নাই।

এ-সমস্ত বোধ হয় কলিরই প্রভাব। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন, কলিতে কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্রই বিপ্রত্বের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইবে (ভা. ১২।৩।৩), অধর্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ উত্তম আসনে আরোহণ করিয়া ধর্মকথা বলিবেন (ভা. ১২।৩।৩৮), পাষণ্ডগণের প্ররোচনায় ভিন্নমতি হইয়া কলির লোকগণ প্রায়শঃ, জগতের পরমগুরু ত্রিলোকনাথ ভগবান্ অচ্যুতের যজনাদি করিবে না (ভা. ১২।১৩।৪৩), ইত্যাদি। অন্যান্য পুরাণেও কলির প্রভাব সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

৭৯। মহাপ্রভুর প্রভাবে তৎকালীন দেশের অবস্থা (২)

যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান সময়ে তন্ত্রধর্মের প্রভাবের কথা বলা হইল। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা আবার আরম্ভ করা হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি অবলম্বন করিয়া মহাপ্রভুর প্রভাব এবং সেই প্রভাবের ফলে তৎকালীন দেশের অবস্থাসম্বন্ধে এক্ষণে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

মহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপাশক্তির বিস্তারপূর্বক নামসংকীর্তন প্রবর্তিত করিলেন। তাঁহার উপদেশে নবদ্বীপের যত্রতত্র ঘরে ঘরে কীর্তন আরম্ভ হইল। শুনিয়া নবদ্বীপের হিন্দুধর্মবিদ্বেষী যবন কাজি অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং একদিন কয়েক স্থানে নিজে আসিয়া কীর্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিলেন, কীর্তন করিতে সকলকে নিষেধ করিলেন এবং পুনরায় কীর্তন করিলে কীর্তনকারীদের জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়াও ধমক দিয়া গেলেন। তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও, কেহ কোনও স্থানে কীর্তন করে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত কাজি যবন-চরও নিযুক্ত করিলেন।

কাজির আচরণে ও আদেশে বহির্মুখ লোকগণ,—যাঁহারা কীর্তন-কারীদের সর্বদা ঠাট্টা-বিদ্রূপাদি করিতেন, তাঁহারা—উৎসাহ পাইলেন। কবি কর্ণপূরের উক্তির উল্লেখপূর্বক পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তৎকালে বাস্তব বর্ণাশ্রম ধর্ম বলিয়া কিছু ছিল না; কেননা, বাস্তবিক বর্ণ এবং আশ্রমই ছিল না। ভগবদ্‌বহির্মুখ পণ্ডিতগণ নিজেদের কল্পিত মতকেই শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য-গৌরবে সাধারণ লোকগণও তাঁহাদের প্রচারিত কল্পিত মতকেই শাস্ত্রমত বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডিত্য এবং অন্য ব্রাহ্মণগণ নিজেদের যজ্ঞসূত্র-মাত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেদের স্বার্থ এবং অপরের উপরে আধিপত্য রক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতেন। যজ্ঞসূত্র-গৌরবে তাঁহারা মনে করিতেন, সাধারণ লোককে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁহাদেরই। তাঁহারা প্রচার করিতেন,—নিম্নশ্রেণীর লোকদের কৃষ্ণকীর্তনে অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে কৃষ্ণকীর্তন পাপজনক এবং দেশের অহিতকর। উচ্চকীর্তনও তাঁহারা আশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের শিক্ষায় সকলেই উচ্চস্বরে কৃষ্ণকীর্তন করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির এবং কুলমর্যাদা-রক্ষণের বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া তাঁহারা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। কাজির আদেশের সুযোগ পাইয়া তাঁহারা নিমাই-পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কাজির নিকটে অভিযোগও করিলেন। পঢ়ুয়া-পণ্ডিতগণও নবদ্বীপের সর্বত্র প্রভুর ও ভক্তদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যাঁহারা পূর্বেই কীর্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কাজির নিষেধ এবং জাতিনাশের ধমক সত্ত্বেও তাঁহারা কীর্তন হইতে মনকে সরাইয়া আনিতে পারেন নাই—কীর্তনমাধুর্যে এমন ভাবেই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট

হইয়াছিল। তাঁহারা ঘরে বসিয়া কীর্তন করিতেন—কিন্তু মৃদুস্বরে এবং ভয়ে ভয়ে। প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া এক বিরাট নগরকীর্তনের আয়োজন করিলেন। নানা স্থানের ভিতর দিয়া এই নগর-কীর্তন কাজির গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কীর্তনের মাধুর্যে, এবং প্রেমাবিষ্ট প্রভুর নৃত্যমাধুর্যে, বিশেষতঃ প্রভুর কৃপাশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পথে অসংখ্য লোক আসিয়া কীর্তনে যোগদান করিতে লাগিলেন। নগরকীর্তন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, কীর্তনকারীদের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে কীর্তন কাজির গৃহে উপনীত হইল। ভয়ে কাজি অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। ভব্য লোক পাঠাইয়া প্রভু তাঁহাকে আনাইলেন। উভয়ের মিলন ও আলাপ হইল। প্রভুর কৃপা-শক্তিতে কাজি প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন,—তিনি আর কীর্তনের বিঘ্ন জন্মাইবেন না এবং তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণও যাহাতে কীর্তনের বিঘ্ন না জন্মায়েন, সেই ব্যবস্থাও করিবেন।

নবদ্বীপের সর্বত্র অবাধে এবং স্বচ্ছন্দভাবে উচ্চকীর্তন চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেরই চিত্তের কালিমা বিধৌত হইয়া গেল। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে সমস্ত পাষণ্ডীরাই যে প্রভুর কৃপায় প্রেমলাভ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নাম-প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়"—অবস্থা হইল। নাম-প্রেমরসে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া লোক সামাজিক উচ্চ-নীচ-ভেদের কথাও ভুলিয়া গেলেন। পদকর্তা লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ চণ্ডালে করে কোলাকোলি, কবে বা ছিল এ-রঙ্গ।" বাস্তব সাম্য ও মৈত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করিল।

অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত পূর্বে যখন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সে-স্থানে নামসংকীর্তন প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। প্রভুর কৃপাশক্তিতে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আত্মপ্রকাশের পরে প্রভু নবদ্বীপে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, লোকপরম্পরা তাহার কথাও সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইল। সর্বত্র লোক কীর্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর এবং নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় বাংলার সর্বত্র নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, প্রায় প্রতি গৃহেই—নামসংকীর্তন চলিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের এবং কোনও কোনও স্থানে মহাপ্রভুরও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের পঠন-পাঠন-কথকতা চলিতে লাগিল। ভগবল্লীলাত্মক যাত্রা-নাটকাদি রচিত, গীত ও অভিনীত হইতে লাগিল। দর্শন-শ্রবণে লোক পরমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন, অশ্রু-কম্প-পুলকাদিতে তাঁহাদের দেহ ভূষিত হইতে লাগিল—হিন্দুধর্মবিদ্বেষী মুসলমানেরাও বাদ যায়েন নাই। সর্বত্র কৃষ্ণগান—মুসলমানদের মধ্যেও। তাহার ফলেই "কানু ছাড়া গান নাই"—এই প্রবাদবাক্য প্রচলিত হইয়াছিল।

বহু মুসলমানও মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক মুসলমান ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরসম্বন্ধে পদও রচনা করিয়াছেন। গ্রাম্য কবিগণ তাঁহাদের গ্রাম্যভাষাতে কৃষ্ণকীর্তনের এবং গৌরকীর্তনের বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। এখনও গ্রামাঞ্চলে এ সকল পদ কীর্তিত হইতেছে।

কীর্তনের এতাদৃশ ব্যাপক প্রভাবের মূলে আধুনিক প্রথায় কোনও প্রচার-কার্য ছিল না। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না; সুতরাং মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকাদি প্রচারের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। সভা-সমিতির আহ্বান করিয়া বক্তৃতাদির দ্বারা প্রচারও ছিল না; তৎকালে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়াও জানা যায় না। প্রভুর কৃপাশক্তির প্রভাবে কীর্তনই কীর্তনের প্রচারক হইয়াছিল।

প্রভুর কৃপাশক্তিতে প্রভুর উপদেশ সকলের হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করিয়াছিল, হৃদয়-বীণার নিগূঢ় তন্ত্রীতে মধুর ঝংকার তুলিয়াছিল। সাধারণতঃ লোক চাহেন—দুঃখ-গন্ধ-লেশশূন্য নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং অকপট নিত্যপ্রিয়। নানা চেষ্টা করিয়াও সংসারে লোক তাহা পায়েন না; কেননা, যে-সুখের জন্য এবং যে-প্রিয়ের জন্য জীবের এই চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষা, তাহা কেহ জানেন না; সুতরাং তাহার প্রাপ্তির উপায়ও অবলম্বন করিতে-পারেন না। মহাপ্রভু সকলকে জানাইলেন—"জীব! যে-সুখের জন্য তোমার চিরন্তনী লালসা, সেই সুখ হইতেছেন সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অপর কিছু নহে। আর যে-প্রিয়ের জন্য তোমার চিরন্তনী লালসা, সেই প্রিয়ও হইতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণই, অপর কেহ নহেন। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন তোমার একমাত্র প্রিয়, অন্য প্রিয় তোমার কেহ বা কিছু নাই। প্রিয়ত্ব-বস্তুটি স্বভাবতঃই পারস্পরিক বলিয়া তুমিও তাঁহার প্রিয়। তোমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধটি হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। তিনিই বাস্তবিক সম্বন্ধ-তত্ত্ব, তাঁহার সহিতই তোমার অনাদি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং তিনি "প্রাপ্য সম্বন্ধ"। তুমি অনাদিকাল হইতে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছ বলিয়া এ-সমস্ত বিবরণ তুমি জান না। তাঁহার সহিত তোমার স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বরূপগত অধিকার তোমার আছে। তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়া চাও, তাঁহার দিকে মন দাও। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম অভিন্ন, জীবের সম্বন্ধে বরং নামের কৃপাই বেশী। নামসংকীর্তনের আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার চির অভীষ্ট সুখ এবং প্রিয় পাইবে।" প্রভু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত, তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত অভিমত নহে (চৈ. ভা.॥ ১।২।১৮১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রভুর কৃপায় লোকে তাহা বুঝিলেন এবং বহির্মুখ পণ্ডিতদের এবং পাষণ্ডীদের মতের অসারতাও উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রভুর কৃপায় প্রভুর এই উপদেশ লোকের চিত্তকে স্পর্শ করিল, সংকীর্তনানন্দে লোক মত্ত হইয়া পড়িলেন। ভগবৎকৃপা বা ভক্তকৃপা ব্যতীত কেবল উপদেশ-শ্রবণে কখনও পরমার্থভূত বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না।

মহাপ্রভুর প্রচারিত নামসংকীর্তন প্রভুর কৃপায় এমনই প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও নাম-সংকীর্তন দৃষ্ট হইতেছে। গৌর-কথারও একটি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে; এখন পর্যন্তও গৌর-কথায় লোকের চিত্ত যেভাবে আকৃষ্ট হয়, অন্য কোনও কথাতেই তেমন হয় না। মহাপ্রভু প্রেমের ঠাকুর তো বটেনই, তিনি লোকের প্রাণের ঠাকুরও।

প্রেমের ঠাকুর এবং প্রাণের ঠাকুর মহাপ্রভুর শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশে একটা সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা যাইবে, বর্তমান সময়েও বাংলার সংস্কৃতি বাস্তবিক মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংস্কৃতিই। স্থলবিশেষে অবশ্য অধুনা কেহ কেহ সেই সংস্কৃতির উপরে অন্যরূপ সংস্কৃতির প্রলেপ দিতে প্রয়াস পাইতেছেন, সংস্কৃতিকে এখনও ঢাকিয়া দিতে পারেন নাই।

এই ত গেল বাংলাদেশে মহাপ্রভুর প্রভাবের কথা। এক্ষণে ভারতের অন্যান্য স্থানের কথা কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে।

সন্ন্যাসের পরে প্রভু উড়িষ্যায় নীলাচলে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে তিনি চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন। দক্ষিণদেশে ও পশ্চিমদেশে ভ্রমণোপলক্ষে অনধিক চারি বৎসর তিনি নীলাচলের বাহিরে ছিলেন। অবশিষ্ট প্রায় বিশ বৎসর তিনি নীলাচলেই ছিলেন। সেই সময়ে উড়িষ্যার সর্বত্র তাঁহার

প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ; তাহার নিদর্শন অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে। আবার, শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের জন্য ভারতের নানাস্থান হইতে সর্বদাই বহু লোক নীলাচলে আসিতেন। প্রভুর দর্শনে ও উপদেশ-শ্রবণে, প্রভুর কৃপায়, তাঁহারা সকলেই নিজেদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিয়াছেন এবং একটা অভূতপূর্ব ভাব লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং সেই ভাব যথাসম্ভব প্রচারও করিয়াছেন।

সর্বশাস্ত্রবিশারদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন তখন নীলাচলে। এই বর্ষীয়ান্ মহাপণ্ডিত ছিলেন একজন সুবিখ্যাত মায়াবাদাচার্য। বহু লোককে তিনি শঙ্কর-বেদান্ত পড়াইয়াছেন, বহু সন্ন্যাসীর উপকর্তা ছিলেন। তরুণ সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকেও তিনি বেদান্ত পড়াইতেছিলেন। কিন্তু শেষকালে প্রভুর কৃপায় তিনি বেদবিরুদ্ধ এবং ভক্তিবিরুদ্ধ মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন এবং প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন। তখন তিনি সমস্ত শাস্ত্রেরই ভক্তিপর অর্থ প্রচার করিতে লাগিলেন এবং লোকদিগকে ভক্তির ও নামের মাধুর্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নিজে পদব্রজে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র তিনি তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। যদিও তিনি কখনও তাঁহার প্রচারিত মত গ্রহণের জন্য কাহাকেও কিছু বলেন নাই, তথাপি তাঁহার প্রভাবদর্শনে এবং তাঁহার কৃপাশক্তির প্রভাবে, অসংখ্য লোক—এমন কি বহু বেদবিরোধী বৌদ্ধও—তাঁহার পদানত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন-গমন-কালেও প্রভু সর্বত্র তাঁহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে মায়াবাদের প্রধান কেন্দ্র বারাণসীতে, তৎকালীন অতি সুপ্রসিদ্ধ এবং মহাপ্রভাবশালী মায়াবাদাচার্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর (কৃষ্ণনামে নৃত্যকীর্তন করিতেন বলিয়া প্রভুকে যিনি স্বীয় শিষ্যবর্গের সহিত ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতেন, সর্বত্র প্রভুর কুৎসা প্রচার করিতেন, সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর) এবং তাঁহার সহস্র সহস্র সন্ন্যাসি-শিষ্যের প্রতি প্রভু যে কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহারা সকলেই মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন, বারাণসী "দ্বিতীয় নদীয়া নগরীতে" পরিণত হইয়াছিল। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মধ্যে প্রভু যে কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের দ্বারা—"আ-সিন্ধুনদীতীর আর হিমালয়। বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥ দুই শাখার (রূপ-সনাতনের) প্রেমফলে সকল ভাসিল। প্রেম-ফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥ পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাহাঁ প্রচারিলা দোঁহে ভক্তি-সদাচার॥ শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার। বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার॥ চৈ. চ.॥ ১।১০।৮৫-৮৮॥"

মহাপ্রভুর প্রচারিত ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক নামাবলী এখন পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র, অন্য সম্প্রদায়ীদের মধ্যেও, কীর্তিত হইতেছে ; এই কীর্তনকারীদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে এমন লোকও হয়তো আছেন, যাঁহারা জানেন না যে, এই নাম মহাপ্রভুকর্তৃক প্রবর্তিত।

মহাপ্রভু নিজে এবং শ্রীপাদরূপসনাতনাদিদ্বারা সমগ্র-ভারতবাসীকে নাম-প্রেমের স্নিগ্ধ-সুকোমল মধুর বন্ধনে একই সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই বন্ধন ছিল হৃদয়ের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন, প্রীতির বন্ধন।

পূর্বে বলা হইয়াছে, বর্তমান সময় পর্যন্তও বাংলাদেশের মুখ্য সংস্কৃতি হইতেছে মহাপ্রভুর প্রবর্তিত

সংস্কৃতি। উড়িষ্যার সংস্কৃতিসম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। ভারতের অন্যান্য স্থানের সংস্কৃতিতেও এখন পর্যন্ত মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংস্কৃতি ফল্গুধারার ন্যায় বিরাজিত।

ভারতের সর্বত্র মহাপ্রভুর প্রভাব লোকের হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করিয়াছিল যে, বহু প্রাদেশিক ভাষাতেও মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মসম্বন্ধে গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। কোনও কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে ইহা হইয়াছে, তাহা নহে। সর্বত্রই ভক্তিরস-রসিক ভক্তদিগের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত ভাবই গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাংলাদেশের পদাবলী-সাহিত্য অতুলনীয়। এই পদাবলী-সাহিত্য ভাবগৌরবে চিরকালই বাংলাসাহিত্যের মুকুটমণি হইয়া থাকিবে।

বাংলার ভক্তিরস-রসিকগণ গানের সহায়তায় হৃদয়ের ভাবকে যথোচিতরূপে মূর্ত করার উদ্দেশ্যে অনেক নূতন রাগ-রাগিণী এবং সুরের প্রবর্তনও করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর মুখ্য অবদান হইতেছে পারমার্থিক। ব্যবহারিক বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোনও উপদেশ দেন নাই। তবে পারমার্থিক বিষয়ের আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি যে-সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্তের অনুসরণে ব্যবহারিক বিষয়েও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

তাঁহার পারমার্থিক অবদান হইতেছে, বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-কথিত পরব্রহ্মের সহিত জীবের স্বরূপগত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধের কথন এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপায়-কথন ; তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধটি যিনি হৃদয়ের অন্তস্তলে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি ইহাও উপলব্ধি করিতে পারেন যে—জীবমাত্রেরই—কেবল মানুষের নহে, পশু-পক্ষি-তৃণগুল্মাদি-দেহে অবস্থিত জীবেরও—একমাত্র প্রিয় হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ এবং জীবমাত্রই তাঁহার প্রিয়। যিনি এই পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি পাইবেন, তিনি ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, প্রিয়ের প্রিয়ও নিজের প্রিয় বলিয়া জীবমাত্রই তাঁহার প্রিয়। এইরূপ ভাবের মধ্যে যে-সাম্য, মৈত্রী ও উদারতা বিরাজিত, তাহা অতুলনীয়। বিভিন্ন কর্মফলবশতঃ জীবের মধ্যে, মানুষের মধ্যেও, প্রকৃতি-প্রবৃত্তি প্রভৃতির ভিন্নতা থাকিবেই। কিন্তু উল্লিখিত সাম্য, মৈত্রী ও উদারতার ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলে, এতাদৃশী বিভিন্নতা সত্ত্বেও, জীবমাত্রের প্রতিই সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও প্রীতির ভাব স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়িবে। মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এইরূপ সাম্য-মৈত্রী প্রভৃতির ব্যাপকতাও সর্বাতিশায়িনী। মহাপ্রভুর উপদেশের অনুসরণ করিলে ব্যবহারিক জগতের নানাবিধ বৈষম্যের মধ্যেও অপূর্ব প্রীতিময় সমন্বয় সম্ভবপর হইতে পারে, জগতে বাস্তব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

মহাপ্রভুর আর একটি অবদান হইতেছে দার্শনিক অবদান—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ। শঙ্কর-পূর্ব আচার্যগণ জীব-জগতের সহিত পরব্রহ্মের কোনও এক রকমের ভেদাভেদ-বাদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু সেই ভেদাভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বলেন নাই। শঙ্কর-পরবর্তী ভাস্করাচার্য এবং নিম্বার্কাচার্যও এই ভেদাভেদ-বাদের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রভুর শিক্ষার অনুসরণে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিত আচার্যদ্বয়ের কথিত স্বরূপ যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা প্রদর্শন করিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলাদেশের কোনও বৈদান্তিক মতবাদ ছিল না। মহাপ্রভুর এই অবদানটিও বাংলার একটি বিশেষ গৌরবের বস্তু।

মহাপ্রভুর অবদানের মধ্যে আর একটি অবদান হইতেছে—ভক্তিরস-তত্ত্ব। পূর্ববর্তী রসাচার্যগণ

লৌকিক রসসম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তির রসত্ব স্বীকার করিতেন না। মহাপ্রভু ভক্তির রসত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার আনুগত্যে তাঁহার চরণানুগত বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিপাদগণ তাঁহাদের গ্রন্থে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রসম্মত যুক্তির সহায়তায় ভক্তিরসসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং এইভাবে একটি অভিনব তথ্য প্রকটিত করিয়া বাংলাদেশকে ও বাঙ্গালীকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং আচরণের মধ্যে ধর্মসমন্বয়-সম্বন্ধেও অতি সুন্দর একটি উপায় পাওয়া যায়। চিত্তগত ভাবের বিচারে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বৈদিক শাস্ত্র, কর্মমার্গ এবং বিভিন্ন ধর্মমার্গের উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহাদের বিভিন্ন ফলের কথাও—অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি, পঞ্চবিধা মুক্তি, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা-প্রাপ্তির কথাও—বলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু বেদোপদিষ্ট সমস্ত মার্গের সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন, বিভিন্ন মার্গের বিভিন্ন ফলের কথাও স্বীকার করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি-কথিত, জীবের স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার কথা তিনি প্রচার করিয়া থাকিলেও, পঞ্চবিধা মুক্তির পারমার্থিকতা তিনি অস্বীকার করেন নাই। বিভিন্ন প্রকার মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণের স্থান এবং তাঁহাদের শাস্ত্র-কথিত-মুক্তিসুখের স্বরূপের কথা এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা-প্রাপ্তিরূপ পরামুক্তি-প্রাপ্ত জীবগণের স্থান এবং তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-সুখের স্বরূপের কথাও মহাপ্রভু জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন। সে-সমস্ত বিবেচনা করিয়া, স্বীয় চিত্তের অবস্থা অনুসারে পঞ্চবিধা মুক্তি ও ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির মধ্যে যে-বস্তুর প্রতি যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই বস্তু-প্রাপ্তির অনুকূল পন্থাই তিনি অবলম্বন করিতে পারেন। তাহাতে বিভিন্ন পন্থার সাধকদের মধ্যে সংঘর্ষেরও কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, স্ব-স্ব রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যবস্তু ভালবাসেন, ভিন্ন ভিন্ন রকমের পরিধেয় বস্ত্র ভালবাসেন। তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ তিক্ত সম্বন্ধ জন্মে না। এইরূপে দেখা গেল, মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে ধর্মসমন্বয়ের একটি অতি সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়। এই সমন্বয়টি হইতেছে বেদানুগত সমন্বয়। এইরূপ সমন্বয়ে অবশ্য বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ ধর্মের কোনও স্থান নাই, থাকিতেও পারে না। কেন না, বেদমতে, যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম; যাহা বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ, তাহা ধর্মই নহে, তাহা অধর্ম। ধর্মের সহিত অধর্মের সমন্বয় অসম্ভব। পূর্বেই বলা হইয়াছে—বেদবিহিত পন্থাই মোক্ষ-প্রাপক। বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ পন্থা,—বেদমতে মোক্ষ-প্রাপক নহে। সুতরাং পরমার্থকামীর বিচারে, মোক্ষ-প্রাপক পন্থার সহিত, মোক্ষ-প্রতিকূল পন্থার একত্রাবস্থিতি বা কোনওরূপ সমন্বয় সম্ভবপর হইতে পারে না। আলোকের সহিত অন্ধকারের সমন্বয় অসম্ভব। অন্ধকার চিরকালই আলোকের বহির্দেশে থাকে।

যদি কেহ বলেন,—উল্লিখিতরূপ সমন্বয় হইতেছে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা (মাতুয়াবুদ্ধি)-প্রসূত সমন্বয়, বর্তমান যুগে তাহা স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য নহে,—তাহা হইলে বক্তব্য এই। পরমার্থভূত বস্তু হইতেছে অনাদি, নিত্য, সনাতন এবং প্রকৃতির অতীত, বা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর। পরমেশ্বরও তদ্রূপ। পরমার্থভূত বস্তু এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়ও একমাত্র পরমেশ্বরই জানেন, তিনি না জানাইলে কেহই তাহা জানিতে পারে না। জীবের কল্যাণের নিমিত্ত অপৌরুষেয় শাস্ত্রে তিনিই তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। সকল দেশের পরমার্থভূত বস্তুকামী সাধকগণই তাহা স্বীকার করেন। সেই পরমেশ্বরই বেদ-বেদান্তাদি

শাস্ত্রে তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ গীতা॥ ১৫।১৫॥" ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-বিশিষ্ট লোকের প্রাকৃত-বুদ্ধি-প্রসূত কোনও শাস্ত্রের অনুশীলনে সেই পরামার্থভূত বস্তু এবং তৎপ্রাপ্তির সাধনের কথা জানা যাইতে পারে না। সুতরাং পরমার্থভূত বস্তুসম্বন্ধীয় ধর্মসমন্বয়ে তাদৃশ শাস্ত্রকথিত ধর্মের (বেদমতে যাহা অধর্ম, তাহার) যে স্থান থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পরমার্থভূত বস্তু নিত্য এবং সনাতন বলিয়া যুগভেদে তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। যুগভেদে তৎপ্রাপ্তির শাস্ত্রকথিত সাধনাঙ্গের কিছু কিছু পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু পরমার্থভূত বস্তুটির পরিবর্তন হয় না।

পরমার্থভূত বস্তুকামীর পক্ষে শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধের পালন অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক যিনি নিজের ইচ্ছামত আচরণ করেন, তিনি কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, সুখ এবং পরাগতিও লাভ করিতে পারেন না। "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্॥ গীতা॥ ১৬।২৩"

শাস্ত্রনিষিদ্ধ অখাদ্য-কুখাদ্য-ভোজন, পরস্ত্রী-পরপুরুষ-গমন, চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধিনিষেধের লংঘন-পূর্বক রোগীর যথেচ্ছাচার যেমন উদারতা বলিয়া কোনও সজ্জনই স্বীকার করেন না, তদ্রূপ সাধকের পক্ষে শাস্ত্রবিধির উল্লংঘনকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার অভাব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের লংঘনকে লৌকিক জগতেও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ বলিয়াই মনে করেন। বেদবিহিত এবং বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ ধর্মের সমান মূল্য দান—ব্যবহারিক বা ধর্মনিরপেক্ষ-রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হয়তো আদরণীয় হইতে পারে কিন্তু পারমার্থিক ব্যাপারে অনাদরণীয়।

যাহা হউক, মহাপ্রভুর, তাঁহার কৃপার ও শিক্ষার প্রভাবের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—মহাপ্রভুর লীলা—"নাহি ওর পার। জীব হঞা কে বা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥ যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ বর্ণিল। সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥ চৈ. চ. ৩।২০।৭১-৭২॥" জয় গৌর।

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকল-ত্রায় তে নমঃ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

(৬. ১. ১৯৬৪—১৩. ৩. ১৯৬৪; ১৯. ৬. ১৯৬৩—২. ৭. ১৯৬৪; ২২. ১১. ১৯৬৪—৩০. ১১. ১৯৬৪)

৮০। বিষ্ণুসহস্রনাম হইতে কবিরাজ-গোস্বামি-কর্ত্তৃক উদ্ধৃতি-প্রসঙ্গ

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক-ভকত-মাঝ
যে রচিল চৈতন্যচরিত।
তাঁহার চরণ-পদ্ম, সকল-মঙ্গল-সদ্ম,
বন্দো মুঞি অধমপতিত॥

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে মহাপ্রাণ ভীষ্মদেব যে-বিষ্ণুসহস্র নাম ব্যক্ত করিয়াছিলেন, মহাভারতের অনুশাসন পর্বে দানধর্ম-প্রকরণে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর অবতরণের হেতু-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই সহস্রনাম হইতে কয়েকটি নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও কোনও মুদ্রিত সংস্করণে সেই উদ্ধৃত নামগুলি যেভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অধুনা কেহ কেহ কবিরাজ-গোস্বামিসম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া জানা যাইতেছে। সেজন্য এই বিষয়টিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় এ-স্থলে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও এক মুদ্রিত সংস্করণ হইতে সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥ ৩১
তপ্তহেম-সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥ ৩২
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাথে।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ ৩৩
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম।
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'-তনু চৈতন্যগুণধাম॥ ৩৪
আজানুলম্বিতভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশু-বদন॥ ৩৫
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম॥ ৩৬
চন্দনের অঙ্গদবালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥ ৩৭
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নামের গণন॥ ৩৮
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি, আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥ ৩৯

মহাভারতে দানধর্ম্মে, বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে (১২৭।৭৫—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥"

এই উদ্ধৃতির সর্বশেষ সংস্কৃত অংশটি যেভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দের একটি শ্লোকের আকার ধারণ করিয়াছে এবং এই সংস্কৃত অংশের পূর্ববর্তী (১২৭।৭৫—এই অঙ্ক হইতেও মনে হইতে পারে, এই অঙ্কটি হইতেছে আকর-গ্রন্থ মহাভারতের শ্লোকাঙ্ক এবং এই ৭৫ অঙ্কটি এইরূপ প্রতীতিও জন্মাইতে পারে যে, সম্পূর্ণ সংস্কৃত বাক্যটি হইতেছে মহাভারতোক্ত সহস্রনামের ৭৫-সংখ্যক শ্লোক। অথচ মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনামে উল্লিখিত আকারের কোনও শ্লোক দৃষ্ট হয় না। "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।"—এই অংশটি হইতেছে মুদ্রিত মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনামের ৯২-সংখ্যক শ্লোকের প্রথমার্ধ এবং "সন্ন্যাস-কৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥"—এইরূপ অংশটি হইতেছে ৭৫-সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ। (বহু বৎসর পূর্বেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকাতে ৭৫ ও ৯২ শ্লোকদ্বয় সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করিয়া একথা বলা হইয়াছে।)

আবার, পূর্বোদ্ধৃত "সুবর্ণবর্ণো"-ইত্যাদি এবং "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"-ইত্যন্ত বাক্যটির পরে একটি অঙ্ক (৮) মুদ্রিত হওয়াতেও সংস্কৃত অংশটি একটিমাত্র শ্লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে। যদি আকর-গ্রন্থের শ্লোকাঙ্কে ৭৫-স্থলে ৯২, ৭৫ লিখিত হইত, তাহা হইলে একটিমাত্র শ্লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকিত না। সংস্কৃতাংশের সর্বশেষে যে ৮ অঙ্কটি লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে, সেই অধ্যায়ে উদ্ধৃত প্রাচীন গ্রন্থের শ্লোকসমূহের ক্রমানুসারে স্থানবাচক অঙ্ক। সম্পূর্ণ সংস্কৃতাংশটি যখন মহাভারতোক্ত দানধর্মপ্রকরণের ৯২ ও ৭৫ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের দুইটি অর্ধাংশ, তখন সর্বশেষে একটিমাত্র অঙ্ক (৮) না লিখিয়া "সুবর্ণবর্ণো"-ইত্যাদি প্রথমাংশের পরে যদি একটি অঙ্ক (৮) এবং "সন্ন্যাসকৃৎ"-ইত্যাদি দ্বিতীয়াংশের পরে আর একটি অঙ্ক (৯) লিখিত হইত, তাহা হইলে এই দুইটি অংশ যে একটিমাত্র শ্লোকের প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধ, এইরূপ প্রতীতির কোনও সম্ভাবনাই থাকিত না। কিন্তু তাহা করা হয় নাই বলিয়া অধ্যায়ে উদ্ধৃত শ্লোক-ক্রমবাচক ৮ অঙ্কটি,—সমগ্র সংস্কৃতাংশটি যে একটিমাত্র শ্লোক এইরূপ প্রতীতিকে দৃঢ়তা দান করিয়াছে।

ক। কবিরাজ-গোস্বামীর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ

এই সমস্ত কারণে অধুনা কেহ কেহ মনে করিতেছেন—মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনামেও যে শ্রীচৈতন্যের নাম আছে, তাহা প্রতিপন্ন করার অভিসন্ধিবশতঃই কবিরাজ-গোস্বামী মহাভারতোক্ত দুইটি শ্লোকের দুইটি অর্ধেক লইয়া একটিমাত্র শ্লোকের আকার দিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যও এই ছিল যে, তাঁহার গ্রথিত শ্লোকার্ধদ্বয় মহাভারতোক্ত একটিমাত্র শ্লোক বলিয়া যেন পাঠকদের প্রতীতি জন্মে।

কবিরাজ-গোস্বামীর বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগসম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। আমাদের নিবেদনের সারমর্ম হইতেছে এই যে, পূর্বোল্লিখিত অঙ্কগুলির একটি অঙ্কও কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত নহে;

মুদ্রিত গ্রন্থ-প্রকাশ-কালে সম্পাদকগণই এই অঙ্কগুলি সংযোজিত করিয়াছেন। এ-কথা বলার হেতু কথিত হইতেছে।

সর্বপ্রথমে আকরগ্রন্থ-মহাভারতের শ্লোকাঙ্কই আলোচিত হইতেছে। কবিরাজ-গোস্বামী যখন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন, তখন মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত ছিল না; সুতরাং তখন মহাভারতের কোনও মুদ্রিত সংস্করণও ছিল না। মহাভারতের হস্তলিখিত প্রতিলিপিই তখন প্রচলিত ছিল। মহাভারতাদি প্রাচীন হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে শ্লোকাঙ্ক ছিল বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, দেখা যায় শ্রীপাদ শঙ্কর-রামানুজাদি বেদান্তভাষ্যকারগণ এবং পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিগণ তাঁহাদের গ্রন্থে বহু স্থলে মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বহুবাক্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কোনও স্থলেই আকরগ্রন্থের শ্লোকাঙ্কের উল্লেখ করেন নাই, কেবল গ্রন্থের নাম, কোনও স্থলে বা গ্রন্থের নামের সহিত প্রকরণাদির উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। যদি এ-সমস্ত আকরগ্রন্থে শ্লোকাঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে সেই শ্লোকাঙ্কের উল্লেখই তাঁহারা করিতেন এবং অধিকতর স্থানব্যাপী প্রকরণাদির উল্লেখ করিতেন বলিয়া মনে হয় না।

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-নামক বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ সংকলিত করিয়াছেন, বর্তমান কালে তাহার একাধিক মুদ্রিত সংস্করণ প্রচলিত আছে। এ-স্থলে দুইটিমাত্র সংস্করণের কথা বলা হইতেছে। পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন-সম্পাদিত এবং কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) এবং শ্রীমৎ পুরীদাস-মহাশয়-কর্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীশচীনাথ চতুর্ধুরী-কর্তৃক ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ। এই উভয় গ্রন্থেই শ্লোকাঙ্ক মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু উভয় গ্রন্থের শ্লোকাঙ্ক সর্বত্র একরূপ নহে। পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণে প্রত্যেক শ্লোকেরই একটি পৃথক অঙ্ক দৃষ্ট হয়; কিন্তু কবিরত্ন-মহাশয়ের সংস্করণে একাধিক শ্লোকেরও একটিমাত্র শ্লোকাঙ্ক দৃষ্ট হয়। তাহার ফলে, প্রত্যেক বিলাসের এবং সমগ্র গ্রন্থেরও মোট শ্লোকসংখ্যা কবিরত্নের সংস্করণ অপেক্ষা পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণে অনেক বেশী দৃষ্ট হয়। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের-প্রাচীন হস্তলিখিত অনুলিপিতে কোনও শ্লোকাঙ্ক ছিল না; থাকিলে তদনুযায়ী মুদ্রিত গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণেও শ্লোকাঙ্কের একরূপতা থাকিত।

অতি প্রাচীন শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও মুদ্রিত বঙ্গবাসী-সংস্করণের সহিত বহরমপুর-সংস্করণের শ্লোকাঙ্কের সর্বত্র একরূপতা নাই। বঙ্গবাসী-সংস্করণে প্রত্যেক শ্লোকেরই একটি পৃথক্ শ্লোকাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু বহরমপুর-সংস্করণে তাহা করা হয় নাই। কোনও স্থলে বা একাধিক শ্লোকের একটি শ্লোকাঙ্ক, কোনও স্থলে বা সার্ধৈক শ্লোকে একটি অঙ্ক, আবার কোনও স্থলে বা অর্ধশ্লোকেরও একটি পৃথক্ অঙ্ক এই সংস্করণে দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে ইহার হেতু জানা যায়। তিনি তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভ লেখার পরে যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা "ক্রমসন্দর্ভ" লিখিয়াছেন, তাহা ক্রমসন্দর্ভের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন এবং এজন্যই তিনি যে তাঁহার ক্রমসন্দর্ভকে সপ্তম সন্দর্ভ বলিয়াছেন, তাহাও সে-স্থলে লিখিয়াছেন। সে-স্থলে তাঁহার উক্তি হইতে বুঝা যায় সর্বপ্রথমে তিনিই শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকাঙ্ক দিয়াছেন। তিনি প্রতি পদ্যের (অর্থাৎ শ্লোকের) একটি অঙ্ক দেন নাই, প্রতিবাক্যের একটি অঙ্ক দিয়াছেন। ক্রমসন্দর্ভ-টীকার প্রারম্ভে বন্দনাদির পরে তিনি লিখিয়াছেন—

"অথাত্র পরিভাষেয়ং জ্ঞাতব্যা যত্নপেক্ষতে। মূলং সটীকমঙ্কাদ্যৈঃ পরিচ্ছেদ্য সহানয়া। অঙ্কা বাক্যান্ত এবাত্র দেয়াঃ পদ্যান্ততো ন তু। বহুপদ্যৈকবাক্যত্বে গর্ভাঙ্কা বিন্দুমস্তকাঃ। যস্মিন্ পদ্যে নাস্তি টীকা তদপ্যঙ্কেন যোজয়েৎ। একপদ্যান্যবাক্যত্বে সংখ্যাশব্দাস্তকান্তকাঃ। বহুপদ্যৈকবাক্যত্বেঽপ্যমী জ্ঞেয়াস্তথাবিধাঃ। যথার্দ্ধকং যুগ্মকঞ্চ ত্রিকমিত্যাদ্যদাহৃতিঃ॥" শ্রীজীবগোস্বামীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রাচীন হস্তলিখিত অনুলিপিতে কোনও শ্লোকাঙ্ক ছিল না। যদি থাকিত, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যাইত যে, ব্যাসদেবের প্রদত্ত শ্লোকাঙ্কই পরম্পরাক্রমে পরবর্তী অনুলিপিতে স্থান পাইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে ব্যাসদেবের প্রদত্ত শ্লোকাঙ্কের পরিবর্তন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। যাহা হউক, বহরমপুর সংস্করণ শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীজীবগোস্বামি-কথিত শ্লোকাঙ্কই প্রায়শঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় মহাভারতাদি অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুলিপিতেও যে কোনও শ্লোকাঙ্ক ছিল না, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যাদির গ্রন্থের উল্লেখপূর্বক পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামী যখন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছেন, তখন যে মহাভারতের হস্তলিখিত প্রাচীন অনুলিপিতে কোনও শ্লোকাঙ্ক ছিল না, তাহাও জানা যায়। এজন্যই বলা হইয়াছে—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কোনও কোনও মুদ্রিত সংস্করণে যে "সুবর্ণবর্ণো" ইত্যাদি সংস্কৃতাংশের আকর-গ্রন্থ মহাভারতের শ্লোকাঙ্ক দৃষ্ট হয়, সেই শ্লোকাঙ্ক কবিরাজ-গোস্বামীর লিখিত নহে, তাহা হইতেছে—গ্রন্থ-মুদ্রণকালে গ্রন্থসম্পাদকগণকর্তৃক প্রদত্ত অঙ্ক।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও কোনও মুদ্রিত সংস্করণে যে পয়ারাঙ্ক, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের আকর-গ্রন্থের শ্লোকাঙ্ক, এবং সেই সমস্ত উদ্ধৃত শ্লোকের পরিচ্ছেদগত ক্রমানুযায়ী স্থান-পরিচায়ক অঙ্কাদি দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত অঙ্কও কবিরাজ-গোস্বামীর লিখিত অঙ্ক বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, এমন মুদ্রিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও আমরা দেখিয়াছি, যাহাতে কোনও রূপ অঙ্কই নাই। এ-স্থলে দুইটিমাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করা হইতেছে। একখানি হইতেছে—শ্রীবিনোদলাল গোস্বামিকর্তৃক সম্পাদিত এবং কলিকাতা ৮২নং আহীরিটোলা ষ্ট্রীট হইতে ১৩৩৭ সালে শ্রীতারাচাঁদ দাসকর্তৃক প্রকাশিত। অপর খানির প্রথমাংশ নাই বলিয়া সম্পাদক ও প্রকাশকের নাম এবং প্রকাশনের সময় জানিবার উপায় নাই। তবে গ্রন্থশেষে এইরূপ একটি মুদ্রিত বাক্য দৃষ্ট হয়—"এই গ্রন্থ মোং কলিকাতা আহীরিটোলা কামার পল্লিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দত্তের ৯৬ নম্বর বাটীতে তত্ব করিলে পাইবেন।" এই গ্রন্থদ্বয় ভিন্ন আকারের, অর্থাৎ তাহাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এক রকম নহে—সুতরাং দুইটি পৃথক্ গ্রন্থ। এই গ্রন্থদ্বয়ের কোনও গ্রন্থেই কোনও রূপ অঙ্ক নাই—পয়ারাঙ্ক নাই, উদ্ধৃত শ্লোকের আকর-গ্রন্থের শ্লোকাঙ্কও নাই এবং উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের পরিচ্ছেদানুগত ক্রমবাচক অঙ্কও নাই। ইহাতে বুঝা যায়—যে প্রাচীন হস্তলিখিত অনুলিপির অনুসরণে এই গ্রন্থদ্বয় মুদ্রিত হইয়াছে, সেই অনুলিপিদ্বয়ে কোনও রূপ অঙ্কই ছিল না, সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর লিখিত মূল গ্রন্থেও কোনও রূপ অঙ্কই ছিল না। যাহা হউক, এই দুইখানি গ্রন্থের প্রত্যেক গ্রন্থেই "সুবর্ণবর্ণো" ইত্যাদি এবং "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ" ইত্যন্ত বাক্যের পূর্বে আকর-গ্রন্থরূপে মহাভারতের সহস্রনামের উল্লেখ আছে। শ্রীবিনোদলাল গোস্বামি-সম্পাদিত গ্রন্থে আছে—"তথাহি

মহাভারতে দানধর্মে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে—" এবং অপর গ্রন্থখানিতে আছে—"তথাহি মহাভারতে দানধর্মে একোনপঞ্চাধিক—দ্বিশতাধিকাধ্যায়ে সহস্রনাম্নি॥" এ-স্থলে পাঠের সামান্য একটু ভিন্নতায় বুঝা যাইতেছে, সম্পাদকদের অনুসৃত আদর্শ প্রতিলিপিতে কিছু পাঠভেদ ছিল। তবে এই পাঠভেদে অর্থভেদ হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে এ-স্থলে শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্বন্ধেও দুয়েকটি কথা বলা হইতেছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের পূর্বে লিখিত। মূল শ্রীচৈতন্যভাগবতে কোনওরূপ অঙ্কই ছিল বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই। কলিকাতা বটতলা হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যভাগবত আমরা দেখিয়াছি; তাহাতে পয়ারাঙ্ক নাই, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের আকর-গ্রন্থের নাম আছে, কিন্তু আকর-গ্রন্থের শ্লোকাঙ্ক নাই, বিভিন্ন অধ্যায়ে উদ্ধৃত এতাদৃশ শ্লোক-সমূহের উদ্ধৃতির ক্রমানুযায়ী স্থানবাচক কোনও অঙ্কই নাই। ইহাতে বুঝা যায়, গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার লিখিত গ্রন্থে কোনওরূপ অঙ্কই লিখেন নাই। প্রভুপাদ শ্রীলঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদিত সটীক শ্রীচৈতন্যভাগবতেও পয়ারাঙ্ক নাই। তবে উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের আকর-গ্রন্থের নামের সম্মুখে বন্ধনীর মধ্যে আকর-গ্রন্থের শ্লোকাঙ্ক এবং শ্লোকের অন্তে অধ্যায়মধ্যে শ্লোকের স্থানবাচক অঙ্ক আছে। আকর-গ্রন্থের শ্লোকাঙ্ক যে সম্পাদক প্রভুপাদের সংযোজনা, বন্ধনীই তাহার প্রমাণ। আর শ্লোকের অন্তস্থিত অঙ্কও তাঁহারই প্রদত্ত, গ্রন্থকারের প্রদত্ত বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, গ্রন্থকার যখন পয়ারাঙ্কই লিখেন নাই, তখন যে তিনি উদ্ধৃত শ্লোকের স্থানবাচক অঙ্ক লিখিবেন, তাহা মনে হয় না। বিশেষতঃ পূর্বোল্লিখিত বটতলার গ্রন্থে এইরূপ অঙ্ক দৃষ্ট হয় না।

বাংলাভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থ কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরামদাসের মহাভারতের পুরাতন মুদ্রিত সংস্করণেও পয়ারাঙ্ক দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেও জানা যায়—কৃত্তিবাস এবং কাশীরামদাস তাঁহাদের গ্রন্থে পয়ারাঙ্ক লিখেন নাই। এইরূপে জানা যায়, তৎকালে পয়ারাঙ্কাদি লেখার রীতি প্রচলিত ছিল না।

এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে,—বর্তমানে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতমৃতের কোনও কোনও মুদ্রিত সংস্করণে যে-সমস্ত অঙ্ক দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত অঙ্ক কবিরাজ-গোস্বামীর প্রদত্ত নহে, সম্পাদকদের প্রদত্ত অঙ্কই।

অন্যান্য মুদ্রিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায়, পূর্বোল্লিখিত আহীরিটোলার গ্রন্থদ্বয়েও "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।"-এই শ্লোকার্ধ প্রথমে লিখিত হইয়াছে এবং তাহার অন্তে একটি দাড়ি দেওয়া হইয়াছে এবং "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"-এই শ্লোকার্ধ তাহার পরে লিখিত হইয়াছে এবং তাহার অন্তে দুইটি দাড়ি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, এই দুইখানি গ্রন্থের অনুসৃত প্রতিলিপিতে—সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর মূল গ্রন্থেও—এইরূপই লিখিত ছিল। সংস্কৃত শ্লোকের রীতি অনুসারে, শ্লোকের প্রথমার্ধের পরে একটি দাড়ি এবং দ্বিতীয়ার্ধের পরে দুইটি দাড়ি হইতেছে দুই অর্ধেকে মিলিয়া একটিমাত্র শ্লোকের পরিচায়ক। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর লেখা অনুসারে, এই দুইটি শ্লোকার্ধ যে একটিমাত্র শ্লোকের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে কবিরাজ-গোস্বামী কি স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে দুইটি শ্লোকের এই দুই শ্লোকার্ধকে একটি মাত্র শ্লোকরূপে প্রতীতি জন্মাইবার প্রয়াসেই এইরূপ করিয়াছেন? কবিরাজ-গোস্বামী যদি তাহাই

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বকথিত যে-অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

এসম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। এই প্রবন্ধের সর্বপ্রথমে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোনও মুদ্রিত সংস্করণ হইতে যে-অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তদন্তর্গত ৩৯-সংখ্যক পয়ার হইতেই জানা যায়—বিষ্ণুসহস্র-নামের অন্তর্গত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" —এই চারিটি নাম হইতেছে শ্রীচৈতন্যের আদিলীলার নাম (অর্থাৎ এই চারিটি নামে যে-সকল গুণ-লীলাদি সূচিত হয়, মহাপ্রভুর আদিলীলাতেই সে-সমস্ত প্রকটিত হইয়াছে) এবং "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"—এই চারিটি নাম হইতেছে শ্রীচৈতন্যের শেষ লীলার নাম (অর্থাৎ মহাপ্রভুর শেষ লীলতেই এই চারিটি নামে সূচিত লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে)। কবিরাজ-গোস্বামী মহাপ্রভুর লীলাকে মুখ্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—আদিলীলা ও শেষলীলা। তাঁহার কথিত আদিলীলা হইতেছে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্বকালের লীলা, অর্থাৎ গার্হস্থ্য-লীলা এবং শেষলীলা হইতেছে গার্হস্থ্য-লীলার পরবর্তীকালের লীলা। শেষলীলার পূর্বেই আদিলীলা। এজন্য, "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" —এই অংশটি মুদ্রিত মহাভারতের সহস্রনামের ৯২-সংখ্যক শ্লোকের প্রথমার্ধ হইলেও, মহাপ্রভুর আদিলীলার নামবাচক বলিয়া, প্রথমে লিখিয়াছেন এবং তাহার পরে মহাপ্রভুর শেষলীলার নামবাচক এবং ৯২-শ্লোকের পূর্ববর্তী, ৭৫-সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"—এই শ্লোকার্ধ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকের রীতি অনুসারে, কোনও শ্লোকের প্রথমার্ধের পরে একটি দাড়ি এবং দ্বিতীয়ার্ধের পরে দুইটি দাড়ি থাকে বলিয়া মহাভারতের মূল গ্রন্থেও "সুবর্ণবর্ণো" ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পরে একটি দাড়ি এবং "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ" ইত্যাদি শ্লোকার্ধের পরে দুইটি দাড়ি ছিল। তদনুসারে কবিরাজ-গোস্বামীও "সুবর্ণবর্ণো" ইত্যাদি ৯২-সংখ্যক শ্লোকের প্রথমার্ধের পরে একটি দাড়ি এবং "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ" ইত্যাদি ৭৫-সংখ্যক শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের পরে দুইটি দাড়ি লিখিয়াছেন। এই একটি এবং দুইটি দাড়ি মূলগ্রন্থে ছিল বলিয়াই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন; এই দাড়িগুলি কবিরাজ-গোস্বামীর নিজের প্রদত্ত নহে। তথাপি কিন্তু প্রথমে লিখিত "সুবর্ণবর্ণো"-ইত্যাদি অংশের পরে একটি দাড়ি এবং তাহার অব্যবহিত পরে লিখিত "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ"-ইত্যাদি অংশের পরে দুইটি দাড়ি থাকাতে উভয় অংশ মিলিয়া যে একটি শ্লোকের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। স্বীয় কোনও অভীষ্ট-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই যে কবিরাজ-গোস্বামী দুইটি পৃথক শ্লোকের দুইটি অর্ধেককে একটিমাত্র শ্লোকের প্রতীতি জন্মাইবার নিমিত্ত এইরূপ করিয়াছেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। মূল মহাভারতে যাহা লিখিত ছিল, তাহাই তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন; দৈবাৎ তাহা একটি শ্লোকের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কবিরাজ-গোস্বামী ছিলেন একজন পরম-ভাগবত ব্যক্তি, ভক্তি হইতে উত্থিত অকপট দৈন্যের মূর্তবিগ্রহ। এজন্যই তিনি তাঁহার চিত্তের অন্তস্থল হইতে উত্থিত ভাবের প্রকাশ করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন—"জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥ মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয়॥ এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনু জগত-ভিতরে॥ প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার। উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥

যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার। অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার॥ মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন। মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ॥ চৈ. চ. ১।৫।১৮৩-৮৮॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় গৌরচরিতামৃত-রস-পরিনিষিক্ত, নানাবিধ দার্শনিক আলোচনায় এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তে এবং ভক্তিসিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ, ভক্তিরস-পরিবেশনের অদ্ভুত নিপুণতার পরিচায়ক একখানি সর্বজন-সমাদৃত গ্রন্থ লিখিয়াও তিনি নিজ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—"আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥ চৈ. চ. ১।৮।৭৩॥", "আমি অতি ক্ষুদ্র জীব—পক্ষী রাঙ্গাটুনি। চৈ. চ. ৩।২০।৮১॥", "আমি লিখি, এহো মিথ্যা করি অভিমান। চৈ. চ. ৩।২০।৮৩॥"-ইত্যাদি। "কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যে রচিল চৈতন্যচরিত।"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয়ও কবিরাজ-গোস্বামীর কৃষ্ণভক্তিরস-সমুদ্রে নিমজ্জিততার কথা বলিয়া গিয়াছেন। এতাদৃশ কবিরাজ-গোস্বামীর চিত্তে কোনওরূপ সংকীর্ণতা, কপটতা, বিপ্রলিপ্সা (পরবঞ্চনার মনোবৃত্তি) স্থান পাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কোনও দুরভিসন্ধির বশীভূত হইয়া তিনি যে মহাভারতোক্ত সহস্রনামের দুইটি পৃথক শ্লোকের দুইটি অংশকে একটিমাত্র শ্লোকরূপে প্রতীতি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও বিশ্বাস করা যায় না। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার চিত্তে উল্লিখিতরূপ দুরভিসন্ধি জাগিতে পারে, তথাপি একটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক যে—তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট তাঁহার এই দুরভিসন্ধি নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। কবিরাজ-গোস্বামীর ন্যায় নির্মলচিত্ত, অকপট পরমভাগবতের কথা দূরে, নিজের অপকৌশল ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যাহাতে থাকে, ভক্তিগন্ধলেশশূন্য কোনও বুদ্ধিমান লোকও নিতান্ত দুঃসাহসী এবং নির্লজ্জ না হইলে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিবেচ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে—স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যের মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে তিনি উল্লিখিতরূপ অপকৌশলের আশ্রয় লইলেও, অনিসন্ধিৎসু পাঠকের নিকটে তাঁহার এই অপকৌশল ধরা পড়িবে। ধরা পড়িলে, তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যের মহিমা যে খর্বতাপ্রাপ্ত হইবে এবং সেই খর্বতা-প্রাপ্তির হেতু যে তিনিই হইবেন এবং তাহাতে তাঁহার ইষ্টদেবের চরণে যে তাঁহার অপরাধ হইবে, তাহাও কবিরাজ-গোস্বামী অবশ্যই জানিতেন। সুতরাং তিনি যে এইরূপ একটি অপকৌশল-গর্ভবাক্য জনসাধারণের নিকটে লিখিতভাবে উপস্থিত করিবেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

এই সমস্ত কারণে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—কেহ কেহ কবিরাজ-গোস্বামীর বিরুদ্ধে পূর্বোল্লিখিত যে-অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন। কবিরাজ-গোস্বামীর চিত্তের পরিচয় জানিবার চেষ্টা বোধ হয় তাঁহারা করেন নাই।

খ। কবিরাজ-গোস্বামীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ

কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্ধৃত শ্লোকার্ধে "সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"-এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ উদ্ধৃত শ্লোকার্ধে "শান্তি"-শব্দের পরে বিসর্গ নাই। তাহাতে "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"-অংশটি একটি সমাসবদ্ধ পদরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের কোনও কোনও মুদ্রিত সংস্করণে "নিষ্ঠা শান্তিঃ

পরায়ণঃ ॥”—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। এইরূপ পাঠে “শান্তি”-শব্দের পরে বিসর্গ আছে ; তাহাতে “নিষ্ঠা, শান্তিঃ এবং পরায়ণঃ”—এই তিনটি পদ পাওয়া যায়।

কোনও মুদ্রিত সংস্করণে বিসর্গযুক্ত শান্তি-শব্দ দেখিয়া পূর্বোক্ত অভিযোগকারিগণ বলিয়া থাকেন—কবিরাজ-গোস্বামী এ-স্থলে শ্লোকের পাঠ পরিবর্তন করিয়া “নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ”-স্থলে “নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণঃ” পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহারা আরও বলেন—কবিরাজের লিখিত পাঠ “নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ” হইতেছে একটি সমাসবদ্ধ পাঠ এবং এইরূপ করার হেতু এই যে, এইরূপ সমাসবদ্ধ-পদ গ্রহণ করিলেই ইহা মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য হইতে পারে। অভিযোগকারীরা এ-স্থলেও কবিরাজ-গোস্বামীর বিরুদ্ধে একটি দুরভিসন্ধির অভিযোগ (মহাভারতোক্ত নামকে শ্রীচৈতন্যে প্রযোজ্য করার দুরভিসন্ধিরূপ অভিযোগ) আনয়ন করিয়াছেন—যে দুরভিসন্ধিদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই কবিরাজ-গোস্বামী শ্লোকের পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন।

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে শান্তি-শব্দের পরে বিসর্গযুক্ত “নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ” পাঠ যেমন আছে, তেমনি কোনও কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে বিসর্গহীন “নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ” পাঠও দৃষ্ট হয়। বাচস্পতি-কাব্যতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ-কবিরত্ন-ভাগবতভূষণোপাধি-সম্বলিত শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ-কর্তৃক সংশোধিত এবং বহরমপুর—শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভা হইতে শ্রীরামদেব মিশ্রকর্তৃক ১৩১৬ সালে প্রকাশিত শ্রীপাদশঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্য-সম্বলিত মহাভারতান্তর্গত অনুশাসনপর্বমধ্যস্থ দানধর্ম-প্রকরণগত “শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম”-নামক গ্রন্থে বিসর্গ হীন “নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ”-পাঠ দৃষ্ট হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত আফতাব্ চন্দ্ মহাতাব বাহাদুরের আজ্ঞায় ও ব্যয়ে, শ্রীতারকনাথ তত্ত্বরত্ন, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি এবং শ্যামাচরণ বিদ্যালঙ্কারাদি কর্তৃক পরিশোধিত এবং ১৮০৩ শকাব্দায় মুদ্রিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ-গ্রন্থাগারের পুরাণ—১০৮ (ক) নম্বরের মহাভারতেও বিসর্গহীন পাঠ দৃষ্ট হয়—“সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥” অনুসন্ধান করিলে এইরূপ বিসর্গহীন পাঠ অন্যত্রও দৃষ্ট হইতে পারে। কবিরাজ-গোস্বামী যে-হস্তলিখিত অনুলিপি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে বিসর্গহীন “নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ” পাঠ ছিল বলিয়াই তিনি তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং পাঠ-পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কোনও কোনও মুদ্রিত মহাভারতে সহস্রনামের ৭৫-সংখ্যক শ্লোকে “পরায়ণঃ”-স্থলে “পরায়ণম্”-পাঠও দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও “পরায়ণম্” এবং “পরায়ণঃ”—এই দুই রকম পাঠের তাৎপর্য লিখিয়াছেন। “পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুনরাবৃত্তি-শঙ্কারহিতং ইতি পরায়ণং। পুংলিঙ্গপক্ষে বহুব্রীহিঃ ॥” ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের সময়েও “পরায়ণম্” এবং “পরায়ণঃ”—এই দুই রকম পাঠ প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে যাঁহারা “পরায়ণঃ”-পাঠ লিখিয়াছেন, তাঁহারা যে “পরায়ণম্”-পাঠের পরিবর্তন করিয়া “পরায়ণঃ” লিখিয়াছেন—একথা বলা যেমন সঙ্গত হয় না, তদ্রূপ বিসর্গযুক্ত “নিষ্ঠাশান্তিঃ পরায়ণঃ”-পাঠের পরিবর্তন করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী যে বিসর্গহীন “নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ” লিখিয়াছেন,—একথা বলাও সঙ্গত হয় না।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যে “পরায়ণঃ” এবং “পরায়ণম্”—এইরূপ যে দুইটি নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে “পরায়ণঃ”-পদটি হইতেছে পুংলিঙ্গ এবং “পরায়ণম্” পদটি হইতেছে ক্লীবলিঙ্গ। বিষ্ণুসহস্রনামারম্ভের পূর্ববর্তী-১৩-সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“নাম্নাং সহস্রস্য কিমেকং দৈবতমিতি

পৃষ্টে একদেবতাবিষয়ত্বাদ্ যত্র পুংলিঙ্গকো নামপ্রয়োগস্তত্র বিষ্ণুর্বিশেষ্যঃ, যত্র স্ত্রীলিঙ্গশব্দপ্রয়োগস্তত্র দেবতা বিশেষ্যা, যত্র নপুংসকলিঙ্গ-শব্দ-প্রয়োগস্তত্র ব্রহ্ম বিশেষণীয়ম্ ।'' তাৎপর্য—বিষ্ণুসহস্রনামের সমস্ত নামই একই দেবতার নাম। সেই দেবতার কোনও কোনও নাম পুংলিঙ্গ-শব্দবাচ্য, কোনও কোনও নাম স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দবাচ্য, আবার কোনও কোনও নাম নপুংসক (অর্থাৎ ক্লীব)-লিঙ্গ-শব্দবাচ্য। যে-স্থলে পুংলিঙ্গ-শব্দের প্রয়োগ আছে, সে-স্থলে তাহার বিশেষ্য হইতেছে পুংলিঙ্গ-শব্দাত্মক বিষ্ণু, যে-স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দের প্রয়োগ আছে, সে-স্থলে তাহার বিশেষ্য হইতেছে স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দাত্মক-দেবতা এবং যে-স্থলে ক্লীবলিঙ্গ-শব্দের প্রয়োগ আছে, সে-স্থলে তাহা হইতেছে ক্লীবলিঙ্গ-শব্দাত্মক ব্রহ্ম-শব্দের বিশেষণীয়। (নামগুলি হইতেছে বিশেষণ)। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি হইতে, পূর্বোল্লিখিত "পরায়ণঃ" এবং "পরায়ণম্"—এই দুইটি নামের মধ্যে একটি পুংলিঙ্গ এবং অপরটি ক্লীবলিঙ্গ হওয়ার হেতু জানা যায়।

যাহা হউক, মূল আলোচ্যবিষয়-প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বিবেচ্য। অভিযোগকারীরা বলেন—সহস্রনামের ৭৫-সংখ্যক শ্লোকোক্ত নামগুলি মহাপ্রভুতে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই কবিরাজগোস্বামী "নিষ্ঠাশান্তিঃ পরায়ণঃ"-অংশের পাঠ-পরিবর্তন করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে নিবেদন এই যে—তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত পাঠ-পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। যেহেতু, অর্থবিশেষে, অর্থাৎ মহাপ্রভুর রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপত্বের অনুরূপ অর্থে, "নিষ্ঠা", "শান্তিঃ" এবং "পরায়ণঃ";-এই তিনটি নামও কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না (পরবর্তী খ-উপ-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইবে)। কবিরাজ গোস্বামী যদি বিসর্গযুক্ত "নিষ্ঠাশান্তিঃ পরায়ণঃ"-পাঠ দেখিতেন, তাহা হইলে তাহাই উদ্ধৃত করিতেন এবং তাহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। সুতরাং পাঠ-পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজনই হইত না। উল্লিখিত কারণে একথা বলাও চলে না যে, তিনি উভয়রূপ পাঠই দেখিয়াছেন ; কিন্তু "শান্তি"-শব্দের পরে বিসর্গযুক্ত পাঠ তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল হয় না বলিয়া তাহা বর্জন করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল, কবিরাজগোস্বামিকর্তৃক পাঠ-পরিবর্তনের, বা পাঠ-বর্জনের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। একথাও বলা চলে না যে—উক্ত তিনটি নামের কেবলমাত্র মহাপ্রভুতে প্রযোজ্যতা দেখাইলে নামসংখ্যা দুইটি বর্ধিত হইয়া পড়ে বলিয়াই তিনি বিসর্গযুক্ত পাঠ দেখিয়াও গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী গ-উপ-অনুচ্ছেদে একথা বলার হেতু কথিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠ পরিবর্তনের যেমন কোনও প্রয়োজন হয় না, তেমনি পাঠ বর্জনেরও কোনও প্রয়োজন হয় না।

গ। কবিরাজ-গোস্বামীর বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ

"নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-এইরূপ বিসর্গযুক্ত পাঠে তিনটি নাম পাওয়া যায়—"নিষ্ঠা, শান্তি এবং পরায়ণ।" কিন্তু "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"-এইরূপ বিসর্গহীন সমাসবদ্ধ পাঠে একটিমাত্র নাম হয়—"নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ।" পূর্বোক্ত অভিযোগকারীরা বলেন—নিষ্ঠা, শান্তি এবং পরায়ণ—এই তিনটি নাম মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য হইতে পারে না এবং নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ—এই নামটি মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য হইতে পারে। এজন্যই কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঠ পরিবর্তন করিয়া বিসর্গহীন "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"-এইরূপ একটি নামবাচক সমাসবদ্ধ পদ লিখিয়াছেন। তাহাতে সহস্রনামের সংখ্যা দুইটি কম পড়িয়া যায়।

এ-সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই। বিসর্গযুক্ত "নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-এইরূপ পাঠের নামগুলির বিশেষ অর্থে তিনটি নামই যে মহাপ্রভুতে এবং একমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে, সুতরাং পাঠ পরিবর্তনের যে কোনও প্রয়োজনই হয় না, তাহা পূর্ববর্তী খ-অনুচ্ছেদেই কথিত হইয়াছে। বিসর্গহীন "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"-এইরূপ একটিমাত্র নাম গ্রহণ করিলেও যে সহস্রনাম-সংখ্যা অপূর্ণ থাকিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে মহাভারতোক্ত নামসমূহের সংখ্যা গণনা করিয়াছেন। যদিও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য সহস্রনামের সর্বশেষ শ্লোকের ভাষ্যের পরে লিখিয়াছেন—"ইতি নাম্নাং দশমং শতং বিবৃতম্।", তথাপি তাঁহার ভাষ্যানুসারে গণনা করিলে দেখা যায়—নামসংখ্যা হয় ১০০৩, অর্থাৎ এক সহস্র হইতে তিন অধিক। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯-সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত "অমরপ্রভুঃ" এবং "বিশ্বকর্মা" এই দুইটি পদের এবং ৩৪-সংখ্যক শ্লোকে কথিত "সুপর্ণো"-পদেরও কোনও উল্লেখ বা ভাষ্য শঙ্করভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। "অমরপ্রভুঃ", "বিশ্বকর্মা" এবং "সুপর্ণঃ" এই তিনটি পদে তিনটি নাম গণনা করিয়াই আমরা শঙ্করকথিত মোট নাম-সংখ্যা ১০০৩ পাইয়াছি। তিনি যদি ঐ তিনটিকে পৃথক্ নাম মনে না করিয়া থাকেন, ১৯-সংখ্যক শ্লোকে কথিত "অমরপ্রভুঃ" এবং "বিশ্বকর্মা" পদদ্বয়কে সেই শ্লোকে কথিত অন্য কোনও নামদ্বয়ের বিশেষণরূপে এবং ৩৪-সংখ্যক শ্লোকোক্ত "সুপর্ণ"-পদটিকেও যদি তত্রত্য কোনও পদের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার কথিত নামসংখ্যা এক সহস্রই হইবে। অবশ্য তিনি ১৯-সংখ্যক এবং ৩৪-সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের ভাষ্যে উল্লিখিত পদগুলি সম্বন্ধে "সবিশেষণমেকং নাম" লিখেন নাই। তাঁহার ভাষ্যে উল্লিখিত পদত্রয়ের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই আমরা উল্লিখিতরূপ কথা বলিলাম। কিন্তু উল্লিখিতরূপে তাঁহার মোট সংখ্যা এক সহস্র পূর্ণ হইলেও সমস্যার সমাধান হয় না। এ-কথা বলার হেতু এই। কোনও কোনও স্থলে, শ্রীপাদ শঙ্কর শ্লোককথিত কোনও অংশের প্রথমে একটিমাত্র-নামসূচক অর্থ করিয়াছেন; আবার তাহার পরে "অথবা", কিম্বা "বা" বলিয়া সেই অংশেরই একাধিক-নামসূচক অর্থ করিয়াছেন। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে। ১৮-সংখ্যক শ্লোকের "ধাতুরুত্তমঃ"-পদে তিনি প্রথমে একটিমাত্র নামের কথা বলিয়াছেন। "ধাতুরুত্তম ইতি নামৈকং সবিশেষণং সামানাধিকরণ্যেন সর্বধাতুভ্যঃ পৃথিব্যাদিভ্য উৎকৃষ্টং চিদ্ধাতুরিত্যর্থঃ।" তাহার পরেই আবার লিখিয়াছেন—"ধাতুর্বিরিঞ্চাদিতো বা নামদ্বয়ং বা কার্য্যকারণ-প্রপঞ্চধারণাচ্চিদেব ধাতুরুক্তঃ সর্বেষামুদ্ধতানামতিশয়েনোদ্-গতত্বাদুত্তমঃ ॥ ১৮ ॥" এ-স্থলে "বা" বলিয়া তিনি "ধাতুরুত্তমঃ" পদের দুইটি নামবাচক অর্থ করিয়াছেন—ধাতু এবং উত্তম। পাঁচটি স্থলে তিনি এইরূপ পাঁচটি অতিরিক্ত নামের কথা বলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কথিত নামসংখ্যা এক সহস্রেরও অধিক হইয়া পড়ে পাঁচ। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতের বঙ্গানুবাদে একহাজারের উপরেও চল্লিশের বেশী নাম পাওয়া যায়। নবদ্বীপের শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামী বেদান্ততীর্থ-সম্পাদিত এবং ১৩৬০ সালে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রম্" দ্বিতীয় সংস্করণে এক-হাজারের উপরে প্রায় পঁচিশটি অধিক নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীল হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সংস্করণ মহাভারতে ১০০৩টি নাম দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ এক সহস্রের উপরেও তিনটি নাম বেশী দৃষ্ট হয়। নামসংখ্যার এইরূপ পার্থক্যের হেতু হইতেছে নাম-গণনার রীতির পার্থক্য। অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখপূর্বক তাহা

প্রদর্শিত হইতেছে। ১৬-সংখ্যক শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর "প্রধানপুরুষেশ্বরঃ" পদের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"প্রধানং প্রকৃতির্মায়া পুরুষো জীবস্তয়োরীশ্বরঃ।" সুতরাং তাঁহার মতে এ-স্থলে নাম হইতেছে একটি—"প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।" কিন্তু এ-স্থলে কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থে আছে দুইটি নাম—"প্রকৃতি, পুরুষের ঈশ্বর।" ১৭-সংখ্যক শ্লোকে "নিধিরব্যয়ঃ"-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর একটি নাম ধরিয়াছেন—"অব্যয়নিধি"; কিন্তু সিংহ মহাশয়, গোস্বামী মহাশয় এবং সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও দুইটি নাম করিয়াছেন—নিধি এবং অব্যয়। ৩৬-সংখ্যক শ্লোকে "বাচস্পতিরুদারধীঃ"-স্থলে শঙ্কর একটি নাম ধরিয়াছেন—"বাচস্পতিরুদারধীরিতি পদদ্বয়মেকং নাম।" কিন্তু সিংহ মহাশয়, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এবং গোস্বামী মহাশয়ও দুইটি নাম করিয়াছেন—বাচস্পতি এবং উদারধী। এইরূপ নামভেদ আরও অনেক আছে।

ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নাম গণনা করিয়াছেন, তখন কবিরাজ গোস্বামীও যে তাঁহার বিবেচনামত একভাবে নাম গণনা করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। তিনি কি ভাবে নাম গণনা করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই; কেননা, সমগ্র বিষ্ণুসহস্রনাম-সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আলোচনা আছে বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার গণনার রীতি অনুসারে "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ" একটি মাত্র নাম হইলেও সহস্রনাম অপূর্ণ হয় বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। তাই তিনি "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"-পদে একটি নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীর মতে "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ" একটি নাম হইলেও দুইটি নাম কম পড়িয়া যাওয়ার আশংকা থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

এই ভাবে দুইটি নাম কম পড়িয়া যায় বলিয়া যদি তিনি দেখিতেন, তাহা হইলে সহস্রনামোক্ত কোনও দুইটি সবিশেষণ নামের বিশেষণাংশ-দ্বয়কে দুইটি পৃথক্ নাম দেখাইয়াও তিনি নাম-সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারিতেন। আবার, শান্তিঃ-শব্দের পরে বিসর্গযুক্ত "নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-অংশের তিনটি নামেরই মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্যতা দেখাইলে যদি দুইটি নাম অধিক হয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তাহা হইলেও সহস্রনামের যে-স্থলে কোনও দুইটি পদকে সন্নিহিত অপর নামদ্বয়ের বিশেষণ-রূপেও গ্রহণ করা যায়, সে-স্থলে সেই দুইটি পদকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াও দুইটি সবিশেষণ নাম করিয়া নাম-সংখ্যা দুইটি কমাইতে পারিতেন। এইরূপে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—কবিরাজ-গোস্বামি-কর্তৃক পাঠ-পরিবর্তনের যেমন কোনও প্রয়োজনই দৃষ্ট হয় না, তেমনি পাঠ-বর্জনেরও কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এ-বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধির অভিযোগের কোনও যক্তিসঙ্গত হেতুই থাকিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বিবেচ্য। বলা হইয়াছে—দুইটি নাম কম পড়িয়া যায়। এ-কথার তাৎপর্য কি? অন্যান্য পণ্ডিতদের কথিত নামের সংখ্যা হইতে দুই কম হয়? না কি সহস্র নাম হইতে দুই কম হয়? অন্যান্য পণ্ডিতদের কথিত নামের সংখ্যা হইতে দুই কম হইলেও কবিরাজ-গোস্বামীর নামের সংখ্যা হাজারের উপরেই থাকিবে। কেন না, পূর্বে শ্রীপাদশঙ্করাচার্যাদির কথিত নামের সংখ্যাসম্বন্ধে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহাদের কথিত নামের সংখ্যা ১০০৩-এর কম কাহারও নাই। আর "নিষ্ঠা, শান্তিঃ এবং পরায়ণঃ" এই তিনটি নামের স্থলে "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"-একটি নাম ধরিলে যে মোট নামসংখ্যা এক সহস্র হইতে দুই কম হইবে, তাহা বলিবার উপায়ও নাই। কেন না, কবিরাজ-গোস্বামীর অবলম্বিত নাম-গণনার রীতি অনুসারে তাঁহার প্রদর্শিত নামগুলির সংখ্যা জানিবারও উপায় নাই; যেহেতু, তাঁহার কোনও

বিবরণ পাওয়া যায় না। অভিযোগকারীরা বোধ হয় আপাত-দৃষ্টিলভ্য জ্ঞান হইতেই এ-কথা বলিয়াছেন। সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচারপূর্বক এ-কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তাঁহাদের এই অভিযোগও অমূলক বলিয়াই মনে হয়।

যুধিষ্ঠিরের নিকটে ভীষ্মদেব যে-নামগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাদের মোট সংখ্যা যে এক সহস্র ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভীষ্মদেব কি ভাবে নাম গণনা করিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। সে-জন্যই ভিন্ন ভিন্ন বিদ্বজ্জন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নাম গণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের গণনার রীতি অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন অনুমান বলিয়াই তাঁহাদের কথিত নামসংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। যদি কোনও পণ্ডিত কোনও রকমে এক সহস্র নাম প্রদর্শনও করেন, তাহা হইলে সেই এক সহস্র নামও ভীষ্মদেবের অভিপ্রেত নাম হইবে কি না, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। যেহেতু, তাঁহার গণনাও তাঁহার নিজস্ব অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ঘ। কবিরাজ-গোস্বামীর বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ

পূর্বকথিত তৃতীয় অভিযোগের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অভিযোগকারীরা বলেন—"নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-এইরূপ বিসর্গযুক্ত পাঠে যে তিনটি নাম, অর্থাৎ নিষ্ঠা, শান্তিঃ এবং পরায়ণঃ—এইরূপ তিনটি নাম আছে, সেই তিনটি নাম মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য হয় না বলিয়াই কবিরাজগোস্বামী স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির দুরভিসন্ধির বশীভূত হইয়া পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন। পূর্বকথিত দ্বিতীয় অভিযোগের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে, বিসর্গযুক্ত "নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-এইরূপ পাঠে যে তিনটি নাম পাওয়া যায়, বিশেষ অর্থে, সেই তিনটি নামও কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য হয়। এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে আরও কয়েকটি কথা বলা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। নচেৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনার অনুসরণে কিছু অসুবিধা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এজন্য অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হইতেছে।

প্রথমে বিষ্ণুসহস্রনাম-সম্বন্ধেই দুয়েকটি কথা বলা হইতেছে। এই নামগুলি যে বিষ্ণুরই সহস্রনাম, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিষ্ণুসংজ্ঞক একাধিক ভগবৎস্বরূপ আছেন—বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণেরও একটি নাম বিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ি-গর্ভোদশায়ি-ক্ষীরোদকশায়ী প্রভৃতিকেও বিষ্ণু বলা হয়। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও একটি নাম বিষ্ণু। আবার, বিষ্ণু-শব্দে ব্যাপনশীলত্ব সূচিত হয় বলিয়া, স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে যে-সমস্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারা সকলেই সর্বব্যাপক এবং সর্বগত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ বলিয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকেও তত্ত্বের বিচারে সর্বব্যাপক, অর্থাৎ বিষ্ণু। মহাভারতোক্ত নামগুলি কি এ-সমস্ত বিষ্ণু-স্বরূপের কোনও একই স্বরূপের নাম? নাকি একাধিক স্বরূপের নাম?

মহাভারত হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের আরম্ভ হইতে জানা যায়, যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের নিকটে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তিনটি প্রশ্ন হইতেছে—"কিমেকং দৈবতং লোকে কিম্বাপ্যেকং পরায়ণম্॥ স্তুবন্তঃ কং কমর্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ শুভম্॥ ২॥", অর্থাৎ "লোকে (সংসারে লোকের ভজনীয়) এক দেবতা কে? কেই বা প্রাণিগণের পরায়ণ (পরম আশ্রয়)? এবং কাহার স্তব এবং

অর্চনা করিলে মানবগণ শুভ (মঙ্গল) লাভ করিতে পারে ?" এই প্রশ্নত্রয় হইতে জানা যায়, যুধিষ্ঠির লোকের ভজনীয় কেবল এক দেবতার (দেবের বা স্বরূপের) কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, একাধিক দেবতার বা স্বরূপের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেবও একমাত্র দেবেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি হইতেছেন— "দেবদেব, অনন্ত, পুরুষোত্তম, অনাদিনিধন, বিষ্ণু, সর্বলোকমহেশ্বর, এবং লোকাধ্যক্ষ। ৪-৬॥" এ-স্থলে "দেবদেব" হইতে আরম্ভ করিয়া "লোকাধ্যক্ষ" পর্যন্ত পদগুলি হইতেছে কথিত একই স্বরূপের বিশেষণ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও ১৩-সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে একই দেবতার কথাই বলিয়াছেন—"নাম্নাং সহস্রস্য কিমেকং দৈবতমিতি পৃষ্টে একদেবতাবিষয়ত্বাদ্-ইত্যাদি।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—মহাভারতোক্ত-সহস্রনাম হইতেছে একই বিষ্ণুর নাম, একাধিক বিষ্ণুর নাম নহে।

এখন আবার প্রশ্ন হইতেছে—সেই একই বিষ্ণু কে ? স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ? না কি বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজস্বরূপ ? না কি অপর কেহ ? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে সহস্রনামেরই কয়েকটি নামের এবং শঙ্করভাষ্যের কোনও কোনও উক্তির আলোচনা দরকার। সেই আলোচনাই করা হইতেছে।

বিষ্ণুসহস্রনামে দেখা যায়, একই নাম একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরঃ (১৭, ২২ প্রভৃতি শ্লোক), বেদবিৎ (২৭-শ্লোক, দুই বার), অমোঘঃ (২৫, ৩০ শ্লোক), মাধবঃ (২১, ৩১ শ্লোক), শ্রীমান্ (১৬, ৩২, ৩৭, শ্লোক), অজঃ (২৪, ৩৫ শ্লোক), সত্যঃ (২৫, ৩৬ শ্লোক) ইত্যাদি। বিষ্ণুঃ-এই নামটি এবং কৃষ্ণঃ-এই নামটিও একাধিক স্থলে দৃষ্ট হয়। আবার এইরূপ কয়েকটি নামও আছে, যাহাদের বর্ণবিন্যাস একরূপ নহে বটে, কিন্তু অর্থ এক। এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—এইরূপ উল্লেখ দোষের নহে ; যেহেতু, একইরূপ বর্ণবিন্যাসবিশিষ্ট একাধিক নাম থাকিলেও সে-সমস্ত নামের অর্থ একরূপ নহে। আবার একার্থক অথচ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিন্যাসবিশিষ্ট একাধিক নাম একার্থক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামই সূচিত করে। "বিষ্ণ্বাদিশব্দানাং পৌনরুক্তমপি বৃত্তিভেদান্ন পৌনরুক্তং শ্রীপতি-মাধব ইত্যাদীনাং বৃত্ত্যেকত্বেঽপি শব্দভেদান্ন পৌনরুক্তং অর্থৈকত্বেঽপি পৌনরুক্তং ন দোষায়। ১৩-সংখ্যক শ্লোকের শঙ্কর-ভাষ্য।"

এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্য হইতে কয়েকটি নামের তাৎপর্য এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। ১৬-সংখ্যক শ্লোকের "কেশবঃ"-নামের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুং প্রতি নারদবচনম্। যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুরাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন। তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে জ্ঞেয়ো ভবিষ্যসীতি॥" ইহাতে বুঝা গেল, কেশী-নিহন্তা ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণেরই এই কেশব-নাম। ২০-সংখ্যক শ্লোকের "কৃষ্ণঃ"-নাম-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন— "সদানন্দাত্মকঃ কৃষ্ণঃ। কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বত ইতি ব্যাসবচনাৎ॥" শ্রুতিতেও অনুরূপ একটি বাক্য দৃষ্ট হয়। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ গো. পূ. তা॥ ১॥" ইহা হইতে জানা গেল, এ-স্থলে 'কৃষ্ণঃ', হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই নাম। ২৭-সংখ্যক শ্লোকের প্রথমোক্ত "বেদবিৎ"-নামের প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"যথাবদ্ বেদার্থং বেত্তীতি বেদবিৎ। বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহমিতি ভগবদ্বচনাৎ॥" এই ভগবদ্বচন হইতেছে— "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥"—শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ১৫।১৫-বাক্য। ইহা হইতেছে

অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেববেদ্যঃ—একমাত্র আমিই সমস্ত বেদের বেদ্য।" সমস্ত বেদের একমাত্র বেদ্য হইতেছেন পরব্রহ্ম। সুতরাং উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণবাক্য হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম এবং তিনিই বেদান্তকর্তা এবং বেদবিৎ। এইরূপে জানা গেল—২৭-সংখ্যক শ্লোকের প্রথমোক্ত "বেদবিৎ" হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই একটি নাম। ৩২-সংখ্যক শ্লোকের "মহাদ্রিধৃক্"-নাম-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"মহান্তমদ্রিং মন্দরং গোবর্দ্ধনঞ্চ অমৃতমন্থনে গোরক্ষণে চ ধৃতবানিতি মহাদ্রিধৃক্।" এ-স্থলেও গোবর্ধনধারী ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে। "শৌরিঃ"-নাম-প্রসঙ্গে ৫০-সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"শূরস্য অপত্যং বাসুদেবরূপঃ শৌরিঃ।" এবং ৮২-সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"শূরকুলোদ্ভবত্বাৎ শৌরিঃ।" উভয় স্থলেই শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। ৫৩-সংখ্যক-শ্লোকের "দামোদরঃ"-নাম-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"যশোদয়া দাম্নোদরে বদ্ধ ইতি দামোদরঃ।" এ-স্থলেও যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে। ৬৬-সংখ্যক শ্লোকের "গোপতিঃ"-নাম-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"গবাং পালনাৎ গোপবেষধরো গোপতিঃ।" এ-স্থলেও ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলা হইয়াছে। ৭৬-সংখ্যক শ্লোকের "গোহিতঃ"-নাম-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"গবাং বৃদ্ধ্যর্থং গোবর্দ্ধনং ধৃতবানিতি গোভ্যো বা হিতঃ গোহিতঃ।" এ-স্থলেও ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কথিত হইয়াছেন। ৮২-সংখ্যক শ্লোকের "কেশিহা"-নাম-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—"কেশিনামানং দৈতেয়ং হতবানিতি কেশিহা।" এ-স্থলেও ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। ৮৭-সংখ্যক শ্লোকের "বাসুদেবঃ"-নামসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"বসুদেবস্য অপত্যং বাসুদেবঃ।"—এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণ। ৮৮-সংখ্যক শ্লোকের "সুযামুনঃ"-নাম-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"শোভনা যামুনা যমুনাসম্বন্ধিনঃ পরিবেষ্টারোঽস্যেতি সুযামুনঃ। গোপবেষধরাঃ যামুনাপরিবেষ্টারঃ পদ্মাসনাদয়ঃ শোভনা অস্যেতি বা সুযামুনঃ।" এ-স্থলেও যমুনা-পুলিনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। সেই শ্লোকেই "যদুশ্রেষ্ঠঃ"-নাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যদূনাং প্রধানত্বাৎ যদুশ্রেষ্ঠঃ।"—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ। ৯৪-সংখ্যক শ্লোকের "গদাগ্রজঃ"-নাম-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"যদ্বা গদো নাম শ্রীবাসুদেবাবরজঃ তস্মাদগ্রে জায়ত ইতি গদাগ্রজঃ।" এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। ১১৯-সংখ্যক শ্লোকের "দেবকীনন্দনঃ"-নাম-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"দেবক্যাঃ সুতো দেবকীনন্দনঃ।" এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণই লক্ষিত। স্পষ্টভাবে বা তাৎপর্য-বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণবাচক আরও কয়েকটি নাম বিষ্ণুসহস্রনামে আছে বলিয়া শঙ্করভাষ্য হইতে জানা যায়।

উল্লিখিত নামগুলির মধ্যে কয়েকটি নাম যে ব্রজলীলাসূচক এবং কয়েকটি যে নন্দ-যশোদা-নন্দনত্ব-বাচক—সুতরাং-ব্রজবিহারি-শ্রীকৃষ্ণবাচক, উল্লিখিত ভাষ্যবাক্য হইতে তাহা স্পষ্টভাবেই জানা যায়। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্। প্রকটলীলায় তিনি যখন মথুরা-দ্বারকায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি বসুদেবের পুত্র বাসুদেব বলিয়া পরিচিত হইতেন বটে ; কিন্তু তখনও তাঁহার যশোদাস্তনন্ধয়ত্ব-স্বভাব তিনি পরিত্যাগ করেন নাই ; সুতরাং তখনও বাস্তবিক তিনি সর্ববেদবেদ্য পরব্রহ্মই। "বেদবিৎ"-নাম-প্রসঙ্গে গীতাবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহাকে পরব্রহ্মরূপেই পরিচিত করিয়াছেন।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের লীলামহিমাদিও বস্তুতঃ তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপরূপে তাঁহারই লীলামহিমাদি। শঙ্করভাষ্য হইতে জানা যায়, বিষ্ণুসহস্রনামের মধ্যে এতাদৃশ বহু

ভগবৎস্বরূপের নাম আছে। তাঁহরাও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপ বলিয়া সেই সমস্ত নামেরও মুখ্য বাচ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাও জানা যায়।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম যে-একই বিষ্ণুর নাম, সেই একই বিষ্ণু হইতেছেন—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিষ্ণুসংজ্ঞক শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুসংজ্ঞক অপর কোনও স্বরূপ নহেন।

যুক্তির সহায়তাতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিশেষ প্রকাশ; সুতরাং তাঁহাদের ভগবত্তাদি শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রাপ্ত, কৃষ্ণনিরপেক্ষ নহে। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার ভগবত্তাদি স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ। এজন্যই অবতার-কালে অন্যান্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপই প্রকাশরূপে স্বয়ংভগবানের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়েন; কিন্তু শ্রীরাম-নৃসিংহাদি ভগবৎস্বরূপের অবতরণকালে, শ্রীকৃষ্ণের কথা দূরে, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপই তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয়েন না। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ-স্বরূপ অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের নামও তত্তৎ-স্বরূপরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই নাম বলিয়া, সমস্ত ভগবন্নামের মূল বাচ্যও পরবন্ধ শ্রীকৃষ্ণই। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুসংজ্ঞক অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ-বিশেষ নহেন বলিয়া একমাত্র তাঁহার নামকীর্তনে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন হইতে পারে না। কেননা, অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া তাঁহাদের নামও শ্রীকৃষ্ণের নামেরই প্রকাশ-বিশেষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপের প্রকাশ-বিশেষ নহেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নামও সেই ভগবৎ-স্বরূপের নামের প্রকাশ-বিশেষ হইতে পারে না। সুতরাং মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম যদি অন্য কোনও বিষ্ণুসংজ্ঞক ভগবৎস্বরূপের সহস্রনাম হইত, তাহা হইলে, সেই অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ নহেন বলিয়া তাঁহার কোনও নামই পরব্রহ্মত্ববাচক এবং স্বয়ংভগবত্তা-বাচক হইত না। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা যায়, সহস্রনামের অন্তর্গত কোনও কোনও নাম হইতেছে পরব্রহ্মত্ব-বাচক এবং স্বয়ংভগবত্তা-বাচক। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—পূর্বে যে প্রদর্শিত হইয়াছে,—এই বিষ্ণুসহস্রনাম হইতেছে একই বিষ্ণুর নাম, সেই একই বিষ্ণু হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ এবং বিষ্ণুসংজ্ঞক শ্রীকৃষ্ণই, বিষ্ণুসংজ্ঞক অপর কোনও ভগবৎস্বরূপ নহেন। অপর যে-সকল ভগবৎস্বরূপের নাম বিষ্ণুসহস্রনামে দৃষ্ট হয়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া এবং তাঁহাদের নামও শ্রীকৃষ্ণনামের প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া, তাঁহাদের নামও তত্তৎস্বরূপরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই নাম।

এইরূপে জানা গেল—মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ এবং মূল নারায়ণ এবং বিষ্ণুসংজ্ঞক শ্রীকৃষ্ণেরই নাম, অপর কোনও ভগবৎস্বরূপের নাম নহে।

এক্ষণে আমাদের মূল প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা আবার আরম্ভ করা হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে,—মহাভারতোক্ত সহস্রনামের বাচ্য পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। তাঁহার এই অনন্তস্বরূপের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি স্বরূপেই পরব্রহ্মের এবং স্বয়ংভগবত্তার দুইটি লক্ষণ—শ্রুতিকথিত-নির্বিশেষ-ব্রহ্মযোনিত্ব এবং প্রেমদাতৃত্ব—এই দুইটি লক্ষণ—বিরাজিত, অন্য কোনও স্বরূপে এই দুইটি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। এই দুই স্বয়ংভগবৎস্বরূপের

এক স্বরূপ হইতেছেন ব্রজবিহারী যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার বর্ণ শ্যাম এবং অপর স্বরূপ হইতেছেন মুণ্ডকশ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষ। রুক্ম-শব্দের অর্থ স্বর্ণ বলিয়া রুক্মবর্ণে স্বর্ণবর্ণ বা স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ বুঝায়।

শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ যে শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও যোনি বা মূল, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতায় এই শ্রীকৃষ্ণবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। এ-স্থলে 'ব্রহ্ম'-শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝায় না, পরন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই বুঝায়। কেন না, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরব্রহ্ম ; সুতরাং তিনি পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা মূল কিরূপে হইতে পারেন ? শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মও তাঁহার এক প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা মূল হইতে পারেন। আর, মুণ্ডকশ্রুতি রুক্মবর্ণ পুরুষকেও "ব্রহ্মযোনি" বলিয়াছেন ; সুতরাং তিনিও নির্বিশেষব্রহ্মের যোনি বা মূল। এই "ব্রহ্মযোনিত্ব" হইতেছে পরব্রহ্মত্বের একটি বিশেষ লক্ষণ।

প্রেমদাতৃত্বও হইতেছে পরব্রহ্মত্বের বা স্বয়ংভগবত্তার একটি বিশেষ লক্ষণ। কেন না, স্বয়ংভগবান্ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। এই লক্ষণটি ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত এবং শ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণ পুরুষেও বিরাজিত।

কিন্তু এই প্রেমদাতৃত্ব-বিষয়ে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা রুক্মবর্ণ পুরুষের একটি অপূর্ব বিশেষত্ব আছে। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ সাধকের যোগ্যতা বিচার করিয়াই প্রেম দান করেন, নির্বিচারে কাহাকেও প্রেম দেন না। কিন্তু মুণ্ডকশ্রুতি হইতে জানা যায়—রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন-প্রাপ্তিমাত্রেই যে কোনও লোক, এমন কি মহাপাপী, মহা-অসুরও, তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত পাপ-পুণ্য হইতে এবং পাপ-পুণ্যের মূল মায়া হইতেও সম্যক্-রূপে নির্মুক্ত হইয়া শ্রুতিকথিত পরাবিদ্যারূপ প্রেম লাভ করিতে পারে। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥ ৩।১।৩॥" ইহা হইতে জানা গেল—এই রুক্মবর্ণ পুরুষ দর্শনদানদ্বারা নির্বিচারে, যাহাকে-তাহাকে, প্রেমদান করিয়া থাকেন। প্রেমদাতৃত্ব-বিষয়ে ইহাই হইতেছে রুক্মবর্ণ পুরুষের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-ইত্যাদি ১১।৫।৩২-শ্লোকে উল্লিখিত মুণ্ডকশ্রুতির তাৎপর্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকের "ত্বিষাকৃষ্ণং"-শব্দে এই শ্লোককথিত ভগবৎ-স্বরূপের "পীতবর্ণত্ব" অর্থাৎ "রুক্মবর্ণত্ব" এবং "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্"-শব্দে মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যে কথিত রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে প্রেমদাতৃত্বরূপ অসাধারণ মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকোক্ত ভগবৎ-স্বরূপ যে শ্রীরাধার স্বর্ণবর্ণে বা পীতবর্ণে আচ্ছাদিত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাপ্রভুতে যে এই শ্লোকোক্ত সমস্ত লক্ষণই বিরাজিত, কবিরাজ-গোস্বামীর শিক্ষাগুরু আদি বৈষ্ণবাচার্য শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই গোস্বামিগণের আনুগত্যে কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ১।৪ অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন—স্বীয় মাধুর্যের আস্বাদনের নিমিত্ত অত্যন্ত লুব্ধ হইয়া, ভক্তভাব-ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন অসম্ভব বলিয়া, স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণই অখণ্ড-প্রেমভক্তিভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধার পূর্ণতমবিকাশময়ী প্রেমভক্তির আশ্রয় হওয়ার নিমিত্ত, হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া পীতবর্ণ বা রুক্মবর্ণ পুরুষ হইয়াছেন। হেমগৌরাঙ্গী শ্রীরাধার হেমকান্তি বা স্বর্ণবর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণের

শ্যামবর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়াছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ এই স্বরূপে স্বর্ণবর্ণ বা রুক্মবর্ণ। কবিরাজ-গোস্বামী ইহাও দেখাইয়াছেন যে—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গে এই রুক্মবর্ণ পুরুষের সমস্ত লক্ষণই বিরাজিত ; সুতরাং ইনিই হইতেছেন—শ্রীভাগবতে কথিত "ত্বিষাকৃষ্ণ-সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদস্বরূপ" এবং মুণ্ডকশ্রুতিকথিত নির্বিচারে প্রেমদাতা রুক্মবর্ণ পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া পূর্ণতমা প্রেমভক্তির আধার শ্রীরাধার সহিত একই বিগ্রহে মিলিত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মহাপ্রভুও শ্রীরাধার ন্যায় ভক্তভাবময়। এই ভক্তভাবময়ত্ব হইতেছে শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রুক্মবর্ণ-কৃষ্ণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর একটি বৈশিষ্ট্য। কেন না, শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণে স্ববিষয়া ভক্তি নাই, থাকিতেও পারে না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া ভক্তি থাকে শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের মধ্যে ; তন্মধ্যে আবার একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই তাহা পূর্ণতমরূপে বিরাজিত।

মহাভারতোক্ত বিষ্ণুসহস্রনাম যখন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেরই নাম, তখন তন্মধ্যে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহারই অপর এক স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ রুক্মবর্ণ পুরুষ মহাপ্রভুর নামও থাকিতে পারে। মহাভারতোক্ত সহস্রনামের মধ্যে মহাপ্রভুর বাচক নাম আছে কিনা, এবং থাকিলে কোন্ কোন্ নাম কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্মের শ্যামবর্ণ স্বরূপ হইতে রুক্মবর্ণ-স্বরূপের পূর্বকথিত বিশেষত্বগুলির কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সেই বিশেষত্বগুলি হইতেছে এই ঃ—

(১) শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, কিন্তু মহাপ্রভু রুক্মবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ বা গৌরবর্ণ।

(২) মহাপ্রভু ভক্তভাবময়। স্বরূপতঃ স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভক্তি পোষণ করেন, ভক্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের নামগুণ-রূপ-লীলাদির কীর্তনাদিদ্বারা তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নাম-রূপ-গুণাদির মাধুর্য আস্বাদন করেন।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও নির্বিচারে প্রেমদান করেন না ; কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি সকলকেই নির্বিচারে প্রেমদান করেন।

(৪) ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন না ; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন।

বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণে। সুতরাং মহাভারতোক্ত কোন্ কোন্ নাম একমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে প্রযোজ্য নয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উল্লিখিত বিশেষ লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এক্ষণে মহাভারত হইতে কবিরাজ-গোস্বামিকর্তৃক উদ্ধৃত "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"—এই নামগুলির আলোচনা করা হইতেছে।

সুবর্ণবর্ণঃ। এ-স্থলে "সুবর্ণ"-শব্দের অন্তর্গত "সু"-শব্দের অর্থ হইতেছে "উত্তম," এবং "বর্ণ"-শব্দে অক্ষর (ক, খ ইত্যাদি বা অ, আ ইত্যাদি) বুঝায়। ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ ইত্যাদি স্থলে যেমন "বর্ণ"-শব্দে অক্ষর বুঝায়, তদ্রূপ। তাহা হইলে "সুবর্ণ"-শব্দের অর্থ হইল উত্তম বর্ণ বা উত্তম অক্ষর। ভক্তের নিকট স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের নামের অক্ষরগুলিই হইতেছে সর্বাপেক্ষা উত্তম অক্ষর। সুতরাং ভক্তের নিকটে "সুবর্ণ"-শব্দে "কৃষ্ণ"—এই অক্ষরদ্বয়কেই অর্থাৎ "কৃষ্ণ"-নামকেই বুঝায়। আর "সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের দ্বিতীয়

"বর্ণ"-শব্দে "বর্ণনকর্তা" বুঝায়। এ-কথা বলার হেতু এই। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে "বর্ণ"-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"ৎ ক স্তুতিবিস্তারশুক্লাত্যুদ্‌যুক্তিদীপনে। ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ॥ (অর্থাৎ, স্তুতি, বিস্তার, শুক্লাদি, উদ্‌যুক্তিদীপনে বর্ণ-ধাতুর প্রয়োগ হয়। (স্তুতি-বিস্তারাদি অর্থে যে বর্ণ-ধাতুর প্রয়োগ হয়, তাহার দৃষ্টান্তও শব্দকল্পদ্রুমে প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্তুতি-বাচক দৃষ্টান্তটি এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে) বর্ণয়তি বর্ণাপয়তি কবিঃ স্তৌতীত্যর্থঃ। (অর্থ—কবি বর্ণন করিতেছেন, বর্ণন করাইতেছেন—ইহার অর্থ হইতেছে স্তুতি করিতেছেন)।" "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২-শ্লোকের "কৃষ্ণবর্ণং"-শব্দ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশস্বপরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্।—যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন, অর্থাৎ তাদৃশ স্বীয় পরমানন্দবিলাসের স্মরণজনিত উল্লাসের বশবর্তী হইয়া নিজে গান করেন এবং পরমকারুণিকতাবশতঃ সমস্ত লোককেও তাহা উপদেশ করেন, তিনি হইতেছেন "কৃষ্ণবর্ণ"। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণাবতারলীলাদিবর্ণনাৎ কৃষ্ণবর্ণম্।" তাৎপর্য্য একই। এ-সমস্ত কারণেই পূর্বে বলা হইয়াছে—"সুবর্ণবর্ণ"-শব্দের দ্বিতীয় 'বর্ণ'-শব্দে 'বর্ণনকর্তা' বুঝায়। সুতরাং 'সুবর্ণবর্ণ'-শব্দের অর্থও হইবে—যিনি 'সুবর্ণ (অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয়, এই অক্ষরদ্বয়াত্মক কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণকে, কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে, বর্ণন করেন, তিনি—সুবর্ণবর্ণ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—"সুবর্ণবর্ণঃ, হেমাঙ্গঃ" প্রভৃতি নাম পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানেরই নাম। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম-স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতে দুই পরব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত—ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ এবং রুক্মবর্ণপুরুষ বা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। এই দুই স্বরূপের মধ্যে রুক্মবর্ণ পুরুষ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন শ্রীরাধার সহিত একই বিগ্রহে মিলিত ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ। ইনিই স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণস্বরূপের পরমানন্দ-বিলাসের স্মরণজনিত উল্লাসের বশবর্তী হইয়া ভক্তভাবে স্বীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নাম-গুণ-লীলাদির কীর্তনাদি করিয়া নাম-গুণ-লীলাদির মাধুর্য আস্বাদন করিতে পারেন এবং সেই উল্লাসের বশবর্তী হইয়া সমস্ত লোককেও শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ-মনন-কীর্তনাদির উপদেশ দিতে পারেন। ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ভক্তভাবাপন্ন নহেন বলিয়া ভক্তভাবে তিনি এইরূপ করিতে পারেন না। সুতরাং "সুবর্ণবর্ণঃ"-নামটি শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে এবং একমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

হেমাঙ্গঃ। হেম-শব্দের অর্থ হইতেছে—স্বর্ণ, রুক্ম। হেমের বা স্বর্ণের ন্যায় অঙ্গ (অঙ্গকান্তি) যাঁহার, তিনি—হেমাঙ্গ। এই নামটিও মহাপ্রভুতে এবং একমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণে প্রযোজ্য নহে। যেহেতু, মহাপ্রভুর অঙ্গকান্তিই স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ, ব্রজেন্দ্রনন্দনের অঙ্গকান্তি তদ্রূপ নহে, তিনি হইতেছেন শ্যামকান্তি।

বরাঙ্গঃ। বরাঙ্গ-শব্দের অর্থ হইতেছে—বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ যাঁহার। লাবণ্য, মাধুর্য, কান্তির ঔজ্জ্বল্য-আদিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গও বরাঙ্গ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গও বরাঙ্গ। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহাদের পার্থক্য আছে। এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ৩৩-৩৪-পয়ারদ্বয় হইতে জানা যায়, দৈর্ঘ্য-বিস্তারে মহাপ্রভু হইতেছেন নিজের হাতের চারিহস্ত-পরিমিত। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দৈর্ঘ্য-বিস্তারে নিজের হাতের সাড়ে চারি হাত (ভা. ১০।১৪।১৪-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা দ্রষ্টব্য)।

উভয়ের দেহই মানুষের দেহ অপেক্ষা বর—শ্রেষ্ঠ। কেননা, মানুষের দেহ হয় দৈর্ঘ্য-বিস্তারে নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত—সাত বিঘত ; জীবতত্ত্ব বলিয়া বর্তমান কল্পের ব্রহ্মার দেহও ব্রহ্মার নিজ হাতে সাত বিঘত (ভা. ১০।১৪।১৪-শ্লোক দ্রষ্টব্য)। চতুর্হস্তপরিমিত দেহবিশিষ্ট বরাঙ্গ মহাপ্রভুই ভক্তভাবাপন্ন. সার্ধচতুর্হস্ত পরিমিত বরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাবাপন্ন নহেন। এতাদৃশ দেহবিশিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গ আবার, সর্বচিত্তহর শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তহারিণী রাধাভাবকান্তিদ্বারা সুবলিত হইয়া এক অসাধারণ বরণীয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, অসাধারণ বরাঙ্গ হইয়াছেন। এজন্য এ-স্থলে "বরাঙ্গ" হইতেছে মহাপ্রভুরই একটি নাম, ইহা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নাম নহে। যে-হেতু, শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব-কান্তি-সুবলিত নহেন। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতেও তাহাই জানা যায়।

চন্দনাঙ্গদীঃ। "চন্দনাঙ্গদী"-শব্দের অর্থ হইতেছে—চন্দনের অঙ্গদ ধারণ করেন যিনি। এই প্রসঙ্গে, এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উদ্ধৃত কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতেছে এইরূপ। "চন্দনের অঙ্গদবালা, চন্দন-ভূষণ। নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্তন॥ ৩৭॥" ভক্তভাবে মহাপ্রভুই কৃষ্ণসংকীর্তন করেন এবং সংকীর্তনে কৃষ্ণ-নাম-গুণাদির স্মরণজনিত পরমানন্দে নৃত্য করেন। ভক্তভাবহীন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং এই নামটিও কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

সন্ন্যাসকৃৎ। "সন্ন্যাসকৃৎ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না, মহাপ্রভুই তাহা করেন। কোনও কোনও কলিতে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নির্বিচারে পাপহত লোকদিগকেও হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকেন, তাহা তিনি নিজেই যে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১।৩ পরিচ্ছেদে কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণ বচন।
কৃপাকরি ব্যাস প্রতি করিয়াছেন কথন॥ ৬৬
তথাহি উপপুরাণে—
অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥"

ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ব্রহ্মার এক কল্পের মধ্যে একটিমাত্র দ্বাপর যুগেই একবার অবতীর্ণ হয়েন, ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি কোনও কলিতেই অবতীর্ণ হয়েন না। তিনিই যে পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্‌রূপে কোনও কোনও (অর্থাৎ যে-দ্বাপরে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী) কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েন, "আসন্ বর্ণা স্ত্রয়োহ্যস্য"-ইত্যাদি ভা. ১০।৮।১৩-শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়। এই পীতবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোল্লিখিত উক্তিতে বলা হইয়াছে—কোনও কোনও কলিতে স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পাপহত লোকদিগকেও নির্বিচারে হরিভক্তি (প্রেম) প্রদান করেন। পূর্ব আলোচনা হইতে জানা যায়—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরূপেই তিনি কোনও কোনও কলিতে অবতীর্ণ হয়েন এবং নির্বিচারে হরিভক্তি প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও নির্বিচারে কাহাকেও প্রেম দেন না।

শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তি হইতেও জানা গেল—তিনি যখন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে কোনও কলিতে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কোনও দ্বাপরেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। এইরূপে জানা গেল, এই "সন্ন্যাসকৃৎ"-নামটি কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, শ্রীকৃষ্ণে ইহা প্রযোজ্য নহে।

শমঃ। "শমঃ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ ॥ ভা. ১১।১৯।৩৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥" কৃষ্ণভক্ত মনে করেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র প্রিয় এবং কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য—সুতরাং একমাত্র কর্তব্য। সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিও, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধার অখণ্ড প্রেমভক্তি-ভাণ্ডারের অধিকারী বলিয়া মহাপ্রভুর শমও (অর্থাৎ বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠত্বও) অখণ্ড—পূর্ণতম ; তিনি এতাদৃশ শমেরও মূর্তরূপ। এজন্য তাঁহার একটি নাম—শমঃ। এই নামটি কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য ; শ্রীকৃষ্ণে এই নাম প্রযোজ্য হইতে পারে না। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তভাবময় নহেন বলিয়া শমশব্দের পূর্বকথিত অর্থে তিনি শমের মূর্তরূপ হইতে পারেন না।

শান্তঃ। মহাপ্রভু শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি 'অশান্ত'। চৈ. চ. ২।১৯।১৩২ ॥" কৃষ্ণভক্তের চিত্তে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার কামনা-ব্যতীত অন্য কোনও কামনাই স্থান পায় না। সেজন্য কৃষ্ণভক্ত হইতেছেন "নিষ্কাম"। "কাম"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে নিজের জন্য কিছু কামনা করা। ভুক্তি (ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বা পরকালের স্বর্গাদি-সুখের ভোগ), মুক্তি (পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও একরকমের মুক্তি), কিংবা সিদ্ধি (অণিমা-লঘিমাদি সিদ্ধি)—এই সমস্তই হইতেছে সাধকের নিজের জন্য কাম্য বস্তু। কৃষ্ণভক্ত এ-সমস্তের কিছুই চাহেন না। "শান্ত"-শব্দের একটি অর্থও হইতেছে—"প্রাপ্তোশমঃ। ইতি ভরতঃ ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ॥" যিনি "উপশম" প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই "শান্তঃ"। "উপশমঃ (উপ+শম+অল, ভাবে)। (পুং) শমতা। তৎপর্যায় ঃ—শমঃ, শান্তিঃ, শমদঃ, তৃষ্ণাক্ষয়ঃ। হেমচন্দ্রঃ ॥ —শব্দকল্পদ্রুম ॥" ইহা হইতে জানা গেল—যিনি শম-প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই "শান্ত"। শম-শব্দের অর্থ পূর্বেই কথিত হইয়াছে—বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠতা। বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠতা নাই বলিয়াই ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামীরা সকলেই অশান্ত। তাঁহাদের বুদ্ধির নিষ্ঠতা হইতেছে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনাতে, শ্রীকৃষ্ণে নহে।

নিখিল-ভক্তকুল-মুকুটমণি শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ মহাপ্রভু হইতেছেন ভক্তভাবে কৃষ্ণভক্ত-মুকুটমণি—সুতরাং তিনিই পূর্ণতমরূপে "শান্ত"। এজন্য তাঁহার একটি নাম "শান্ত"। এই অর্থে, এই "শান্ত"-নামটি কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, পূর্বোক্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ। "নিষ্ঠা"-শব্দে "কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা" বুঝায়। "শান্তি"-শব্দের অর্থ এইরূপ। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান হইতে জানা যায়, অমরকোষের মতে "শান্তি"-শব্দের একটি অর্থ—শম। শম-শব্দের অর্থ পূর্বেই কথিত হইয়াছে— বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠতা। অয়ন-শব্দের অর্থ—গতিও হয়, আশ্রয়ও হয়, প্রাপ্তিও হইতে পারে। তাহা হইলে "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে এই—কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠা এবং শান্তি (বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা) হইতেছে পর (শ্রেষ্ঠ—সর্বশ্রেষ্ঠ) অয়ন যাঁহার, তিনি হইতেছেন "নিষ্ঠাশান্তি-

পরায়ণঃ।" এই নামটিও কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, পূর্বোক্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

বিসর্গযুক্ত "নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-পাঠে তিনটি নাম পাওয়া যায়—"নিষ্ঠা", "শান্তিঃ" এবং "পরায়ণঃ"।

এই তিনটি নাম মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য হইতে পারে কি না, এক্ষণে তাহাই বিবেচিত হইতেছে॥

নিষ্ঠা। কৃষ্ণভক্তের নিষ্ঠা থাকে একমাত্র কৃষ্ণভক্তিতে। সুতরাং ভক্তসম্বন্ধে নিষ্ঠা-শব্দে "কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাই" বুঝায়। অখণ্ড-কৃষ্ণভক্তিভাণ্ডারের অধিকারী মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তিনিষ্ঠাও অখণ্ডা—পূর্ণতমা। মহাপ্রভু হইতেছেন—এতাদৃশী নিষ্ঠার মূর্তরূপ। তিনিই মূর্তিমতী নিষ্ঠা। এজন্য তাঁহার একটি নাম—নিষ্ঠা। এই অর্থে এই "নিষ্ঠা"-নামটি কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে, পূর্বোক্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

শান্তিঃ। "নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"—এই বিসর্গহীন বাক্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—"শান্তিঃ"-শব্দের একটি অর্থ হয়—"শমঃ"। পূর্বে "শমঃ"-নাম-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—মহাপ্রভু মূর্তিমান্ শম বলিয়া তাঁহার একটি নাম—শম। শান্তি-শব্দের "শম"-অর্থেও মহাপ্রভু হয়েন—মূর্তিমতী শান্তি। এজন্য তাঁহার একটি নাম—শান্তিঃ। পূর্বোক্ত কারণে ইহাও কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য হয় না।

"শান্তি"-শব্দের এইরূপ অর্থে "শম" এবং "শান্তি" একার্থক হইলেও, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের পূর্বোল্লিখিত উক্তি অনুসারে, শব্দভেদ (অর্থাৎ বর্ণবিন্যাসের ভেদ) বলিয়া পুনরুক্তি-দোষ হয় না।

"শান্তি"-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। একটি কথা এ-স্থলে বলা আবশ্যক। এ-স্থলে "শান্তিঃ" হইতেছে সর্বব্যাপক পরব্রহ্মের একটি নাম। সুতরাং "শান্তিঃ"-শব্দেরও ব্যাপকতম অর্থ-গ্রহণই সঙ্গত। ব্যাপকতম অর্থে শান্তি-শব্দ পরা-শান্তিকেই বুঝায়। এই ব্যাপকতম অর্থে "শান্তিঃ"-শব্দ যে পরব্রহ্মকেই বুঝায়, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

আলোচ্য "শান্তিঃ"-নামপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—"সমস্তাবিদ্যানিবৃত্তিঃ শান্তিঃ সা ব্রহ্মৈব॥ —সমস্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতেছে 'শান্তি'। এই 'শান্তি' ব্রহ্মাই (অর্থাৎ পরব্রহ্মাই)।" শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে পরব্রহ্মের একটি তটস্থ লক্ষণকেই ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। কেননা, ব্রহ্মের প্রভাবেই সমস্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে। কার্যদ্বারা যে-লক্ষণটি জানা যায়, তাহাই হইতেছে তটস্থ লক্ষণ। শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মের কোনও একটি লক্ষণও ব্রহ্মবাচক নাম হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণও ব্রহ্মবাচক নাম হইতে পারে। তটস্থ-লক্ষণ হইতে স্বরূপ-লক্ষণের যে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, পরবর্তী আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। স্বরূপলক্ষণে পরব্রহ্ম হইতেছেন—মাধুর্য। এজন্যই শ্রুতি মাধুর্যব্যঞ্জক শব্দেই পরব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন—তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, আনন্দঘন, রসঘন—ইত্যাদি। অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দকেই "রস" বলা হয়। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভঃ॥" পরব্রহ্ম হইতেছেন—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। কি রকম "আনন্দস্বরূপ"? —রসস্বরূপ অর্থাৎ অনির্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দস্বরূপ। মাধুর্য

হইতেছে আনন্দের বা রসের স্বরূপগত ধর্ম বা লক্ষণ। এজন্য মাধুর্য্যকে আনন্দস্বরূপ-রসস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপগত লক্ষণ বলা যায়। বস্তুতঃ মাধুর্য্যই হইতেছে পরব্রহ্মত্বের সার। যেহেতু, পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে যে-সমস্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজমান, তাঁহাদের প্রত্যেক স্বরূপেই আনন্দ বা মাধুর্য বিরাজিত—এমন কি শ্রুতিকথিত নির্বিশেষ ব্রহ্মেও। কিন্তু ব্রহ্মের সকল তটস্থ-লক্ষণ সকল স্বরূপে নাই। তন্মধ্যে আবার-স্বয়ংরূপ পরব্রহ্মে এই মাধুর্যের সর্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ। এজন্যই স্বয়ংরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য—"কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে, তা'সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমনি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৮॥" বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত চঞ্চল। ভা. ১০।৮৯-অধ্যায় হইতে তাহা জানা যায় এবং সেই নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও যে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যসুখ এবং নারায়ণের মাধুর্যাদি আস্বাদনজনিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের যোগ্যতা লাভের আশায়, উৎকট ব্রত-নিয়ম ধারণপূর্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীভাগবত হইতে জানা যায়। "যদ্‌বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ভা. ১০।১৬।৩৬॥" এমন কি "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার, আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। 'স্বসৌভাগ্য' যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম, এই রূপ তার নিত্যধাম॥ চৈ. চ. ২।২১।৮৬॥" "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥ ভা. ৩।২।১২॥"-শ্লোকই তাহার প্রমাণ। কিন্তু শাস্ত্র হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের, এমন কি নারায়ণেরও, মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহাদের মন চঞ্চল হয় না। সুতরাং তাঁহারাই পরমা শান্তি লাভ করেন। এইরূপে জানা গেল—শান্তি-শব্দের ব্যাপক অর্থে, মাধুর্যময় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—"শান্তিঃ"। নারায়ণ-লক্ষ্মীপ্রভৃতিরও চিত্তাকর্ষক মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের পূর্ণতম বিকাশ হয় তাঁহার মদনমোহন-রূপে। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন, তখনই শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে তাঁহার মদনমোহন-রূপ প্রকটিত হয়। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্ব-মোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥" কিন্তু রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের মাধুর্য যে মদনমোহনরূপের মাধুর্য অপেক্ষাও সর্বাতিশায়িরূপে অধিক, রায়রামানন্দের অপরোক্ষ অনুভূতিই তাহার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে-বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এইরূপ ঃ—

একদিন রায়রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসিস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন॥

এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু! কারণ ইহার॥
প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥ চৈ. চ. ২।৮।২২০-২৮॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—রামানন্দ রায় সন্ন্যাসী প্রভুকে প্রথমে শ্যামসুন্দর বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখভাগে কাঞ্চনপ্রতিমাতুল্যা গৌরাঙ্গী শ্রীরাধাকেও দেখিয়াছিলেন। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ"—এই প্রমাণ অনুসারে, তখন শ্রীকৃষ্ণের মদন-মোহন-রূপই প্রকটিত হইয়াছিল। স্বীয় উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন-রূপ দেখিয়া রামানন্দের যে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই আনন্দের আস্বাদন-জনিত উন্মাদনা রামানন্দ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি তখন সম্বিৎহারা হয়েন নাই; সহজভাবেই তাঁহার দৃষ্ট রূপের বিবরণ তিনি প্রভুর নিকট বলিতে পারিয়াছিলেন। আত্মগোপন-তৎপর ভক্তভাবাপন্ন প্রভু রামানন্দের গাঢ় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মহিমা-খ্যাপনার্থ যে-কথাগুলি বলিলেন, তাহা হইতে জানা যায়, প্রভু রামানন্দকে জানাইতে চাহিয়াছেন—"তিনি সন্ন্যাসীই, অপর কিছু নহেন। রাধাকৃষ্ণে রামানন্দের গাঢ় প্রেম আছে বলিয়াই, সেই প্রেমের প্রভাবে তিনি প্রভুর সন্ন্যাসিরূপের স্থলে রাধাকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন।" প্রভুর কথা শুনিয়া,—

"রায় কহে—তুমি প্রভু! ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর, তোমার কোন্ ব্যবহার?॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ— পড়িলা ভূমিতে॥ চৈ. চ. ২।৮।২২৯-৩৪॥"

রামানন্দ রায়কে প্রভু তাঁহার স্বরূপ দেখাইলেন। সেই স্বরূপটি হইতেছে—"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ," অর্থাৎ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা—এই উভয়ে মিলিত একটি রূপ, রাধাকৃষ্ণমিলিতস্বরূপ। এই রূপের মাধুর্যের আস্বাদন-জনিত উন্মাদনা রামানন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, আনন্দের আধিক্যে তিনি সম্বিৎহারা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। অথচ এই রামানন্দই কিঞ্চিৎ-কাল পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপ দেখিয়াও সম্বিৎহারা হয়েন নাই, সহজভাবেই কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতেই জানা যায়—রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপের মাধুর্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপের মাধুর্য অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক। শ্রুতি যে পরব্রহ্মকে "রসঘন, আনন্দঘন" বলিয়াছেন, রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গেই তাহার চরমতম পর্যবসান—রসঘনত্বের, আনন্দঘনত্বের, পূর্ণতম-মাধুর্যঘনত্বের চরমতম পর্যবসান এই ভক্তভাবময় রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গেই ; পরব্রহ্মের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ইহার পূর্ববর্তী স্তরই বিকশিত।

শ্রীপাদ শঙ্কর একটি তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখপূর্বক দেখাইয়াছেন—"শান্তি" নামটি ব্রহ্মবাচক। তাঁহার অর্থে এই নামটি পরব্রহ্মের শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেও প্রযোজ্য হইতে পারে, শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপেও প্রযোজ্য হইতে পারে। তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণে এ-স্থলে যে-আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে জানা যায়—পরব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণে, শান্তি-শব্দের ব্যাপকতম অর্থে, কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণমিলিত-স্বরূপ—সুতরাং ভক্তভাবময়—শ্রীগৌরাঙ্গই এই শান্তি-নামের বাচ্য, শ্রীকৃষ্ণ বাচ্য হইতে পারেন না।

পরায়ণঃ। পর (শ্রেষ্ঠ বা সর্বশ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয় বা অবলম্বন) যিনি, তিনি হইতেছেন পরায়ণ (বহুব্রীহি)।

এই নামটি মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে, আদি বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিগণের কয়েকটি শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত এবং তাঁহাদের আনুগত্যে ভজন-পরায়ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজন-রীতি অবগত হওয়ার প্রয়োজন।

তাঁহাদের মতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিষয়মাত্র, আশ্রয় নহেন। সুতরাং তিনি হইতেছেন প্রেমের বিষয়-বিগ্রহ এবং তাঁহার লীলাদিও তদনুরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনিই হইতেছেন সেই প্রেমের আশ্রয় ; সুতরাং তিনি হইতেছেন প্রেমের আশ্রয়-বিগ্রহ এবং তাঁহার লীলাদিও তদনুরূপ—ভক্তভাবময়।

কেবলমাত্র প্রেমের বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রেমের বিষয়াত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধিনী সেবাই পাওয়া যাইতে পারে, প্রেমের আশ্রয়াত্মক-স্বরূপসম্বন্ধিনী সেবা পাওয়া যাইতে পারে না। আবার কেবলমাত্র প্রেমের আশ্রয়বিগ্রহ মহাপ্রভুর সেবায় প্রেমের আশ্রয়াত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধিনী সেবাই পাওয়া যাইতে পারে, প্রেমের বিষয়াত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধিনী সেবা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। উল্লিখিত দুই রকমের সেবার কোনও এক রকমের সেবাতেই উভয়রূপ সেবা পাওয়া যায় না। অথচ উভয়রূপ সেবা-প্রাপ্তিতেই যে সেবা-প্রাপ্তির পূর্ণতা, তাহা অস্বীকার করা যায় না। উভয়রূপ সেবা-প্রাপ্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়া গিয়াছেন—"এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সর্বদাই প্রেমের বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি আস্বাদন করেন। সুতরাং "গৌরাঙ্গ-গুণে ঝুরিতে" পারিলে শ্রীকৃষ্ণলীলার স্ফূর্তি হইতে পারে

(গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে ॥ নরোত্তমদাস ঠাকুরের উক্তি), এবং গৌরপ্রেম-রসার্ণবে ডুবিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণের অন্তর জানিয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত সেবাদ্বারা তাঁহাদের প্রীতিবিধান করা যাইতে পারে (গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ ॥ ঠাকুর-মহাশয়ের উক্তি)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গৌরভক্তভাবময় নহেন বলিয়া, ভক্তভাবে তাঁহারই গৌরস্বরূপের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদির আস্বাদন করেন না। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেও গৌরলীলার স্ফূর্তি হইতে পারে না। এ-সমস্ত কারণেই, উভয়রূপ সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রয়েই, শ্রীগৌরের এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। কৃষ্ণলীলাদির আস্বাদন-লোলুপ গৌরের প্রীতির নিমিত্তও গৌরচরণাশ্রিত সাধকদের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গও শ্রীকৃষ্ণোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ সাধনে গৌরই হইতেছেন সাধকদের পর (পরম বা একমাত্র) অয়ন (আশ্রয়)। এজন্য তাঁহার নাম—"পরায়ণ"। পূর্বোক্ত কারণে মহাপ্রভুতেই এই নামটি প্রযোজ্য, শ্রীকৃষ্ণে ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

আবার "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং" ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২-শ্লোকানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ কলির উপাস্য বলিয়া (অর্থাৎ শ্রীরাম-শ্রীনারায়ণাদির উপাসনাও শ্রীগৌরাঙ্গের আনুগত্যেই বিহিত বলিয়া) তিনি সকল রকমের সাধকের পক্ষেই "পরায়ণ"।

উল্লিখিত বিশেষ অর্থে "নিষ্ঠা," "শান্তিঃ" এবং "পরায়ণঃ"—এই তিনটি নামই যখন কেবলমাত্র মহাপ্রভুতেই প্রযোজ্য, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না, তখন কবিরাজ-গোস্বামী যদি বিসর্গযুক্ত "নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-পাঠ দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি এই পাঠ গ্রহণ করিয়াই মহাপ্রভুতে এই নামত্রয়ের প্রযোজ্যতা প্রদর্শন করিতেন। তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত।

এইরূপে দেখা গেল –বিসর্গযুক্ত "নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ"-পাঠ গ্রহণ করিলে, এই পাঠে কথিত নামত্রয় মহাপ্রভুতে প্রযোজ্য হইতে পারে না বলিয়াই যে কবিরাজ-গোস্বামী অভিসন্ধির বশীভূত হইয়া উল্লিখিত সহস্রনামাংশের পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন, —এইরূপ অভিযোগের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।

জয়তি জয়তি দেবঃ সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ।
জয়তি জয়তি দেবো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥
জয়তি জয়তি দেবঃ সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ।
জয়তি জয়তি দেবো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

(১৭. ৮. ১৯৬৫—২১. ৮. ১৯৬৫)

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকা সমাপ্তা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৭	প্রকাশিত	প্রদর্শিত	১৩৬	২৩	শ্রীগৌরাঙ্গে-স্বরূপ	শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ
৬	১২	খুমারহট্ট	কুমারহট্ট	১৪৫	১	মস্ককরী	মস্করী
৬	১৮	শ্রীবাশ	শ্রীবাস	১৪৬	১৯	ব্রজলক্ষ্মীতরা	ব্রজলক্ষ্মীতয়া
৬	১৯	এবং	'এবং'-শব্দটি থাকিবে না	১৪৬	২৪	স্বেচ্ছয্যাগাৎ	স্বেচ্ছয়াগাৎ
৮	২৩	অবিবাহিতা	অবিবাহিত	১৪৮	৩০	যাঁহো	যাঁহা
১২	২৭	?	,	১৪৯	২২	সর্ব্বেরহমেব	সর্ব্বৈরহমেব
১৪	৭	সেবকের	সেবকে	১৫২	১৩	দৃঢ়ু মতি	দৃঢ়মতি
১৬	২৬	১-১২	২-১২	১৫৮	১৬	কুমুদবনেও	কুমুদবনে,
১৯	২৯	ইহারাই	ইহারই	১৫৯	৭	পঢ়য়াদের	পঢ়ুয়াদের
৩৯	১৫	(প্রভু	প্রভু	১৭২	৫	প্রবোধর	প্রবোধয়
৩৯	১৬	শ্লোক দুইটি	(শ্লোক দুইটি	১৮১	১	চারূ	চারু
৩৯	২২	তত্তেহনুকমাং	তত্তেহনুকম্পাং	১৮৩	১৩	সতুরাং	সুতরাং
৪৭	৩২	প্রেমৃণৈর	প্রেমৃণৈব	১৮৩	২০	পোপীগণের	গোপীগণের
৫০	৬	পঞ্চতীর্থ	পক্ষতীর্থ	১৮৪	৩	কহে	বহে
৫০	২৪	অন্তধান	অন্তর্ধান	১৮৮	১১	ভূমাশ্বচাণ্ডালগোখরম্	ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্
৫২	১৩	ছড়িয়া	ছাড়িয়া	১৮৮	১১	প্রবিষ্টো	ঈশ্বরো
৫৪	৩	চলেতে	চলিতে	১৮৮	১১	তত্রৈব	প্রবিষ্টো
৫৪	২৫	প্রভু যে	(প্রভু যে	১৮৮	১১	১১।১৯।১৬	১।২৯।১৬
৫৭	১	বলিতেছে	চলিতেছে	১৯৪	৮	ভাগবদ্‌বহির্মুখ	ভগবদ্‌বহির্মুখ
৮২	৪	বাসুদেব	বসুদেব	১৯৬	২৮	করিরাছিলেন	করিয়াছিলেন
৮৫	২৬	স্তন্ব	স্তম্ভ	১৯৭	৩২	তন্তুবায়দের	তন্ত্রবায়দের
৯৮	১৭	সাঙ্গোপাঙ্গোস্ত্র-	সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-	১৯৯	৪	নিধারিত	নির্ধারিত
৯৯	১৫	আলোচনার	আলোচনায়	২০৩	৯	স্বখ-	সুখ-
৯৯	২৬	গোবিন্দধনি	গোবিন্দধ্বনি	২১০	১২	স্বয়ং	বিশ্বং
১০২	১৮	প্রস্তাবিত-সম্বন্ধে	প্রস্তাবিত বিষয়-সম্বন্ধে	২১১	২৪	অধোক্ষর	অধোক্ষজ
১০৬	১৫	তাঁহরা	তাঁহারা	২১৪	২১	জল	জাল
১১০	৬	আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	২১৫	১৩	শীঘ্র	শীঘ্রং
১১২	২৩	কখন-	কথন-	২১৬	২১	ধান	ধ্যান
১২৮	১০	প্রখম	প্রথম	২১৮	২৬	ভট্যাচার্য	ভট্টাচার্য
১২৮	১৩	তাহায়	তাহার	২২০	২৩	ধ্যানদি	ধ্যানাদি
১২৮	৩১	গ্রন্থাকারের	গ্রন্থকারের	২২২	৩১	পূজামন্ত্রাদি ও	পূজামন্ত্রাদিও
১৩৩	২০	দিয়ে	দিয়া				

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২৩	১৯	দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাষ্কিকাঃ	দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ
২২৭	৩০	এমন ও	এমনও
২৩১	৯	তান্ত্রিকী	তান্ত্রিক
২৩১	৯	তান্ত্রিক	তান্ত্রিকী
২৩১	১০	সহজ	সহজ*
২৩২	৩২	কৃষ্ণ-নন্দের	কৃষ্ণানন্দের
২৩৭	২৬	কালসন্তরণোপনিষৎ	কলিসন্তরণোপনিষৎ
২৩৭	২৮	মথৈঃ	মখৈঃ
২৪০	৫	যা ত্বয়ি	সা ত্বয়ি
২৪১	২৯	-প্রমাণ বলে	-প্রমাণ-বলে
২৪৩	১২	নিরাকায়া	নিরাকারা
২৪৩	২২	তণুং	তনুং
২৪৩	২৭	নৃ. পূ. তা.	নৃ. পূ. তা.
২৪৪	১৫	সর্বভূতান্ত্ররাত্মা	সর্বভূতান্তরাত্মা
২৪৪	১৬	গো. পু. তা.	গো. পূ. তা.
২৪৬	১১	দর্শয়াত	দর্শয়তি
২৫০	পাদটীকা ২	যোড়শদেবীরই	ষোড়শীদেবীরই
২৫০	ঐ ৫	খিনসূক্তে	খিলসূক্তে
২৫৩	২৭	বেদিকী	বৈদিকী
২৫৬	১০	ভুবানেশ্বরী	ভুবনেশ্বরী
২৬৬	১৪	অসিয়া	আসিয়া
২৭১	৮	বিযরের	বিষয়ের
২৭২	১৪	ব্রাহ্মাণ	ব্রাহ্মণে
২৮৩	২৯	অন্তস্থল	অন্তস্তল
২৯০	৮	একদেবতাবিষয়ত্বাদ্	একদেবতাবিষত্বাদ্”
২৯১	১৯	যদুনাং	যদূনাং
২৯৩	৫	শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতায়	শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়
২৯৫	১৪	রূপ-গুণ-লীলাদিকে,	রূপ-গুণ-লীলাদিকে)
২৯৬	২৩	পাপহতান্নবান্	পাপহতান্নরান্

সংযোজন

ভূ. ২১৪ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন পংক্তির পরে সংযোজনীয় ঃ— (এই গ্রন্থের প্রকাশক হইতেছেন —“স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন-কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩।” “বেলুড় রামকৃষ্ণমঠের অধ্যক্ষ-কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।” “নবম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৯।” সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে বেলুড়-রামকৃষ্ণমঠের অনুমোদিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের ভূমিকা হইতেই কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইতেছে।)

ভূ-২৩১ পৃষ্ঠার ১০ পংক্তিতে “**সহজ**”-শব্দ-প্রসঙ্গে পাদটীকায় নিম্নলিখিত অংশ সংযোজনীয় ঃ—

* মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং মহাপ্রভুর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার রচিত “বৃহদ্‌ভাগবতামৃতম্‌”-গ্রন্থে কামাখ্যাদেবী-সম্বন্ধে যে-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, কামাখ্যাদেবী ছিলেন বৈদিকী দেবী, তখনও তিনি তান্ত্রিকী দেবী ছিলেন না। অথচ সেই কামাখ্যাদেবীকে তান্ত্রিকেরা তান্ত্রিকী দেবী বলিয়া এবং তাঁহার অধিষ্ঠানক্ষেত্র কামগিরিকে একটি পীঠস্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন (তন্ত্রচূড়ামণি-গ্রন্থে)।

ড. রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত — "রাধাগোবিন্দনাথ-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"

প্রভুপাদ শ্রীল প্রানগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন। – পরিপক্ক হস্ত, প্রতিভাশালিনী বুদ্ধি, সুপাণ্ডিত্য এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণা — এই চারিটি থাকিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তোমার এই সংস্করণ হইয়াছে। . . . ভূমিকাংশটি অতি সুন্দর হইয়াছে; বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবদ্ধ এবং বাহুল্য পরিবর্জিত হইয়া শুধু জ্ঞানপূর্ণ তথ্যে ইহা পরিপূর্ণ। জটিল স্থানসমূহের সমাধানে তুমি যেরূপ ধৈর্য এবং যত্নসহকারে সুসঙ্গত অর্থ করিতে প্রয়াস করিয়াছ, তাহা অননুকরণীয়; ইহাতে তুমি সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছ। দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে-সুমীমাংসা করিয়াছ, তাহা মনোরম হইয়াছে। . . . তুমি যে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছ, ইহা সর্বসাধারণের বলিতেই হইবে।

প্রভুপাদ শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ। – এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব ভূমিকাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার সুবিদা হইয়াছে। . . . শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে অন্যের ব্যাখ্যা দূষণ করিয়া নিজ মতে শাস্ত্রানুগত যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ অথবা তাঁহাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই; বৈষ্ণবোচিত রীতিতেই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবুর যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার আছে, তাহা তৎকৃত টীকা পাঠেই স্পষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ ভাগ্যবানের পক্ষেই শ্রীগৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকা লেখা সম্ভব। বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত এই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। . . . এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ ব্যাখ্যাসম্বলিত একটি অপূর্ব সম্পদ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীল ভাগবত কুমার গোস্বামী, এম. এ., পি-এইচ্. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। – আপনার ব্যাখ্যানচাতুর্য ও লিপিকৌশল বড়ই হৃদয়াকর্ষক। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অপ্রকৃত ভাবরাজি এমন উজ্জ্বল ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীশচীনন্দনের কৃপাপাত্র, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার এই প্রেমভক্তির বিবৃতি উজ্জ্বলরসের উপাসকগণের কণ্ঠহার রূপে বিরাজ করুক, ইহাই প্রার্থনা। 'ভূমিকাদিতে আপনি (অপ্রকটে) স্বকীয়াবাদ অবলম্বন করিয়াই প্রেমধর্মের অপূর্ব অপ্রাকৃত মহিমা প্রকটন করিয়াছেন ঃ এপথের যাঁহারা ভাগ্যবান পথিক, তাঁহার আপনার প্রদর্শিত যুক্তিপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের বরেণ্য শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর উপদিষ্ট এই পথ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। আপনার প্রকাশিত শ্রীশ্রীচরিতামৃত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে-আনন্দ পাইলাম, তাহা ভাষায় লিখিয়া আপনাকে জানাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এপর্যন্ত এই গন্থের যত সংস্করণ দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় আপনার সম্পাদিত সংস্করণই তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

শ্রীল রাখালানন্দঠাকুর-শাস্ত্রী (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায়)। . . . বঙ্গভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম প্রকাশ করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য সম্পাদক-মহাশয় ভূমিকার মধ্যে — যেসকল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর মুলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা গ্রন্থপাঠকগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাটিও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (বহু গোস্বামিগ্রন্থের অনুবাদক)। – শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এমন প্রাঞ্জল সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা বৈষ্ণবজগতের সম্পদবিশেষ।

পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সংখ্যা-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, জ্যোতিভূষণ। . . . এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এরূপ সুসজ্জিতভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া কোনও সংস্করণই বাহির হয় নাই, হইবে কি না তাহাতেও আমার সন্দেহ আছে। কি সিদ্ধান্ত পরিবেষ, কি ভাষাসন্নিবেশ --- সর্বপ্রকারেই এই সংস্করণটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী – ছয় গোস্বামীর মহাদানের প্রতিটি অক্ষর আস্বাদনে-বিতরণে রাধাগোবিন্দের জুড়ি নেই গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে। . . . আগামী সহস্র বৎসর তাঁহার দান ভক্তিগঙ্গার পূতধারায় মানবগতিকে জীবন্ত রাখিবে।

অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী – শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কে ও বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্বের স্থাপনকল্পে এমন সামগ্রিক ও সার্থক দার্শনিক আলোচনা তাঁহার পূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নাই। . . . আধুনিক কালের উচ্চতর গণিততানুসীল ও বিজ্ঞানচর্চা তাঁর শাস্ত্রবিচারে তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা বিধান করে।

উদ্বোধন – ড. রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সুবিদিত। তাঁহার সুবৃহৎ ভূমিকা টীকাসম্বলিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গদেশের অমূল্য ও অনপম সম্পদ।

মূল্য ঃ ২,৫০০.০০ (৬ খণ্ড)